বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ২০১০

প্রকাশকাল
১৫ জানুয়ারি ২০১০

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: অজ্ঞাত
[সংগ্রহ জাঈদ বিন কালাম]

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২৫০.০০ টাকা
২৫০.০০ রুপি
৭ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

ষোল শতাব্দীর শেষ ও সতের শতাব্দীর শুরু– এই সময়কালে ইউরোপ মহাদেশে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত করে পুঁজিবাদী চিন্তা চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রধানত ঐ সময়কার উপন্যাস সৃষ্টি হয়।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর হাতে তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটে। এই সময়কার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ সামন্তবাদী এবং কেউ কেউ পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা ছিলেন উদার মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তার অনুগামী। চিন্তার এই ধারাবাহিকতায় তাদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল কখনও গ্রামভিত্তিক, কখনও-বা নগরকেন্দ্রিক। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বিষয়বস্তু, গঠনরীতি, প্রকরণ ইত্যাদির প্রভেদের সাথে সাথে তাদের উপন্যাস একসময় সামগ্রিকতা থেকে সরে এসে, হয়ে পড়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ঔপন্যাসিকগণ প্রধানত তাদের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিজেদের লিখিত উপন্যাসে এ-অঞ্চলের গণমুক্তির উপায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিলেন অনভিজ্ঞ ও দ্বিধান্বিত।

বৃটিশদের শাসন নির্যাতন মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ববাংলার যে-সকল বঞ্চিত মানুষের অবদান অনস্বীকার্য, তারাই '৫২-র ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগ এবং পরে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কর্তৃক দমন-অবদমন, নির্যাতন ও শোষণের চূড়ান্ত মোকাবেলা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জন করেন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। অথচ এটা লক্ষণীয় যে বাঙালিদের মধ্যে বিশেষত পিছিয়ে-পড়া মুসলমানদের লড়াই-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোতে নিম্নবর্গের মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পায়নি বলে নিম্নবর্গের অবদান বা আত্মত্যাগও এ-অঞ্চলের মূলধারার ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। এছাড়া '৪৭ ও '৭১-এ কত দরিদ্র হিন্দু তাদের ভিটে-মাটি ছেড়ে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড থেকে চিরবিদায় নিয়েছে আবার ভারতে কত মুসলমানকে শিকার হতে হয়েছে নির্মম পরিস্থিতির– এসব ক্ষেত্রেও শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে একচ্ছত্রভাবে সাধারণ জনগণের পক্ষ অবলম্বন করতে সম্ভবত দ্বিধান্বিত ছিলেন এমনকি তারা এখনো দ্বিধান্বিত। কেননা তারা রাজনৈতিকভাবে কোন্ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী তা তাদের অধিকাংশেরই নিজেদের কাছেও হয়ত পরিষ্কার নয়– এ নিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আজ প্রশ্ন উঠেছে। নতুন প্রজন্মের ধারণা 'শিল্পীর রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে নেই'– এ-কথার মাধ্যমে একটি শ্রেণী মূলত সুবিধাবাদের জায়গাতেই নিজেদের রাখতে চায়!

বাংলাদেশের উপন্যাস নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে বঞ্চিত মানুষের রাজনৈতিক ভাষা– যার মূলে থাকবে না ঈশ্বর, থাকবে না একক বা কতিপয় ব্যক্তি– থাকবে বৃহত্তম সাধারণ জনগণ, এই আমাদের প্রত্যাশা ।

সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
১৫.০১.২০১০

সম্পাদকীয়: দুই

'পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উপন্যাস রচনার উত্তম ক্ষেত্র'– কথাটি এই অর্থে সঠিক যে, এই ব্যবস্থার চরম শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে যে-তাগিদ সৃষ্টি হয়– তাকে শিল্পরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে 'ডিটেইল'-এর সুযোগ নেয়া যায় ।

আমাদের মতো দেশগুলোতে প্রধান সমস্যা হল, এখানকার পুঁজিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সম্ভাব্যতাকে, সোভিয়েত রাশিয়ার সামন্ত-পরবর্তী সমাজতন্ত্রের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে না-দেখা । সোভিয়েত রাশিয়ার সামন্ত-বিরোধ সেখানকার উপন্যাসে যেভাবে স্থান করে নিতে পেরেছিল; আমাদের মতো দেশগুলোতে পুঁজিতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এখানকার উপন্যাসে সেভাবে প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে দ্বিধান্বিত । এর কারণ হল, এখানকার মানুষের মনের প্রকৃত চাওয়াকে সমাজবাদী রাজনীতিকগণ যেমন বুঝতে পারছেন না, একইভাবে শিল্পস্রষ্টাদের মধ্যে, বিশেষ করে ঔপন্যাসিকগণ অনেক ডিটেইলের সুবিধা পেয়েও চরিত্র সৃষ্টিকালে বিষয়টিকে কাজে লাগাতে পারছেন না । "সোভিয়েত-রাশিয়ার জনগণ আমাদের জনগণের চেয়ে অধিক সচেতন ছিল বিধায় তাদের সামন্ত-বিদ্বেষ যতখানি চরম হয়ে উঠেছিল, আমাদের জনগণ তুলনামূলক কম সচেতন বলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ততখানি চরম হয়ে উঠছে না এবং এর ফলেই এখানকার ঔপন্যাসিকদের মনোজগতকে বিষয়টি স্পর্শ করতে পারছে না"– বিষয়টি মোটেও এরকম নয় বরং আমাদের জনগণ প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা ও শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজেদের অনাস্থা ও সোচ্চার অবস্থানের কথা নানাভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– জনগণের সে-ভাষা হয়তো এখানকার ঔপন্যাসিকগণ বুঝতে পারছেন না । মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বড় ঘটনার মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব এরা খুঁজে পান না; অথচ মুক্তিযুদ্ধের ফল হিসেবে সামন্তমূল্যবোধ লালনকারী ধনী আরও ধনী হল, কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত চুরি-ডাকাতির সুযোগ পেল কিন্তু

অধিকাংশ সাধারণ মানুষের পাতে জুটল না তেমন কিছুই। এক্ষেত্রে আমাদের ঔপন্যাসিকরা সোভিয়েত বাস্তবতার জমিদার-জমিদারনী ও কুলাকদের সঙ্গে এখানকার রাজনীতিদস্যু, ভূমিদস্যু, বাজার-দস্যু এবং বেপরোয়া সুদ ও মুনাফাখোরদের এক করে দেখার প্রাসঙ্গিকতা বোধ করি খুঁজে পান না!

বাংলাদেশ যে আলাদা একটি রাষ্ট্র, বাঙালিত্ব একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি– এ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির মানুষের লড়াই-সংগ্রামের স্বরূপ ও স্বপ্নটা কী, কোন্ অবস্থা ও অবস্থান থেকে কোথায় আমরা যাচ্ছি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এ-অঞ্চলের উপন্যাস বড় ধরনের অবদান রাখতে পারত। শিল্প-সাহিত্যের অন্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় উপন্যাসে অনেক বেশি মূর্ত, চাক্ষুষ ও বিস্তৃত রূপ নিয়ে বিষয়গুলো আবিষ্কার করার সুযোগ থাকলেও, শ্রেণী-বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সেই দ্বন্দ্বমুখর ছাপগুলো উপন্যাসে তুলে ধরা হয়নি।

উপন্যাস একটি জাতিকে পথ পর্যন্ত দেখাতে পারে; সেদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এখানকার জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে সবসময়ই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন; প্রতিক্রিয়াজাত সেই গণরোষ বা গণপ্রেমকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন এখানকার শাসক গোষ্ঠী; একইভাবে একে শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়ে ওঠেননি এখানকার ঔপন্যাসিকরাও। ব্রিটিশ বিরোধিতা কিংবা পাকিস্তান বিরোধিতার বিভিন্ন পর্যায়ে– এখানকার জনগণ বারবার ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন– সফলও হয়েছেন– অথচ সেই পরিস্থিতির পূর্ব-ইঙ্গিত আবিষ্কারে অথবা এর পরবর্তী স্বপ্ন নির্মাণে বাংলাদেশের উপন্যাস ভূমিকা রাখতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। যার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি বড় ঘটনা, যুদ্ধের পূর্বে লেখা কোনো উপন্যাসে সেভাবে আভাস বা ইঙ্গিত হিসেবে উঠে আসেনি। একইভাবে বলা যায়, প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেল– অথচ সামগ্রিকতা নিয়ে শ্রেণী-বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর সফল কোনো উপন্যাস আজ অবধি লেখা হল না! এমনকি যাঁরা জাতীয়তাবাদ কিংবা নারীবাদকে তাদের উপন্যাসে প্রধান বিষয় করেছেন, তাদের মধ্যেও শ্রেণী-বৈষম্যকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রকটভাবে লক্ষ্যণীয়।

বর্তমানে তো উপন্যাস লেখার জন্য নিবেদিত প্রাণ একজনও নেই বললে চলে। যারা দু'চার জন আছেন বলে নিজেরা মনে করেন, তাদের আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় শূন্যের কোঠায় অর্থাৎ বাস্তবের বল্গাহীন রাজনীতির সাথে প্রায় সহাবস্থানের মাধ্যমে সমাজবাদী রাষ্ট্র-ভাবনা উপন্যাসে পর্যন্ত স্থান দিতে এরা নিরুৎসাহী। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিতন্ত্রের ছায়াতলেই এরা বড়জোর কথিত উদার মানবতাবাদের পোষ্য; ঝুঁকিহীন নিরাপদ এক কথিত শিল্পী-মানস এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে বহুদিন ধরে। প্রকৃত প্রস্তাবে এরা নয়া ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার অনুগামী।

বেনিয়া সংবাদ পত্রিকার ঈদসংখ্যাগুলোতে যে উপন্যাস নামধারী বড়গল্প ছাপা হয়, সেগুলো অধিকাংশ সময়ই হয় নিম্নমানের, অপাঠ্য ও অরুচিকর। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ যদি ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে ঠাসাও থাকে তারপরও দূরবর্তী

এমনকি নিকটবর্তী কোনো পূর্বাভাস নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের উপন্যাসের যেন কোনো ক্ষমতাই নেই ! যেমন ভূমিকম্প ও জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে বাংলাদেশ যে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোনো উপন্যাস লেখা হয়নি। এমনকি ভবিষ্যতে কোনোমতে টিকে থাকবে সে-ধরনের মোটামুটি মহিমাসম্পন্ন উপন্যাসও এ সময়ে লিখিত হচ্ছে কি-না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ এবং উদ্বেগের কারণ রয়েছে।

অন্যদিকে 'ঔপন্যাসিক আবার উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন কেন'– এই মানসিকতা লালন করেন আমাদের ঔপন্যাসিকগণ। যা সম্ভবত একটি মানসিক সমস্যা মাত্র। আমাদের ধারণা, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা চরিত্র ও স্বপ্ন যারা নির্মাণ করেন, ভাষার ওপর যাদের বিশেষ দক্ষতা, সেই ঔপন্যাসিকগণ মানসিকভাবে চাইলেই শুধু উপন্যাস কেন বরং অন্য আরও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে সক্ষম হবেন। এটি চাপিয়ে দেয়ার কোনো ব্যাপার নয়, এই পোড়ো দেশে এটি আমাদের নিতান্ত প্রত্যাশা। তা-না-হলে, উপন্যাস অধ্যাপকদের হাতে পড়ে এককেন্দ্রিক ব্যাখ্যার জিনিসে পর্যবসিত হবে। এতে উপন্যাসের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে পাঠক কখনো-বা ভুল সংবাদ ও সশ্লেষের মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারেন।

বাংলাদেশ কবিতার দেশ হলেও, উপন্যাসও এ-ভাষায় সংখ্যার দিক থেকে একেবারে কম লিখিত হয়নি; শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণীবোধ তথা শ্রেণী-সংগ্রাম এসব উপন্যাসে প্রধান হয়ে না-অসলেও উদার মানবিক দৃষ্টিতে এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভালো উপন্যাস রয়েছে। আবার শ্রেণীচিন্তা সমৃদ্ধ উপন্যাস যে বাংলাদেশে একেবারেই লিখিত হয়নি, তাও নয়। হয়তো এ ধরনের উপন্যাস দু-চারটির বেশি হবে না!

সব মিলিয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের মতো একটি ক্ষেত্র নিয়ে মূল্যায়ন-সংখ্যা করা হালখাতার সীমিত ক্ষমতার কাছে এক ধরনের অসম্ভবই বটে। তারপরও এ বিষয়ে সামগ্রিক কোনো বই বা পত্রিকা না-থাকার কারণে হালখাতার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুসারে সে তার চেষ্টা প্রদর্শন করল।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
১৫.০১.২০১০

সূচি

বাংলাদেশের তেল–গ্যাস–কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা'র প্রতিক্রিয়া

তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা কেমন হলো?
মাহ্‌বুব-উল-আলম ০৮

জনগণের পক্ষে এক বিস্ফোরক দলিল
অপর্ণা হাওলাদার ১৭

প্রবন্ধ

বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ, শিল্পজিজ্ঞাসা ও আঙ্গিক বিবেচনা
সৈয়দ আকরম হোসেন ২০

জাতিরাষ্ট্র ও উত্তর-উপনিবেশবাদ: বাংলাদেশের উপন্যাসপাঠের ভূমিকা
মাসুদুজ্জামান ২৮

বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা: আত্মপরিচয়ের ভাষ্য
হামীম কামরুল হক ৬৪

বড় প্রবন্ধ

পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা
যতীন সরকার ৮৫

প্রবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধোত্তর নবচৈতন্য ও উপন্যাসের শিল্পরীতি
রফিকউল্লাহ খান ১৩৬

প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস
রিষিণ পরিমল ১৪৭

বড় প্রবন্ধ

বাংলাদেশের উপন্যাস
বিশ্বজিৎ ঘোষ ১৭৮

প্রবন্ধ

বাসনার নারীভাব: আহমদ ছফার 'গাভী বিত্তান্ত'
সলিমুল্লাহ খান ২২০

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুই উপন্যাস
মা মু ন হু সা ই ন ২২৯
শওকত আলীর উপন্যাস: শোষিত শ্রেণীর অসহায়ত্ব ও সংগ্রামের প্রকৃতি অন্বেষণ
ফ রী দু ল আ ল ম ২৫৬
সত্যেন সেনের উপন্যাস ও অন্যান্য
নূ র মো হা ম্ম দ ২৬৬
সত্যেন সেনের ‘পদচিহ্ন’
ম ফি দু ল হ ক ২৬৯
মুসলমানমঙ্গল: ‘যুক্তি’ ও বিভ্রান্তি
শা ন্ত নু কা য় সা র ২৭৪

প্রবন্ধ
আবুল ফজলের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা
সৈ য় দ আ জি জু ল হ ক ২৯০
পদ্মার পলিদ্বীপ: দ্বীপদেশের মহাকাব্য
জা হে দ স র ও য়া র ২৯৭
ক্রীতদাসের হাসি: প্রতীকের আড়ালে সমকাল
সৌ মি ত্র শে খ র ৩০১
সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস
মো স্ত ফা তা রি কু ল আ হ সা ন ৩১৫
আবুবকর সিদ্দিকের ‘জলরাক্ষস’ ও ‘খরাদাহ’
ক বী র চৌ ধু রী ৩২৬
বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সেলিনা হোসেনের গায়ত্রী সন্ধ্যা
সৈ য় দা না জ নী ন আ খ তা র ৩৩৭
চার উপন্যাসের জহিরকথন
কা ম রু জ্জা মা ন জা হা ঙ্গী র ৩৪৭

প্রবন্ধ
জনপ্রিয় উপন্যাস কি সাহিত্য নয়?: প্রসঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ
ফে র দৌ সী সু ল তা না ৩৫৯

প্রবন্ধ
মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’: কলাকৈবল্যবাদী উপন্যাস?
ব দি উ র র হ মা ন ৩৬৭
ররশীদ করীম : উপন্যাস সাহিত্যের ‘উত্তম পুরুষ’
দী প ং ক র গৌ ত ম ৩৭৮
জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণা: নারীবাদ ও সমাজ-বাস্তবতা
আ হ মা দ মা য হা র ৩৮২
উড়ুক্কু: বিপন্নতার বর্ণমালা, প্রতিবাদের আখর
গো পা দ ত্ত ভৌ মি ক ৩৮৯

বা ং লা দে শে র তে ল–গ্যা স–ক য় লা খ নি জ স ম্প দ অ ধি কা র স ং খ্যা ’র প্র তি ক্রি য়া

তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা কেমন হলো?

মাহ্‌বুব-উল-আলম

ঘটনাচক্রে ‘হালখাতা’ নামের ত্রৈমাসিকের ‘তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা’টি আমার হাতে আসে। এতদিন টিভি ও পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের খনিজসম্পদ বিষয়ে খণ্ডিত আলোচনা সমালোচনা দেখেছি ও পড়েছি। হালখাতা’র মাধ্যমে এবারই প্রথম এ-ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হই। বলতে গেলে দেশের সবচাইতে প্রয়োজনীয় এবং একমাত্র সম্বল তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ নিয়ে ক্ষমতাসীনদের ছিনিমিনি খেলার ভয়াবহ চিত্র বিভিন্ন গুণিজনের ভাবনায় সিক্ত হয়ে সমন্বিতভাবে পুস্তকাকারে (ত্রৈমাসিক সাময়িকী) প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকাসংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বুদ্ধিসঞ্জাত এসব ভাবনা জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে, উদ্দীপিত করবে। অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্যকরণীয় এই

আন্দোলনে দেশের মালিক জনগণ সুসংহত হয়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আন্দোলনকে আরো বেগমান, আরো কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ-ব্যাপারে এ-সংখ্যাটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য এই সংখ্যা ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার।

মুষ্টিমেয় ধনিক স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠে নিয়ামক আর 'জনগণ' থাকে উপেক্ষিত। অনেকেই বলেন, গরিবের সুন্দরী বউ সকলের ভাবী। বিত্ততাড়িত সবলেরা লুণ্ঠন করে দুর্বলের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল। গরিবের বিন্দুবিন্দু 'যৎকিঞ্চিৎ' সম্পদ ধনিক শ্রেণীর জন্য গড়ে তোলে বিশাল সম্পদের পাহাড়। আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রাধান্যলাভ মানবসভ্যতায় এক অনন্য ঘটনা, মানবসভ্যতায় বিরল প্রাপ্তি। ব্যক্তির সমন্বয়েই পরিবার, সমাজ ও দেশ। ব্যক্তির সম্মান, প্রাধান্য, ইচ্ছার প্রতিফলন জনমানস গঠনে প্রবলভাবে কার্যকর হয়। জনআকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় যখন সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন কোনো শক্তিই তাকে রুখতে পারে না। ইতিহাসও তাই বলে। সেই ইতিহাস তৈরি হয় যে টুকরো টুকরো সময়ের সমন্বয়ে, সেই সময়েরই দাবি পূরণ করেছে হালখাতার এ-সংখ্যাটি।

'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি' আওয়ামীবান্ধব ও বিএনপিবৈরি– জনমনের এই বিশ্বাসে চিড় ধরাবে এই সংখ্যা। ক্ষতিকর এই জনভাবনা থেকে নিজেদেরকে বের করে আনতে পারবে– জাতীয় কমিটির জন্য এ এক বড় পাওয়া। এতে পাঠক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, জাতীয় কমিটি কোনো দলের লেজুড় নয়, কোনো দলের বৈরিও নয়। দেশের স্বার্থের বাইরে তাদের কোনো চাওয়া নেই।

এবার সংখ্যাটির তথ্যাশ্রয়ী রচনাগুচ্ছের প্রতি মনোনিবেশ করা যাক। প্রথম রচনা শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'জাতীয় খনিজ সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন' প্রবন্ধে মাগুরছড়া ও টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের আগুনে পুড়ে যাওয়া বিপুল ক্ষতির বিবরণ যেমন পাওয়া যায় তেমনি বিভিন্ন সরকারের সাথে লুণ্ঠক বহুজাতিক কোম্পানির অসম চুক্তির তথা বাংলাদেশের একমাত্র সম্বল চুরির কাহিনী জানা যায়। সরকারের 'অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, দলীয় সংকীর্ণতা'র কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি খনিজসম্পদ ও তেল-গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি কোম্পানির পরিবর্তে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির তাগিদও আছে এ লেখায়। আছে লুণ্ঠন ও দুর্নীতিকে রোধ করার দৃঢ় প্রত্যয়। এছাড়াও রয়েছে এশিয়া এনার্জির চুক্তির ক্ষতিকর দিকের বিবরণ। দ্বিতীয় রচনা বদরুদ্দীন উমরের 'বাঙলাদেশের তেল-গ্যাস রক্ষা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে তিনি 'বিদেশি কোম্পানিকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর শর্তে গ্যাস উত্তোলনের অনুমতিদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে' সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। গ্যাস রফতানি ও চুক্তির ক্ষতিকর দিক উদ্ঘাটনের চাইতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান লেখক ও চিন্তকের কাছ থেকে আমরা তথ্যনির্ভর দিক-নির্দেশনা আশা করতে পারি।

আনু মুহাম্মদের সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় তাঁর কথা দিয়েই শুরু করি: 'এই সম্পদ উত্তোলন করতে হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে, জনগণের কাজে এর প্রতিটি বিন্দু ব্যবহার করা হবে এবং কোনো বহুজাতিক কোম্পানি বা বিদেশি কোম্পানি বা তাদের লুটেরা দেশি সহযোগীদের স্বার্থে উন্নয়নের কথা বলে গ্যাস বা তেল বা কয়লা তুলে বিদেশে পাচারের ব্যবস্থা হবে না।' তিনি বলেন, তাঁরা চুক্তির বিরোধী নন, কিন্তু সেই চুক্তি হতে হবে ন্যায়সঙ্গত শর্তে এবং মালিকানা থাকবে জনগণের। বিদেশি কোম্পানির কাছে ব্লক ইজারা নয়, বরং সমুদ্রসীমায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেই নিজের সম্পদ রক্ষা করতে হবে। সমুদ্রসীমার ওপর আমাদের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠাই বেশি জরুরি। সরকারের চরম দায়িত্বহীনতার কারণেই ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র-অঞ্চল নিজেদের বলে দাবি করতে পারছে। বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দিয়ে বাংলাদেশের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তার জন্য যে-প্রয়োজনীয় ও কার্যকর-ব্যবস্থা গ্রহণ করা বেশি জরুরি সে-ব্যাপারে সরকারের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। তাঁদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর অপপ্রচারের তথ্য-বিশ্লেষণনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য জবাব দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনের সহজাত ক্ষমতা এবং আন্দোলনের ন্যায্যতা তিনি এখানেও প্রদর্শন ও প্রমাণ করতে পেরেছেন।

হায়দার আকবর খান রনোর 'গ্যাস ও কয়লা প্রসঙ্গ: সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও' এই সুলিখিত প্রবন্ধে 'বিদেশি কোম্পানির সেবাদাস ও স্বার্থরক্ষকে'র কথা যেমন আছে, গ্যাস রপ্তানির ক্ষতিকর প্রভাবের বিবরণও এখানে আছে। সাথে আছে ব্রিটিশ কোম্পানি এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষতিকর ও স্বার্থবিরোধী কর্মতৎপরতার বিবরণ এবং নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্নতা। প্রবন্ধে তিনি হিসেব কষে দেখিয়েছেন গ্যাসের জন্য খনন ও অনুসন্ধান কাজে বিদেশি কোম্পানির তুলনায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের খরচ কত কম। অপ্রয়োজনে বিদেশিদের ডেকে এনে আমাদের সম্পদ ডাকাতি করার সুযোগ দানের জন্য একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও আমলার বিরুদ্ধে তিনি দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

বদরুল ইমামের 'গ্যাস রপ্তানির ধারাটি সোজা ভাষায় বলবেন কি?' প্রবন্ধে লেখক গ্যাস রপ্তানিসংক্রান্ত ধারাগুলোর বিববণ ও ব্যাখা প্রদান করেছেন। একই বিষয়ে সরকারি ও আন্দোলনকারীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে ধারাগুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে মডেল চুক্তি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে তাদের আস্থায় এনে তা প্রণয়নের তাগিদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করে অধ্যাপকের পা ভাঙার চেয়ে এটাই উত্তম পথ।

আবু আহমেদের 'সমুদ্রের গ্যাস আসলে কার?' প্রবন্ধে লেখক আন্দোলনকারীদের 'মিছিলে পুলিশের বর্বরোচিত হামলা'র নিন্দা যেমন করেছেন, সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ রপ্তানির পক্ষে অবস্থান নেয়ায় তিনি তাদের সমালোচনা

করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বাপেক্সকে ইনটেনশনালি দুর্বল করা হচ্ছে এবং আরও দেখিয়েছেন, বিদেশি কোম্পানির হাতে নিজেদের গ্যাস তুলে দিয়ে তাদের রপ্তানি করার সুযোগ দিলে আমাদের কী পরিমাণ ক্ষতি হবে। এম এম আকাশের 'গ্যাস রপ্তানির সুযোগ রেখে চুক্তি: জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী' প্রবন্ধে লেখক আমাদের নিজস্ব সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। সেজন্য দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে অধিকতর স্বার্থানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন :

ক. কূটনৈতিক তৎপরতা
খ. বিচারের জন্য জাতিসংঘের কাছে উত্থাপন

তাঁর লেখায় বিদেশি দু'টি কোম্পানির সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে গ্যাস রপ্তানির ক্ষতিকর দিকের বর্ণনা যেমন আছে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এই চুক্তি বাতিলের দাবিও আছে। তাঁর লেখায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর সাহিত্যমানসম্পন্ন ভাষ্য জনমানসকে আলোড়িত করার ক্ষমতা রাখে।

মো. হোসেন মনসুরের 'গ্যাস উত্তোলন ও জাতীয় স্বার্থরক্ষা: দুই-ই প্রয়োজন' প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি দাবি করেছেন, ২০০৮ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি একটি সেমিনার আয়োজন করেন এবং সে-সেমিনারে ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক বদরুল ইমাম বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকলেও সেদিন মডেল পিএসসির বিরুদ্ধে জোরালো কোনো যুক্তি কেউই দাঁড় করাতে পারেননি। তাঁর এধরনের বক্তব্য খুবই দুঃখজনক। এব্যাপারে তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানি, এর বহু বছর আগে থেকেই এবং কেয়ারটেকার সরকার আমলে মডেল পিএসসি ২০০৮ সংশোধিত আকারে প্রণীত হলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এর বিরোধিতা করে তাঁদের জোরালো বক্তব্য জাতির সামনে প্রকাশ করে আসছেন, দেশব্যাপী জনমত গঠন করে আন্দোলন জোরদারে সচেষ্ট রয়েছেন এবং সর্বোপরি এবিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলেই সম্যক অবহিত। তাই লেখকের এমন ভাষ্য গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিনা সে-প্রশ্নের অবতারণা তিনি নিজেই করলেন বলে অনেকেই ভাববেন। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি এমন বিতর্কিত বক্তব্যের অবতারণা করায় তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে– এটা তিনি উপলব্ধি করলে এমন তথ্য পরিবেশন করতেন কিনা সে-প্রশ্ন রয়ে যায়। এরপর তিনি গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কথিত চুক্তির পক্ষে এই যুক্তিগুলো তুলে ধরেন, যা 'বিদেশি লুণ্ঠনকারী ও তাদের সহযোগী জাতীয় বেঈমানরা' (অন্যান্য লেখকদের ভাষায়) বলে থাকেন :

ক. যেহেতু অনুসন্ধান করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই সেহেতু বিদেশি কোম্পানি দিয়ে কাজটি করিয়ে নেয়া যুক্তিসঙ্গত, যাতে আমরা মজুদ গ্যাসের পরিমাণ জানতে পারি;
খ. এই চুক্তির ফলে ভারত ও মায়ানমার আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে ড্রিলিং করে গ্যাস নিয়ে যেতে পারবে না;
গ. আগের পিএসসিগুলোতেও গ্যাস রপ্তানির সুযোগ আছে, কিন্তু তাতে রপ্তানির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি ।
ঘ. পেট্রোবাংলার অনুমতি ছাড়া গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না;

এর পরের বক্তব্যে তিনি নিজেই নিজেকে উন্মোচিত করেছেন এভাবে, '... বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় তা বর্তমান সরকার করতে পারে না, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তিধর প্রেসিডেন্ট মি. ক্লিনটনের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ৫০ বছরের মজুদ রেখে গ্যাস রফতানি করা যেতে পারে। ... কেউই বিশ্বাস করবে না আওয়ামী লীগ সরকার গ্যাস রফতানির অনুমতি দেবে। আর ধারণাপ্রসূত কিংবা আবেগতাড়িত হয়ে কোনো কর্মসূচি দিয়েও দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কারও কাম্য নয়।' তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই কেউ খুঁজে পেতে পারেন কেন তিনি পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এবং তিনিই যেহেতু চেয়ারম্যান সেহেতু গ্যাস রক্ষার ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হওয়ার আর কোনো সুযোগ তাঁরা না-ও দেখতে পারেন। অন্যান্য লেখকগণ কোম্পানির যেসব দেশীয় দোসরদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন তিনি যে তাদেরই গোত্রভুক্ত তা নিজেই প্রমাণ করার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে জনগণের ভাববার সুযোগ তিনি নিজেই করে দিয়েছেন– তাঁর লেখায় এমন ভাবনার খোরাক রয়েছে বলে অনেকের কাছেই মনে হবে। নাইজেরিয়াসহ অন্যান্য দেশের পরিণতি থেকে তিনি শিক্ষা নেননি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এরপর আন্দোলনকে আরো বেগবান করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই এমন ভাবনা জাতীয় কমিটি ভাবতেই পারে। ফেরদৌসী সুলতানার 'তেল-গ্যাস জ্বালানি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক কয়লা ও গ্যাসসংক্রান্ত চুক্তির ক্ষতিকর পরিণতি তুলে ধরেছেন। দেশীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্যাস উত্তোলনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রীয় কোম্পানি পিডিভিএসএ, সৌদি আরবের সৌদিআমার্কো ও মালয়েশিয়ার পেট্রোনাসের উদাহরণ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে অবহেলার সমালোচনা করেছেন তিনি ।

আদিত্য চৌধুরীর 'তেল-গ্যাস-কয়লা সংকট সরকারের অনিচ্ছার ফসল' প্রবন্ধে লেখক পেট্রোনাস, নাইকো বা সৌদিআমার্কোর ন্যায় বাপেক্সকে সরকারি সহযোগিতা প্রদান না-করার জন্য আফসোস করেছেন। কারো কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে নমুনা চুক্তির মূল শর্তকে তিনি 'দেশের স্বার্থবিবর্জিত' বলে অভিহিত করেছেন। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পূর্বে চুক্তিবদ্ধ না-হওয়ারও তাগিদ দেন তিনি ।

শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ড. তামিম নামে এক অনুগত উপদেষ্টাকে নিয়োগের ব্যবস্থা করে অতি তাড়াতাড়ি সাগরের তেল-গ্যাস লুণ্ঠন ও পাচারের জন্য মডেল পিএসসি-২০০৮ প্রণয়ন করে।' উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বর্তমান মডেল পিএসসি ২০০৮ বাতিলের দাবি জানান।

মো. নুরুল ইসলামের 'বাংলাদেশের সংবিধান : পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ১৯৭৪ ও মডেল পিএসসি ২০০৮, প্রবন্ধে লেখক সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট-১৯৭৪ ও অনুমোদিত মডেল পিএসসি-২০০৮ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন,

ক. সংবিধান অনুসারে গ্যাসসম্পদের মালিক জনগণ।

খ. পেট্রোবাংলার পক্ষে সমুদ্রাঞ্চলে পাইপলাইন নির্মাণ করে স্থলভাগে গ্যাস আনা সম্ভব হবে

না। ফলে ১০০ ভাগ গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাবে পেট্রোবাংলাকে সম্মত হতে হবে।

গ. রপ্তানির ধারা বাদ দিয়ে যেসব আইওসি সম্মত হবে তাদের সুযোগ প্রদান করা উচিত।

ঘ. মডেল পিএসসি ২০০৮-এর ধারায় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার পরিবর্তে আইওসিগুলোর

সুবিধাপ্রদানকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. রপ্তানির ধারা বাদ দিয়ে পিএসসির নির্ধারিত দামে সম্পূর্ণ গ্যাস ক্রয় করা দেশের জ্বালানি

নিরাপত্তার জন্য অধিক সহায়ক।

নূর মোহাম্মদের 'নমুনা পিএসসি ২০০৮ : সংক্ষিপ্ত নমুনা পর্যালোচনা' প্রবন্ধে লেখক গ্যাস রপ্তানিকে দেখেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন এই ভাবে, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশীয় দালালদের যেমন রয়েছে বিপুল মুনাফা অর্জন ও ঘুষ গ্রহণের প্রশ্নে সীমাহীন নির্লজ্জতা তেমনি আছে কূটকৌশলের অভিজ্ঞতা।' তিনি সুললিত ভাষায় 'সাম্রাজ্যবাদ, বহুজাতিক তেল কোম্পানি ও তাদের এদেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আরো বেশি বেশি করে সম্পৃক্ত' করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ধারা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করবার স্বাধীন ক্ষমতা থাকবে ঠিকাদারের।

নমুনা পিএসসির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় তিনি তিনটি বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন :

ক. চুক্তিতে বর্ণিত এলাকার আইনগত ভিত্তি নেই ।
খ. চুক্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অসঙ্গতি স্থাপন করা আছে যাতে আইওসি নিজেদের স্বার্থে তা
ব্যবহার করতে পারে ।
গ. নিজ দেশের বাস্তবতায় জ্বালানিসম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা উচিত ।

মাহমুদুল আলমের 'বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস : বিদেশি কোম্পানিগুলোর ভূমিকা' শীর্ষক
প্রবন্ধে লেখক বিদেশি কোম্পানির পক্ষে তাঁর যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু তথ্যউপাত্ত ও যুক্তি দিয়ে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি ।

এম. শামসুল আলমের 'জ্বালানি সম্পদে জনগণের অধিকার' শীর্ষক তথ্যউপাত্তসমৃদ্ধ দীর্ঘ নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন,

ক. সাগরের ৮০% গ্যাস এলএনজি হিসেবে রপ্তানির উদ্দেশে গোপনে মডেল পিএসসি ২০০৮
প্রণীত হয়েছে ।
খ. বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করে নয় – বরং উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও বিপণন ব্যয় কমিয়ে
আনলে বিদ্যুতের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা যাবে ।
গ. সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি
অব্যাহত থাকলে বিদ্যুতের দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাবে । ফলে জনগণ বিদ্যুতের ওপর
তার স্বত্বাধিকার হারাবে ।
ঘ. সরকারের নিজস্ব মালিকানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, বণ্টন ও বিপনন করা হলে ২৩৯২.২৩ কোটি টাকা লোকসানের পরিবর্তে লাভ হত প্রায় ৩৩০০.০০ কোটি টাকা ।
ঙ. সার আমদানির ফলে বছরে ক্ষতি হয় ৩.৬ হাজার কোটি টাকা । দেশে সরকারি মালিকানায় সার উৎপাদিত হলে ক্ষতির পরিবর্তে লাভ হত ।
চ. লৌহ, ইস্পাত ও সিমেন্টের মূল্য প্রায় পুরোটাই বিদেশি বাজারনির্ভর । রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কারখানাগুলো চালু থাকলে ভোক্তাকে এত অধিক মূল্যে এসব পণ্য ক্রয় করতে হত না ।
ছ. বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে দৈনিক ঘাটতি থাকে যথাক্রমে ১৩৩.২ ও ১২৫.১ মিলিয়ন একক, যা মোকাবিলা করা হয় সরকারি খাতে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন বন্ধ রেখে ।
জ. সমুদ্রসীমা-সমস্যার সাথে সাগরের তেল-গ্যাস ইজারার কোনো সম্পর্ক নেই ।

ঝ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঙ্কট পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
ঞ.মডেল পিএসসি অনুযায়ী চুক্তি হলে সাগরের তেল-গ্যাসের ওপর জনগণের অধিকার খর্ব হবে।
ত. উৎপাদিত কয়লার ৬% সরকারের আর ৯৪% এশিয়া এনার্জির। তাদের কাছ থেকে অধিক মূল্যে কিনতে হবে।
থ. উন্মুক্ত খননপদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হলে
১. ৫০ হাজার মানুষ উচ্ছেদ হবে ২. ২.২ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে
২. মরুকরণ বৃদ্ধি পাবে
৩. ১৩৫ বর্গমিটার এলাকা খনিগর্ভে বিলীন হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৬৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা
৪. খালবিলের পানি দূষিত করবে
৫. খনি ধ্বংসের শিকার হতে পারে

দ. সাগরে উৎপাদিত শতভাগ গ্যাসের মালিকানা হবে বিদেশি কোম্পানির। বিদেশে রপ্তানি নিশ্চিত হবে। ফলে সাগরের গ্যাস দেশের জ্বালানি সঙ্কট নিরসনে কোনো ভূমিকা রাখবে না।
ধ. পিডিবি কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ যত কম হবে জনগণকে তত বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হবে।
ন. বিভিন্ন অজুহাতে গ্যাসের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে খরচ উসুলের নামে বিদেশি কোম্পানি তার ভাগের গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের জনগণ।
ট. অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় সরকার অনেক বেশি ক্ষমতা-নিরাপত্তাহীন এবং পরিস্থিতি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়।

কেন সারো বিবা/অনার্য লিখিত/অনূদিত 'মুক্তিকামী পৃথিবীটাকে এরাই পরিণত করেছে এক ভয়ংকর কয়েদখানায়' শীর্ষক আত্মকথন ও বর্ণনায় নাইজেরিয়ার তেললুণ্ঠন, জালিম শাসকশ্রেণীর নির্মম অত্যাচার ও প্রতিবাদকারীর বেদনাবিধুর করুণ কাহিনী সাবলীল ভাষায় বিধৃত হয়েছে। এই লেখায় আমরা জানতে পেরেছি :
ক. নাইজেরিয়ার ওগোনী অঞ্চলে শেল কোম্পানির অবাধ তেল-লুণ্ঠন
খ. বনাঞ্চল ধ্বংস, গ. এ্যাসিড রেইনে জমি বন্ধ্যা ও তৈলাক্ত, ঘ. তৈলাক্ত পানীয় জলের কুয়ো
ঙ. ওগোনী জনগণ চোখের সামনে নিজেদের জমি ও জীবনকে নিরুপায় দর্শকের মতো নষ্ট হতে দেখেছে
চ. নিজেদের ভূমিতে নিজেরাই পরবাসী
ছ. তিন দাবিতে বিবার আন্দোলন

* শেল কর্তৃক শোষিত তেলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে * ওগোনী অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে হবে

* ওগোনী অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে ।

জ. জনগণের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সময় দুই হাজার বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীকে হত্যা করা হয় এবং ২৭টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় ।

ঝ. প্রহসনের বিচারে বিবাসহ ৯ জনকে ফাঁসি দেয়া হয় ।

ঞ. ৯৪টি অঞ্চল থেকে ৪৩,২৪৩ বর্গকিলোমিটার লিজ নেয়া জমি কব্জা করে শেল কোম্পানি এই হত্যাকাণ্ডের জাল বোনে ।

নাইজেরিয়ার তেললুণ্ঠন, শোষণ ও জালিম শাসকের সীমাহীন অত্যাচার এবং তজ্জনিত জনদুর্ভোগের কাহিনী বাংলাদেশের জনগণের জন্য বিশেষ করে ড. হোসেন মনসুরের জন্য শিক্ষণীয় । তাই এই রচনাপ্রকাশ সকল দিক দিয়েই সময়োপযোগী । এজন্য 'হালখাতা' শুকনো ধন্যবাদ নয়. সকল বাংলাদেশির কৃতজ্ঞতার দাবিদার ।

ধনিক শ্রেণীর জটিল মনে একমাত্র কুটিল চিন্তা কীভাবে দুর্বলের সম্বল হাতানো যায় । বিত্তলোভী, অর্থলোভী বুভুক্ষু ক্ষমতাবান, গৃধ্নু দস্যু লুণ্ঠনকারী বহুজাতিক কোম্পানি ও তার দেশীয় দালালদের হিংস্র থাবা থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করাই হয়ে উঠুক 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র লক্ষ্য । দেশ থেকে দখলদার ইংরেজ তাড়িয়েছে বাঙালিরা । হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাভূত করেছে বাঙালিরা । এখন তো তারা নিজের দেশে নিজেদের ভোটে সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করেছে । সরকারে নিজেদের ইচ্ছার প্রতিফলন সংঘটনের সক্ষমতা অর্জন করেছে । নিজেদের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে না-পেলে সরকার পাল্টানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে । তবে কেন পারবে না লুটেরা শকুনির থাবা থেকে নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে? ইরানের প্রধানমন্ত্রী নিজেদের সক্ষমতা অর্জনের আগে গ্যাস উত্তোলনের বিরোধী ছিলেন এবং বিদেশি কোম্পানিকে গ্যাস উত্তোলনের অনুমতি দেননি । এই অপরাধে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছিল । দেশের স্বার্থে প্রয়োজন দেখা দিলে আমাদের নেতৃবৃন্দ ও নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধামুক্ত থাকবেন বলে আমরা আশা করতে পারি । পাশাপাশি 'তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'র কর্তব্য হবে তাঁদের কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত, বিস্তৃত ও ব্যাপকতর করার মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে আন্দোলনকে আরো বেগবান করা এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কল্যাণময়ী জনজাগরণ সৃষ্টি করা । এর মাধ্যমে দেশে জনবান্ধব জনকল্যাণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, সরকারের নিরাপত্তা-সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, গণবিরোধী ও দেশবিরোধী অপশক্তি দমিত হবে এবং নিজেরাই নিজেদের সম্পদ আহরণে সক্ষম হবে । তবেই অর্জিত হবে হালখাতার 'তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা'র সার্থকতা । আমার এই আকুতি সম্পাদকীয় ও কয়েকজন লেখকের লেখাতেও অনুরণিত হয়েছে । যেহেতু কোনো কিছুই রাজনীতির বাইরে নয় তাই প্রায় সকল লেখাতেই রাজনৈতিক মানস প্রতিফলিত । তাই এই সংখ্যার মাধ্যমে জনমনে

আশঙ্কামুক্তির প্রত্যাশা জন্ম নিতেই পারে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য 'হালখাতা'কে জানাই আরেক প্রস্থ ধন্যবাদ।

পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখার বিষয়বস্তু, তথ্যউপাত্ত ও মানের গভীরে আমাকে যেতে হয়েছে। প্রকাশিত কিছু লেখায় বিষয়বস্তু, তথ্যউপাত্ত ও মানের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সেকারণে সে-লেখাগুলোকে পর্যালোচনার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি, যদিও সে-সংখ্যা অতি সীমিত। জাতীয় সমস্যাবিজড়িত অতিপ্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে 'হালখাতা'র ৩য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশের জন্য হালখাতার সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও তাঁরা এ ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপজীব্য করার এই ধারা অব্যাহত রাখবেন – এই প্রত্যাশা রইল।

মাহ্‌বুব-উল-আলম
অধ্যক্ষ (অব.), রংপুর ক্যাডেট কলেজ], মিরপুর, ঢাকা।

জনগণের পক্ষে এক বিস্ফোরক দলিল

অপর্ণা হাওলাদার

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা'র 'তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা'-কে মূল্যায়ন করতে গেলে একে বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদের বর্তমান পরিস্থিতি, জ্বালানি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ আশংকা এবং এ-সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য ও যুক্তির পর্যাপ্ত উপকরণে সাজানো একটি বিশেষ সংখ্যা বলতে হয়। অর্থনীতির শিক্ষার্থী হিসেবে আমি এই সংখ্যাটিকে একটি চমৎকার রেফারেন্স বলতে দ্বিধা করব না। যে রেফারেন্স সাক্ষী দেবে এই নীতিহীন সাম্রাজ্যবাদের পোষা রাষ্ট্রযন্ত্র যখন দেশের সম্পদ পানির চেয়ে কম দামে বিদেশি অপশক্তির হাতে তুলে দিচ্ছিল, তখন এই মেরুদণ্ডহীন

সমাজেও দু'একটি ঋজু মানুষ মিছিলে ছিলেন যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ, বিদেশি অপশক্তি, আর তার দেশি লেজুড়কে প্রকাশ্যে প্রতিবাদের মাধ্যমে তাড়ার মুখে রেখেছিলেন।

নির্বাহী সম্পাদক ও সম্পাদকের সম্পাদকীয়তে বাম রাজনীতি, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, আছে পুরো পত্রিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিফলনও। নয়া ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রকে রোধ করার ক্ষেত্রে জনগণের সোচ্চার হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, সম্পাদক আশাপ্রকাশ করেছেন আবার একটি গণআন্দোলনের, যে আন্দোলনের জোয়ারে অপশক্তি ভেসে যাবে।

তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎবন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক বয়োজ্যেষ্ঠ বাম রাজনীতিবিদ শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ দিয়ে পত্রিকাটির শুরু। তিনি সরকারের বিভিন্ন জ্বালানি সংক্রান্ত চুক্তি এবং চুক্তির কারণে পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় বদরুদ্দীন উমরের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি তাঁর স্বভাবসুলভ সৎ বিশ্লেষণের রূপক। তবে প্রথম প্রবন্ধ দুটিতেই তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি চোখে পড়েছে। সে জন্য অবশ্য সময়স্বল্পতা একটি কারণ হতে পারে।

রাজপথের যোদ্ধা অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ জ্বালানি সম্পদে বিদেশি শক্তির আগ্রাসনকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন প্রতিটি সেক্টরে কিভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। সরকারের ছলচাতুরির সামনে কী করে একটি তৈরি হওয়া আন্দোলন অস্ত্র দিয়ে থামানোর চেষ্টা করা হয়, আবার সৌজন্যের ভান করে কতটা নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করতে পারে আমলাতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, তিনি তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। কস্ট স্ট্রাকচারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী হায়দার আকবর খান রনো দেখিয়েছেন, গ্যাসের রপ্তানির সুযোগ নেই কোনো যুক্তিতেই।

এই সংখ্যার একটি অন্যতম আকর্ষণ অধ্যাপক আবু আহমেদ-এর প্রবন্ধটি। বাংলাদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা যেন কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রথমেই বৈশ্বিক হয়ে ওঠেন! আবু আহমেদ সেখানে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আর একটি বিশেষ প্রবন্ধ পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. হোসেন মনসুরের; গৎবাঁধা লাভের ফানুস উড়িয়েছেন তিনি; চোখে ঠুলি বেঁধে পড়লে তাঁর লেখা সত্য মনে হতে পারে হয়তো। অধ্যাপক এম এম আকাশের প্রবন্ধ বরাবরের মতই শিকড়ে ঘা দেওয়ার মতো।

এছাড়াও এই সংখ্যায় লিখেছেন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আউয়াল, তানভিরুল হক প্রবাল, মিজানুর রহমান, ফেরদৌসি সুলতানা, শাহ আলম সারোয়ার, আদিত্য চৌধুরী। প্রত্যেকের লেখাই বেশ বস্তুনিষ্ঠ ও নানা বিষয়ে পূর্ণ ও নানা দিক থেকে যৌক্তিক।

মো. নুরুল ইসলাম ও নূর মোহাম্মদ-এর দুটি প্রবন্ধ আমার মতে কম পড়াশোনা করাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। মডেল পিএসসি ২০০৮-এর একটি ধারা তুলে তাঁরা দেখিয়েছেন কতটা আত্মহত্যার সামিল গ্যাস পাচারের এই সিদ্ধান্ত। কতটা হঠকারী এর হোতারা। নূর মোহাম্মদ পিএসসির একটি আকাঙ্ক্ষিত রূপরেখাও দেখিয়েছেন।

এম শামসুল আলমের প্রবন্ধটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হিসেবে কাজ করবে। যেখানে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, যোগান, বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরে তিনি উঠিয়ে এনেছেন রপ্তানির অগ্রহণযোগ্যতাকে। সাগর-সম্পদ, গ্যাসনীতিতে দুর্নীতি, জ্বালানিজাত পণ্যের দেশীয় শিল্প, প্রফিট স্ট্রাকচারের দৈন্য– কিছুই বাদ যায়নি তার সুলিখিত, তথ্যভিত্তিক এই প্রবন্ধ থেকে। সরকারের সদিচ্ছার অভাবকেও তিনি যৌক্তিক উপহাসে দেখিয়েছেন কিভাবে দেশের কর্তাব্যক্তিরা সাময়িক সুখের জন্য আগামীকে নিলামে তুলতে দ্বিধান্বিত হন না।

নাইজেরিয়ার মানবাধিকারকর্মী, কবি 'কেন সারো বিবা'র ডায়েরি থেকে তুলে আনা শেষ লেখাটি কিছুক্ষণের জন্য যে কাউকে স্তব্ধ করে দেবে। বাংলাদেশের নিয়তি থেকে এমন ভবিষ্যতকে সরাতে হলে আামাদের প্রত্যেককে যে যার অবস্থান থেকে সোচ্চার হতে হবে। আর সব মিলিয়ে চূড়ান্ত কথাটি হল কেবল গণজাগরণই হয়তো আমাদের জ্বালানি সম্পদকে রক্ষা করার একমাত্র ক্ষমতা রাখে। সেদিক থেকে হালখাতা'র 'তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা' জনগণের পক্ষে এক বিস্ফোরক দলিল; যা ভবিষ্যতের আন্দোলনকে ক্রমাগত গতি দান করবে।

অপর্ণা হাওলাদার
শিক্ষার্থী, এম.এস.এস
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ, শিল্পজিজ্ঞাসা ও আঙ্গিক বিবেচনা

সৈ য় দ আ ক র ম হো সে ন

আবেগ-অভ্যাস, আচার-আচরণ, চিন্তাপ্রবাহ, মতাদর্শ, ধর্মচিন্তা, তত্ত্বকথা ও দর্শন প্রভৃতির যোগফল সমাজচেতনা– যা বস্তুজগত বা সমগ্র সমাজজীবন ও প্রকৃতিলোকের নির্বিবাদী দর্পণ। সমাজসংগঠন যদি হয় শ্রেণীবিভক্ত, জটিল, দ্বিধাগ্রস্ত ও দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ– চৈতন্যপ্রবাহও হবে নিঃসন্দেহে তার অনুগামী। সমাজচৈতন্য এক সার্বিক প্রবাহ, যার অন্তর্গত রাষ্ট্রচিন্তা, নৈতিকতা, ধর্মচিন্তা, শিল্প-বিজ্ঞান পরস্পর বহমান; দর্শন প্রভৃতি গতিবান। প্রকাশ-মাধ্যম ও ব্যক্তির মানসসংগঠনের বিভিন্নতায় একক চেতনাপ্রবাহ বিভক্ত, তবে একে-অপরে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং অন্তর্গূঢ়সূত্রে পরস্পরসাপেক্ষ।

সমাজজীবনের অন্তর্গঠনের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার বহির্গঠন অর্থাৎ চৈতন্যপ্রবাহ। বস্তুত, সমাজজীবনের বিবর্তনশীলতা স্বায়ত্তশাসিত বা স্বয়ংক্রিয় নয়; বরং তা নির্ভরশীল উৎপাদনযন্ত্র বা উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের ওপর। সামন্তসমাজের সবল ধ্যানধারণা– নতুন উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদন-সম্পর্কবহ বুর্জোয়াসমাজে কার্যত অচল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যচিন্তা, সমাজদর্শন, রাধাকান্ত প্রমুখের সমাজতত্ত্ব– হিন্দুকলেজের নব্যশিক্ষিতের কাছে হয়েছিল অগ্রাহ্য, পরিত্যাজ্য।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চেতনাপ্রবাহও বহুভুজ হতে বাধ্য। কোনো শ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষানুগ রাষ্ট্রীয়চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতিচেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যানধারণার যোগফলই হল সে শ্রেণীর একক চেতনাপ্রবাহ। প্রতিটি শ্রেণী-উদ্ভূত চেতনাপ্রবাহ স্বার্থানুগ এ-কারণে যে, প্রতিটি শ্রেণীই তার সমাজদর্শনকে প্রতিযোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সচেতন, অর্ধচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করে।

শ্রেণীবিভক্ত-সমাজে মতাদর্শ যদি শ্রেণীচেতনার প্রতিভাস ও প্রতিনিধি হয়, তবে সাহিত্য-শিল্প নিঃসন্দেহে সামগ্রিক জীবন-সত্য প্রকাশে অক্ষম। অথচ পরিপূর্ণকে আবিষ্কার, শাশ্বত সত্যকে চিহ্নিত করাই হল সাহিত্য-শিল্পের অন্বিষ্ট। সত্য নিরপেক্ষ নয়, বরং সাপেক্ষ। সমাজ এবং চেতনার ক্রমবিকাশই শাশ্বত। সমাজবিকাশের ধারায়

যে-শ্রেণীউদ্ভূত জীবনদর্শন প্রগতিদর্শন প্রগতিশীল, তাই তুলনামূলকভাবে সত্য এবং সুন্দর। যতক্ষণ বুর্জোয়াশ্রেণী, সামন্তশ্রেণীর সাথে সংঘর্ষরত সে-পর্যন্তই বুর্জোয়াচেতনাপ্রবাহ সত্যসন্ধ। যেমন রামমোহন রায়ের শিক্ষাদর্শ ও ধর্মচিন্তা। কিন্তু যখন বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ক্ষমতা অধিকারে সক্ষম হয়, তখন থেকেই সে হয় ক্রমবিকাশ-বিরোধী–অর্থাৎ সত্যবিরোধী।

এখানে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সমাজসংগঠনের কঠোর শাসনে যদি চেতনাপ্রবাহ অঙ্কশাস্ত্রের মতো নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ব্যক্তিভাবনাও হবে শর্তবন্দি, সাপেক্ষ ও শৃঙ্খলিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সত্যদর্শী নয়। কারণ সমাজগঠন যেমন ব্যক্তিদর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে, 'ব্যক্তি-চেতনা'ও তেমনি সমাজগঠনকে করে প্রভাবিত। কোনো ব্যক্তি অধীতবিদ্যা, ইতিহাসজ্ঞান ও সমাজবিকাশের মৌলসূত্রসমূহ আত্মস্থ করে ভবিষ্যৎ রূপাবয়ব প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। এবং দৃশ্যমান সত্যে পৌছাতে ব্যক্তির সক্রিয় ভাবনা ও ভূমিকা বর্তমান সমাজগঠনকে প্রভাবিত করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ, ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া, প্রবহমানতা ও জটিলতা প্রভৃতি সম্পর্কে সমগ্রধারণাজাত-প্রতিভা, শর্তনিরপেক্ষ। এবং এটাই ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রাথমিক শর্ত। এ-সূত্রেই 'Every novel is an extended metaphor of the author's view of life –on life itself.'

সমাজশর্তনিরপেক্ষ প্রতিভাই কালোত্তীর্ণ, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের ধূলিঝড়ে কিংবা স্বার্থের অভিশাপে তাঁরা নন সত্যান্ধ, কিংবা অকালতাড়িত জন্মান্ধ। শ্রেণীস্বার্থের চক্রপথে তাঁরা মুদ্রাদোষে নন জ্ঞানান্ধ।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-স্কুল উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করে– 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' এবং প্রকাশ করে মুখপত্র 'শিখা'। এ-সাহিত্যসমাজের আদর্শ ছিল– 'চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয়সাধন ও সংযোগসাধন'। পত্রিকায় ছাপানো হত, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন–সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদির, অধ্যাপক শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকী, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। 'মুসলমানের ধর্ম নাই –তার জীবন নিতান্ত কুৎসিত'– মোখতার আহমদ সিদ্দিকীর উক্তিতে; অথবা 'রাস্তায় চলতে মুসলমান বালক-বালিকার অস্বাভাবিক আলাপ ও গতিবিধি দেখলে আপনারা রাগই করুন আর যাই করুন মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করি'– আনোয়ারুল কাদিরের এই লেখায়; কিংবা এ-সময়ের– Swimming Club, Eating Club, Laughing Club, Anti-pardah league -এর প্রাণশক্তিতে 'ইয়ং বেঙ্গলীয়' উল্লাস, বেদনা, উদ্দামতার বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। বস্তুত এঁরাই ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ইয়ং বেঙ্গল। ঐতিহাসিক কারণেই 'শিখা সম্প্রদায়ে'র মুক্তবুদ্ধিজাত চেতনাপ্রবাহ নির্দ্বন্দ্ব ছিল না। রক্ষণশীল সামন্ত প্রতিনিধি 'ঢাকার নবাববাড়িতে' লাঞ্ছিত হয়েছিলেন আবুল

হুসেন। তৃতীয়বর্ষ থেকে মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্যসমাজে'র 'সাহিত্যসভা' অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়। 'মোহাম্মদী' ও 'সোলতান' পত্রিকা 'শিখা'-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। 'শিখা' সম্প্রদায়ের ভাববিপ্লবের সংঘাত-তরঙ্গে– পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের জাগরণের প্রবাহ হয়েছিল গতিবান। এবং তা চার দশকের শেষপর্যন্ত ছিল পূর্ববঙ্গীয় (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) সাহিত্যিকবর্গের তথা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার উৎসভূমি, প্রাণক্ষেত্র। দুই দশকের শেষাশেষি বাংলার মানসতটভূমে আছড়ে পড়েছিল রুশ বলশেভিক বিপ্লবের তীব্র তত্ত্বাবেগ। একালেই মুজফ্ফর আহমদের প্রচেষ্টায় কলকাতায় জন্ম নিল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। চারের দশকে এঁরা হলেন স্বাবলম্ব, শক্তিবান; প্রতিষ্ঠিত হল জেলাভিত্তিক সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রতিকূলে তাঁদের মিত্রপক্ষের সমর্থন ছিল উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিল না, ছিল দূরদর্শিতাবহ; জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলেই তা হয়েছিল প্রমাণসিদ্ধ। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের ফলাফলে কম্যুনিস্ট সংগঠন ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারী; সদস্যকর্মী হিসেবে আত্মপ্রচারে ও সক্রিয় দায়িত্ব পালনে পূর্বাপেক্ষা বিপদাশঙ্কা ছিল কম। এঁদের কর্মচাঞ্চল্য, সেকালে নিরাপদ না হলেও, চরম নিরাপত্তাহীন ছিল না।

ঢাকা শহরেও কম্যুনিস্ট সংগঠন সক্রিয় ছিল। মার্কসবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী বুর্জোয়া মানবতাবাদী কিছু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী, বিভাগ পূর্বকালেই 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিভাগ-পরবর্তীকালেও এর বৈঠক বসত। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত (ক. দ. গ.), মদনমোহন বসাক, সরলানন্দ সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, রবি গুহ, অচ্যুত গোস্বামী, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অসম সমাজবিকাশের জন্য বিশ শতকের প্রারম্ভকাল থেকে চারের দশক পর্যন্ত–পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনালোকে বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল:

The Novel is the epic form of our modern bourgeois society... it did not exist, except in very rudimentary form, before that modern civilisation which began with the renaissance and like every new art form it has served its purpose extending and deepening human consciousness.

অথবা :

While capitalism was basically foreign to the arts, it nevertheless favoured their growth and the production of an enormous range of many-sided, expressive and original works.

উপর্যুক্ত সময়সীমার মধ্যে ঔপন্যাসিক চেতনাপ্রবাহের ও জীবনদৃষ্টির দুটি স্রোত বহমান। একদিকে নজিবর রহমান, কোরবান আলী এবং শেখ ইদ্রিস প্রভৃতি, অপর দিকে কাজী ইমদাদুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির এবং আবুল ফজল প্রমুখ।

নজিবর রহমান, কোরবান আলী, কিংবা শেখ ইদ্রিস– বুর্জোয়া জীবন-জিজ্ঞাসামুখী যতটা নন, তার চেয়েও বেশি ছিলেন সামন্তমূল্যমানে বিশ্বাসী। এই চেতনার পশ্চাৎগামিতা, তাঁদের সৃষ্টিকে দ্বিধান্বিত করেছে। এদিক দিয়ে নবজাগরণের সংস্কারমুক্ত, মননশীল, যুক্তিআশ্রয়ী জীবনবোধের অধিকারী ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক। সামন্তসমাজের অসঙ্গতিকে তিনি অঙ্কন করেছেন *আবদুল্লাহ্* উপন্যাসে। পূর্ববাংলার সামন্তজীবনের তথা মুসলিম সমাজের ধর্মসংস্কার, পীরভক্তি, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাববাদী প্রতিবাদ উচ্চারিত হল *আবদুল্লাহ্* উপন্যাসে। এই চেতনাপ্রবাহকে প্রসারিত করেন কাজী আবদুল ওদুদ এবং হুমায়ুন কবির। এ-পর্বের ঔপন্যাসিকদের জীবনদৃষ্টির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল : [এক] জীবনের totality বা সমগ্রতায় বিশ্বাস; [দুই] বুর্জোয়া জীবনচিন্তা– liberty, equality and fraternity-তে আস্থা; [তিন] ঔপন্যাসিকদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা; [চার] শিল্পজিজ্ঞাসায় তাঁরা ছিলেন formal realist. জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে তাঁরা জীবনকে অবলোকন করতে চেয়েছেন। সামগ্রিক জ্ঞান-অনুভূতি, বোধ ও অভিজ্ঞানকে এঁরা চৈতন্যর অন্তর্গূঢ় সংস্পর্শে করতে পারেননি চিত্রকল্পরূপে উদ্ভাসিত, পঞ্চইন্দ্রিয়ের কাছে ব্যঞ্জনাময় ও গৌরবান্বিত। কারণ শ্রেণী হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও ছিল অপুষ্ট, অশক্ত।

এ-পর্বের আবুল ফজল এক স্বতন্ত্র নাম। পুনর্জাগরণের সমাজচিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টিকে একত্রিত করার প্রবণতা, সংস্কার ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও "সমাজবিচ্ছিন্ন এক স্বাতন্ত্র্যবোধ" আবুল ফজলকে চেতনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে করেছে প্রাগ্রসর। এই সমাজবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে প্রাণিত করেছিল– 'কল্লোলে'র অনুসরণে হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রগতি' প্রকাশে। ১৯২৭-এর *চৌচির* উপন্যাসে শিল্পিত হয়েছে মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন-চেতনা। তিরিশোত্তর পশ্চিবঙ্গীয় সাহিত্যরীতিকে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন আবুল ফজল। *জীবনপথের যাত্রী* উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের পদধ্বনি শোনা যায়; বুদ্ধিনির্ভর সমাজতান্ত্রিক চেতনা রূপায়িত হয় তাঁর *রাঙা প্রভাত* উপন্যাসে। ঘটনাবিমুখ অন্তর্চেতনাপ্রবাহের শব্দরূপ *প্রদীপ ও পতঙ্গ*। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর শিল্প-সার্থকতা আবুল ফজলের কাছে প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। কারণ 'পশ্চিমবঙ্গীয়' বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণীর মতো শত বছরের বুর্জোয়া অর্থনৈতিক অবস্থার অন্ত-অসঙ্গতি, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রতারণার অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিক্ষত মূল্যবোধের উত্তরাধিকার নিয়ে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হননি আবুল ফজল। পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী ইতিহাসের 'কালো সিঁড়ি' তখনো অতিক্রম করেনি। কাজেই কল্লোলের চেতনা আবুল ফজল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন– জীবনের সমগ্রতা দিয়ে আত্মস্থ

করতে পারেননি। এ-কারণে আবুল ফজলে চেতনার শুদ্ধ জ্যামিতিক প্রমাণ আছে– মন ও মননের, ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার, চরিত্র এবং ব্যাখ্যার– অনিবার্য শব্দ, বাক্য ও দৃষ্টিভঙ্গিজাত চিত্রকল্প নেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে আবুল ফজল প্রমুখের প্রাগ্রসর চেতনাপ্রবাহ ও প্রাকরণিক স্রোত গিরিকন্দর অতিক্রম করে সমতল পেয়েছে পাক-আমলের সমাজ গঠনে , প্রতিভার মনোভূমে।

মধ্যবিত্তের সঙ্কট ও পাক-আমলের বাংলাদেশ: প্রথম পর্ব

১৯৪৮ সালের মধ্যেই পূর্ব-বাংলার উঠতি বেনিয়া পুঁজিবাদী শ্রেণী এবং তার পক্ষপুটে লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুভব করল তাদের সঙ্কট। পাকিস্তানি বৃহৎ বেনিয়া-পুঁজি অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করল পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা এবং উৎপাদনযন্ত্র। এবং এ কার্যে 'ধর্ম ঐক্যের' নামে, শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে, তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করল– এ-দেশীয় সামন্তশ্রেণী ও সামন্তমূল্যবোধ-লালিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। দেশীয় সামন্তশোষণ ও পাকিস্তানি বড় বণিক-বেনিয়াদের শোষণে, শিল্পপুঁজির প্রয়োজনে এবং ইতোমধ্যে কাঁচামাল ও বাজারের লোভে পূর্ব বাংলা গড়ে উঠল আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজ রূপে। পূর্ব-বাংলার সমাজবিকাশ হল অবরুদ্ধ। ঘটানো হল সামন্তসমাজ-মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ।

বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রতিবাদ করল ১৯৪৮-এ। ১৯৫২-র রক্তদানের পরও প্রত্যক্ষত সে প্রতিবাদ সার্থক হল না। কারণ সে-সময় জাতীয়তাবাদী ঐক্যের নেতৃত্বদানকারী–বাঙালি পুঁজি ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কৈশোর কাল। বস্তুত ভাষা-আন্দোলন–বাঙালি মধ্যবিত্ত ও অশক্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর পাক-শাসকচক্রের শৃঙ্খলমুক্তির 'রক্তিম প্রতীক'। ৫২-র প্রতিবাদের পর আমরা লক্ষ করলাম বাঙালি বেনিয়া-পুঁজি পাকিস্তানি পুঁজির সহযোগী পুঁজি হিসেবে গড়ে উঠছে। ফলত বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সামনে দেখা দিল সঙ্কট। অবিকশিত সমাজের বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাদের সামনে খোলা থাকল তিনটি পথ–[১] পাক-শাসকচক্রের সঙ্গে আপসের; কিংবা [২] বিপ্লবের, অথবা [৩] সমাজজীবন ও ইতিহাসের পথচ্যুত হয়ে আত্মবিবরে পলায়নের।

প্রথম পর্বের উপন্যাস

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ কাল-পরিসরে, যাঁরা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন– সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে তাঁরা মুষ্টিমেয়। আবুল ফজল ও আবুল মনসুর আহমদকে 'প্রাক্-৪৭ পর্ব' অন্তর্গত করলে অন্যেরা হলেন আবু ইসহাক, আবু রুশদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সরদার জয়েনউদ্দীন, ইসহাক চাখারী, আকবর হোসেন, আফসারউদ্দিন, দৌলতুন্নেসা এবং শওকত ওসমান প্রমুখ। উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্বাচনে এঁরা প্রায় সকলেই গ্রামকেন্দ্রিক; জীবনদৃষ্টিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী, প্রকরণে

দ্বিধান্বিত। উপন্যাসের ভাষা আবিষ্কারে তাঁরা অন্যমনস্ক, গঠনে অতিদ্রুততা-আক্রান্ত, কেউ-বা অপরিমিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছাড়া প্রকরণনিষ্ঠা প্রায় সকলের মধ্যেই দুর্লক্ষ্য।

জননী শওকত ওসমানের মানবতাবাদী চেতনাপ্রবাহের ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ। ঘটনাংশ গ্রামীণ। উপন্যাসটি মননধর্মী নয়, মনোধর্মী। জননী দরিয়া, আজহার খাঁ, চন্দ্র, মোনাদির, আমজাদ, ইয়াকুব, এলোকেশী, শৈরমী চরিত্রগুলি– রোহিণী চৌধুরী, হাতেম খান দুই গ্রাম্য জমিদারের দাঙ্গায় প্ররোচনা, লা-মজহাবীর বাহাস প্রভৃতি ঘটনাস্রোতের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েও স্বতন্ত্র ও পরিণামী। চন্দ্রকে টাইপ মনে হয়। ঘটনাবিন্যাসে পরিমিতির অভাব আছে– আজহার খাঁর অতীত ইতিহাস অপ্রয়োজনীয়। ঘটনাবিন্যাসে এবং চরিত্রের অভিব্যক্তিতে শওকত ওসমান দু'মাত্রা ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো নাট্যিক-রীতি ব্যবহার করেছেন, কখনো চিত্র-রীতি প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসটিতে বিস্তৃত ক্যানভাস ব্যবহৃত হলেও, অধিকাংশ রঙের ব্যবহার ঘটেছে দরিয়া-চরিত্র অঙ্কনে। এই শিল্পসৃষ্টির দ্বন্দ্ব–বৃহত্তর জীবনের অর্থাৎ সামন্তসমাজের অন্তঃঅসঙ্গতিজাত দ্বান্দ্বিক অগ্রগামী চিত্ররূপ হতে গিয়েও জননীর দরিয়া বিবি হয়েছে ট্রাজেডিতে পরিণত। মাতৃত্বের গৌরবই হয়েছে সারকথা। দরিয়া বিবির চেতনায় জীবনসংগ্রাম মাতৃত্ব উৎসজাত। শওকত ওসমানের Pictorial treatment এবং Dramatic treatment-এর জন্ম তার যথাস্থিতবাদী নিরাসক্ত মানসলোকে। *জননী* শওকত ওসমানের প্রারম্ভ সৃষ্টি, উপন্যাসটি প্রাক্-৪৭ আমলে রচিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *লালসালু* প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এ। ভণ্ড ও ধূর্ত মজিদ-চরিত্র অঙ্কনের জন্য, কিংবা কেবল সামন্ত-সমাজজীবনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের চরিত্র-চিত্রণের জন্য *লালসালু* গৌরবান্বিত নয়। মজিদ টাইপ চরিত্র হয়নি– তার পরাজয়ে পাঠকমনে করুণা সঞ্চারিত হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনের উপরিতলের চিত্র-অঙ্কন না-করে, উন্মোচন করেছেন সমাজ-মূলের অসঙ্গতিকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কৃতিত্ব অভিজ্ঞানকে তিনি নিরাসক্তিতে পরিণত করেছেন; ঘটনাকে প্রতিক্রিয়ায় রূপ দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়ার আবেগকে চিত্রে অঙ্কন করেছেন, impressionist শিল্পীর মতো: "খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাঁপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সেই ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

আত্মস্থ রচনাশৈলী *লালসালুকে* কাব্যিক পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ করেছে, যেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি একাত্ম। তার সাংগীতিক রীতি, মন এবং মননকে, মানুষ এবং প্রকৃতিকে

জৈবিক-ঐক্য দান করেছে। চরিত্র কিংবা ঘটনাবিন্যাসে কোথাও প্রগাঢ় রঙ ব্যবহৃত হয়নি। সমাজ-সম্পৃক্ত কর্মদায়িত্বচ্যুত, সমাজবিচ্ছিন্ন একক 'আমিত্ব'-বোধ থেকেই এই নিরাসক্তি, গীতিময়তা ও আত্মগতচেতনার জন্ম। বুর্জোয়া সমাজবিন্যাসের আন্তর্জাতিক অসঙ্গতি, সমকাল সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ার পলায়নবাদী চেতনাসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্প অভিজ্ঞানের জন্ম। এ-অর্থে তিনি 'কল্লোল'-উত্তর চেতনার যথার্থ প্রতিনিধি।"

পুঁজিবাদী সমাজে অন্ত-অসঙ্গতির প্রতিবাদী চেতনা হিসেবেই রোম্যান্টিকতার জন্ম। রোম্যান্টিকতা পেটি-বুর্জোয়া চেতনাপ্রবাহ। রুশোর Discourses থেকে Commuunist-manifesto প্রকাশের অন্তর্বর্তীকাল পর্যন্ত ইয়োরোপের নিয়ন্ত্রক চেতনা ছিল রোম্যান্টিকতা। পূর্ব বাংলার অবিকশিত পুঁজিবাদআশ্রিত মধ্যবিত্তশ্রেণী-চরিত্রে রোম্যান্টিকতার 'হ্যাঁ-অর্থক' দিক অপেক্ষা 'না-অর্থক' দিকটিই ছিল অধিকতর সক্রিয়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ছিলেন মূলতই রোম্যান্টিক। তাঁর *কাশবনের কন্যার* চরিত্রগুলো সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অতি-রোম্যান্টিকতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সুদৃঢ় হতে পারেনি। রোম্যান্টিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। তা-সত্ত্বেও গ্রামবাংলার মাটির ঘ্রাণ, আবেগীচিত্র ভেসে আসে উপন্যাসের শব্দস্রোতে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* অনুভূতির সততায় প্রথম পর্বের একটি বিশিষ্ট রচনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্য গীতল, কিন্তু বুদ্ধি-শৃঙ্খলিত; শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গদ্য গীতময়, কিন্তু আবেগী এবং উচ্ছাসপ্রবণ।

আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) বহু-বিতর্কিত উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব বাংলার সমালোচকগণ একে 'বিস্ময়কর', 'শিল্পকুশল', 'সার্থক সাহিত্য', 'স্মরণীয় সাহিত্য' বলে প্রশংসা করেছেন এবং অপরপক্ষে কেউ কেউ *সূর্যদীঘল বাড়ীকে* 'সার্থক উপন্যাসই নয়', 'স্কেচধর্মী রচনা' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এবং এর সমর্থনে সাংগঠনিক ত্রুটি ও চরিত্র চিত্রণের অপরিমিতির উদাহরণও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সব সমালোচকের উক্তিগুলো পরীক্ষা করলে একটা সত্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার কারণ পাওয়া যায় না। আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ী* ভূতুড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনো গৃহকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, উন্মুলিত জয়গুন-পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী। হাসুর শহরের জীবনসংগ্রাম– গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্কেতবহ। নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি দিয়ে আবু ইসহাক ঢাকা শহরের সন্নিকটস্থ জীবনধারা; স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উপলক্ষে উৎসব এবং ঈদ ইত্যাদির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা গতিবান। জয়গুনের জীবনসংগ্রাম ও অবশেষে ছিন্নমূল হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মাঝেও-যে 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র ট্রাজিক পরিণাম দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, তার কারণ আবু ইসহাকের শিল্পদৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। আবু ইসহাকের চোখের এবং মনের দেখা জীবন ও জীবনচিত্র–মননে পরিশীলিত হয়ে প্রাগ্রসর চেতনাপুঞ্জের শব্দরূপ পায়নি। আবু ইসহাক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন যে, গ্রামীণ পরিবার উন্মুলিত হচ্ছে নতুন সমাজব্যবস্থার কৃত্রিম বিন্যাসে। 'করিম বক্সের মৃত্যু ঔপন্যাসিক পরিণামের কারণ হিসেবে দুর্বল'– এ-জন্যেই। আবু ইসহাক গ্রামজীবনের স্থবিরতার চিত্রে অধিক আকৃষ্ট

হয়েছেন, কিন্তু আপাত স্থবিরতার মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল গতি বহমান তা তিনি ধরতে পারেন নি। এ-কারণে তাঁর বাস্তব-আবেগীচিত্রগুলিতে বেগ সঞ্চার হয়নি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' (১৯৫২ সালে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্বলিত শ্রেণীচেতনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী মনে বুর্জোয়া রোম্যান্টিক এবং মানবতাবাদী; মননে শ্রেণীসচেতন। *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যানে*– যে দ্বান্দ্বিক জীবনাগ্রহের সামগ্রিক রূপ উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল–তা বিক্ষত হয়েছে–ঔপন্যাসিকের চেতনলোকের অর্থাৎ মন-মননের দ্বন্দ্বে। তাঁর এ-উপন্যাসের প্রতিজ্ঞা এবং প্রমাণের মধ্যে মেরুদূর সম্পর্ক। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর ভাষারীতি স্বায়ত্তশাসিত ও জীবনের বহুভুজ বোধের ভার বহনে সক্ষম।

সামনে নতুন দিন (১৯৫৬) রচয়িতা আবু রুশদ মধ্যবিত্তজীবনের সঙ্কট, জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণাকে এড়িয়ে নগরজীবনের বাহ্যিক অবয়বকে অঙ্কন করেছেন। এ-কারণে ফর্মের কোনো অনিবার্য রূপ আবিষ্কারেও তিনি নিরুৎসাহ। সবল বক্তব্য সত্ত্বেও সরদার জয়েনউদ্দীনের *আদিগন্ত* সাংগঠনিক অসতর্কতায়, শব্দ-বিন্যাসের একমাত্রিকতায় এবং মননশীলতার অভাবে দুর্বল রচনা। আকবর হোসেন, নজিবর রহমান, শেখ ইদ্রিস ফর্ম-অনুসারী আখ্যায়িকা রচয়িতা মাত্র। দৌলতুন্নেসা, ইসহাক চাখারী, কাজী আফসারউদ্দিন প্রমুখ ঔপন্যাসিক মূলত প্রাক্-৪৭ ধারারই পদাঙ্কচারী। দৌলতুন্নেসা তাঁর সুবৃহৎ *পথের পরশ* উপন্যাসে স্থবির, অচল, গ্রামজীবনকেই অঙ্কন করেছেন। জীবনের তথা সমাজের দ্বন্দ্ববাদী ক্রমবিকাশে তিনি বিশ্বাসী নন, বরং তিনি সমাজসমন্বয়বাদী। কাহিনী-গঠনে ও চরিত্র-চিত্রণে দৌলতুন্নেসা অকৃত্রিম এবং আন্তরিক। প্রকৃতিকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণের আত্যন্তিক চেতনায় কাজী আফসারউদ্দিন বিশিষ্ট।

প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অধিকাংশই চরিত্র ও ঘটনাংশ-নির্বাচনে গ্রামমুখী, জীবনদৃষ্টিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী। জীবনের দ্বান্দ্বিক বিকাশধারা, গ্রামজীবনের তথা সমাজের অন্ত-অসঙ্গতিজাত প্রবহমানতা নিরীক্ষণে অধিকাংশই অসমর্থ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং শামসউদ্দীন আবুল কালাম ব্যতীত কমবেশি সকলেই– প্রাক্-৪৭ পর্বের মূল্যবোধের পদাঙ্কচারী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা, আত্ম-সন্ধান ও আত্মমুখিতা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মার্কসীয় চেতনার প্রতিশ্রুতি এবং শামসউদ্দীন আবুল কালামের পেটি-বুর্জোয়াসুলভ না-অর্থক রোম্যান্টিকতা-প্রসূত এয়ী চেতনাবোধ, ১৯৪৭-৫৭ কাল পরিসরের সমাজচেতনা-প্রবাহে নতুন সংযোজন।

কালো দুঃখ ও বাংলাদেশ: দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫৮-১৯৭০

১৯৪৭ সাল থেক ১৯৫৭ কাল-পরিসরে পাকিস্তানি বেনিয়া পুঁজি 'শিল্পপুঁজি' হিসেবে বিকশিত। কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য– প্রতিযোগিতাহীন এলাকা প্রয়োজন। পূর্ববাংলার ওপর চাপানো হল সামরিক শাসন। গত দশ বছরের নড়বড়ে

বাংলার সামন্তসমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করা হল ইধংরপ উবসড়পৎধপু-র শৃঙ্খলে। অখণ্ড পাকিস্তানের শ্লোগান, পরাজিত-প্রায় সামন্ত-ধ্যানধারণা, ধর্মমোহ, সাম্প্রদায়িকতা হল পুনরুজ্জীবিত।

পক্ষান্তরে ৪৭-এর বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী এ-সময় স্ফীতকায়। ১৯৬০-৬১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৬৬৭ জন। ১৯৭১ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার লক্ষ। অথচ সম্মুখে রয়েছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্বের সঙ্কট, রাষ্ট্রনৈতিক অনধিকার। বেতার যদি জীবনাগ্রহের স্বাক্ষর হয়, তবে তার লাইসেন্স ১৯৪৭-৪৮ সালের ৫,৩৭৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ তে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৫৩। অথচ বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধীন চিন্তাক্ষমতা হয়েছে লুণ্ঠিত। তাদের জীবন হল বন্দিপ্রহরের যোগফল।

এ-পর্বে যে-সব সাহিত্যিক আবির্ভূত হলেন, বস্তুতই, তাঁদের সম্মুখে ছিল বন্দিমুহূর্ত, অলঙ্ঘ্য দেয়াল, অবরুদ্ধ সমাজচেতনা ও জটিলতম সমাজগঠন। চলার পথে অগ্রজের সংঘর্ষ-উপদ্রুত পদক্ষেপের চিহ্ন নেই; তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, নিরাপদ আশ্রয়ে আসীন। এ-কালের সাহিত্যিকদের মানসচক্ষের হেডলাইটে উদ্ভাসিত হয়েছে–সুউচ্চ প্রাচীর, অকাল এবং সুবিধাভোগীর পরিতৃপ্ত মুখচ্ছবি।

প্রাক্-৪৭ পর্বের অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী পূর্বপ্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট। পাক-শাসকগোষ্ঠী সচেতন-বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকদেরকেও রেডিও, টেলিভিশন, প্রেস ট্রাস্ট, বি এন আর এবং লেখক সংঘের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করতে সচেষ্ট হল। কারণ All mass media (Press, Cinema, Radio, TV, etc.) are utilised, for example, by imperialist bourgeoisie to poison the minds of the working people and disarm them idiologically.

পরিবর্তন ঘটল মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের। তাঁরা জীবিকার উন্নতির ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই সাহিত্যভাবনা এবং শিল্প-শরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলেন ফ্রয়েডে আশ্রয়ী, কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। মানবতাবাদী শ্রেণী অংশত আক্রান্ত হলেন, কারণ অশক্ত বুর্জোয়া মানবতাবাদ যতখানি বর্ণচোরা ততোধিক নিরাপদ। এদের অধিকাংশই হলেন আত্মরোমন্থনে তুষ্ট, কল্পলোকের জ্বলন্ত জতুগৃহে যন্ত্রণাদগ্ধ, ক্রমবিকাশে শঙ্কাগ্রস্ত, দেহবাদী পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

১৯৫৮-৭০ পর্বের সাহিত্যিকদের স্ব-কালকে আত্মস্থ ও বিচার করার উৎসাহ ছিল না যেন। এদেশে বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানে বিশ্বাস নেই; ধর্ম আছে, তা বহু ব্যবহৃত; রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রনীতি নেই; বামপন্থী আন্দোলন বহুধা খণ্ডিত; সিদ্ধান্ত আর তত্ত্ব-গবেষণায় নেতৃবর্গ তখন ব্যস্ত। তাঁদের কাছে, অন্তরঙ্গ চেতনা-স্রোতে, পাকিস্তান 'লুপ্তস্বপ্ন', বুর্জোয়া সমাজমূল্য, যা ইতোমধ্যে ইয়োরোপে ক্ষয়িষ্ণু, ব্যর্থতায় বিচূর্ণিত।

ইতিহাসের গতিতে নয়, তাঁদের দৃষ্টি, মন ও মনন–সংযুক্ত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত ইয়োরোপীয় মধ্যবিত্ত ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তি-প্রতিক্রিয়াজাত সাহিত্যভাবনা ও শিল্পরীতিতে। তাঁদের কাছে সুখদ এবং আত্মীয় মনে

হল ভার্জিনিয়া উলফ-এর কণ্ঠস্বর–on or about December 1910, human character changed। এ-সময় ১৯১০-এ লন্ডন গ্রাফটন গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছিল ভ্যানগগ, মাতিস, সেজাঁ ও পিকাসো প্রমুখের ছবি।

স্মরণ রাখা দরকার, ইয়োরোপীয় পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর তৎকালীন সাহিত্যাদর্শ হল ধ্বংস-উন্মুখ পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টি প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী জীবনদর্শন। পক্ষান্তরে পূর্ববাংলার সমাজগঠন অর্ধ-সামন্ত, অর্ধ-ঔপনিবেশিক। সুতরাং অসম সমাজের দুই আদর্শ-প্রান্তে জীবনের, তথা শিল্পের জ্যা পরাতে অগ্রসর হলেন এ-পর্বের ঔপন্যাসিকগণ।

এ-পর্বের ঔপন্যাসিকদের কাছে, ব্যক্তিচেতনাপ্রবাহ অধিকতর শ্রদ্ধাবহ; সমাজ শত্রু, প্রতিপক্ষ। রাজনীতি, কল্যাণ পরিত্যাজ্য; প্রেম, প্রহসন আর রিরংসার যোগফল। একালের ঔপন্যাসিকদের প্রধান লক্ষণ অন্তর্মুখিতা এবং আত্মসর্বস্বতা; জীবন নামক শত্রুকে নির্বাসিত করার অক্লান্ত প্রয়াস। রূপবন্ধে– মগ্নচিত্রকল্প, বিচূর্ণিত উপমারূপক-প্রতীক প্রয়োগ তাঁদের অন্বিষ্ট। গত দু-পর্বের সমাজসম্পৃক্ত কর্মচেতনাকে এঁরা আত্মমগ্ন চৈতন্য-অন্ধকারে করলেন উপহাস। এঁরা আত্মভুক চেতনাশ্রয়ী; বিকৃত সমাজগঠনের চারদেয়ালে শৃঙ্খলিত, সমাজ-শর্তসাপেক্ষ, ব্যক্তিপ্রতিক্রিয়াবাদী। এই চেতনা-সামগ্রীই এ-পর্বের ঔপন্যাসিকদের গৌরব এবং দুর্বলতা। জলস্তম্ভের মতো ঊর্ধ্বগামী কোনো প্রতিভা শর্তমুক্ত সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে অবরুদ্ধ অবক্ষয়, অচলতাকে চাবুকাঘাত করে সচল করেননি। এমনকি ইতিহাসের আলোকদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমাজ-অন্তর্গত ক্রমবিকাশের ফল্গু-সিক্তস্রোত সন্ধানে তাঁদের ছিল অনীহা।

১৯৪৭-৫৭ পর্বের ঔপন্যাসিকগণ একালে ছিলেন সত্যান্ধ; এ-পর্বের ঔপন্যাসিকগণ হলেন জন্মান্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ঔপন্যাসিকদের যৌথ চেতনাপ্রবাহ, জীবনদর্শন এবং তাঁদের রূপবন্ধ, চরিত্রনির্মাণ, চিত্রকল্প উপমা-রূপক-প্রতীক নির্মাণের অস্থিরতায়, অবজ্ঞায়, অবিশ্বাসে, অভিনবত্বে আমাদের বন্দিচেতনা-স্রোত বিধৃত; ওঁদের বোধ-বোধি-চেতনালোক আমাদের উৎপীড়িত বিবেক, অক্ষমতার আর্তনাদ, সত্যান্ধের বিবেকী ধিক্কার; জন্মান্ধের আত্মমুক্তির ক্রমিক পরিণাম।

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস : ১৯৫৮-১৯৭০

দ্বিতীয় পর্বের ঔপন্যাসিকদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, ১৯৪৭-৫৭ পর্বের ঔপন্যাসিকদের চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসার ক্রমবিকাশ সন্ধান; দ্বিতীয়ত, এ-পর্বের নতুন ঔপন্যাসিকদের রেখাচিত্র অঙ্কন।

শওকত ওসমানের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে– একালে। *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৩); *সমাগম* (১৯৬৮) এবং *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭০)।

শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস, গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব–ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না'– নায়কের উক্তি এ-উপন্যাসের সারকথা। এবং এ-জীবনদর্শন সর্বকালেরও বটে। ঔপন্যাসিক রূপবন্ধ নির্মাণে হারুন-অর রশীদের বাগদাদের কাহিনী-কে নাট্যরীতিতে

পরিচর্যা করেছেন। চরিত্রগুলি–এক একটি চেতনার প্রতীক। খলিফা ও মশরুর; তাতারী এবং কবি নওয়াস–যথাক্রমে ক্ষমতা-অন্ধ অত্যাচারী, উৎপীড়িত মানবতার এবং শাশ্বত সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্কেতবহ। ভাষারীতি–বিষয় প্রকাশে যথাযথ। *সমাগমে* শওকত ওসমান ফ্যান্টাসির জগতে পদচারী। *রাজা উপাখ্যান* প্রতীকাশ্রয়ী হলেও, গল্পরস প্রধান; পরিচর্যায় বিবরণধর্মী এবং নাট্যিক।

প্রশ্ন উঠবে, *জননীর* বৃহৎ ক্যানভাস বাদ দিয়ে এ-পর্বে শওকত ওসমান কেন ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় থেকে ঘটনাংশ নির্বাচন করলেন। কেনই-বা তিনি পরিতৃপ্ত হলেন 'ফ্যান্টাসির' উদ্ভট জগতে। এ-পর্বে শওকত ওসমানের কৃতিত্ব– তিনি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার সঙ্গে শিল্পভাবনাকে প্রগতিশীল ও সৃষ্টিমুখী রাখার জগত আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে স্মরণযোগ্য, জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখনি There comes a moment of decision এবং শিল্পীমানস either break through to socialism or founder in fatalism, symbolism, mysticism and reaction. শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী মানস-চেতনার জন্ম–স্বকাল-সঙ্কট থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যই। শওকত ওসমানের কৃতিত্ব তিনি তাঁর পলাতক চেতনাকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করত সমর্থ হয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটি উপন্যাস– *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)। *লালসালুতে* প্রবাহিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজ-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চেতনাপ্রবাহ এ-পর্বে আত্মনিমগ্ন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্থিতধী। 'কোনো সঙ্কটকালে পরিবেশকে উপেক্ষা কিংবা অতিক্রম করে ব্যক্তির যে অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তির সেই অস্তিত্বই সার বা মূল অস্তিত্ব। ব্যক্তির এ-অস্তিত্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কোনো সংকট-মুহূর্তে মানুষ, এর আলোতে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।' স্কুলশিক্ষক আরেফ আলীর আত্মগত দ্বন্দ্বে এবং পরিণামে, কাদের যে যথার্থ হত্যাকারী, এই সত্য প্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন শিল্পায়িত হয়েছে। আরেফ আলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্কটাক্রান্ত ভয়, আবেগ, রক্তাক্ত অনুভূতির রূপবন্ধ ও চিত্রকল্প সৃষ্টির সার্থকতা এ-উপন্যাসের গৌরব। ধ্রুপদী ভঙ্গির ভাষারীতির মধ্যে আবেগের বেগ সঞ্চারিত হওয়ায় এ-উপন্যাসের ভাষা, চেতনার চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সার্থক।

ফর্ম নিরীক্ষায় এবং উপস্থাপনের রীতিতে *কাঁদো নদী কাঁদো* অভিনব। তবারক ভুইঞার গল্পচ্ছলে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন কুমুরডাঙ্গা মফস্বল শহরের জন-জীবনের আতঙ্ক, ভয়, ভীতি, আশঙ্কা এবং অভিব্যক্তি যেমন বিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কিত হয়েছে; তেমনি 'এক শ্রোতার' আত্মমগ্ন চেতনাস্রোতের শব্দরূপে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনদ্বন্দ্ব, ভয় এবং পরিণাম রূপান্বিত হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার উকিল কফিলউদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, ডাক্তার, মোহন চাঁদ, কালু মিঞা, ছলিম মিঞা, মিহির মণ্ডল, হবু মিয়া, সকিনা খাতুন প্রভৃতি চরিত্র স্বল্প রেখায় স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল। ঘটনাবিন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বহুক্ষেত্রে ড্রামাটিক ট্রিটমেন্ট করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা-চরিত্রের ভয়, ভীতি, দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা, আত্মনিমগ্ন রক্তাক্ত। চেতনাপুঞ্জের চিত্র-অঙ্কনে তিনি অভিব্যক্তিবাদী; কোনো কোনো

ক্ষেত্রে পরাবাস্তববাদীও বটে। যেমন: মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কালীন অনুভূতি :

"সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। ...এবং কলিজাটি আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মতো ডানা ঝাপটাতে শুরু করে।"

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য, অস্তিত্ববাদ ইয়োরোপীয় পচনশীল বুর্জোয়া সমাজ অন্তর্গত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত মনের প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চরম আত্মরতিমূলক প্রতিক্রিয়া।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর *শেষ রজনীর চাঁদ* (১৯৬২), *নাম না জানা ভোর* উপন্যাস দুটিতে নগর-জীবনাশ্রয়ী ঘটনার মাধ্যমে তাঁর রোম্যান্টিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম পর্বের মার্কসবাদী চেতনা লুপ্ত প্রায়; বরঞ্চ রোম্যান্টিক দৃষ্টি সুখদ উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছে।

রোম্যান্টিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ-পর্বে জীবনপলায়নবাদী। *কাঞ্চনমালার* রোম্যান্সধর্মিতা প্রায় উপাখ্যানে আত্মতৃপ্ত। *কাশবনের কন্যার* অন্তরঙ্গ গীতল জীবনজিজ্ঞাসার স্বাক্ষর এ-উপন্যাসে অনুপস্থিত।

সরদার জয়েনউদ্দীনের *পান্নামোতি* (১৯৫৬) এবং নীল রঙ রক্ত (১৯৫৫) উপন্যাস দুটির প্রকরণগত সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে তাঁর অনেক *সূর্যের আশা* এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাসটি উত্তমপুরুষে লেখা। বিস্তৃত ক্যানভাসে-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সঙ্কট, মানুষের জীবনযুদ্ধের বহুভুজ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কোনো কোনো চিত্রে, এ-আখ্যানে, রোম্যান্টিক কল্পনা-আতিশয্য–অন্তরঙ্গ বস্তুনিষ্ঠাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। চরিত্রগুলি চলমান, ভাষারীতি উপযুক্ত। অনেক *সূর্যের আশা* সরদার জয়েনউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রথম পর্বের দৌলতুন্নেসার *বধূর লাগিয়া* (১৯৬২) একালের অন্তর্গত।

১৯৫৮-১৯৭০ : নতুন ঔপন্যাসিকদের রেখাচিত্র

এ-কালের নব্য ঔপন্যাসিকদের প্রধান লক্ষণ –অন্তর্মুখিতা। আত্মমগ্ন চেতনাপ্রবাহ এবং মনোবিকল রীতিতে এঁরা অধিক আগ্রহী। রাজিয়া খান, সৈয়দ শামসুল হক এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ–এঁদের মধ্যে অন্যতম।

রাজিয়া খানের দুটি উপন্যাস : *বটতলার উপন্যাস* (১৯৫৯) এবং অনুকল্প (১৯৫৯)। *বটতলার উপন্যাসের* মঈন, সুমিতা, হেটি, শামসা, তরু, মিন্টু–সবাই যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপ। সবাই জীবনের সঙ্গতির সন্ধানী, শান্তির প্রত্যাশী–অথচ শূন্যতাবোধ তাদেরকে নিঃশেষিত করল। বিশ্লেষণী টর্চ জ্বেলে এরা যত আত্মসমীক্ষা করছে, ততোই অন্ধকার যেন গাঢ় হচ্ছে। আধুনিক নিঃসঙ্গ মানুষের রক্তক্ষরণের শব্দরূপ উপন্যাস দুটি। আত্মিক প্রকরণে– *বটতলার উপন্যাস*–সুসংগঠিত

হয়েও দুর্বলতার চিহ্নবহ। আতিশয্যহেতু ঘটনা এবং কাহিনী ভারসাম্যহীন, পল্লবিত। *অনুকল্প* ফর্মের দিকে দিয়ে অনেক বেশি সুগঠিত। রাজিয়া খান–জীবনের চেতনা-প্রতীতির সঙ্গে বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন treatment-এর প্রশ্নে। ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনের বাস্তবপ্রচ্ছদকে স্বীকার করেছেন। রাজিয়া খান বিশ্লেষণ-ধর্মী। বিমূর্ত চেতনাপুঞ্জকে বিমূর্ত অবয়বে প্রকাশ করতে তাঁর আগ্রহ নেই।

সৈয়দ শামসুল হক-এর উপন্যাস *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯), *দেয়ালের দেশ* (১৯৫৯), *অনুপম দিন* (১৯৬২) ও *সীমানা ছাড়িয়ে* (১৯৬৪)। *এক মহিলার ছবি*–অন্ত-অসঙ্গতি সম্পন্ন সমাজ-অন্তর্গত এক মহিলার মানসিক জটিলতার চিত্ররূপ; আত্মমগ্ন চেতনার আর্তনাদ। মানসিক দুর্বলতা, নৈঃসঙ্গ্য, অবিশ্বাস–নাসিমাকে অক্টোপাসের মতো নিঃশেষ করেছে। প্রচলিত উপন্যাস ফর্ম থেকে *এক মহিলার ছবি* ব্যতিক্রমী। ভাঙা-ভাঙা, ছেঁড়া-ছেঁড়া–ভঙ্গক্রম স্মৃতিচারণ ও চেতনার আবেগ, এ-উপন্যাসে শব্দরূপ পেয়েছে। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ হয়েছে–প্রবল আবেগের অনুরণনে ও গীতলতায়। গদ্যরীতি কবিতাক্রান্ত: বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উপমাবহুল। দ্বৈত-ভালোবাসা ও সন্তান প্রত্যাশার সহজাত বৃত্তি নিয়ে রচিত উপন্যাস *দেয়ালের দেশ*। *অনুপম দিন* রচিত হয়েছে অবচেতন মনের দ্বৈত-ভালোবাসার বিশ্লেষণ নিয়ে; *সীমানা ছাড়িয়ে* রাজনীতি, প্রণয় এবং শিল্পী-সত্তার পরাজয়ের শিল্পকথা। চরিত্রে অন্তর্যন্ত্রণা ও অন্তর্মুখিতার তীব্রতাকে ধারণ করতে সৈয়দ শামসুল হকের গদ্য সাবলীল।

আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র*– শিল্পী জাহেদ এবং তার স্ত্রী ছবি, জামিল ও তার স্ত্রীর মনোবিশ্লেষণ ও মনোবিকলনের শিল্পরূপ। বিধবা নারী বিলকিসের অবরুদ্ধ যৌনচেতনার বিকৃতির বিশ্লেষণ *শীতের শেষরাত* বসন্তের প্রথম দিন। তা-সত্ত্বেও, জীবনের অসঙ্গতি, কদর্যতা বিকৃতির উর্ধ্বে মানুষ আত্মমুক্তির সন্ধান পায়– এই 'হাঁ-অর্থক' জীবনবোধ উপন্যাস দুটির পরিণামী সিদ্ধান্ত। আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলাদেশী উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন– *ক্ষুধা ও আশা*। গ্রামজীবনের বৈচিত্র্য, শহর-জীবনের অন্ধকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং একটি বিশেষ যুগের সার্বিক পরিচয় *ক্ষুধা ও আশায়* সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের বস্তুনিষ্ঠা, জীবনবোধ ও মনোবিশ্লেষণী অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর *ক্ষুধা ও আশা*। শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্বে যে সমাজ বিকশিত হয়– এ-সত্য আলাউদ্দিন আল আজাদের সচেতনভাবে উচ্চারিত হল। জোহা-পরিবারের উন্মুলিত হওয়া এবং নিঃশেষিত হওয়া *ক্ষুধা ও আশার* চরম বাক্য নয়। *কর্ণফুলি* চট্টগ্রামের সম্প্রদায়-বিশেষের জীবনালেখ্য। চরিত্র ও ঘটনা, আতিশয্যমুক্ত নয়।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ব্যতীত, শ্রেণীসচেতন ঔপন্যাসিকের মধ্যে শিল্পগৌরবে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়– তিনি শহীদুল্লা কায়সার। তাঁর দুটি উপন্যাস *সারেং বৌ* (১৯৬২) এবং *সংশপ্তক* (১৯৬৫)। *সারেং বৌ*– বিষয়গৌরবে অভিনব; নবীতুন-চরিত্রনির্মাণে গৌরবান্বিত, বেদনার শব্দরূপে অন্তরঙ্গ। অতি গীতলতা

উপন্যাসের দৃঢ়তাকে দুর্বল করেছে; আবেগ-আতিশয্য পরিণামকে করে তুলেছে অস্বাভাবিক। শহীদুল্লাহ কায়সারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *সংশপ্তক*। এ-উপন্যাসে 'যুগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবন চেতনার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এটি এপিকধর্মী উপন্যাস। বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টিতে *সংশপ্তক* পূর্ববাংলার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলোর অন্যতম।'

জহির রায়হানের জীবনদৃষ্টি মূলত রোম্যান্টিক। *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসটিতে রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়ে গ্রাম-জীবনের অনাদৃত রূপকে দেখা হয়েছে। এই রোম্যান্টিক দৃষ্টির চোরাবালিতে *বরফ গলা নদী* উপন্যাসের পরিণাম হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক ও মেলোড্রামাটিক। জহির রায়হান জীবনবোধে রোম্যান্টিক –দৃষ্টিতে আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক।

১৯৫৮-৭০ পর্বে বাংলা উপন্যাসের গতি বিচিত্রমুখী–ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও অনেক। অনেকেই গুণগত উৎকর্ষে, জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে, ভাষা ও গঠনরীতির সৌকর্যে উল্লেখযোগ্য।

মীজানুর রহমান শেলীর *পাতালে শর্বরী*, হুমায়ুন কাদিরের নির্জন মেঘ, আবদুর রাজ্জাকের *কন্যাকুমারী*, রশীদ করীমের উত্তম পুরুষ এবং প্রসন্ন *পাষাণ*, আহসান হাবীবের *অরণ্য নীলিমা*, আতাহার হোসেনের *পিপাসা*–প্রভৃতি উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে বাংলাদেশের অবিকশিত নগর-জীবনের বহু-বঙ্কিম জটিলতা।

এ-পর্বের আরেকটি ধারা ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকাংশ উপন্যাসের উপাদানসমূহ শিল্পরূপ পেয়েছে। ইবনে রশীদের *ফাল্গুন করা* (১৯৫৮), চৌধুরী শামসুর রহমানের *মস্তানগড়* (১৯৬২), আবুজাফর শামসুদ্দীনের *ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান* (১৯৬৪) এবং মেসবাহুল হকের *পূর্বদেশ* (১৩৭০) উল্লেখযোগ্য।

এ পর্বের সত্যেন সেন একক নাম। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর উপন্যাস নানামুখীন। প্রায় উপন্যাসেই তাঁর বক্তব্য–ফর্ম, চেতনা ও ভাষারীতির সঙ্গে সমন্বিত নয়। তাঁর উপন্যাসসমূহের মধ্যে *অভিশপ্ত নগরী* (১৩৭৬), *আল বেরুণী* (১৩৭৬), *কুমারজীব* (১৩৭৬), *পদচিহ্ন* (১৩৭৫), *পাপের সন্তান* (১৯৬৯) *পুরুষমেধ* (১৯৬৯), *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৩৭৬), *সাত নম্বর ওয়ার্ড* (১৩৭৪) *সেয়ানা* (১৩৭৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিথের নব রূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন-সঙ্কট বিবেচনায় *অভিশপ্ত নগরী* এবং *পাপের সন্তান* বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ কাল-সময়ে বাংলাদেশের সমাজ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে–ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে প্রবহমান ছিল। এই সমাজ বিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রবাহ–১৯৪৮-এ জীবনের উপরিতলে আছড়ে পড়েছিল–গণজাগরণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯-এ। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে দ্বান্দ্বিক বিকাশের প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত হল। আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। ১৯৪৭-৭০ কাল-পরিসরে সমাজ-বিকাশের দ্বন্দ্বপ্রবাহ ও জীবন-সংঘাতকে, শিল্পরূপ দিতে আমাদের

উপন্যাসশিল্প কতটুকু সত্যসন্ধ ছিল, তা বিচার্য বিষয়। এ প্রশ্নের জবাব ঔপন্যাসিক, আলোচক এবং পাঠক–সকলের কাছেই পরিচ্ছন্ন হওয়া ইতিহাসের প্রয়োজনে আজ বাঞ্ছনীয়।

ক্ষুধা ও আশার একটা অংশ মনে পড়ছে–'ইতিহাস পড়ে একটা জিনিস আমি বুঝেছি, ইতিহাসের একটি নিজস্ব গতি আছে তাতে ব্যক্তি নিজেকে জড়িয়ে চলে মাত্র; চেষ্টা করলে সেই গতিকে বিভ্রান্ত বা বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু রোধ করতে পারে না।' জীবনের এই সত্যকে রূপান্বিত করতে আজ আমাদের প্রয়োজন–নতুন সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা, ইতিহাসসচেতন চেতনাপ্রবাহ, অনিবার্য শব্দাবলি এবং চিত্রকল্প।
[১৯৭৩]

দুই
আঙ্গিক বিবেচনা

পরিবর্তমান সমাজচৈতন্যপ্রবাহের ব্যক্তিচিত্ত-আশ্রয়ী চেতনার অভিব্যক্ত রসধমব সাহিত্যশিল্প; এবং প্রবহমান সমাজ-ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সামন্তরালভাবে সাহিত্যশিল্প রসধমব অর্থাৎ ভড়ৎস-ও রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই, উপন্যাসের শিল্পরীতিও পরিবর্তন হয় অনিবার্যভাবে রূপ থেকে রূপান্তরে। ফলে উপন্যাসশিল্পের কোনো স্থির ফর্ম-নির্দেশ সম্ভব নয়।

২.১

মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই পুঁজিবাদী সভ্যতাগর্বী ইয়োরোপ রূপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিতে। শুরু হয় তার সভ্যতার অবক্ষয় ও স্খলন; দারিদ্র, অসত্য ও মূল্যবোধ-জীর্ণতায় মধ্যবিত্ত সমাজ হয়ে ওঠে বিপন্ন। ধনবাদী শ্রেণীর শোষণ-উৎস যন্ত্র ও যন্ত্রজটিলতার, পীড়নে সংবেদনশীল মানুষ অতি দ্রুত হয়ে যায় সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র, একাকী; নিঃসঙ্গ, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ও অন্তর্মনস্ক। ধনবাদী ক্রূরশক্তির মর্মন্তুদ পীড়নে ইয়োরোপীয় মানুষ ক্রমশ শুরু করে মগ্নচৈতন্যে জীবনযাপন। তাদের কাছে উনিশ শতকী সমগ্রতাবোধ, কার্যকারণতত্ত্ব, যুক্তিবাদ রূপ নিল মূল্যহীন ও কালজীর্ণ অবিশ্বাসে। তারা তীক্ষ্ণ অনুভববেদ্যতা, সহজাতবৃত্তি, অন্তর্গত চেতনাস্রোত, কার্যকারণহীন ঘটনা ও সময়প্রবাহকে অনুধ্যান করলেন শিল্পাদর্শের পরমেশ্বর হিসেবে। যেহেতু বহমান বহির্বস্তুজগত এবং স্রষ্টার অনুভবসংবেদন মন–এ-দুয়ের জটিল বাস্তবতা একাত্ম হয়ে প্রকাশ ঘটায় রূপের; সে-কারণে উপন্যাসের ফর্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধিত হল জটিলতর রূপান্তর। সমাজপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিচৈতন্য ও সজাগ-অস্তিত্বের অন্তর্লীন কিংবা তরঙ্গময় সংঘাত-সংঘর্ষ যুক্ত হয়েই সাধিত হয় মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতর ক্রমবিকাশ। সঙ্কটসঙ্কুল সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ভ্রমমুক্তির তপস্যা, নিরন্তর সংগ্রাম, দুঃসহ অন্তর্যন্ত্রণার জটিলতার প্রসঙ্গ, পরিসর ও প্রসারকে রূপান্বিত করাই হয়ে ওঠে এ-পর্যায়ের উপন্যাস-শিল্পের

বৈভব, তার ফর্মের অনিবার্যতা। প্লটবিন্যাসের কার্যকারণ, চরিত্রের বিকাশক্রম, সময়ধারণা ও বাক্যগঠনরীতির মাঝে সঞ্চারিত হল এক অস্থির মন ও মননক্রিয়া। সৃষ্টি হল চৈতন্যপ্রবাহরীতির উপন্যাস। পরীক্ষাপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ রচনা করল anti-plot, anti-hero I anti-time উপন্যাস। ঐতিহাসিক-সামাজিক শরীরী ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে 'হোমারের মহাকাব্যের ওডিসিয়ুস রূপান্তরিত হয়ছে অক্ষম আইরিশ ইহুদি ব্লুমে।'

২.২ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চেতনাপ্রবাহ বহুভুজ হতে বাধ্য। কোনো শ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষানুগ রাষ্ট্রীয় চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতিচেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যান-ধারণার যোগফলই হল সে-শ্রেণীর একক চেতনাপ্রবাহ। বাংলাদেশের উপন্যাসে বিধৃত জীবন ও তার ফর্মবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বময়, জটিল সমাজ-সংগঠন তথা চেতনাপ্রবাহের ভূমিকা অনিবার্য। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, ১৯৪৭-এ সেই ঔপনিবেশিক-প্রক্রিয়ার রূপান্তর, ৫২ সালে নব্য শোষণ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে জাতীয় চৈতন্যের রক্তমুখী বহিঃপ্রকাশ, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাস্রোতে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক জীবনবোধকে করেছে আন্দোলিত, স্পন্দিত, রক্তাক্ত ও জটিলতর। কিন্তু স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের সাহিত্যিক অভিযাত্রার উৎসকেন্দ্রে ও শৈল্পিক উত্তরাধিকারবোধ অনিবার্য ছিল, দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় তথা অব্যর্থ ফর্ম-উদ্ভাবনে তার উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য।

প্রকরণ বিবেচনায় প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্যায়ের পূর্ববাংলার দুটি উপন্যাসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। একটি কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)-এর *নদীবক্ষে*। (১৯১৯); অপরটি হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) *নদী ও নারী*। ব্যক্তির অর্ন্তগত জীবন ও বহির্বাস্তবতাকে সমন্বিত করার চেষ্টায় কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* বিশিষ্ট। চরিত্রায়ণ, চরিত্র-অন্তর্মুখ গ্রাম বাংলার বহির্বাস্তবতার বিন্যাস, রবীন্দ্র-প্রভাবিত সংবেদনময় সৃষ্টিশীল গদ্যরীতির ব্যবহার ঔপন্যাসিক-ফর্ম নিরীক্ষায় *নদীবক্ষের* বিশিষ্টতাকে করেছে সুচিহ্নিত। হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী* Epic form-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নদীপ্রবাহ, জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ-উপন্যাস। পদ্মা-তীরবর্তী সংগ্রামশীল মানুষের দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতা, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ এবং সর্বোপরি অস্তিত্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও ভবিষ্যৎসঞ্চারী চিরজয়ী জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সক্রিয়তার রূপায়ণে হুমায়ুন কবিরের সার্থকতা সন্দেহাতীত। এ-উপন্যাসে জীবনপ্রবাহ যেমন নদীর বহমানতার সাথে সমান্তরালভাবে উপস্থিত, তেমনি ভাষাভঙ্গিও নদীর মতোই গতিচঞ্চল, তরঙ্গময়। জীবনের সমগ্রতার বিশ্বাস, বুর্জোয়া জীবনচিন্তা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জীবনের যথাযথ রেখা, পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ, মাত্রা ও রঙে কাজী আবদুল ওদুদ ও হুমায়ুন কবির অবলোকন করতে চেয়েছেন জীবনকে। শৈল্পিক

উত্তরাধিকার ও সমকালসংলগ্ন ফর্ম-নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত উপন্যাসদ্বয় বাংলাদেশের উপন্যাসপ্রবাহে দূরসঞ্চারী।

নদীবক্ষে এবং *নদী ও নারী* উপন্যাসে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সাতচল্লিশ-পরবর্তী পর্যায়ে সে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশার ক্ষেত্রে বিব্রত হলাম আমরা। এ-পর্যায়ে উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। ১৯৪৭-১৯৫৭ কাল পরিসরে যাঁরা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্বাচনে গ্রামকেন্দ্রিক। জীবনদৃষ্টিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী, প্রকরণে শ্রমবিমুখ ও দ্বিধান্বিত। উপন্যাসের ভাষা-আবিষ্কারে তাঁরা অন্যমনস্ক, গঠনে অতিদ্রুততা-আক্রান্ত কেউ-বা অপরিমিত। এ-সকল ঔপন্যাসিক সমকালীন বিশ্ব তথা কল্লোলীয় (১৩৩০) শিল্পবোধকেও অতিক্রম করতে পারেননি। এক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)। ফর্মনিষ্ঠা বলতে যা বোঝায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে তার সার্থক বিন্যাস ঘটেছে। তাঁর *লালসালু* (১৯৪৯) উপন্যাসের পটভূমিও গ্রামজীবন। কিন্তু জীবনের উপরিতলের চিত্র-অঙ্কন না-করে, তিনি উন্মোচন করেছেন সমাজমূলের অসঙ্গতিকে। তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে, অভিজ্ঞানকে তিনি নিরাসক্তিতে পরিণত করেছেন, ঘটনাকে প্রতিক্রিয়ায় রূপ দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়ার আবেগকে চিত্রে অঙ্কন করেছেন, impressionist শিল্পীর মতো। চেতনালোক, চিত্রগুচ্ছ, বর্ণনাংশ ঘটনা ও জীবনকে শিল্প-আয়তনিক ও দৃশ্যমান করতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* উপন্যাসে নির্বাচন করেছেন ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ (author's omniscient point of view)। মজিদ-চরিত্রের জীবনপ্যার্টার্ন ও সমগ্রতাবোধের অন্তর্লীন সূত্রসমূহ *'লালসালু' র* প্রথম পর্যায়ের ঘটনা, চিত্র ও বর্ণনাসংলগ্ন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সমান্তরালভাবে লেখকের দৃষ্টিকোণও স্থানান্তরিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও মজিদের মহব্বতনগরে প্রবেশের পর তার প্রেক্ষণবিন্দুই এ-পর্যায়ে *লালসালুতে* প্রগাঢ় ও পরিণামসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। সঙ্কটদীর্ণ ব্যক্তিত্বের অন্তর্মূলে আত্মস্থ চেতনাময় প্রেক্ষণবিন্দু থেকে জীবন ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসা রূপায়িত হওয়ায় *লালসালুর* ঘটনাক্রম ও চেতনাপ্রবাহ, রূপান্তরধর্মী, বর্ণময় ও সঙ্গীতস্পন্দিত। ফলে মুখচ্ছদ উন্মোচিত, অস্তিত্বের নির্দয় সত্যের দিকে ধাবমান মজিদের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক-শিহরিত সমগ্রতাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। অন্ধকারের অধীশ্বর মজিদ হতে পারত দুঃখময়কবলিত লুপ্ত অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তি। তা' হয়নি, কেননা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ভিন্ন। সুতরাং উপন্যাসের অন্ত্যপর্যায়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করলেন জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু। অন্তিম পর্যায়ে জমিলার মেহেদিরঞ্জিত প্রতীকী পদাঘাত আমাদের পৌঁছে দেয় এক সত্যদর্শী অস্তিত্ববলয়ে। দৃষ্টিকোণ প্রেক্ষিত, বহির্জগত, আলম্বন বিভাব (objective correlative), ভূদৃশ্যচিত্র এবং চিত্র ও চিত্রকল্প সৃজনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিচর্যা প্রকরণও পাঠকের মন-মনন ও হৃদয়বর্তী। *লালসালু* উপন্যাসে লেখক প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করেছেন চরিত্রের অন্তর্গত সংবেদনসিক্ত ও চেতনাময় অনেকান্ত নির্বাচিত

দৃষ্টিকোণ (multiple selective omniscient of view)। চরিত্রগুলো মূলত মজিদ, তাহেরের বাপ, জমিলা ইত্যাদি অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি; স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রেক্ষণবিন্দু উৎসাহিত পরিচর্যা (treatment) ও অভিপ্রায় প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে অন্তর্জগতে সঙ্গীতময়, সঙ্কেতময়, নিবিড়, নিটোল ও সংহতিপূর্ণ। লেখকের সাংগঠনিক রীতি মন এবং মননকে, মানুষ এবং প্রকৃতিকে জৈবিক ঐক্য দান করেছে। চরিত্র কিংবা ঘটনাবিন্যাসে কোথাও প্রগাঢ় রঙ ব্যবহৃত হয়নি। সমাজসম্পৃক্ত কর্মদায়িত্বচ্যুত, সমাজবিচ্ছিন্ন একক 'আমিত্ব'বোধ থেকেই এই নিরাসক্তি, গীতিময়তা ও আত্মগত চেতনার জন্ম। বুর্জোয়া সমাজবিন্যাসের আন্তর্জাতিক অসঙ্গতি, সমকাল-সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ার সংক্ষুব্ধ চেতনাসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্প অভিজ্ঞানের জন্ম। এ-অর্থে তিনি 'কল্লোল'-উত্তর চেতনার যথার্থ প্রতিনিধি।

[ক] জীবনের পরিব্যাপ্ত সময় এবং ব্যাপমান সমাজের সামূহিক (collective) অভিজ্ঞতা থেকে এপিক ফর্মের জন্ম হয়। Epic একটি সমাজের উত্থানপর্বের আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের শিল্পনির্মাণ। জীবনসংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ, ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করায় এর অভিযাত্রা প্রলম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তরকাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধও আরেকটি উত্থানের সূর্যদিগন্ত উন্মোচন করেছিল। আমাদের কথাসাহিত্যে এপিক ফর্মের উপন্যাস রচনায় যে প্রতিশ্রুতি হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারীতে* উৎসারিত হয়েছিল, শহীদুল্লাহ কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫)-এ তার সিদ্ধি। গ্রাম ও নগরজীবনের সুবৃহৎ ক্যানভাসকে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে সামন্তসমাজের অবক্ষয় এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানপ্রক্রিয়াকে *সংশপ্তক*-এ বিন্যস্ত করেছেন লেখক। যুগচেতনা, শিল্পচেতনা এবং জীবনচেতনার সমন্বিত বিন্যাসে জীবনের সমগ্রতা এ-উপন্যাসে হয়ে উঠেছে আন্দোলিত স্পন্দিত। ইতিহাসবোধ ও সংগ্রামী জীবনচেতনার ক্রমধারার শিল্পরূপ হল *সংশপ্তক*।

আলাউদ্দিন আল আজাদের (জন্ম ১৯৩২) *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) সম্পর্কে স্বতন্ত্র মন্তব্য প্রয়োজন। এপিক-এর সাথে এর সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রেও ব্যবধান আছে–যেমন ব্যবধান *ইলিয়াড* এবং *ওডেসির* মধ্যে। *ইলিয়াডের* বিষয়, ঘটনা এবং চরিত্রের ব্যাপ্তি, *ওডেসিতে* ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রসারতা ও গভীরতা। *ক্ষুধা ও আশাও* ব্যক্তির গভীরতর অন্তর্জীবনের এপিক। সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞায় না হলেও, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এপিক ফর্ম-এর অনুসারী আরো দু'টি উপন্যাস হল আবু জাফর শামসুদ্দীনের (জন্ম ১৯১১) *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪) এবং আবু ইসহাকের (জন্ম ১৯২৬) *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬)। আবহমান ইতিহাস পরম্পরার সাথে সমকাল-তরঙ্গিত জীবনচেতনার সমন্বয়ে রিজিয়া রহমানের (জন্ম ১৯৩৯) *বং থেকে বাংলা* (১৯৭৮) এপিকধর্মী উপন্যাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এ-উপন্যাসের সময়-পরিসর আড়াই হাজার বছর পূর্বকাল থেকে একাত্তর সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সময় ও সমাজপরিসরের এই বিস্তৃতির সাথে সংযুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের ইতিহাস ও

জীবন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনের ইতিবাচক মূল্যমান অন্বেষায়, বিষয়ের সাথে গদ্যরীতির গতিময় বিন্যাসে বং *থেকে বাংলা* নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

[খ] জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন হয়ে ওঠে অনিবার্য, তখনি, 'There comes a moment of decision'. শিল্পীমানস 'either breaks through to socialism or founders in fatalism, symbolism, mysticsm and reaction'. সুতরাং ১৯৫৮-১৯৭০ কালপরিসরে রচিত উপন্যাসের বক্তব্য প্রত্যক্ষতার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হল পরোক্ষ শিল্পঅন্বেষার জটিলতায়। সম্মুখস্থ বন্দিমুহূর্তে, অলঙ্ঘ্য দেয়াল, অবরুদ্ধ সমাজচেতনা ও জটিলতম সমাজসংগঠন অধিকাংশ ঔপন্যাসিককেই করে আত্মবিবরকামী ও পলায়নবাদী। কেউ হলেন ফ্রয়েড-আশ্রয়ী, কেউ-বা স্বল্পভাষী; কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নালোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপে। এ অবস্থায় সঙ্গত কারণেই সচেতন শিল্পী প্রকাশের নবতর ফর্ম সন্ধানে সচেষ্ট হলেন। রূপক বা প্রতীকধর্মী উপন্যাস রচনার কার্যকারণ এখানেই নিহিত। যেহেতু অসম্ভব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আত্মনিয়োগ, যেহেতু সচেতন শিল্পীমানস সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে উপস্থাপন করতে চান সমাজজীবনমূলস্পর্শী বক্তব্যকে; সে-কারণেই রূপক-প্রতীকই হল নিরাপদ প্রকাশমাধ্যম। সি.এস.লুইসের মতে, স্পষ্টরূপে যা প্রকাশযোগ্য নয়, তাকে প্রতীকের মাধ্যমে এবং পরিচিত বিষয়কে গভীরতর বক্তব্যের ছদ্মাবরণে তাৎপর্যবহ করে তোলাই এ জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

জননীর উচ্ছ্বাস, সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা এবং ঐতিহাসিক সান্ত্বনার কথা বাদ দিলে শওকত ওসমানের (জন্ম ১৯১৭) *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৫৮) *সমাগম* (১৯৬৭) *রাজা উপাখ্যান* (১৯৭১) এবং পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩) ফর্মের পরীক্ষা এবং সমাজঘনিষ্ঠতায় ব্যতিক্রম-ধর্মী। *ক্রীতদাসের হাসি* প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। মানুষের মুক্তিকামী আকাঙ্ক্ষার সর্বকালিক অভিব্যক্তি এ-উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য। ঔপন্যাসিক রূপবন্ধ নির্মাণে হারুন-অর-রশীদের বাগদাদের কাহিনীকে নাট্যরীতিতে পরিচর্যা করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রপুঞ্জ একেকটি চেতনার প্রতীক। খলিফা ও মশরুর তাতারী এবং কবি নওয়াস যথাক্রমে ক্ষমতা-অন্ধ অত্যাচারী, উৎপীড়িত মানবতার এবং শাশ্বত সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্কেতবহ। সংলাপপ্রধান ভাষারীতি এবং বিষয়প্রকাশে অনিবার্য শব্দচয়ন এ-উপন্যাসের আঙ্গিক সতর্কতার প্রমাণ। *সমাগম* উপন্যাসে ফ্যান্টাসির আশ্রয়ে শওকত ওসমান সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসবিন্যস্ত চরিত্রপুঞ্জের সকলেই প্রয়াত। সম্প্রদায় এবং জাতিধর্ম-অতিক্রান্ত সর্বজনীন জীবনবোধ এর চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। যেমন : আলাওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হাজী মুহম্মদ মোহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, লিও তলস্তয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *রাজা উপাখ্যানে* রূপকের আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সামষ্টিক স্বার্থের জন্য মানুষের যে নিরন্তর সাধনা, তাই উপস্থিত করেছেন। অভিশপ্ত রাজা জাহুকের শাপমুক্তি এবং নতুন জীবনোপলব্ধিতে উত্তরণ *রাজা উপাখ্যানের* মৌল প্রতিপাদ্য। শোষিত অবরুদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বার্থ

নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়– সামূহিক জীবনচৈতন্যে উত্তরণই হল প্রত্যাশিত। শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-শৃঙ্খল জর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিতে *রাজা উপাখ্যান* অনন্য। *পতঙ্গ পিঞ্জর*-এ মানুষের সংঘশক্তির জয়যাত্রা বিন্যস্ত। একাত্তর সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবল ফর্ম-নিরীক্ষার প্রবণতাই মুখ্য। এ-উপন্যাসের গৌড়গ্রাম সমগ্র বাংলাদেশের এবং পতঙ্গকুল হানাদার পাকবাহিনীর রূপকীয় প্রকাশ যেন। *পতঙ্গ পিঞ্জর* উপন্যাসে রূপক-আঙ্গিকের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিবাদী। তবে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই গদ্যরীতির পরিশীলনে দুর্বলতা সুস্পষ্ট। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসচেতনতা বা অনুশীলনে অনাগ্রহ শওকত ওসমানের শৈল্পিক ত্রুটির উল্লেখযোগ্য প্রান্ত।

[গ] বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতা, বহির্জীবন থেকে অন্তর্জীবনে এবং সমষ্টি থেকে ব্যক্তিচৈতন্যে আত্মনিমজ্জন ঔপন্যাসিককে করে তোলে আত্মমুখী; চৈতন্যের বিস্তার ও গভীরতার প্রশ্নে অনুসন্ধিৎসু। আধুনিক সভ্যতার বহুলাঙ্গিক অসঙ্গতি এই নিঃসঙ্গ ও ব্যক্তিচৈতন্যমূলকস্পর্শী শিল্প-প্রবণতার অন্যতম কারণ। চৈতন্যপ্রবাহরীতির ব্যবহার ঔপন্যাসিক ফর্ম-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পের এক মেধাবী সংযোজন। মানুষের অস্তিত্ববিষয়ক উৎকণ্ঠা ও জিজ্ঞাসার রূপায়ণে, চৈতন্যের বহুমাত্রিক জটিলতার স্বরূপ উন্মোচনে এবং বিন্দুর মধ্যে বৃহৎকে শব্দ-শিল্পময় করার ঐকান্তিকতায় এ-রীতির উপন্যাস বিশিষ্ট।

শিল্পপ্রমূর্তির প্রশ্নে তপস্যাশুদ্ধ এবং অতিক্রমণের প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রিয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) আমাদের ঔপন্যাসিক ফর্মনিরীক্ষার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। *লালসালু* প্রবাহিত তাঁর সমাজবিছিন্ন নিঃসঙ্গ চেতনাস্রোত সমাজ ও সময়ের পরবর্তী জটিল রূপান্তরে আত্মনিমগ্ন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্থিতধী। কোনো সঙ্কটকালে পরিবেশকে উপেক্ষা কিংবা অতিক্রম করে ব্যক্তির যে অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়, ব্যক্তির সেই অস্তিত্বই সার বা মূল অস্তিত্ব। ব্যক্তির এ অস্তিত্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। কোনো সঙ্কট মুহূর্তে মানুষ এর আলোতে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। *চাঁদের অমাবস্যায়* স্কুলশিক্ষক আরেফ আলীর আত্মগত দ্বন্দ্বে এবং পরিণামে কাদের যে যথার্থ হত্যাকারী, এই সত্য প্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন শিল্পায়িত হয়েছে। লালসালু উপন্যাসের বহির্বাস্তব, *চাঁদের অমাবস্যায়* ক্রমশ ব্যক্তিমনের জটিল অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। আপাতদৃষ্টিতে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও এ-উপন্যাসে, মূলত শিল্পপ্রক্রিয়ায় কার্যকর থেকেছে ভীতসন্ত্রস্ত আতঙ্কশিহরিত আরেফ আলীর অতিসংবেদনশীল প্রেক্ষণবিন্দু। অস্তিত্বগত প্রান্তিক পরিস্থিতির (border line situations) তীক্ষ্ণমুখ আঘাতে আরেফ আলী আত্মযন্ত্রণাকাতর, চেতন-অবচেতনায় রক্তাক্ত, সত্যানুসন্ধানে আত্মখননকারী জটিল ও স্তরবহুল; অভিজ্ঞতায় ক্রমসঙ্কুচিত। তার অস্তিত্বসঙ্কটের এই অন্তর্ময় তীব্র, তীক্ষ্ণ, প্রগাঢ় সংরাগ ও সংক্ষোভময় দৃষ্টিকোণের জন্যই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ চাঁদের অমাবস্যায়

অনেকাংশে expressionist। একস্‌প্রেশনিজমের মৌল বৈশিষ্ট্য হল, উল্লাস-প্রেম-ভালোবাসা কিংবা সন্ত্রাস-আশঙ্কা আক্রান্ত সত্তার আবেগ, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশে বহির্জাগতিক আকারের বিকৃতি ঘটানো। এই বিকৃত রূপালেখ্য মূলত চিত্রকল্প কিংবা প্রতীকাশ্রয়ী। বিকৃত রূপালেখ্যময় মেধাবী চিত্রকল্প ও প্রতীক, এ-কারণে চাঁদের অমাবস্যার অনুচ্ছেদ-প্রবাহে প্রায়শ পরিকীর্ণ। এ-উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আরেফ আলীর অন্তর্জগতের নিরুদ্ধ অনুভূতিচক্র, টানাপড়েন ও আতঙ্কিত অস্তিত্বের উন্মোচনে স্বভাবতই বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় সুস্থির। যেখানে তাঁর পরিচর্যা চিত্রাত্মক, চিত্রকল্পময় অথবা প্রতীকী সেখানেই তিনি অনিবারণীয় উদ্ভাবনাসূত্রে একস্‌প্রেশনিস্ট। *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের অন্তর্বয়ন ভাবানুষঙ্গ-জটিল। কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ এবং তবারক ভুইঞার নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষণবিন্দু– যুগ্মভাবে একে অপরের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের অনুচ্চারিত ও উচ্চারিত বাক্যস্রোতে রীতিমতো একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়; এখানেই *কাঁদো নদী কাঁদোর* প্রকরণ উৎস। তবারক ভুইঞার সংলাপ-আশ্রয়ী স্মৃতি অনুষঙ্গে শব্দরূপ পেয়েছে বহির্বাস্তবময় কুমুরডাঙ্গার বিচ্ছিন্ন আতঙ্কগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট ও শঙ্কামুক্তি। অপরপক্ষে তবারক ভুইঞার উচ্চারিত সংলাপে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা আন্দোলিত ও উদ্ভাসিত চেতনাপ্রবাহের শিল্পরূপ হল মুহাম্মদ মুস্তফার মনস্তাপ ও শূন্য-অস্তিত্বের ইতিহাস। কুমুরডাঙ্গার সমষ্টিমনস্কতা বিন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, যথাযথভাবে তবারক ভুইঞার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করলেও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ অতিদ্রুত সমীকৃত হয়েছে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রেক্ষণবিন্দুতে। অস্তিত্বতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং আত্মসমীক্ষায় মুহাম্মদ মুস্তফা খোদেজার আত্মহত্যাজনিত মনস্তাপে বিকৃতমস্তিষ্কপ্রায়। ভীতিবিহ্বল সীমাহীন অন্ধকারের নিমজ্জিত ও নষ্টমস্তিষ্কের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত অনুভূতির প্রতিচিত্র ও প্রতিরূপ মূলত হয়ে উঠেছে কার্যকারণহীন; উল্লম্ফনধর্মী স্থানকালবিচ্ছিন্ন ও স্বপ্নব্যাকরণময়। ঘটনাবিন্যাসে লেখক বহুক্ষেত্রে নাটকীয় পরিচর্যা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা চরিত্রের ভয়, ভীতি, দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা ও আত্মনিমগ্ন চেতনাপুঞ্জের চিত্র অঙ্কনে তিনি পরাবাস্তববাদী (Surrealist)। তুলনাসূত্রে ফর্মনিষ্ঠায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিচর্যাগত বিবর্তন উপস্থাপনযোগ্য। [১] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লালসালুতে ইমপ্রেশনিস্ট, গীতময়, চিত্রাত্মক ও চিত্রকল্পময়; ভাবানুষঙ্গে কখনো প্রতীকধর্মী; [২] চাঁদের অমাবস্যায় এক্সপ্রেশনিস্ট, বিশ্লেষণাত্মক, প্রতীকস্পর্শী মেধাবী-চিত্রকল্পময়; এবং [৩] *কাঁদো নদী কাঁদোতে* নতুন এক শিল্পমাত্রায় পরাবাস্তববাদী।

সৈয়দ শামসুল হকের (জন্ম ১৯৩৫) *এক মহিলার ছবি* (১৯৫৯) অন্ত-অসঙ্গতিসম্পন্ন সমাজ-অন্তর্গত এক মহিলার মানসিক জটিলতার চিত্ররূপ: আত্মমগ্নচেতনার আর্তনাদ। মানসিক দুর্বলতা, নৈঃসঙ্গ্য, অবিশ্বাস–নাসিমাকে অক্টোপাসের মতো নিঃশেষ করেছে। প্রচলিত উপন্যাস ফর্ম থেকে *এক মহিলার ছবি* ব্যতিক্রমী। ভাঙা-ভাঙা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভগ্নক্রম স্মৃতিচারণ ও চেতনার আবেগ এ-উপন্যাসে শব্দরূপ পেয়েছে। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ হয়েছে প্রবল আবেগের অনুরণনে ও

গীতলতায়। সৈয়দ শামসুল হকের ঔপন্যাসিক গদ্যরীতি কবিতাক্রান্ত, বৈশিষ্ট্যসূচক এবং উপমাবহুল। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রপুঞ্জের অন্তর্যন্ত্রণা ও অন্তর্মুখিতার তীব্রতাকে ধারণ করতে তাঁর গদ্য সাবলীল। লেখকের স্তব্ধতার *অনুবাদ* (১৯৮৫) এবং *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* বিশিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনাবাহী ও উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহেরের স্মৃতিচারণা এবং আত্মোপলব্ধি *চাঁদের অমাবস্যার* যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও সত্তা-উত্তরণের সাথে বিষয়বিন্যাস ও প্রকাশরীতির দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। রাজিয়া খানের (জন্ম ১৯৩৬) *অনুকল্প* (১৯৫৯) ফর্মের দিক দিয়ে সুগঠিত উপন্যাস। জীবনের সঙ্কট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি অন্বেষার পরিবর্তে মনোবিকলন ও আত্মরতির মধ্যেই মানবীয় পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। পরিচর্যার প্রশ্নে রাজিয়া খান জীবনের চেতনা-প্রতীতির সঙ্গে বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মূলত বিশ্লেষণধর্মী। বিমূর্ত চেতনাপুঞ্জকে বিমূর্ত অবয়বে প্রকাশ করতে তাঁর অনাগ্রহ সুস্পষ্ট।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক জীবনের বিচিত্রমাত্রিক জটিলতায় মানুষের সামূহিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। ফলে মানবিক উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ হয়ে ওঠে ব্যক্তি-আশ্রয়ী; বিপন্ন বিধ্বস্ত বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ চৈতন্যের তমসাচ্ছন্ন অন্ধগুহায় আত্মপলায়নকেই মনে করে 'জীবন'। প্রচলিত ঔপন্যাসিক ফর্ম এই মানবিক সঙ্কটের ফলে রূপান্তর লাভ করে। জন্ম নেয় anti-plot, anti-hero, anti-time উপন্যাস। ভিক্টোরীয় যুগের আদি-মধ্য-অন্ত – এই ত্রিনীতি উপন্যাসের সংগঠনের প্রশ্নে এখন দূরধ্বনি মাত্র। সভ্যতা-সঙ্কটের পটভূমিতে মানুষ যেখানে কীটপতঙ্গের মতো নিরস্তিত্ব প্রায়, সেখানে উপন্যাসের চরিত্র, বিষয় ও ফর্ম-পরিকল্পনার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। চরিত্র বা ঘটনা অপেক্ষা চৈতন্যই সেখানে উপন্যাসের মৌল উপাদান। ব্যক্তির আত্মহনন, আত্মস্খলনই হল সারকথা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা মনস্তাপজনিত ভীতি আতঙ্কের ফলে যে মর্মঘাতী প্রতিক্রিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়, তার ফলে সে হয়ে পড়ে আতঙ্কিত অস্তিত্বে শৃঙ্খলিত। এবং এই ভীতি তাকে ক্রমাগত করে মানববিযুক্ত, কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীবিযুক্ত। তার অস্তিত্ব প্রাত্যহিক আত্মমগ্ন বিবরবাসী, শর্তবন্দি; অস্তিত্বের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে সে ব্যর্থ। ভয়-ভীতি-অনুশোচন তাকে করে তুলেছে অস্তিত্বের দায়িত্ব পালনে অক্ষম– মৃত্যুচৈতন্য ও অস্তিত্ববিলুপ্তিতে যার পরিণাম। এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় এই ভীতি এবং ভীতি-উত্তরণ। চরিত্র বা ঘটনা এখানে মুখ্য নয়; মুখ্য হল ভয়, আতঙ্ক, একাকিত্ব প্রভৃতি border line situation-এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব অনুধাবন। *কাঁদো নদী কাঁদো* উল্লিখিত শ্রেণীর উপন্যাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৈয়দ শামসুল হকের স্তব্ধতার অনুবাদ চৈতন্যকেন্দ্রিকতায়, মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্য সন্ধানে, শূন্যতা ও নিস্তব্ধতার অতলান্তিক বোধে এ-জাতীয় ঔপন্যাসিক ফর্মের আরেক উদাহরণ। একে বলা যায়– 'decentralization of self and self-consciousness.'

[ঘ] মিথ-ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন বা পুনর্জন্মদান আধুনিক উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মননশীল শিল্পরীতি। বিষয়ের এই পশ্চাৎগমন যে সভ্যতা-সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালবিযুক্তির জটিল প্রক্রিয়া, তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে জীবনদর্শন ও শিল্পবোধের বিভিন্নতায় এই মিথ-ঐতিহ্য অনুযায়ী উপন্যাস ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র ফর্ম পরিগ্রহ করে। যেমন, আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার নেতিবাচক প্রক্ষেপে জেমস্ জয়েসের ওডিসিয়ুস পরিণত হয়েছে অক্ষম আইরিশ ইহুদিতে; আবার হাডওয়ার্ড ফাস্টের *স্পার্টাকাস* মানবীয় সংগ্রামশীলতার চিরন্তনতার প্রতীকে।

মিথ-নির্ভর ঔপন্যাসিক ফর্ম নির্মাণে আমাদের সাহিত্যে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। *The old Testament*-এর ঘটনাংশকে তিনি চিরায়ত মানবীয় সংগ্রামের সাথে প্রতিন্যাস করেছেন। *অভিশপ্ত নগরী* (১৩৭৬) এবং *পাপের সন্তান* (১৯৬৯) উপন্যাসে। মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদীবিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন সঙ্কট-বিবেচনায় এ দুটি উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র, অনতিক্রান্ত। শওকত আলীর (জন্ম ১৯৩৬) *প্রদোষে প্রাকৃতজন* (১৯৮৪) রিজিয়া রহমানের একাল চিরকাল (১৯৮৪) এবং সেলিম হোসেনের (জন্ম ১৯৪৭) *চাঁদবেনে* (১৯৮৪) যথাক্রমে ঐতিহ্য, এবং মিথ-আশ্রয়ী ফর্ম নিরীক্ষার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের দূরায়ত কাহিনী অবলম্বনে অন্ত্যজ জীবনের পরাভব, বেদনা এবং উত্তরাধিকার প্রবাহের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন শওকত আলী, তাঁর *প্রদোষে* প্রাকৃতজন উপন্যাসে। ভাষারীতির প্রশ্নেও তিনি সতর্ক, বিষয়-অনুষঙ্গী গদ্যরীতি নির্মাণেও। আরণ্যক আদি মানবের জীবনকাহিনী, তাদের প্রত্যাশা-অচরিতার্থতা, বিশ্বাস-সংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা প্রভৃতির সমন্বয়ে মানবীয় সঙ্কটের চিরন্তনরূপ বিন্যস্ত হয়েছে রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল* উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরকে আধুনিক জীবনসঙ্কট ও সংগ্রামের পটভূমিকায় স্থাপন করে সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন *চাঁদবেনে* উপন্যাস। গদ্যসতর্কতা, এবং সংক্ষিপ্ত, চিত্র ও চিত্রকল্প, রোম্যান্টিক প্রতীকী অভিব্যঞ্জনা এঁদের গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

আঞ্চলিক উপন্যাস একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যমণ্ডিত মানবসম্প্রদায়ের ভাব এবং ভাবনা, আচার এবং উচ্চারণ, স্থূলতা এবং নান্দনিক জ্ঞান অর্থাৎ local colour and habitation-কে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ দান করে।

বাংলাদেশের দূরাঞ্চলের জীবন-অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু বিষয় ও শিল্পের জৈবিক সমগ্রতা নির্মাণে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই অসফল। এ-শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে শহীদুল্লাহ্ কায়সারের (১৯২৬-১৯৭১) *সারেং বৌ* (১৯৬২), শামসুদ্দীন আবুল কালামের (জন্ম ১৯২৬) *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪), আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলি (১৯৬১) এবং সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের* ঘরবসতি (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য।

উপকূলবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনসমগ্রতা *সারেং বৌ* উপন্যাসের উপজীব্য। বিষয়-গৌরবে এ উপন্যাসে অভিনব; নবীতুন চরিত্র নির্মাণে গৌরবান্বিত, বেদনার শব্দরূপে অন্তরঙ্গ। অতিগীতলতা উপন্যাসের দৃঢ়তাকে দুর্বল করেছে; আবেগ-আতিশয্য পরিণামকে করে তুলেছে অস্বাভাবিক। শামসুদ্দীন আবুল কালাম মূলত রোম্যান্টিক। ভাবাবেগ, অকৃত্রিমতা, উদ্ভাস এবং গীতিময়তা তাঁর জীবনবোধের অন্তর্লক্ষণ। কাশবনের কন্যার চরিত্রগুলি সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অতি-রোম্যান্টিকতার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সুদৃঢ় হতে পারেনি। রোম্যান্টিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির সম্ভাবনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলি* ঈষৎ অভিজ্ঞতার রোম্যান্সমাত্র– বিশেষ অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের শব্দরূপ হিসেবেই এর বিশেষত্ব। সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ববাংলার সমুদ্রবেষ্টিত বিশেষ জনবসতির জীবনকথা। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে লেখকের গভীর জীবন-সচেতনায় এ উপন্যাস আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সর্বজাতিক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। জীবন অনুধাবনে এবং সুসংহত রূপবন্ধ নির্মাণে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* বাংলা উপন্যাসপ্রবাহে বিশিষ্ট।

২.৩

উপন্যাসের ফর্মনিরীক্ষার দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য আরেকজন ঔপন্যাসিক হলেন জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)। তাঁর *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) উপন্যাসে চিত্রনাট্যের পরিভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। পরিচর্যার ক্ষেত্রেও তিনি মূলত চলচ্চিত্রানুগ (cinematic)। রশীদ হায়দারের (জন্ম ১৯৪১) অন্ধ কথামালা (১৯৮২) উপন্যাসে ক্রম-ভগ্ন স্বপ্নের ব্যাকরণ ব্যবহৃত হলেও তাঁর উপন্যাসের বিষয় একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ। অতীত এবং বর্তমানের সমান্তরাল উপস্থাপন, এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎসঞ্চারী স্বপ্নকল্পনার আবেগী-চিত্র ব্যবহারে *অন্ধ কথামালা* বিশিষ্ট।

২.৪

পুস্তকব্যবসায়ী এবং উপন্যাসজীবীদের কল্যাণে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মতো বাংলাদেশে উপন্যাস-প্রকাশনা ক্রমাগত স্ফীতকায় হচ্ছে। আমাদের ভৌগোলিক-সীমানার মধ্যে এই অতিস্ফীতি যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি আন্তর্জাতিক উপন্যাসের পটভূমিতে শিল্পমানের প্রশ্নেও তা অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্য-শিল্পে আমরা পরিমাণ চাই না, মান প্রত্যাশা করি। পরিমিতিবোধ শিল্পকলার একটা অনিবার্য চারিত্র্যধর্ম। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবৃদ্ধি উপন্যাসের শিল্প-বিবেচনার প্রশ্নে কোনো গুণগত মাত্রা সংযোজন করে না। বাংলাদেশের উপন্যাস যেমন বিষয়সর্বস্বতা অতিক্রম করতে পারেনি, তেমনি উপন্যাস-বিবেচনাও কেবলমাত্র বিষয়কেন্দ্রিকতার মধ্যেই আবর্তিত।

সমাজ ও সময়ের বহমানতায় আন্তর্জাতিক উপন্যাসের বিষয় ও ফর্মের যে রূপান্তর, আমাদের উপন্যাসের পটভূমিতে তা দূরশ্রুতিমাত্র। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য

যে, ১৯৪৭ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত বাংলাদেশের উপন্যাস পরীক্ষা ও সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, স্বয়ংসিদ্ধ, আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রসাধিত, প্রকরণ-সমৃদ্ধ ও রূপবান উপন্যাসের সংখ্যা কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত, হতাশাব্যঞ্জক।

তরল ও সরল ঘটনাপরম্পরা, সাদা-কালো চরিত্রের বিন্যাস, শিথিল গদ্যশৈলী অশিক্ষিত পটুত্ব শ্রম-ফসলকে আমরা উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু চার দশকে জাতিক ও আন্তর্জাতিক সমাজপ্রবাহের যে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাস বিবেচনায় আজ সতর্ক অভিনিবেশ অনিবার্য। কেননা, সময় ও সমাজের অনিবার্য গতিধর্ম অনুসারে মানুষ যেমন তার অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে অভিজ্ঞানে, জীবনজিজ্ঞাসাকে রূপ দেয় জীবনদর্শনে, আকাঙ্ক্ষাকে বিকশিত করে সৃষ্টিশীল কল্পনায়; তেমনি সমাজপ্রবাহের বৈচিত্র্য, সংঘর্ষ ও গতির জটিল ক্রিয়াশীল অভিজ্ঞামণ্ডিত দৃষ্টি দিয়েই অবলোকন করতে হবে। এটা আজ স্বতঃসিদ্ধ যে, জাতীয় জীবনের রক্তাক্ত বিনাশী, আত্মঘাতী ও সংগ্রামলগ্ন চেতনা-বিন্যাস উপযোগী ফর্ম যে সশ্রম সাধনা, বোধ, প্রজ্ঞা ও চৈতন্যবিস্তারের মাধ্যমে সম্ভব– আমাদের অধিকাংশ ঔপনসিকদের মধ্যেই তা' দুঃখজনক হলেও দুর্লভ; বহির্বাস্তবতার মতো মানুষের অন্তর্জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সমধিক ব্যর্থতা পীড়াদায়ক। তবে দূরায়ত জীবন, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মিথ-আশ্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে কতিপয় শিল্পসিদ্ধি অর্জিত হওয়ার কারণ বিশেষ জীবনবোধে সমকালীন সঙ্কট অবলোকনের ক্ষেত্রে স্রষ্টার অভিনিবেশ, অভিজ্ঞান ও দক্ষতা।

আধুনিক ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাকে হতে হয় জীবনমূলস্পর্শী: শিল্পসৃষ্টির প্রশ্নে পরীক্ষাপ্রবণ ও সমকালশাসিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, লেখকের অভিজ্ঞতাহীনতায়, জীবনের মর্মমূলস্থিত প্রত্যাশা অনুধাবনের ব্যর্থতায় এবং শিল্প-নির্মিতির প্রশ্নে নিষ্ঠা, সাধনা ও আন্তর্জাতিক বোধের অভাবে সে-গুলো বর্ণনাধর্মী বিষয়বিস্তারে পর্যবসিত হয়েছে মাত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী নব-জীবনবেদ, জীবনজিজ্ঞাসা, পরিবর্তিত অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাস এবং রূপান্তরিত নবমূল্যবোধের পটভূমিকায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। যুদ্ধোত্তর জাতীয় জীবনে নৈরাজ্য, অবক্ষয় এবং হতাশা বাংলাদেশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিককেই করে তোলে ব্যক্তিচৈতন্য-আশ্রয়ী; মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একাধিক উপন্যাসেও যার বিন্যাস সুস্পষ্ট। কিন্তু বর্হিজগতবিমুখ ব্যক্তি-অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-সংক্ষোভ ও রক্তক্ষরণ উন্মোচনে যে মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা, বোধ, উপলব্ধি এবং অস্তিত্বসজ্ঞানতা প্রয়োজন জীবনের অন্তর্মুখিতা ও বৈচিত্র্য রূপায়ণে যে গভীর জীবনবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টির প্রয়োগ অপরিহার্য – ঔপন্যাসিকদের প্রয়াস সে-ক্ষেত্রে অসফল। ব্যক্তির পরাভব, আত্মখনন ও আত্মহনন উন্মোচনে পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কতিপয় সাফল্য স্বাধীনতা উত্তরকালেও কিংবদন্তির মতো উচ্চারিত; এবং অনুসৃত।

জীবন-অবলোকন অনভিজ্ঞ এবং শিল্পনিরীক্ষায় অপরিপক্ব হলেও বর্তমান প্রজন্মের তরুণ লেখকদের উপন্যাস পাঠে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী

তাঁরা আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু সুসংগঠিত (well-made) উপন্যাস হল জীবনবোধের অনিবার্য image। এই অনিবার্য গুণ, বিষয় এবং আঙ্গিকের হয়ে-ওঠা জৈবিক সমগ্রতার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। সেজন্যই নতুন প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের প্রয়োজন সশ্রম সাধনা, অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক বিস্তার; এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনকে সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা, ইতহাসচেতনা ও সমকালঅন্বেষায় শিল্পরূপ দানের দক্ষতা। এ-সত্যকে রূপান্বিত করতে হলে প্রয়োজন নবতর জীবনদৃষ্টি, সময় ও সমাজসচেতন চেতনাপ্রবাহ, অনিবার্য শব্দাবলি এবং চিত্রকল্প।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উপন্যাস ধনবাদী সমাজের শিল্পোৎপাদন মাত্র নয়; এবং তার পৃষ্ঠপোষকও নয় "প্রাকচল্লিশ ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী," কিংবা নয় অর্ধশিক্ষিত কাহিনীভুক পাঠকশ্রেণী। উপন্যাস হল জীবন অতলান্তিক মহাসমুদ্রে ওডিসিয়ুসের বহির্যাত্রা ও অন্তর্যাত্রার বিস্ময়কর শিল্পিত সমীকরণ। সঞ্চরণশীল প্রগতিপন্থীদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মার্কসীয় দর্শনে শিল্পসাহিত্য সমাজের conception বা propaganda নয় বরং image । 'আঙ্গিক আমার সম্পদ, আমার আত্মিক ব্যক্তিসত্তা, মানুষ আর রচনাশৈলী অভিন্ন।' –কার্ল মার্কসের এ-উক্তি শিল্প-অনুন্নত বিশ্বের বর্তমান প্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের জন্য হতে পারে অনিবার্য দিগ্‌দর্শন। **[১৯৮৭]**

তিন.০১
সংযোজন

স্বাধীনতাপূর্ব কালে কলোনি-শোষণ ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হিসেবে মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাস-অবলম্বী ও প্রতীকী উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক উপন্যাসের এ-এক মননশীল প্রকরণ। এর শিকড় সংলগ্ন থাকে সংগ্রামী সভ্যতার সময়-গর্ভে। মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাস এ-ক্ষেত্রে উপন্যাসের উপকরণ মাত্র নয়, বরং বিষয়; বা author's attitude towards life. লোকপুরাণের ফিনিক্স পাখি যেমন নিজের ছাই থেকে নতুন দেহ নিয়ে জেগে ওঠে, তেমনি মৃত ইতিহাস থেকে জেগে ওঠে আর এক ইতিহাস। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা উপন্যাসের ধারায় এ-বিষয়প্রকরণ যুক্ত করেন মূলত শওকত ওসমান এবং সত্যেন সেন। আরব্যরজনী ও শাহ্‌নামার পুরাণকথা অবলম্বনে শওকত ওসমান ১৯৬২-তে রচনা করেন *ক্রীতদাসের হাসি;* অতঃপর ১৯৭০-এ *রাজা উপাখ্যান*। দুটিই প্রতীকী মননের রূপক প্রকাশ। *ক্রীতদাসের হাসি* মানবীয় মুক্তি আকাঙ্ক্ষার চিরন্তন সংঘাতের রূপককথা। *রাজা উপাখ্যান*-এ শব্দরূপ পেয়েছে : বিচ্ছিন্নতা নয়, জনসংযুক্তি ও জনস্বার্থে উত্তরণের মাঝেই শাপমোচনের মন্ এনিহিত, এই কথা। সত্যেন সেন-এর সৃষ্টির কৌশল ও গভীরতা ভিন্ন মাত্রার। সময়-সতর্কতা ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞানে তিনি বাইবেলের *বুক অব দ্য প্রফেট : যেরেমিয়া* পুরাণকে শাশ্বত মানবীয় সংগ্রামের সাথে প্রতিন্যাস করেছেন তাঁর *অভিশপ্ত নগরী* (১৯৬৮) *পাপের সন্তান* (১৯৬৯)-এ। সত্যেন সেন এ-ধারায় আরো উজ্জ্বল এ-

কারণে *যে বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৯৬৯)-এ তিনি জীবনসংগ্রামের রূপক- উৎস সন্ধান করেছেন বাঙালির ইতিহাসের দ্বন্দ্বগর্ভে।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাসের এ রূপক-প্রতীকী প্রকরণ বিচিত্র উৎসে যুক্ত হয়ে বিষয়বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এর সমাজতাত্ত্বিক কারণ সম্ভত এই যে পাক-আমলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত কোনো পরিবর্তন স্বাধীনতা-উত্তর কালে ঘটেনি; ঘটেছে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতিশোষণ রূপ নিয়েছে শ্রেণীশোষণে; সামরিক শাসক পরিবর্তন করেছে তার কৌশল; স্তব্ধ করছে দেশের সত্যকণ্ঠ; প্রতিনিয়ত ঘোষিত হচ্ছে দাবিয়ে-রাখার আইন। ফলে অনেক ঔপন্যাসিক identity-র জন্য আত্মসন্ধান ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য পুনরায় প্রত্যাবর্তন করছেন ঐতিহ্য আর ইতিহাসের কাছে; এটা স্বাভাবিক এবং মনোবিজ্ঞানসম্মতও বটে। শওকত আলীর প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪); সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮৩), *চাঁদবেনে* (১৯৮৪); রিজিয়া রহমানের *বং থেকে বাংলা* (১৯৭৮), *একাল চিরকাল* (১৯৮৪), তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ করার বিষয় পাক-আমলের পশ্চিম এশীয় পুরাণকথা এখন পরিত্যক্ত। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতীকী উৎসের গুরুত্ব পেয়েছে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও লোকপুরাণ। এসব রচনার শতমূল সঞ্চারিত হয়েছে চর্যাপদের জীবনে, মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য-ভূমিতে, বাংলার প্রদোষলগ্ন থেকে ধাবমান কালে, উত্তরবাংলার আদি জনপদ আর সাঁওতাল বিদ্রোহে। ছিনিয়ে নেয়া এবং অবরুদ্ধ জাতিসত্তার গোপন টেনসন্ বা সংকর্ষে উদ্ভূত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের এ বিষয়-প্রকরণ।

৩.২

বাংলাদেশের উপন্যাসের একটি অন্যতম ধারা আঞ্চলিক জীবন রূপায়ণ। আঞ্চলিক উপন্যাস একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার আর্থসামাজিক কাঠামো অন্তর্গত জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, নৃতাত্ত্বিক আবেগ ও ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আঞ্চলিক উপন্যাস local colour and habitations-কে শিল্পরূপ দান করে। বাংলাদেশের দূরাঞ্চলের জীবন-অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হয়েছে প্রচুর; কিন্তু সার্থক হয়েছে খুব কমই। গভীরতম জীবনবোধের অভাবে সেগুলোর অধিকাংশ হয়ে গেছে রোম্যান্টিক উপাখ্যান, নয়তো লোককথা, অথবা খণ্ডচরিত্রের রঙিন সন্নিবেশ মাত্র। এমনকি, শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলি* (১৯৬২) ও পরিণত হয়েছে রোম্যান্টিক আখ্যানে ও রোম্যান্সকর নাটকীয় ঘটনাসন্নিবেশে। প্রকৃতপক্ষে শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* (১৯৬২) বিষয়গৌরবে ও জীবন-উন্মোচনে সার্থক। নবীতুন-চরিত্র ঔপন্যাসিকের একাগ্র এবং অসঙ্কোচ জীবনদৃষ্টির প্রকাশ। বহির্বাস্তবের সংঘর্ষে, অন্তর্জীবনের সঞ্জীবনী প্রেরণা ও সাহসের যোগফলে নবীতুন খণ্ড স্থানকাল ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে মানব-

অস্তিত্বের প্রতিনিধি। ঔপন্যাসিকের সমগ্র দৃষ্টিকোণের গুণে সুদূর সামাজিক পরিবেশও যে, অমেয় তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 'সারেং বউ'।

শহীদুল্লা কায়সারের এই সফল প্রবাহ স্বাধীনতা-উত্তর কালে গভীরতর বৈচিত্র্য নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অজয় রায়ের *অরণ্যানী*, রিজিয়া রহমানের উত্তর পুরুষ (১৯৭৭), *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৮১), *সূর্য সবুজ রক্ত* (১৯৮১), শামসুদ্দীন আবুল কালামের সমুদ্র বাসর (১৯৮৬) এবং সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রিজিয়া রহমানের সংবেদনশীল কল্পনাশক্তি, চরিত্র-নির্ণয়ের ক্ষমতা ও totality সৃষ্টির টেকনিক আত্মস্থ করে তাঁর রচনা ইতোমধ্যে অর্জন করেছে এক উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য। *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জীবনকথা। সময় ও সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ববোধকে সেলিনা হোসেন তাঁর উপন্যাসে প্রাণপ্রবাহে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়েছেন। ঔদার্য, স্খলন, নীতিবোধ, রিরংসা, শ্রম এবং বেঁচে থাকার সংঘাতময় যাপিত জীবনের শব্দরূপ দেন তিনি নির্মম নির্মোহে; পরক্ষণেই তিনি সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন হাঙর মানুষের লড়াইয়ের মাঝে এক ধ্রুপদী প্রতীক। এ যেন বুড়ো ধীবর Santiago-এ সেই স্ফীতকেশর সিংহের স্বপ্ন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এ প্রবাহে যুক্ত হয়েছে অধিকতর শৈলীসতর্কতা এবং আঞ্চলিক জীবনকে সর্বজনীন করে তোলার ইতিবাচক প্রতিভা।

৩.৩

আলাউদ্দিন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪); শহীদুল্লাহ কায়সারের সংশপ্তক (১৯৬৫), সত্যেন সেনের উত্তরণ (১৯৭০) বিশাল পটভূমিকায় রচিত এপিকধর্মী রাজনীতিসচেতন উপন্যাস। স্বাধীনতার পরপরই বাঙালি সমাজ জীবনের entirety-কে এপিক-শৈলীতে রূপ দিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, তাঁর *পদ্মা-মেঘনা-যমুনা* (১৯৭৪) উপন্যাসে। এ-উপন্যাসের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য যত বেশি, শিল্পমূল্য তত নয়। উপকরণপুঞ্জ কেন্দ্রীয় রস-আবেগে ঘূর্ণিত, দ্রবীভূত ও স্ফটিকায়িত হয়ে প্রার্থিত শিল্পরূপ পায়নি। মধ্যবিত্তের কুণ্ডলায়িত সময়ের চালচিত্র হিসেবে শওকত আলীর ট্রিলজি : *দক্ষিণায়নের দিন-কুলায় কালস্রোত-পূর্বদিন পূর্বরাত্রি*– পরিশ্রমী সৃষ্টি। শওকত আলীর চরিত্রগুলো সমাজের নির্ধারিত ছাঁচে মিল খায় না, তাই বিচ্ছিন্নতা তাদের অস্থিগত; ক্রমাগত জীবনজিজ্ঞাসায় তারা অস্তিত্ববান। শওকত আলীর গল্পকথন ও ন্যারেটিভ আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর উপন্যাসে উপকরণের প্রাচুর্য কম, তাই অপচয়ও যৎকিঞ্চিৎ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) মানবিক অস্তিত্বের সংঘর্ষ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টির টানাপোড়েনকে অভিব্যক্ত করেছে। এ-উপন্যাসে অনুভব করা যায় শহর-গ্রামের 'জীবনস্পর্শী' মানুষের সংঘাতময় অন্তঃস্পন্দন। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে বিচিত্রধর্মী ঘটনা, নানা-মাত্রিক চরিত্র এবং উৎকণ্ঠিত সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণ-উন্মুখ এক আত্মসত্তার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন

ঔপন্যাসিক। কিন্তু সে-রূপায়ণে জাতি ও সমাজসত্তার অমোঘ ভূমিকার কথা ভোলেননি তিনি। বহু এবং একের সমীকরণে তাঁর সামর্থ্য অতুলনীয়।

পাক-আমলে *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯)-এর মাধ্যমে জহির রায়হানই প্রকৃতপক্ষে ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাসের ধারার সূত্রপাত করেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালে সেলিনা হোসেন রচনা করেন যাপিত জীবন (১৯৮১) ও *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৬)। এ-পর্যায়ে *আর্তনাদ* (১৯৮৬) রচনার মধ্য দিয়ে শওকত ওসমানের যেন পুনর্জন্ম ঘটেছে। এঁরা কেউই সাধারণ পাঠকের সুবিধাস্থল জেনে নিয়ে উপন্যাস লেখেননি। এঁদের উপন্যাসে ইতিহাসের পশ্চাৎ অনুসরণ নেই; জীবনের সংগ্রাম ও সমান্তরলতাই প্রধান। *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* এবং *আর্তনাদ*-এর ধ্বনিপুঞ্জ যেন লোকায়ত মানুষ কিংবা উন্নতগ্রীব কোনো ঘটনার অমোঘ, অবিনাশী এক আহ্বান–টেকনিক এখানে গৌণ।

৩.৪

আইয়ুব ডিকেডের জাতি-শোষণ সশস্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন এবং ঘৃণ্যপ্রলোভন-আতঙ্কিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা করেন *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)। অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসু আতঙ্কিত মনের মুক্তিলাভের জটিলতর অন্তর্বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রগুলোকে, লক্ষ করি, অস্তিত্বের চেতন-অবচেতন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে; শুনি তাদের নিঃশব্দ আর্তনাদ; দেখি তারা দুহাতে ভেঙে-ভেঙে চলেছে অন্ধকার; শোনা যায় তাদের কষ্টচালিত শ্বাস-প্রশ্বাস। এভাবেই ভীতিশিহরিত নিরস্তিত্বের গুহাপথ অতিক্রম করে, আত্মপ্রবঞ্চক 'কীটপতঙ্গ সদৃশ' আরেফ আলীরা হয়ে ওঠে সূর্যপ্রতিম, টান-টান প্রতিবাদী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব, তিনিই প্রথম সমকালীন পাশ্চাত্য শৈলীকে অঙ্গীকার করেন বাংলা উপন্যাসে। বলা যায়, বাংলা উপন্যাস উন্নীত হল আন্তর্জাতিক উচ্চতায়। উপন্যাস সৃষ্টিতে তিনি কখনো ইমপ্রেশনিস্ট, বিশ্লেষণধর্মী, আবার কখনো-বা পরাবাস্তববাদী। আন্তর্জাতিক প্রকরণনিষ্ঠ ওয়লীউল্লাহ্ সমকালে ছিলেন এক নিঃসঙ্গ পথিক।

স্বাধীন বাংলাদেশে সৈয়দ শামসুল হক-এর *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪) ও *অন্তর্গত* (১৯৮৪) এ-স্রোতে সাহসী সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ এবং সাম্প্রতিক প্রকরণে, এ-উপন্যাস–মর্মদাহ ও স্বপ্ন-স্মৃতিচারণায়–অপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার একক হয়ে উঠেছে। তাঁর *স্তব্ধতার অনুবাদ* (১৯৮৫) অন্ধকারে নিমজ্জিত নষ্ট মস্তিষ্কের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত অনুভূতির প্রতিচিত্র; যা মূলত হয়ে-উঠেছে উল্লম্ফনধর্মী, স্থানকাল-বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্নব্যাকরণময়। তিমিরবিনাশী হতে গিয়ে, আত্ম-নিষ্কাষণ-আত্মখননের এমন কঠোর শ্রম, মুষ্টিমেয় ঔপন্যাসিকই, আমাদের দেশে স্বীকার করেছেন। রশীদ হায়দারের *অন্ধ কথামালা* (১৯৮২)-র বিষয় মুক্তিযুদ্ধ। এ উপন্যাসে ক্রমভগ্ন সময়ের ব্যবহার ঘটেছে। অতীত এবং বর্তমানের সমান্তরাল উপস্থাপন, এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎসঞ্চারী স্পন্দিত স্বপ্নচিত্রের ব্যবহার *অন্ধ কথামালার* বৈশিষ্ট্য। anti-hero,

anti-time, anti novel-এর শারীরবৃত্তের সঙ্গে সমকালীন প্রতিবন্ধী চেতনার সমীকরণ, নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশের উপন্যাসপ্রবাহে সমৃদ্ধতর প্রান্ত। মঞ্জু সরকার-এর *তমস* (১৯৮৪)-ও এ-ধারার উপন্যাস।

'ইনাররিয়েলিটি ধর্মী' উপন্যাস সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। স্বাধীন বাংলাদেশে এ-শৈলীর উপন্যাসচর্চা বেশ প্রসার লাভ করেছে। চেতন থেকে অবচেতনে চরিত্রের যাওয়া-আসা, ছিন্ন-ভিন্ন চরিত্রের স্বীকারোক্তি, অন্তঃসংলাপ, চিন্তার উল্লম্ফনধর্মী স্বেচ্ছাচারের ছদ্মবেশে অর্থপূর্ণ আত্মকথন; আত্ম-অনুসন্ধানের আত্মদহন; বোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে নিরন্তর মুখোমুখি হওয়া; মনের অনাবিষ্কৃত গহ্বরে চেতনার হেডলাইট-জ্বালা–ইত্যাদি 'ইনাররিয়েলিটি' ধর্মী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৯ সালে সৈয়দ শামসুল হকের *এক মহিলার ছবি* থেকে এর স্পষ্ট সূত্রপাত। এ ধারা স্বাধীন বাংলাদেশে অধিকতর বিস্তৃতি ও শিল্পশ্রী লাভ করেছে। রশীদ করীম-এর *প্রেম একটি লাল গোলাপ* (১৯৭৮), সেলিনা হোসেন-এর *মগ্ন চৈতন্যে শিস* (১৯৭৯); বশীর আল হেলালের কালো ইলিশ (১৯৭৯); হাসনাত আবদুল হাই-এর *আমার আততায়ী* (১৯৮০) এবং শামসুর রাহমান-এর অক্টোপাস (১৯৮৫) এ-প্রবণতার প্রাগ্রসর দৃষ্টান্ত।

৩.৫

বাংলাদেশের উপন্যাস আলোচনা আবুবকর সিদ্দিকের *জলরাক্ষস* (১৯৮৫) ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উপন্যাসের পটভূমি প্রলয়ঙ্কর প্লাবন। এর কাহিনী হল নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও পাশব প্রশাসনের বিরুদ্ধে গোনজোরালি-জরিনের দুঃসাহসী লড়াই। 'আবুবকর সিদ্দিক যে অমিত তেজ এবং সাহসের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন-ধারার আলেখ্য তুলে ধরেছেন, তা মনে রাখার মতো ঘটনা।'–শওকত ওসমানের এ-উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে হরিপদ দত্তের *অন্ধকূপে জন্মোৎসব*-এর নাম উল্লেখ করাও বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যবসা-সফল একটি ধারার উল্লেখ না-করলে এ-আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বিনোদনমুখ্য নভেলেট-ধর্মী গদ্যরচনার একটি ধারা ক্রমাগত বিস্তার লাভ করছে। পূর্ব-নির্ধারিত আকার, নাটক-চমকিত ঘটনাবিন্যাস, কৌতুক ও কৌতূহলের বুনন, স্নিগ্ধ কণ্ঠ, সাবলীল ভঙ্গিমা এবং স্বচ্ছন্দ ও স্বভাবগদ্য এর বৈশিষ্ট্য। এর শরীর গঠনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শহরতলি, মধ্যশ্রেণীর জীবনবৃত্ত, ভাঙন-ধরা গ্রাম, পতিত যুবসমাজ এবং অলৌকিক রহস্যজগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। বয়ঃসন্ধিকালীন তরুণ-তরুণী, 'উত্তর-চল্লিশ পৌরস্ত্রী' এবং জীবনে প্রতীক্ষমান–থমকে-থাকা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য, এ-ধারা–অবরুদ্ধ আমাদের সমাজে, খুলে দিয়েছে হিরন্ময় এক খুশির জানালা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যে এরা সর্বাধিক জনপ্রিয়, লোককান্ত।

৩.৬

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস-বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা উপস্থাপন করতে হলে আমাদের উচিত, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের শিথিল-গ্রথিত খণ্ডিত মানসিকতার মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলো আলোচনা করা। জানা দরকার তাঁদের সীমাবদ্ধতার আর্থ-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণ; যার কুহক শক্তির ভয়ালমায়াবী আকর্ষণে 'স্রষ্টার মনে জেগে ওঠে ক্লান্তি, এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা, অক্ষমতা ও অনিশ্চয়তার অবসাদ।'

স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাঙালি জীবনে ফুটে উঠতে লাগল পরাজয়ক্লিষ্টতা। অতীত যেন বিদ্রূপ করছে; বর্তমান হয়ে উঠেছে পাণ্ডুর, নির্ভর-অযোগ্য। জাতিসত্তা পুনরায় নিক্ষিপ্ত হল অতীত-গর্ভে; বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হল মূল্যবোধের স্তম্ভগুলো; গণতন্ত্র হল সমরাস্ত্র-শাসিত; জাতিশোষণ রূপান্তরিত হল শ্রেণী-শোষণে; সহস্র কোটিপতির রসদ-সরবরাহে আমাদের অস্তিত্বমূল শুকিয়ে গেল। রাজনৈতিক মঞ্চে আর্বিভূত হল ছিন্নমূল সব ভাড়াটে কুশীলব; ছদ্মবেশের আড়ালে দেখা গেল তাদের অতীত-কঙ্কাল। স্বাধিকার আন্দোলন চারদিকে থমকে যায় নরবলি উৎসবে। *রক্তকরবীর* ব্যাঙের মতো টিকে থাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল কই? এমনকি স্বপ্ন-দেখার মতো কোনো নিকটবর্তী বিশ্বাসের আশার বাতিঘরও থাকল না। অর্জিত এমনি-এক অধিকারবঞ্চিত 'স্বাধীনতা'র অন্ধকারে যদি কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপের মতো বুঝে হাঁটতে হয় আবার, তাহলে সৃষ্টির সেই মহান ঘণ্টা ধ্বনিত হবে কীভাবে?

মানলাম, আমাদের মধ্যশ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নগণ্য; তাঁরা ইতিহাস ও কালজ্ঞানে বিভ্রান্ত; সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞায় তাঁরা দুর্বল; আন্তর্জাতিক শিল্প-উত্তরাধিকার অর্জনে তাঁরা অক্ষম। এ-সব সীমাবদ্ধতার কথা মেনে নিলেও কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না। মূলকথা, এ-সত্য আমাদের কবুল করতেই হবে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন এবং জনগণতান্ত্রিক মুক্তি অর্জন ছাড়া সাহিত্যশিল্পের নির্বাধ ও সুস্থ সৃষ্টিশীলবিকাশ সম্ভব নয়। পরিবর্তনের জন্য সাংগঠনিক শ্রম ছাড়া, কেবল অভিযোগ শুধু অভিযোগকেই পুঞ্জিভূত করবে। স্বাধীনতার পর দৃশ্য-অদৃশ্য সব ষড়যন্ত্রে আবার আমরা গড়িয়ে পড়ছি সূচনাবিন্দুর অন্ধকারে; এখন প্রয়োজন শুধু সিসিফাস-হওয়া : সামনে আমাদের নির্মম আর-এক অধ্যবসায়।

জাতিরাষ্ট্র ও উত্তর-উপনিবেশবাদ: বাংলাদেশের উপন্যাসপাঠের ভূমিকা

মা সু দু জ্জা মা ন

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি, মানেই গৌরবময় সাহিত্য! কিন্তু যখনই জনগণ এগিয়ে এসে একধরনের ঐক্য সৃষ্টি করে তখনই এর সাহিত্যিক উপকরণগুলো একত্রিত হতে থাকে আর তারপরই রচিত হয় সুমহান সাহিত্য। আসুন এটা স্বীকার করে নিই, আমাদের মহৎ সাহিত্যের অভাব রয়েছে; এর কারণ এই নয় যে আমরা এটা পারি না, আসল কারণ হল আমরা এমন কোনো বড়ো জাতি নই যে সাহিত্যে তার অনিবার্য প্রতিফলন পড়বেই পড়বে। **(–হোসে মার্তি)**

সারা পৃথিবী জুড়ে সেই একই বস্তাপচা চলচ্চিত্র, সেই বিরক্তিকর যন্ত্র, সেই প্লাস্টিক অথবা এ্যালুমিনিয়মের অত্যাচার, সেই একই ঘোরানো-প্যাঁচানো প্রচারণার ভাষা, ইত্যাদি। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দুনিয়ায় অতীতের মতোই শেকড় গাড়তে চাইছে, উঁচুতে তুলে ধরছে একমাত্র নিজেদের জাতীয় সত্তাকে। খুলে দিতে চাইছে উপনিবেশবাদী ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্মবাদী আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসী চেহারা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় যদি অংশগ্রহণ করতে হয়, তাহলে ওই একই সময়ে দরকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হওয়া। এ জন্যে প্রয়োজন সমস্ত বিশুদ্ধ আর সরল অতীতকে বর্জন করা। **(–পল রিকোয়ের)**

কিউবার মুক্তিসংগ্রামের এক মহানায়ক হোসে মার্তি, সেই সঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন দার্শনিক পল রিকোয়ার; লেখাটি শুরু করেছি এ দু-জনের দুটো উদ্ধৃতি দিয়ে। দু-জনই ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে সাহিত্য যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ শিখাটাকে উঁচুতে তুলে ধরতে পারে অথবা উন্মোচন করতে পারে এর আভ্যন্তর সংকট, সেই অভিমত। বাংলাদেশের উপন্যাসে এই পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী প্রসঙ্গ কীভাবে উপজীব্য হয়েছে, জাতিরাষ্ট্র ও উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা ও সংকট কীভাবে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা মূর্ত করতে পেরেছেন, এই লেখার মূল ভাববস্তু সেটাই।

এক.

আধুনিক সমালোচনারীতি অনুসারে এখন যে-কোনো রচনাই হচ্ছে বয়ান, যার ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে ডিসকোর্স। কথাসাহিত্যকে আরও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়

ন্যারেটিভ বা বিবরণ বলে। উপন্যাস এই কথাসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত অত্যন্ত শক্তিশালী সৃজনী গদ্যমাধ্যম। বয়ান অবশ্য কোনো সরল-সহজ বিবরণমাত্র নয়; বয়ানের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তার জীবনার্থকে রূপ দিয়ে থাকেন। ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা, কাহিনীর আধারে নানা আঙ্গিকে, ভাষাবৈচিত্র্যে, উপমা-রূপকের অনুসূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় উপন্যাসে।

ব্যক্তিক আত্মসংকট, আত্মদ্বন্দ্ব আর আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপই হচ্ছে উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিজীবন এভাবেই কোনো-একটি কাহিনীকে ঘিরে আবর্তিত হয়, বিকাশ লাভ করে এবং অন্তিম পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। কাহিনী নির্বাচন করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বেছে নিতে পারেন যে-কোনো একটি ক্ষেত্র, হতে পারে তা গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত, কিংবা নাগরিক প্রতিবেশে অথবা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জনপদকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে উপন্যাসের কাহিনী। বিষয়ের কেন্দ্রে থাকতে পারে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, পারিবারিক সংকট, সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রেম, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা রাজনীতি। বাংলাদেশের উপন্যাসেও লক্ষ করা যাবে এই বিষয়বৈচিত্র্য। এতে সমকালীন দেশকাল, বিশেষ করে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব এবং উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজের নানা অনুসূক্ষ্ম প্রসঙ্গ কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে উপজীব্য হয়েছে। উপন্যাস হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক বয়ান।

কিন্তু এর স্বরূপ কী ছিল, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদ অথবা এখন যে বিষয়টি আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে– সেই বিশ্বায়নকে তাদের উপন্যাসে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন, এর ব্যক্তিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য কী – এসব নিয়েই লেখা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধটি। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত বলবার আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তটি খুব সংক্ষেপে বুঝে নেয়া জরুরি; আর এরই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে বাংলাদেশের উপন্যাসে ধৃত উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রকৃত চারিত্র্য। এসব দিক বিবেচনা করে বর্তমান প্রবন্ধটিকে তিনটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে:

প্রথমত, উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ;

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদের সঙ্গে উপন্যাসের

আন্তরসম্পর্ক;

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের উপন্যাসে উপজীব্য উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও উত্তর-

উপনিবেশবাদের স্বরূপ এবং এসবের সৃজনী তাৎপর্য।

দুই

বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন দিয়েছিলেন জাতির একটি চমকপ্রদ ব্যাখ্যা যার সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। অ্যান্ডারসন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, উপন্যাসই জাতিগঠন করেছে, জাতিগঠনে পালন করেছে প্রধান ভূমিকা। তার মতে জাতি হচ্ছে একধরনের 'কল্পিত জনগোষ্ঠী'। এই জনগোষ্ঠী, জাতিরাষ্ট্র ও আধুনিক জাতীয়তাবাদ গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দু'টি ছাপা-মাধ্যম: সংবাদপত্র ও উপন্যাস। এ দুটি মাধ্যমই নির্মাণ করে দিয়েছে জাতিরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। সামন্তবাদের অবসানের পর যখন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছিল, তখনই এই কল্পিত জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সংবাদপত্র, উপন্যাস এবং যোগাযোগের নতুন নতুন মাধ্যম সংস্কৃতির এমন একটি রূপ দাঁড় করায় যে-সংস্কৃতির প্রতি সবাই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, অংশগ্রহণ করেছিলেন; সৃষ্টি হয়েছিল নতুন নতুন শব্দ ও বিশেষ ভাষাভঙ্গি। সংবাদপত্র ও উপন্যাস, অর্থাৎ 'মুদ্রণ পুঁজিবাদে'র প্রভাবে এভাবেই সৃষ্টি হয় একটি মান্য বা প্রমিত ভাষারীতির, যে-ভাষারীতিকে ঘিরে গড়ে ওঠে ওই কল্পিত জনগোষ্ঠী যারা আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রধান উৎস।

অ্যান্ডারসনের এই ব্যাখ্যা ইউরোপ ও আমেরিকার জন্যে প্রযোজ্য হলেও অবশিষ্ট পৃথিবীর জন্যে যে সমভাবে কার্যকর হতে পারে না, সে-সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন 'তল থেকে দেখা ইতিহাসে'র অন্যতম প্রবক্তা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অ্যান্ডারসন যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে ইতিহাসের ভাবকল্প হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা আর আমরা – অর্থাৎ উত্তর-উপনিবেশবাদী পৃথিবীর মানুষ হচ্ছি ওই আধুনিকতার ভোক্তামাত্র। তারা ঔপনিবেশিক জ্ঞানদীপ্তির নামে উপনিবেশ স্থাপন ও শোষণ করেছে, আবার আমাদের উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ, আন্দোলন ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দুরবস্থাকে অগ্রাহ্য করেছে, এমনকি আমাদের কল্পনাকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। তার মতে জাতীয়তাবাদ আসলে এভাবে সৃষ্টি হয়নি, জাতীয়তাবাদের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং সেই আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। পশ্চিমের স্বাধীনতা, ব্যক্তিক আত্মমুক্তি ও মানবিকতার ধারণাকে পুবের দেশগুলোকে তাই ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি করতে হবে জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স, ভারতীয় ভাবুক-শিল্পীরা এভাবেই জাতীয়মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন – পার্থ সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরেক নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী বলেছেন, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ একত্রে মিলে "সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী জাতিরাষ্ট্রের একটা সার্বজনীন রূপ দাঁড় করিয়েছে (চক্রবর্তী ১৯৯২ : ১৯)।"

দেশকালের এই ভাবনা কি শুধু এখনি ঘনিয়ে উঠছে আমাদের মধ্যে? এ আসলে এক চিরায়ত প্রক্রিয়া, কিন্তু আধুনিক কালে আমাদের জীবন অনেকবেশি রাজনীতিসম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দেশকালের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পাচ্ছে। সাহিত্য যে দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানবিকতার দিকে এগিয়ে যায়, বঙ্কিমমচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে

গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সেকথা, "... বাংলাদেশে আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম"; আর কবি ইয়েট্‌স সম্পর্কে তার অভিজ্ঞান : "কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন।" (ঠাকুর ১৩৯৮ : ৬৬৭-৬৬৯)

কিন্তু এটাই শেষকথা নয়, কেননা রাষ্ট্রিক মতাদর্শ হয়ে উঠতে হলে সেই মতবাদের মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্থান হতে হবে। কিন্তু 'কল্পিত জনগোষ্ঠী' খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে কারা ওই গোষ্ঠীতে আছে, কিন্তু তাদের ভাবনা থেকে বাদ পড়ে গেছে প্রান্তিক মানুষ – যেমন নারী,[১] নিম্নশ্রেণী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী, বর্ণভেদের শিকার মানুষ। তল থেকে দেখা ইতিহাসবিদেরা এলিট শ্রেণীর ওই ইতিহাসকে খণ্ডিত আখ্যা দিয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষকে তাদের বিষয় করে তুলেছেন। রণজিৎ গুহ বলেছেন, নিম্নবর্গের অবদানকে শুধু এলিট শ্রেণীর ইতিহাস দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না, দেখতে হবে 'তাদের নিজেদের মতো করে'। তার মতে 'জনগণের সচেতন চৈতন্যকে কখনও আধিপত্যের সঙ্গে মিলিয়ে' জাতীয় মুক্তির কথা ভাবা হয়নি (গুহ ১৯৮২ : ৫-৬)। এখন নিম্নবর্গীয় সমীক্ষণ শুধু নিম্নবর্গীয় মানুষ কীভাবে উপনিবেশের শিকার হয়েছিল সেই ইতিহাস নয়, কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজের অংশ করে তুলে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হচ্ছে, কীভাবে তারা উত্তর-উপনিবেশবাদের অংশ হয়ে উঠেছে, সে-সব ব্যাখ্যা করছে (বোজ্জোলি ও ডেলিয়াস ১৯৯০ : ৩৪)। শহীদ আমিন দেখিয়েছেন, জাতিই হচ্ছে জনগোষ্ঠী, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে বহুবিচিত্র মানুষ; শুধু কার সঙ্গে কার ঐক্য রয়েছে কিংবা কারা সমজাতিক ঐতিহ্যের অধিকারী, সে-সব বিবেচনা করাই বড়ো কথা নয়, বরং অনৈক্যের উৎসগুলো খুঁজে দেখতে হবে, দেখতে হবে জাতিরাষ্ট্র থেকে বাদ পড়লো কারা, অবদমিত থাকছে কারা, আধিপত্য বিস্তার করা হচ্ছে কাদের উপর এবং কেন (আমিন ১৯৯৫ : ৩)। কিন্তু উপনিবেশবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজে কীভাবে শুরু করা হবে এই কাজ? বিশেষ করে উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রকাঠামো যেখানে ধারণ করেছে অনেক জটিল রূপ, সেখানে বুদ্ধিজীবী লেখক-শিল্পীদের অবস্থান কেমন হবে? রাষ্ট্র, শাসনযন্ত্র এবং নির্যাতন-আধিপত্যের স্বরূপ তারা কীভাবে উন্মোচন করে দেখাবেন? ফ্রানৎজ ফানোঁ এ প্রসঙ্গে লেখকদের বিপ্লবী সক্রিয়তা আর গণআন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তির উপর জোর দিয়েছেন এভাবে :

"এটা সম্ভব নয় সেই অতীতে ফিরে যাওয়া যেখান থেকে জনগণের উদ্ভব ঘটেছে; বরং আমরা যোগ দিতে পারি সেইসব টালমাটাল আন্দোলনে যে আন্দোলনকে তারা আকার দিতে চাইছে। যখন এটা শুরু হবে তখনই সবকিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে, এরকম আলামতই দেখা যাবে। এতে কোনো ভুল করা যাবে না, এটা সেই অনিশ্চিত অবস্থা যা নিয়ে কাজ করছে জনগণ; আমাদের এতে অংশগ্রহণ করতেই হবে। এটা

এমনই একটা বিষয় যেখানে আমাদের আত্মা স্ফটিকায়িত হচ্ছে; আমাদের বোধ এবং আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হচ্ছে আলোয়।" (ফানোঁ ১৯৬৩)

অ্যামিকার কাবরাল ওই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন আবার 'জাতীয় সংস্কৃতি'র ইতিবাচক এবং মূল্যবোধ-আশ্রয়ী আন্দোলনের মধ্যে। তিনি মনে করেন, "কোনো সংস্কৃতিই বিশুদ্ধ নয়, চূড়ান্ত নয়। ইতিহাসের মতো সংস্কৃতি সবসময় প্রসারিত হয় এবং তা বিকাশমান (কাবরাল ১৯৯৪ : ১৬)।" জাতি কোনো স্থির ধ্রুব বিষয় নয়, এটি নিরন্তর বিকাশমান; আর সেজন্যেই তা সময়ান্তরে পুনঃকল্পিত হতে হবে; বার বার রাষ্ট্রভাবনাকে জনগণের স্বার্থে নবায়িত করে নিতে হবে। লেখক-শিল্পীদের কাজ হল এটাই, অতীত ভাবকল্পের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রকল্পনার পথে এগিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বিবেচনা করি তাহলে আমাদের সৃজনশীল লেখায়, বিশেষ করে উপন্যাসে, যাকে আমি বয়ান বলে উল্লেখ করেছি, কীভাবে এই জাতিরাষ্ট্র, উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে? কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কেননা রাজনীতিই ছিল এবং এখনও রয়েছে অধিকাংশ লেখকের ভাবনার কেন্দ্রে। একই সঙ্গে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা ও সংকটের উৎস কী, উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে আধুনিকতার পথে কীভাবে অগ্রসর হয়েছি, সংকট ও সম্ভাবনার সেই দিকগুলোও আলোচিত হবে এই লেখায়।

তিন.

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির অধীন ছিল : ঔপনিবেশিক কাল এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক কাল। ঔপনিবেশিক কালের সূত্রপাত ঘটেছিল ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে, পরবর্তীকালে যা প্রলম্বিত হয়েছিল পাকিস্তানি শাসনকাল পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে প্রথমে দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং পরে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ; প্রবেশ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মতো বাঙালি মুসলমানেরা শুরু থেকেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের তীব্র বিরোধিতা করলেও পাকিস্তানি রাষ্ট্রসৃষ্টিতে আন্দোলন করার পাশাপাশি ওই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আত্মবিলোপের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভ্যান শেনডেল বলেছেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল 'ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ'কে অবলম্বন করে। সেই সময় এই বদ্বীপ এলাকার মুসলমানেরা নিজেদের প্রথমে মনে করেছিল মুসলমান, তারপর বাঙালি। তারা স্বপ্ন দেখেছিল এমন এক বাংলাদেশের যেখানে ইসলামি মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, বাঙালির জীবনধারা যাবে বদলে। বাঙালি মুসলমানেরা এই লক্ষ্যেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু তারা বাঙালিত্বকে বিসর্জন দিতে চায়নি, বাংলা ভাষাকেও নয় (ভ্যান শেনডেল ২০০৯ :

১০৭)। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় তাই যখন বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালিয়ে উপনিবেশবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হল, তখনই তারা ওই শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে, তাই বলা বাহুল্য, সক্রিয় ছিল স্বাতন্ত্র্যের বোধ আর একক জাতি হয়ে-ওঠার প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবদুর রাজ্জাকের মন্তব্য :

"বাংলাদেশের মানুষ একটা জাতি, কারণ তারা একটা জাতি হতে চায়, অন্য কিছু নয়। ... এই জাতিকে তৈরি করেছে তার অনমনীয় গর্ব, সুখে-দুঃখে আট কোটি মানুষের সঙ্গে একই পরিচয় বহন করা, অন্য কিছু নয়, শুধু বাঙালি হতে চাওয়ার জেদ।" (রাজ্জাক ২০০১ : ৪৪)

বাংলাদেশের মানুষেরা এভাবেই পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের মতো 'সর্বভারতীয় সভ্যতার মায়াবিনী হাতছানির শিকার' যেমন হয়নি, তেমনি পাকিস্তানি জাতিসত্তার মধ্যেও বিলীন হয়ে যেতে চায়নি। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির মতো, বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় জাতির মতো "আমাদের জাতির দেয়ার মতো কিছুই নেই। তথাপি যা আমাদের একত্রে ধরে রেখেছে, পরিণত করেছে এক জাতিতে, তা হচ্ছে আমাদের শুধু এই জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়ার ঐকান্তিক কামনা।" (রাজ্জাক ২০০১ : ৪৪)

পৃথক জাতি হয়ে ওঠার ওই সক্রিয় উপনিবেশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে, লক্ষণীয়, বাঙালি মুসলমানেরা গ্রহণ করেছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শকে সেটি হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ভেন শেনডেল এই পরিবর্তিত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : "তারা প্রথমে ছিল বাঙালি, তারপর মুসলমান। নতুন সমাজ গড়ে উঠবে এমনসব নীতির উপর যার চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে পশ্চিমে। পশ্চিমী এই নীতিরই প্রয়োগ ঘটানো হবে আঞ্চলিক পরিবেশে, আর তা হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বেশিরভাগ মানুষের সংস্কৃতি হিসেবে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তবে সেই ধর্মীয় বিশ্বাস চর্চিত হবে ব্যক্তিগত স্তরে, কিন্তু তা জাতীয় পরিচয় হয়ে উঠবে না" (ভ্যান শেনডেল ২০০৯ : ১৮৩)।

আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদের দুটি ধারা আমরা লক্ষ করি : উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ এবং উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ। সম্প্রতি এই জাতীয়তাবাদকে আবার ভিন্ন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে : রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ এবং সংঘালঘু জাতীয়তাবাদ (কাইমলিকা ও স্ট্রায়েল ১৯৯৯ : ৬৬)। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ যে রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছিল, সেটি ছিল উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; বাঙালি জাতীয়তাবাদ নামে যা পরিচিত। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির অব্যবহিত মুহূর্তে, সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অনুসারে, উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ থেকে উদারনৈতিক

জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে জাতি হয়ে ওঠার জন্যে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন, তা-ও ছিল বিদ্যমান ও সক্রিয়। বাংলাদেশের একক জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, জাতি বলতে কী বুঝব আমরা? কীভাবে একে সংজ্ঞায়িত করব?

চার.

লেখাটা শুরু করেছিলাম মার্তি আর রিকোয়ারের বয়ান দিয়ে, ফিরে যাচ্ছি সেই প্রসঙ্গে আর এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উপন্যাসে কীভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদী বাংলাদেশের উপস্থাপনা ঘটেছে, আলোচিত হবে সেই প্রসঙ্গ। মার্তির কাছে, উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়, সাহিত্য হচ্ছে জাতীয় অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। মহৎ এই সাহিত্যই জনগণের ঐক্যের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতির অস্তিত্বের কথা জানান দিতে পারে। আধুনিক কালে উপনিবেশবাদের অবসান ও জাতিসৃষ্টিতে সাহিত্য যে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে, চিনুয়া আচেবে, ওলে সোয়েঙ্কা, জর্জ ল্যামিং, ন্যাদিন গর্ডিমার, এম জে কোয়েৎজির লেখায় সেই দূরদৃষ্টির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। সাহিত্য তাদের উপন্যাসে রাজনৈতিক রূপান্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। লেখকদের সৃষ্টিশীল লেখার মধ্য দিয়েই রচিত হয় নতুন সাংস্কৃতিক পটভূমি যা জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মার্তি যথার্থই ভেবেছেন, উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসৃষ্টিতেও সাহিত্য পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রাষ্ট্রযন্ত্রের গণতান্ত্রিক অথবা আধিপত্যবাদী, জনবান্ধব বা নির্যাতনমূলক দুই ধরনের চেহারাই চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয় সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে। ধারণাগত দিক থেকে সাহিত্য ও জাতি তাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বি-উপনিবেশীকরণের পৃথিবীতে, মার্তি ঠিকই ভেবেছেন, মহৎ সাহিত্য হচ্ছে জাতির চিহ্ন; জাতিও আরেকটি বিশেষ চিহ্ন – এই চিহ্ন হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতার, যথার্থ সার্বভৌমত্বের, আত্মনির্ভরতার। এই ভাবনার ওপর নির্ভর করেই উপনিবেশবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী। জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের কিংবা ইতিবাচক অর্জনের জন্যে প্রয়োজন দেখা দেয় সমগ্র রাজনৈতিক স্থাপনা ও সম্ভাবনার উৎসগুলো জনস্বার্থে ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যবহার করা। কিন্তু রিকোয়ার যেমনটা বলেছেন, রাজনীতি এই সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলতে পারে। কেননা রাষ্ট্র শুধু অতীতের স্মৃতিবাহী ঔপনিবেশিক চিহ্নমাত্র নয়, আধুনিকতারও চিহ্ন। এই আধুনিকতার পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের হতে হবে প্রগতিবাদী; গ্রহণ করতে হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাজারপুঁজি; গড়ে তুলতে হবে যৌক্তিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থা।

কিন্তু এ হল আধুনিকতার একটা দিক, এর অন্য দিকটা হচ্ছে এমন এক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো বা পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সামাজিক অস্তিত্বের একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করবে। এই প্রক্রিয়াটাকেই কখনও কখনও 'সাংস্কৃতিক

সাম্রাজ্যবাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পরেও অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাই যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অথবা যে বি-উপনিবেশীকরণ চলছে, তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বি-উপনিবেশীকরণের জন্যে তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষকথা নয়, সামাজিক অস্তিত্বের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, যা আবার পশ্চিমের তুলনায় পৃথক, অনারোপিত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, প্রার্থিত। লক্ষ করলে দেখা যাবে উপনিবেশের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পরও, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরও উপনিবেশমুক্ত দেশগুলো, যার অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ, জনমানুষের স্বপ্নপূরণ করতে পারেনি বা এগিয়ে আসেনি। কিন্তু বাংলাদেশের উপন্যাসে কীভাবে জাতি, রাষ্ট্র ও জনমানুষের কথা উপস্থাপিত হয়েছে সে-সব বিষয় আলোচিত হয়েছে এই লেখায়। বলা বাহুল্য, আমার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কেন্দ্রে রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বয়ান, দেশজ ও পশ্চিমী ভাবনাজাত বয়ান, আধুনিক প্রগতিবাদী উন্নয়নধর্মী বয়ান, আধুনিকতার সঙ্গে সংযুক্ত জাতীয়তাবাদী বয়ান, রাজনৈতিক ভূমিকাসূচক বয়ান কীভাবে বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের লেখায় উপজীব্য হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রণয়ন করা।

পাঁচ.

প্রায় চার দশক হল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এই স্বাধীনতার পটভূমিতে সক্রিয় ছিল দুটি ঔপনিবেশিক শক্তি – ব্রিটেন ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উপন্যাস পাকিস্তান সৃষ্টির কাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের উপন্যাসে সর্বপ্রথম উপনিবেশবাদের পটভূমি নির্মিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত *লালসালু* উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক মজিদ ধর্মীয় কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে জয়ী হয়, কিন্তু তার এই বানানো ধর্মবোধ পরাজিত হয় তার দ্বিতীয় স্ত্রী অল্পবয়সী জমিলার কাছে। আগেই বলেছি, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা, ঔপন্যাসিক ওয়ালীউল্লাহ সেই ধর্মকেই কৌতুকে পরিণত করেছেন, মজিদ হয়ে উঠেছে এক খলনায়ক। উপন্যাসটি এভাবেই পরিণত হয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদবিরোধী বয়ানে। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে পাকিস্তান রাষ্ট্রসৃষ্টির অন্তঃসারশূন্যতা প্রথম শৈল্পিকভাবে উপজীব্য হয়েছে আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ি*তে। ব্রিটিশ উপনিবেশমুক্ত পরিবেশে বাংলাদেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষ সমকালের পাকিস্তান রাষ্ট্রপরিসরে বেঁচে থাকার রাজনৈতিক অধিকার পেলেও তাদের সেই অধিকার বাস্তবায়িত হয়নি, বিশেষ করে নারী পারিবারিক-সামাজিক স্তরে অর্জন করতে পারেনি মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, বেঁচে থাকার জন্যে তাকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। আহমদ ছফার *ওঙ্কার* উপন্যাসে আবার নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে ঘোষিত ও বিবৃত হয়েছে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষায়, "একটি জনগোষ্ঠী থেকে পরিপূর্ণ একটি জাতিতে পরিচিত হওয়ার সংকল্প (ইলিয়াস ২০০৩ : ১০৩)।" শহীদুল্লাহ কায়সারের *সংশপ্তক*কে সামন্তবাদী সমাজ ও

ঔপনিবেশিক শক্তি কীভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে আর সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে কীভাবে আন্দোলন করেছে, গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ, জড়িয়ে পড়েছে জাতিরাষ্ট্র গঠনে, এই উপন্যাসের নায়ক জাহেদের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে পাওয়া যায় তারই চমৎকার বয়ান। এই উপন্যাসটি, গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, হয়ে উঠেছে ফ্রেডিরিক জেমিসন যাকে চিহ্নিত করেছেন 'জাতীয় রূপকে' (হধঃরড়হধষ ধষষবমড়ৎু) (জেমিসন ১৯৮৬)। শওকত ওসমানের উপন্যাসেও এই জাতীয় রূপকের বিষয়টি আরও স্পষ্ট। তার 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার কথা। আনোয়ার পাশা'র 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের বিষয়বস্তুও মুক্তিযুদ্ধ। তবে সরল অর্থে নয়, এর নায়ক সুদীপ্ত শাহিন কিভাবে মধ্যবিত্তের পিছুটান এড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধে অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, পাওয়া যায় তার বিবরণ।

তবে বাংলাদেশের উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজ আরও স্পষ্টভাবে উপজীব্য হয়েছে আখতারুজ্জামানের ইলিয়াসের উপন্যাস *চিলেকাঠের সেপাই*তে। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিজীবন তখন এতটাই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে ঊনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনের মধ্যেও এর নায়ক ওসমান চিলেকোঠার মধ্যেই আত্মরতি আর মরবিডিতে আক্রান্ত হয়েছে, কেঁপে কেঁপে উঠেছে মিছিল আর স্লোগানের অভিঘাতে। কিন্তু তার দ্বিতীয় উপন্যাস *খোয়াবনামায়* তিনি ফিরে গেছেন পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্তে। শহুরে জীবন নয়, গ্রামীণ মানুষের জীবনই যে পাকিস্তান আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছিল, পাওয়া যায় সেই রাজনৈতিক-ব্যক্তিক ন্যারেটিভ; আর কাহিনীর নেপথ্যে সক্রিয় থেকেছে অনতিদূর কালের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আর তেভাগা আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিল যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদের কথাও চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে, সেইসঙ্গে শ্রেণীবিভক্তির সূক্ষ্ম দিকও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। শওকত আলীর উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায় আরেক ধরনের জটিল উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত। তার *দক্ষিণায়নের দিনে* সমকালীন মার্কসবাদী আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থানের বিষয়টি বেশ চমৎকারভাবে উপজীব্য হয়েছে। তবে উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজ যার উপন্যাসে সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে উপজীব্য হয়েছে তিনি হচ্ছেন সেলিনা হোসেন। তার বেশ কয়েকটি উপন্যাস, যেমন হাঙর নদী গ্রেনেড, যাপিত জীবন, কাঁটাতারে প্রজাপতি, গায়ত্রীসন্ধ্যায় ব্রিটিশবিরোধী ঔপনিবেশিক সংগ্রাম ও উত্তর-উপনিবেশবাদী বাংলাদেশের সমাজের উপস্থিতি ও বয়ান বেশ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অন্য যেসব ঔপন্যাসিকের রচনায় উপনিবেশবাদী এবং উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র ও সমাজের ছবি পাওয়া যায় তারা হলেন, রশীদ করীম, রশীদ হায়দার, আবুবকর সিদ্দিক প্রমুখ। অন্যদের তুলনায় কিছুটা বিলম্বে হলেও হাসান আজিজুল হক লিখেছেন আগুনপাখি শীর্ষক উপন্যাস, যার মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণাদায়ক

অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। মাহমুদুল হকের জীবন আমার বোনের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ; সমকালের এক তরুণ কিভাবে রাষ্ট্রিক সংকটের মধ্যেও ব্যক্তিক-পারিবারিক সংকটে বিপন্ন বোধ করেছে, উত্তর-উপনিবেশবাদের এই স্থবির চিত্রই এর মূল বিষয়।

তবে পঞ্চাশ ও ষাটের ঔপন্যাসিকেরাই নন, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের তরুণতর ঔপন্যাসিক বা সমকালের ঔপন্যাসিকদের রচনায় উত্তর-উপনিবেশবাদী বাংলাদেশের অবক্ষয়িত, ভঙ্গুর, জনবিরোধী চরিত্র আরও স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এদের উপন্যাসেই উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে চমৎকারভাবে। এসব ঔপন্যাসিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মঞ্জু সরকার, মইনুল হাসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন, ইমতিয়ার শামীম, সাদ কামালী, হরিপদ দত্ত, নাসরীন জাহান, আনিসুল হক, হারুন হাবিব, জাকির তালুকদার, আহমদ মোস্তফা কামাল, প্রশান্ত মৃধা, শাহনাজ মুন্নী, শাহীন আখতার প্রমুখ। বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করতে চাই শহীদুল জহিরের কথা। উপন্যাস রচনার নিজস্ব শৈলী চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সমকালের নগরজীবনের সংকীর্ণ পরিবেশে কীভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজের আর্ত-দীর্ণ চরিত্রগুলো জীবনযাপন করে, তার উপন্যাসে পাওয়া যায় এই জীবনের অসাধারণ প্রতিচ্ছবি। সামগ্রিকভাবে উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও উত্তর-উপনিবেশের বহুমাত্রিক বিষয় মূর্ত হয়েছে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচনায় আর তা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ডিসকোর্স বা বয়ান। তবে এই সাফল্য সত্ত্বেও উত্তর-উপনিবেশবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ই এখনও তাদের রচনায় অনুক্ত থেকে গেছে। কিছু কিছু প্রসঙ্গ স্থানাভাবের কারণে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয়নি, বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে যে অগণতান্ত্রিক অপশাসন, সামরিকায়ন, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, বিশ্বায়ন প্রভাবিত আর্থব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণ, মৌলবাদের উত্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ বাংলাদেশের উপন্যাসে কীভাবে উপজীব্য হয়েছে, তা বিবেচনা করে দেখা জরুরি।

ছয়.

সমকালীন ইউরো-মার্কিন বয়ানে উত্তর-উপনিবেশবাদকে তৃতীয় বিশ্বের নিজেদের সৃষ্ট সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একসময় উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। অপশাসন, অগণতান্ত্রিকতা, সামরিকায়ন, আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক ঋণ ও পরনির্ভরশীলতা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠন, ব্যাপক প্রকাশ্য দুর্নীতি, সশস্ত্র মৌলবাদের আস্ফালন ও উত্থান এই দেশগুলোর সাধারণ মানুষের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। বাংলাদেশও এর

ব্যতিক্রম নয়; রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরের মধ্যে সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে নিহত হয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমানকে, আবদুর রাজ্জাক যাকে উল্লেখ করেছিলেন 'আমাদের যুগের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব' বলে (রাজ্জাক ২০০১ : ৪৪)।[২] সেই শুরু, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গ আর সামরিকায়নের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ গণতন্ত্র থেকে সরে গিয়ে মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বৃহত্তর বৈশ্বিক পরিসরে প্রকাশ্যে ইসলাম কিন্তু সংগোপনে লাদেনীয় রাষ্ট্রদর্শনের অনুকরণে মৌলবাদী রাষ্ট্রের (যেমনটা দেখা গিয়েছিল আফগানিস্তানে) স্বপ্নে বাংলাদেশের অনেক তরুণ এখন বিভ্রান্ত, ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে সশস্ত্র রাষ্ট্রবিপ্লবের। এ হল বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের সংকটের একটা দিক। অন্য আরেকটি দিকও ভয়াবহ আর মারাত্মক। দ্বিমেরু পৃথিবীর অবসানের পর এককেন্দ্রিক মার্কিন পরাশক্তির প্রভাবে বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক শ্রেণী শাসকদের সহায়তায় বাংলাদেশের সীমিত সম্পদকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে তৎপর। জনগণের সম্পদ ও জীবনকে এদেশের উত্তর-উপনিবেশবাদী শাসকেরা কখনই গুরুত্ব দেয়নি, একারণেই ঘটতে পেরেছে ফুলবাড়ির মতো ঘটনা। সাধারণ মানুষের জীবনমানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পাহাড়িদের সঙ্গে বাঙালিদের দীর্ঘকালের যে দ্বন্দ্ব তারও অবসান ঘটেনি। এমনকি একই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালিরা নিজেদের 'মূলধারা'র অংশ মনে করে তাদের 'প্রান্তিক' বলে বিবেচনা করে। কিন্তু পাহাড়িদের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতার ব্যবহার যে ভুল, বিভ্রান্তিকর ও আধিপত্যবাদী, সাধারণ বাঙালিরা তা বুঝতেই পারে না। এ রকম নানা অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

ব্যক্তি ও জনজীবনের ছোট ছোট পরিসরে প্রতিদিন আরও ঘটছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানা ঘটনা। পারিবারিক বলয়ে নারী শিকার হচ্ছে ফতোয়ার, প্রকাশ্যে বাড়ছে বোরখার ব্যবহার, ক্ষুদ্র চাষিরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করে কমিয়ে ফেলছে জমির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক উর্বরতার ক্ষমতা, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশবান্ধব বীজ, ক্ষুদ্র ঋণের নামে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, বৈশ্বিক উন্নয়নের জোয়ারে প্রকৃতি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য, ইন্টারনেটের যৌনজগতে বিচরণ বাড়ছে তরুণ-তরুণীদের, নাগরিক ব্যক্তিজীবনও অনেকটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে, বাড়ছে দাম্পত্য টানাপোড়েন। এর সবই ঘটছে উত্তর-উপনিবেশবাদী বাংলাদেশ রাষ্ট্র নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে বলে। প্রত্যাশার কথা, শাসকবর্গ ও লুম্পেনশ্রেণী যে পথেই অগ্রসর হোক না কেন, এখনও একশ্রেণীর তারুণ্য প্রতিরোধের প্রেরণায় প্রদীপ্ত। সচেতন এই তরুণেরাই বুকে পুষে রেখেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আকাঙ্ক্ষা, নতুন এক আধুনিক বিজ্ঞানধর্মী বাংলাদেশের স্বপ্ন।

তো এই স্বপ্ন শুধু তরুণদেরই নয়, সৃজনশীল লেখকদেরও দেখতে হবে, দেখাতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে চোরাস্রোতের মতো উত্তর-উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের ভেতর ভেতরে প্রবাহিত হচ্ছে যে অসংগতি তাকে দেখার ও দেখাবার দায়িত্ব তো তাদেরই। কিন্তু সমকালের ক-জন ঔপন্যাসিক এই কাজটি করতে পেরেছেন বা করছেন? লক্ষ করলে

দেখা যাবে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কীভাবে পাকিস্তানি উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে বাংলাদেশ, শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সংকট, তার কোনো সৃজনী বয়ান রচনায় উৎসাহী হতে দেখা যায়নি বাংলাদেশের কোনো ঔপন্যাসিককে। একইভাবে বাংলাদেশের উপন্যাসে আজও উপজীব্য হয়নি বিশ্বায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।[৩] ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, যা এখন আরও সম্প্রসারিত হয়েছে বৈশ্বিক পটে, কেউ কি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন কোনো উপন্যাস?[৪] লেখা হয়েছে কি ফুলবাড়ি বা সম্পদলুণ্ঠনের কোনো বয়ান? বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে যতটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে যতটা ধারণা থাকা দরকার, তা তাদের অধিকাংশেরই নেই; যেমনটা ছিল শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী ও শহীদুল জহিরের।

আমাদের নিশ্চয়ই আর বেশিদিন এরকম ঔপন্যাসিকের অপেক্ষায় থাকতে হবে না?

টীকা

১. খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তাই উল্লেখ করছি, উপনিবেশবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের ভুবনখ্যাত ভাবুক ফ্রানৎস ফানোঁ নিজেও নারীমুক্তির কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন : If we want to destroy the structure of Algerian Society, its capacity for resistance, we must first of all conquer the women; we must go and find them behind the veil where they hide themselves and in the houses where the men keep them out of sight. It is the situation of woman that was accordingly taken as the theme of action. The dominant administration solemnly undertook to defend this woman, pictured as humiliated, sequestered, cloistered…transformed by the Algerian man into an inert, demonetized, indeed dehumanized object…After it had been posited that the woman constituted the pivot of Algerian society, all efforts were made to obtain control over her. (Fanon 1965 : 37-38)

২. আবদুর রাজ্জাক শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা হিসেবে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা এরকম : "(স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে) ওই অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলোকে যে কোটি কোটি জনতা, যারা ভবিষ্যতের জাতিকে সৃষ্টি করবে তাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বিধা ছিল না। বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন প্রতীক (রাজ্জাক ২০০১ : ৪৫)।"

৩. এ বিষয়টির কিছুটা প্রভাব পড়েছে যে উপন্যাসে সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা মনিকা আলীর *ব্রিক লেন*।

৪. জাকির তালুকদারের *মুসলমানমঙ্গল* প্রাসঙ্গিক এই বিষয়টিকে ছুঁয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (২০০৩) 'আহমদ ছফার উপন্যাস', *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, ঢাকা : ঐতিহ্য ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৮) 'কবি য়েট্‌স', পথের সঞ্চয়, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খ , কলিকাতা : বিশ্বভারতী ।

রাজ্জাক, আবদুর (২০০১), *বাংলাদেশ জাতির অবস্থা*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ ।

Amin, Shahid (1995) *Event, Metaphor, Memory, Chauri Chaura 1922-1992*, Delhi: Oxford University Press.

Bozzoli, B. and Delius, P. (1990) 'Radical History and South African Society', *Radical History Review* 46/47: pp. 13-45.

Chakrabarty, Dipesh (1992) 'Postcoloniality and the Artifice of History, Who Speaks for Indian Pasts?', *Representations* 37 Winter: pp. 1-24.

Fanon, Frantz (1963) *The Wretched of the Earth*, trans. C. Farrington, New York: Grove Press.

___ *A Dying Colonialism*, trans. H. Chevalier, New York: Grove Press.

Guha, Ranajit (1982) 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India', in Ranajit Guha (ed.) *Subaltern Studies*, vol. 1, New Delhi: Oxford University Press, pp. 1-8.

Jameson, Frederic (1986) 'Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism', *Social Text* 15, Fall: pp. 65-88.

Kymlicka, Will and Christine Straehle (1999) 'Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature', *European Journal of Philosophy 7:1*, pp. 65–88.

Van Schendel, Willem (2009) *A History of Bangladesh*, Cambridge: Cambridge University Press.

বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা: আত্মপরিচয়ের ভাষ্য

হামীম কামরুল হক

১৯৪৭ পূর্ববর্তী অনেক বাঙালি হিন্দু লেখককে অভিযুক্ত করা হয় যে তাঁরা কেন বাঙালি মুসলমানের কথা লেখেননি। বলাবাহুল্য এই অভিযোগ আছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও। মজার একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। এদেশেরই এক অধ্যাপক ভারতে বেড়াতে গেলে ভারতীয় বাঙালি একজন খ্যাতিমান ও বির্তকিত লেখকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাপোষণ করেন। তাঁকে ওই লেখকের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখলেন তিনি ধুতি পরা। ছোটখাটো মানুষ। একবার তাঁর দিকে তাকালেন কি তাকালেন না। তেমন কিছু আপ্যায়নও করলেন না। বাংলাদেশী অধ্যাপক ওই লেখককে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেন বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে লিখলেন না?

লেখক জবাবে বললেন, আমার বাড়ি তো কিশোরগঞ্জ, কলকাতায় থিতু হওয়ার পর তো ওখানে তেমন আর যাওয়া হয়নি। তারপরও একবার গেছিলাম। তখনকার একটা ঘটনা বলি। বাড়ি থেকে ফেরার পথে একটা হাট পড়ে। হোসেনপুর। সেখানে বাস থামানো হল। কারণ ওখানে প্রচুর দেশি ফল কিনতে পাওয়া যায়। যাত্রীরা প্রায় সবাই নেমে গেল। ফলফলারি কিনে আবার বাসে উঠল। তো আমার পাশে বসা লোকটি বাস থেকে নামেনি।

তাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই আপনি কোনো ফল কিনলেন না যে। ফল খেতে পছন্দ করেন না বুঝি?

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, আমার পছন্দ আরবের ফল। আমি এসব ফল তেমন একটা খাইটাই না।

আরবের ফল মানে?

খেজুর । ওইটা থাকলে কিনতাম।

তো এইধরনের খেজুর-খাওয়া লোকদের নিয়ে আমি আর কী লিখতে পারি বলেন?

বাংলাদেশের লোককে 'খেজুর খাওয়া আত্মপরিচয় বিস্মৃত' বলে অনেকেরই হয়তো প্রশ্ন জাগে – সে আগে বাঙালি না মুসলমান? কিন্তু একেবারে সাধারণ খেটে-খাওয়া গ্রামের কৃষক, শহরের মজুর কি কখনো আত্মপরিচয়ের এই জিনিসটি ভেবে দেখে? (যদিও তাঁরা উপন্যাসের পাঠক নন, কিন্তু সমাজে তাঁদের গুরুত্ব কোনো লেখক-অধ্যাপক-ডাক্তার-প্রকৌশলীর চেয়ে এতটুকু কম নয়) তারপরও আমাদের বেশিরভাগ লোকই জানে না মুখেমুখে ও আচারে যতটাই মুসলমান সে ভেতরে ভেতরে ততটাই বাঙালি।

তার সঙ্গে পাকিস্তানের তো মিলবেই না, হিন্দুস্তানেরও নয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই এদেশের বাঙালি সেটি টের পেয়েছিল। সে মুসলমান তবে পাকিস্তানি মুসলমান নয়, বাঙালি মুসলমান। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান, সে নিজেকে কী বিবেচনা করল তা-ই কেবল নয়, অন্য জনগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের চোখে সে কী সেটিও বুঝে নেওয়ার আছে। আত্মপরিচয়ের এই দ্বিমুখী দিক আছে।

আত্মপরিচয় বিস্মৃত হওয়ার সেই দায় মেটানোর কাজ কি ঔপন্যাসিকের? সেই প্রশ্নটাও থাকে। আর ভাষার মতো আপাত সহজ কিন্তু গভীর, জটিল, কুটিল বিষয় নিয়ে প্রতি পদে ভাষারই পেতে রাখা ফাঁদে পা দিতে হয়, ভাষা নিয়ে লিখতে চাওয়া যেকোনো ব্যক্তিকে। ভাষা, উপভাষা, সাহিত্যের ভাষা এবং উপন্যাসের ভাষা– এর যেকোনো একটা বিষয় নিয়ে আমার মতো অর্বাচীনের পক্ষে আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন এবং অতিঅল্প পরিসরে প্রায় দুঃসাধ্য কি অসম্ভবতুল্য বিষয়। কারণ এ নিয়ে রীতিমতো এক বিরাট অভিসন্দর্ভ লেখা যেতে পারে। এ লেখায় ছোট পরিসরে কিছু কিছু সূত্র ও ইঙ্গিতমাত্র আমরা দেখে নিতে পারি।

দুই

কোনো অঞ্চলের ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভেতরে প্রচলিত নানান উপভাষা থাকে। দৈনিক পত্রিকার বা রেডিও-টিভিতে যে ভাষায় খবর পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশের কোনো মানুষ সে-ভাষায় কথা বলে না। মান বাংলা তাহলে কোনটি? এটা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হতে পারে। হাসান আজিজুল হক একবার বলেছিলেন, কোনো বিভাষী বা বিদেশের কোনো লোক যদি বাংলা শিখতে চান তাহলে তাকে যে বাংলাটি আমরা শেখাতে চেষ্টা করব তা-ই আসলে মান-বাংলা বা প্রমিত বাংলা। তাকেই 'স্ট্যান্ডার্ড' ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই মান-বাংলা আবার উপন্যাসে কতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে নমুনা তো বাংলা সাহিত্যে অবিরল। সমস্যা ও তর্কের সুরাহা সহজে হবার নয়।

বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাস কাকে বলব? এদেশের বাঙালি কলকাতায় গিয়ে যে উপন্যাস লিখছেন তা কি পশ্চিমবঙ্গের লেখা বলে শনাক্ত হবে? আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে এদেশে এসে লেখালেখি করা, যাদের বইপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তারা কি এদেশের লেখক? তাঁদের লেখাই বাংলাদেশের উপন্যাস? 'লালসালু' প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে ১৯৪৮ সালে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১৩৬৩ অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে। তাহলে 'লালসালু' কি বাংলাদেশের উপন্যাস? আর অদ্বৈতমল্ল বর্মণ বাংলাদেশের লোক ছিলেন বলে কি তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে বাংলাদেশের উপন্যাস বলতে পারি? কারণ এর পটভূমি-চরিত্রাবলী-সংলাপ সবই যে এলাকার সে এলাকা এখন বাংলাদেশের ভেতরেই পড়ে। বিতর্ক তো আরো পিছিয়ে নেওয়া যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস কি বাংলাদেশের উপন্যাস? পৃথিবীজোড়া এ ব্যাপারটা আছে। ছিল এবং থাকবে।

ভি.এস.নাইপল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদের লোক। গেলেন ব্রিটেনে, লিখলেন ইংরেজিতে, তাঁর পরিচয় ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর 'মিগুয়েল স্ট্রিট' বা 'অ্যা হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস' কি ত্রিনিদাদীয় উপন্যাস না ব্রিটিশ উপন্যাস? ভারতীয়, ত্রিনিদাদীয় ও ব্রিটিশ– তিনে মিলে তৈরি হয়েছে তার মনন। নাতলি সারোৎ ছিলেন ধর্মে ইহুদি, অন্যদিকে রুশ, লিখতেন ফরাসিতে। তিনি শেষ পর্যন্ত ফরাসি ঔপন্যাসিকই তো। ঠিকই একই ধাঁধা তৈরি হয়েছিল ২০০৮ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী জাঁ মরি গুস্তাফ লে ক্লোজিও-র ক্ষেত্রে। তিনি মরিশাসের না ফ্রান্সের? তিনি সহজ করে বলেছিলেন, "ফরাসি ভাষাই তার দেশ।" অথচ মরিশাস অঞ্চলের কি বিরাট প্রভাব তার জীবনজুড়ে আছে তা তো তিনি স্বীকার করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আমাদের অতি পরিচিত হেমিংওয়ের বেশিভাগ লেখার পটভূমি আমেরিকার বাইরে। কখনো ইতালি, কখনো স্পেন, কখনো কিউবা, কখনো আফ্রিকার কোনো দেশ। কিন্তু তার পরিচয় তিনি আমেরিকান লেখক। আরো অনেক লেখককে ধরে এ তর্ক বাড়ানো যায়। যার ভেতরে টি এস এলিয়টের মতো কবি, জোসেফ কনরাড, নবকভের মতো লেখকেরা পড়বেন।

আমরা জানি সুনির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও জীবনযাপন থেকেই একজন লেখকের জন্ম হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশে যাঁদের জন্ম, বা পশ্চিমবঙ্গে জন্ম হলেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে বসবাস করে গেছেন এবং যার বইগুলো মূলত ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বা হয়ে চলেছে তাঁদেরকেই আমরা বাংলাদেশের লেখক বলতে চাই।

তিন

বাংলাদেশের বাঙালির জীবন বাঙালি মুসলমান লেখকের লেখায় কতটা এল? মুসলিম সমাজের কথা কতটা এল? ১৯৪৭ তথা দেশবিভাগ-পরবর্তীকালে বাংলাভাষাভাষী এ অঞ্চলে উপন্যাসের যে আদল দাঁড়াল তাকে এখন বাংলাদেশের উপন্যাস বলছি, ঠিক সেই আমলে একে কি বলা হত পূর্বপাকিস্তানি উপন্যাস না পূর্ববঙ্গীয় উপন্যাস? বাংলাদেশের উপন্যাস তো স্পষ্ট অর্থে ১৯৭১ সালের পরেরই হওয়ার কথা। এর আগে সেই মীর মশাররফ, ইমদাদুল হক, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী থেকে শুরু করে ষাট দশকের অনেক লেখকের উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের মূল ধারায় যুক্ত হয় না। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কি অশ্রুকুমার সিকদারের লেখায় বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার পরিসর দেখে নিলে ওই লেখককুল হয়ে ওঠেন এক অর্থে 'বাংলা উপন্যাসের হারানো প্রজন্ম'– লস্ট জেনারেশন, অন্য অর্থে 'নো ম্যানস্ ল্যান্ডের লেখক'ও। না ঘরকা না ঘাটকা অবস্থা। তার ওপর আজকে উপন্যাস বলতে যা বুঝি তাঁদের লেখাগুলো উপন্যাস পদবাচ্য কিনা তা-ও একটা প্রশ্ন বৈকি।

আত্মপরিচয় আত্মসচেতনতা তৈরি করে। সেই আত্মসচেতনা লেখককে নিজের লেখার ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেদিক থেকে উপন্যাসের ভাষার একটা পরম্পরাগত সম্পর্ক আছে বৈকি। আত্মপরিচয়ের সচেতনতা উপন্যাসের জন্য এক অর্থে জরুরি, কেননা তা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। অনেকের ধারণা সমাজ নিয়ে জনপদ নিয়ে বড় ক্যানভাসে যে গদ্যকাহিনী লেখা হয় তা-ই উপন্যাস। আর ব্যক্তি নিয়ে ছোটপরিসরে লেখা গদ্যকাহিনী হল ছোটগল্প। এমন উদ্ভট আরো অনেক ধারণা আছে– স্বয়ং 'সাহিত্যের ভাষা' কথাটা– সাহিত্য তো ভাষা দিয়েই। আর 'ভাষা' বিষয়টা যতটা না লেখার তার চেয়ে উচ্চারণের তথা ধ্বনি নির্ভর। সে ভাষার দুভাগ– মৌখিক আর লিখিত। লিখিত ভাষা বা 'সাহিত্য' বলি কিন্তু আদতে তার দুটো ধরন হতে পারে পদ্য বা গদ্য।

উপন্যাসের ভাষা মানে উপন্যাসের গদ্য। সার্ত্র তার 'হোয়াট ইজ লিটারেচার' বইখানাতে কখনো 'ঔপন্যাসিক' কথাটা ব্যবহার করেননি। ঔপন্যাসিককে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'গদ্য লেখক' হিসেবে। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে এই 'গদ্য' বিষয়ক ধারণাটির ব্যাপক অভাব রয়েছে। আবার যে গদ্যে প্রবন্ধ লেখা হয়, সেখানে যেসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়, একই শব্দ উপন্যাস বা ছোটগল্পে প্রয়োগ করা যায় না। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তার গোটা সাহিত্যকর্মে 'তাৎপর্যপূর্ণ' কথাটা তিনি ব্যবহার করেননি। যদি কেউ দেখাতে পারে তো তিনি লেখালেখি ছেড়ে দেবেন। 'এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে' –এই বাক্যটি উপন্যাসে কি প্রয়োগ করা যায়? যে শব্দ প্রবন্ধের গদ্যের উপযোগী আর তা উপন্যাসে প্রয়োগ করলে কী আবেদন সৃষ্টি করে– না গদ্যটিকে ভ্রষ্ট করে তা নিয়ে আমাদের সচেতন চিন্তা নেই। এর ছাপ পড়েছে এদেশের সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে। গদ্য বিষয়ক অসচেতনতার ছাপ প্রকটভাবে ধরা পড়েছে আমাদের উপন্যাস চর্চায়।

চার

উপন্যাসের গদ্য তো বাক্যের পর বাক্য বসিয়ে যাওয়া নয়– অমিয়ভূষণের এই কথার সঙ্গে হাসান আজিজুল হকের কথাটা যোগ করে দিতে হয়; তিনি বলেছিলেন, গদ্য বা 'ভাষারীতি নিজে সাহিত্য নয়, সাহিত্য বলতে লেখক যা যা বোঝেন, যা যা করেন তাই বয়ে নিয়ে বেড়ায়; এদিক থেকে তা বিদ্যুতের তার, বিদ্যুৎ নয়।' বোধ করি যেকোনো গদ্য রচনা সম্পর্কে এ একেবারে মোক্ষম কথা। আমাদের উপন্যাসের গদ্য নির্মাণে একদিকে আছে তা দিয়ে বাস্তবকে নির্মাণের প্রয়াস, আর আছে বিষয়কে বর্ণনামূলক কাহিনীর মধ্যে গুঁজে দেওয়ার সহজ পরম্পরা। ফলে বাংলা উপন্যাসে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। বাংলাদেশের উপন্যাস তো সেদিক থেকে আরো বৈচিত্র্যহীন। এদেশে কোনো 'সিরিয়াস লেখক' কোনোদিন একটা রহস্যকাহিনী লেখার চিন্তাও বোধকরি করেননি। যাকে বলে কিনা 'লিটারারি থ্রিলার' তা-ও নয়। এমাবার্তো একোর ' দ্য নেম অব দ্য রোজ' বা 'ফুকোস পেন্ডুলাম' ধরনের লেখার কথা কেউ ভেবে থাকলে বাংলা

উপন্যাসের ঐতিহ্যে এই ধরনের থ্রিলার-উপন্যাসও নেই। আবার কার্ট ভনেগার্টের মতো 'ব্রেকফাস্ট অব চ্যাম্পিয়নস' বা ইসমাইল রীডের মতো 'মম্বো জাম্বো' ধরনের বিচিত্র লেখাও এখানে ভাবা যায় না। এক্সপ্রেশনিস্ট, সিম্বলিস্ট জাতীয় উপন্যাস; অ্যান্টি-নভেল, মেটাফিকশন আঙ্গিকের উপন্যাস নিত্য লেখা হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকায়। এদেশের সম্প্রতি দুয়েকজন তরুণ এপথে পা দিয়েছেন। কারো কারো প্রচেষ্টা ম্যাজিক রিয়ালিজমে অবগাহন করে সৃষ্টিলতার ষোল আনা উশুলের, এতে প্রায় ক্ষেত্রে বরং মাশুলই দিতে হয়েছে। নিজের পাতা ফাঁদে ও চোরাপথে নিজেই হারিয়ে গেছেন। ভাবা যায় না আলা রবগ্রিঁয়ে, মিশেল বুতরের মতো নব-উপন্যাসের কথাও। কারণ আমেরিকার বাস্তবতা বা ফরাসি বাস্তবতা তো এদেশের বাস্তবতা নয়। সেটি হুবহু এখানে আমদানি করলে তা হবে, দেবেশ রায় যে চেষ্টাকে বলেছিলেন, 'শিল্পের চোরাপথ'। ফলে প্রায় বৈচিত্র্যহীন, স্থবির সমাজ থেকে আসা ব্যক্তির লেখায় পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত আঙ্গিকে বাঙালির জীবন খুব যে শিল্প-সফলতা নিয়ে দেখা দেবে সে আশার পালে এখনো হাওয়ার জোর নেই। ব্যক্তির মনের পালে অল্পস্বল্প সে হাওয়া লাগলেও সমাজে, রাষ্ট্রের দিকে থেকে সেই হাওয়া এখনও প্রবল নয়।

ফলে বাংলাদেশের উপন্যাসকে যে গদ্য বয়ে নিয়ে যায় তাতেও তেমন একটা বৈচিত্র্য নেই। বাক্যতত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষাকে বিচার করার কথা তো ভাবাই হয় না। পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের সঙ্গে গদ্যের তুলনা করলেও এর একটা পাঠ আমাদের হতে পারে। বাংলাদেশের উপন্যাসে ক্রিয়ার ব্যবহার, বাক্যে শব্দ স্থাপন, বাক্যপ্রকরণের ধরন, সংলাপ ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলেও আমরা বাংলাদেশের গদ্যের ভিন্নতা টের পাব। তবে তফাত তো কেবল ওই বঙ্গ এ বঙ্গ নয়, লেখকে লেখকেও তফাত আছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মাহমুদুল হকের গদ্য তো এক নয়। এছাড়া যেসব লেখক সমাজগবেষকের চোখ নিয়ে উপন্যাসকে ইতিহাসসংলগ্ন করতে চেয়েছেন আর যে লেখকেরা ব্যক্তিমানুষের গহীনে হানা দিয়ে মনের অন্ধিসন্ধি নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের গদ্য তো একরকম হওয়ার কথা নয়। ইলিয়াস প্রথম ধারার হলে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দ্বিতীয় পথের যাত্রী, মাহমুদুল হকও তাই।

ফলে বাংলাদেশে উপন্যাসের গদ্যের আলোচনায় এদেশের লেখকদের বেছে নেওয়া বিষয়গুলোকে বিবেচনার ভেতরে আনতে হয়। দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষ, ইতিহাসের ধারায় ব্যক্তি, ধর্মবিশ্বাস ও ব্যক্তি, দেশভাগ, গ্রামীণ সমাজের অভাব অভিযোগ সংঘাত, ভাষা আন্দোলন, নানান রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধিকারের সংগ্রাম, নাগরিক মানুষের বিকার, যুবসমাজের নানান ক্ষয় অবক্ষয়, বেকারত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্রকামী মানুষের অবস্থান ও বৈরী রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই কত কী– ফলে সার্বিকভাবে দেখতে হলে পরিধিটা বাড়াতেই হয়। আবারো বলি, একটা প্রবন্ধের বিষয় নয়, এ নিয়ে বিরাট গ্রন্থ লেখা যায়। তারপরেও ক্রিয়া, সর্বনামের ব্যবহার; দীর্ঘ বাক্য, সংক্ষিপ্ত বাক্য; সংলাপের ধরন, বাক্যের জ্যামিতিক বিন্যাস, ভাষার ভেতরকার

বিচিত্র 'টিউনিং' অনুভব করার বিষয়টি নিয়ে খুব কম লেখক সচেতনভাবে ভেবেছেন, ভাবলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার খুব একটা নমুনা আমরা পাইনি, আর যাঁরা তা প্রয়োগ করেছেন তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি, কারণ তাঁদের লেখা উপন্যাসের 'বিদ্যুতে' খুব কম পাঠকই স্পৃষ্ট হয়েছেন। বাংলাদেশের উপন্যাসের গদ্য খুব কম লেখকের হাতে এর সেই সক্ষমতা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

পাঁচ

একদা বাংলা উপন্যাসের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে গিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর অঙুলি নির্দেশ করেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল, আগে তো উপন্যাসকে উপন্যাস হতে হবে, তারপর তো তার ভাষা নিয়ে আলোচনা। উনি তাই উপন্যাসের ভাষা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আলোচনা করেছিলেন উপন্যাসের স্বরূপ নিয়ে। এবং তিনি যে স্বরূপ তুলে ধরে ছিলেন তাতে যে কয়েকটি ব্যাপার আমাদের চোখে লাগে– এক. তার মতে বাংলা ভাষায় লেখা খুব কমই গ্রন্থ আছে যাদের উপন্যাস বলা যায়; দুই. কোনো বই উপন্যাস হল কিনা তা বিচার করতে গেলে যে মাপকাঠি তাতে বেশির ভাগ তো বটে বলতে গেলে প্রায় কোনো বাংলা উপন্যাসই ধোপে টেকে না। 'উপন্যাসের ভাষা' শিরোনামে তাঁর ওই লেখাটি পড়ার পরে অনেকের মনে বাংলা উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন জাগবে এবং প্রায় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধারণায় বড় রকমের ফাটল ধরবে। সবমিলিয়ে তাঁর কথা ছিল: উপন্যাসের ভাষাকে এর বিষয়ের থেকে আলাদা করা যায় না। উপন্যাসের বিষয়ই উপন্যাসকে তার জন্য উপযুক্ত ভাষার জোগান দেয়। উপন্যাসের বিষয়-আশয় নিয়েই আমাদের লেখকদের বেশিভাগেরই বিরাট খামতি রয়ে গেছে। ফলে ভাষাও সেই মতো উপন্যাসোচিত হয়নি। কারণ তাঁর মতে, উপন্যাস কোনো তত্ত্ব নয়। উপন্যাস বাক্যের পর বাক্য বসানো নয়। উপন্যাস মনেই ইনচেস্ট বা ইত্যাদির প্রতিবেদন বা বর্ণনা নয় যে সাংবাদিকমাত্রই ঔপন্যাসিক হয়ে যাবেন। উপন্যাস কোনো গল্প-কাহিনীকে টেনে লম্বা করার বিষয় নয় যে উপন্যাস বড়ও বটে, গল্পও বটে। এর সঙ্গে যোগ করেন– কোনো এক ইংরেজ লেখকের মতে, উপন্যাসে গল্প যে রাখা হয় তার কারণ কোন ঘটনা আগে ঘটছে, কোনটা পরে ঘটছে তা ধরিয়ে দিতে, গল্প বলা বা একটা কাহিনীকে বর্ণনা করা উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। এবং সবচেয়ে মারাত্মক কথাটি তিনি বলেছিলেন যে উপন্যাস ভাষাচর্চার জায়গা নয়।

তিনি এর সঙ্গে আরো যোগ করেন: উপন্যাস হল একটা থিমের 'হয়ে ওঠা'। থিম নামের একটা জীবন্ত বিষয়ের ভাব। থিমটাকে ব্যাখা করতেই নানান চরিত্র এবং ঘটনা পরিস্থিতির সন্নিবেশ। থিমটাকে হতে দেওয়া আর বর্ণনা করা এক বিষয় নয়। ফলে গদ্যের অযোগ্যতায় বাক্য মরে যেতে থাকে। শব্দগুলো হয় মরা ব্যাঙ। কারণ বাক্যগুলো বাক্য মাত্র থাকে। বাক্যগুলোর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ তৈরি না হলে তা জীবন্ত হয় না। আর আমরা যে-ভাষায় কথা বলি তা-ই যে গদ্য– এমন মর্মান্তিক ঠাট্টা বাংলা উপন্যাসে গদ্যের ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। ঔপন্যাসিক চরিত্রের মুখে যে

সংলাপ জোগান তা আদতে ঔপন্যাসিকেরই গদ্য। অবশ্যই তা চরিত্রের শ্রেণীচরিত্র, তাঁর ভৌগোলিক আঞ্চলিক অবস্থানজাত হতে পারে কিন্তু তা লেখকেরই গদ্য। ওই ভাষায় চরিত্র কথা বলে না। বরং এ বিষয়টি নাটকে হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে তফাত আছে। ওই তফাতটুকু মনে রাখলে সংলাপের ক্ষেত্রে ওই বিপদে পড়া লাগে না।

তাঁর মতে উপন্যাস সবমিলিয়ে একটা কলা-পরিণতি। সেখানে ভাষাটা চামড়ার মতো। তিনি চামড়াকে নারীর আদিম শাড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই শাড়ি চালাকি করে পালটানো যায় না। ফলে যখন কোনো থিমকে হয়ে ওঠার পথ খুঁজতে হয় সেই থিমই ভাষাটা তৈরি করে নেয়। যদি থিমটা ভাষা না পায়, তাহলে তা কল্পনাই হয়ে থাকে।

উপন্যাসের ভাষায় তাই প্রতিটি শব্দ অনিবার্যভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ সেটি অনিবার্য পরিস্থিতিকেই ভাষা দেয়। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত টানেন: উপন্যাস গদ্যে লেখা মহাকাব্য– এতে করে বাংলা ভাষায় উপন্যাসের সংখ্যা যদি কমে যায় তাতে বইব্যবসায়ীদের লোকসান হবে, পাঠকদের নয়। আর পাঠকের যেটা হবে, তিনি ভাববেন যে তিনি অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে দুচারখানা উপন্যাসও তাহলে পড়েছেন মাত্র।

এবং কোনো বই উপন্যাস কিনা তার বিচার করতে (এরিস্টোটলের সাহায্য নিয়ে দেখাতে চান) আমাদের যা যা বিচার করতে হবে তা সাজানো গেলে আমরা পাচ্ছি, ১. আর্গুমেন্ট; ২. প্রপার নেম; ৩. মিথ। এবং প্রথমটি, মানে আর্গুমেন্টের বিচারে যদি এগুতে চাই তাহলে কতগুলো বইকে উপন্যাস হিসেবে পাচ্ছি– 'মবি ডিক', 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ', 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'রিজারেকশন', 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'দ্য পসেসড', 'দ্য ম্যাজিক মাউন্টেইন', 'চাটার হাউস অব পারমা' ইত্যাদি। ফলে যার আর্গুমেন্ট নেই, দুশো কি দুহাজার পৃষ্ঠায় যার আর্গুমেন্ট ধরা যায় না তা উপন্যাস নয়। সে বই যত মনোহর, গদ্যে লেখা হোক যত সুখপাঠ্য হোক তা উপন্যাস নয়।

বাংলা উপন্যাস নিয়ে করা দেবেশ রায়েরও নানান চিন্তাভাবনায় অমিয়ভূষণের মতো কঠিন মনোবৃত্তি প্রকাশ না পেলেও তিনি মনে করেন, বাংলাভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ, জীবনানন্দ, কমলকুমারের মতো অসম্ভব শক্তিশালী আরো কিছু লেখক থাকার পরও আমাদের উপন্যাসের দীনভাব কাটে না। কারণ উপন্যাস বলতে 'ডন কিহোতে', 'টম জোনস', 'স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক', 'হিউম্যান কমেডি', 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'আনা কারেনিনা', 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ' এদের দ্বারা সৃষ্ট যে আদর্শ বোঝায় সেই আর্দশের ধারাপাতে আমাদের উপন্যাসগুলোকে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তথা বিস্তার, প্রসার ও গভীরতায় ম্লানই মনে হয়। এর কারণ হিসেবে বাংলা উপন্যাসের গড়ে ওঠার সময়টা

ছিল ঔপনিবেশিকতার আবেগে মোড়া আর রাষ্ট্র তখনও পর্যন্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংকট তৈরি করেনি। কিন্তু এর ভেতরেও ছিল 'গোরা'-'চতুরঙ্গে'র উদাহরণ।

ছয়

উপন্যাস তো আত্মপরিচয়ের তদন্তও। নইলে কেন পাঠক উপন্যাস পড়বেন? তাঁর নিজের আত্মান্বেষণ ও জিজ্ঞাসার কোনো না কোনো দিক তাকে উপন্যাস পাইয়ে দেয় বলেই তো। তবে উপন্যাস আরো অনেককিছু করে। উপন্যাস মানে শুধু উপন্যাস-ও হতে পারে। আবার উপন্যাস এক লোকযাত্রা। রালফ ফক্স-এর মতে, 'উপন্যাস আমাদের সভ্যতার এক মহান লোকশিল্প, মহাকাব্যের সার্থক উত্তরসূরি।' মিলান কুন্দেরার কাছে, 'উপন্যাস অস্তিত্বের পাঠ'। এবং শেষমেষ উপন্যাস ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান ও আত্মপরিচয়ের পাঠ।

বাহ্যিকভাবে ব্যক্তিমানুষ দেশ-জাতি-ভাষাভিত্তিতেও একধরনের আত্মপরিচয় লাভ করে, কিন্তু তাকে আরো গভীরতর এক আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হতে হয়। তা-ও বলতে গেলে একবারেই জানা ও নিত্য পরিচয়, কিন্তু কটা মানুষ জানতে পারে যে দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-আচার পেরিয়ে সে একটা মানবিক 'মানুষ'? আর সেটি জানলেও তার জানা বাকি থাকে সে নিজে 'কী ধরনের মানুষ'। সে-ও আরেক রকম আত্মপরিচয়ের তদন্ত। সেই তদন্তটি সারার জন্য লেখক কিছু 'টুলস' ব্যবহার করেন। সেই 'টুলস'গুলো কোনো দার্শনিক তত্ত্ব থেকে আসা 'টুলস' নয়; বরং একেবারে সাধারণ, একেবারে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য ঘটে যাওয়া ছোট্ট কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিন্দুতুল্য অনুভূতি, ঘটনা, বস্তু থেকে পাওয়া। হতে পারে স্বপ্ন, হতাশা, আতঙ্ক, কৌতুক, যৌনতা, ষড়রিপুগুলো দুটো একটা কি প্রতিটাই (কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য), ষড়গুণও হতে পারে (সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধ-আশ্রয়: এইগুণগুলো রাজাদিগের এই ছয়গুণ, ঠিক সাধারণ জনতার জন্য নয় এক অর্থে), লোকজ গুণের ভেতরে ধৈর্য, সাহস, পরিশ্রম, নির্লোভ–এগুলো 'টুলস' হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, দেখাতে পারেন এসব থেকে জাত নানান ফলাফল– ব্যর্থতা, খুন, আত্মহত্যা, সংঘাত– সর্বোপরি মানব-অস্তিত্বের যে তদন্ত কোনো দর্শন, ইতিহাস, রাজনৈতিক মতবাদ, প্রতিষ্ঠানিক মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে সম্ভব নয়, সেখানে হাত রাখে উপন্যাস।

ফলে উপন্যাসও আমাদের একধরনের জ্ঞানের জোগান দেয়। কিন্তু এই ধরনের জ্ঞান কেবল উপন্যাসের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব, এবং তা কোনো সেকেন্ডারি জ্ঞান নয়, যে ইতিহাসে ঘটেছিল বলে তা নিয়ে লিখলেই কোনো লেখা উপন্যাস হয়ে যাবে। কোনো অনালোচিত গোত্র বা সম্প্রদায় যাদের বঞ্চনার কথা কেউ বলে না– তাদের নিয়ে গবেষণা করে লিখলেই সে লেখা উপন্যাস পদবাচ্য ধরে নিতে হবে। অবশ্যই ওই ধরনের গবেষণা কাজে দেয় কিন্তু তা লেখকের ওই সব 'টুলসে'র ব্যবহারে ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন এক রসায়নে গড়ে ওঠে যাতে সেটি ওই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে ছাপিয়ে এক বিশেষ 'দার্শনিক' জ্ঞান হয়ে থাকে যা উপন্যাসই আমাদের দিতে পারে, যার জন্য

তলস্তয়কে কয়েক লক্ষ শব্দে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' লিখতে হয়, হেমিংওয়েকে বোধ করি ত্রিশহাজারের কম শব্দে 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি' লিখতে হয়। গ্রাহাম গ্রিনকে স্বয়ং আলাদা করে দিতে হয় তাঁর লেখার কোনটা উপন্যাস হচ্ছে আর কোনটা 'এন্টারটেইমেন্ট' জাতীয় লেখা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শব্দে, খণ্ডের পর খণ্ড ধরে মার্সেল প্রুস্ত ('রিমেমবারেন্স অব থিংস পাস্ট') বা রবার্ট মুসিল ('দ্য ম্যান উইদাউট কোয়ালিটিস')-র মতো লেখকেরা বলতে গেলে একটাই উপন্যাস লিখে যান সারাজীবনে!

যেকোনো সফল উপন্যাসই বলে: এ জীবনের দিকে তাকাও– যেভাবে দেখছ তার অন্তরালেই কেবল নয়, তোমার চোখের সামনে অনেককিছুই নিত্য ঘটমান কিন্তু তোমার দেখা হচ্ছে না। তুমি সচেতন নও তোমার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে এবং সর্বোপরি তোমার নিজের সম্পর্কে।– মিলান কুন্দেরা এভাবেই দেখতে চেয়েছেন উপন্যাসের অভিঘাতকে। তাই উপন্যাস পাঠ মানে নতুন দৃষ্টিলাভ করা। 'একটি নতুন চোখ আবিষ্কার একটি মহাদেশ আবিষ্কারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ'– মার্সেল প্রুস্তের এই কথাটি যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়– কাফ্কার গুস্তাফ জানুখকে বলা কথা: 'সাহিত্য খুবই বাজে সংরক্ষক, জীবনের খুব সামান্যই সে ধরতে পারে এবং ধরে রাখতে পারে'–র সামনে তাহলে মনে হয়, প্রুস্তের কথাটির জোর টের পাওয়া যাবে। সাহিত্যের চূড়ান্ত কাজ তো আসলে ডকুমেন্টশন নয়। জীবনের রিপোর্টিংও নয়– সাহিত্য চৈতন্যে নতুন আলোড়ন বা উদ্দীপনা জাগায়। ঘটনাটি ঘটে পাঠকের নান্দনিক জগতে। অনুভবের মধ্যে দিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সেই জীবনসমুদ্রে ডোবানো তুষার পাহাড়ের চূড়াটিকে সে দেখতে পায়। ফলে হয়তো একদিকে কোনো সংঘর্ষ থেকে রক্ষা মেলে বা কোনো বিপর্যয় থেকে আরোগ্য লাভ হয়। 'সাহিত্য' এর ভোক্তার এই ভাবে বিমোক্ষণ ঘটায়। আবার, কাফ্কা-ব্যবহৃত 'সাহিত্য'র জায়গায় 'উপন্যাস' শব্দটি প্রতিস্থাপন করে দিলে তার একটা দায়িত্ব এর ভাষা বা গদ্যের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

গদ্যের একদিক হল যুক্তি। আরেকদিক হল সংযুক্তি। আরেকদিক হল 'পূর্বাপর সংগতি'– এই দিকটিই হল কোনো উপন্যাসের সার্বিকভাবে উত্তরণের শর্ত। যাকে ইংরেজিতে 'কনসিসটেন্সি' বলে বাংলাদেশের গদ্যে তার ব্যাপক ব্যত্যয় দেখা যায়। বলা হয়, আমাদের দেশেই কেবল নয়, গোটা প্রাচ্যজুড়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি হয়নি কারণ এখানে যুক্তিবোধের প্রবল পরাক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠেনি।

গদ্যের মূল শক্তি যুক্তিবোধ। আর এই যুক্তিবোধই জীবনের উপরিকাঠামোর ভেতর- বাইরে গভীরতর সত্যকে দেখতে চায়, দেখতে গিয়ে ফাঁকির জায়গাগুলো দেখে নেয়, ফাঁপা অংশগুলো বুঝে নিতে পারে; শূন্যতাকে, বিচ্ছিন্নতাকে আবিষ্কার করতে পারে। এই দেখাটাই কোনো স্থানে উপন্যাসের মাধ্যমে ভাষা পায়। শুরু হয় বোবাযুদ্ধ। প্রতিপক্ষ? কারা আর– ওই সব ফাঁকি-ফাঁপা-বিচ্ছিন্নতাবোধ আক্রান্ত জীবন ও মানুষ এবং তাদের যাপিত সময়।

উপন্যাস এভাবেই জীবন সম্পর্কে 'আর্গুমেন্ট' তৈরি করে। এই 'আর্গুমেন্ট'-এর আদতে কোনো অনুবাদ হয় না। আর সেই আর্গুমেন্ট-এর একটা অবলম্বন উপন্যাসের ভাষা। মূল অবলম্বন হল উপন্যাসের থিম, যার প্রণোদনায় আকার পায় এর বিষয় ও বিষয়ের সেবায় হাজির হতে থাকে চরিত্র ও অন্যান্য বিষয়-আশায়। এবং এর যে আঙ্গিক তাও নির্মিত হয় ওই থিম ও বিষয়ের চাপে। অনেকেই আবার স্রেফ উলটা করে দেখেন। ফ্রেমটা দেখে নিতে না পারলে কোনোভাবেই উপন্যাসটা নিয়ে কাগজে কলমে বা কম্পিউটারে নামতে পারেন না তারা। এটা আমরা দেবেশ রায়ের কাছ থেকে শুনেছি। শুনেছি শহীদুল জহিরের কাছ থেকেও। এসব নিয়ে বিস্তর তর্ক হতে পারে কিন্তু জীবন সম্পর্কে আর্গুমেন্ট তৈরি না করলে, পাঠককে স্থানচ্যুত না করলে উপন্যাসের কোনো কিছুকে আর শেষ পর্যন্ত আর উপন্যাস বলা যায় না। এর জন্যই কি পাশ্চাত্যে একটা কায়দার নাম তৈরি হয়েছে 'ফিকশন' আর আমাদের এখানে 'কথাসাহিত্য'। তা-ই কাহিনীনির্ভর বা কল্পনানির্ভর গদ্যলেখকদের গড়পরতা একটা নাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে– কথাসাহিত্যিক। কে জানে নভেল/উপন্যাসের গরিমা বা মহিমা বহন করে না বলেই কায়দা করে এটা বলা হচ্ছে কিনা। উপন্যাসের আর্গুমেন্ট, ছোটগল্পের একমুখী প্রতীতি ও চূড়ান্তে একটি তীব্র কাব্যবিগ্রহ তৈরিতে আজকালকার লেখকদের উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরসা না রাখতে পারায় এটা হয়েছে হয়তো।

যাই হোক, বাংলাদেশের উপন্যাসের গদ্য নিয়ে কথা বলতে গেলে এটুকু বলা বোধকরি জরুরি যে আজকের বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার আগেই নিজস্ব আর্গুমেন্ট নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে বাংলাভাষাভাষী এই জনগোষ্ঠীর উপন্যাস। আমাদের উপন্যাসের মাধ্যমেই আত্মপরিচয়ের তদন্ত শুরু হয়। প্রথম তদন্তকারী লোকটির নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ওই তদন্তের ফলে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় 'লালসালু'। ধরা পড়ে কোন বিষয়টি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যুক্তিহীন বিশ্বাস– নামের সেই সমস্যাটিকে শনাক্ত করেন। নির্মেদ গদ্যের পরম্পরায় আমরা সেই থিমকে হয়ে উঠতে দেখি মজিদ নামের চরিত্রের মাধ্যমে। এর পর প্রায় ষোল বছর বছর পর ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবশ্যা' এবং সর্বশেষে ১৯৬৮ সালে 'কাঁদো নদী কাঁদো'। এই সময়কালেই বাংলাদেশের উপন্যাসের গতিপথ নির্মিত হয়। বলাবাহুল্য, তখনও বাংলাদেশটা রাষ্ট্রীয়ভাবে তৈরি হয়নি।

সাত

উপন্যাস জনপদ বা কোনো গোত্রভুক্ত সমাজের বৃত্তান্ত নয়, যে পাটিকরদের নিয়ে লিখলে তা উপন্যাস হয়ে যাবে। কোনো ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড যেমন যুদ্ধবিগ্রহ বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের নাটকীয় ঘটনা নিয়ে লিখলে তা উপন্যাস হয়ে যাবে।– একথাটি বারবারই স্মরণ করবার আছে, সঙ্গে এ-ও যোগ করে দেওয়া যে, গদ্যে দক্ষতা থাকলেই ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়ই এমন অনেক ঔপন্যাসিক আছেন যাদের নিজস্ব গদ্যশৈলী ছিল না।

আর অনেক লোকের ওই যে-একটা হাস্যকর ধারণা– আমরা যেভাবে কথা বলি, তা-ই গদ্য– নানান সময়েই এই হাস্যকর ধারণা উথলে ওঠে– লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নেওয়ার দায় যেন অনেককে পেয়ে বসে। এর ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব গদ্যশৈলী বা স্টাইল তৈরি করার চেষ্টা করে অনেকেই। প্যারীচাঁদ মিত্র-কালীপ্রসন্ন সিংহ একভাবে করেছিলেন সেই উনিশ শতকে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্র' গোষ্ঠী। কিন্তু অনেকেরই খেয়াল করার কথা 'সবুজপত্রে'র বহু আগে রবীন্দ্রনাথই তার য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র জাতীয় আরো কিছু লেখা চলিতরীতিতেই লিখেছিলেন। কারো কারো মতে সাধুভাষার গদ্যই বাংলা গদ্যের প্রকৃত স্বরূপটা ফুটিয়ে তুলতে পারে। চলিত রীতির নামে মুখের ভাষার কাছাকাছি যে বাংলাগদ্যের চল শুরু হল তা আদতে সাধুভাষার চেয়েও কৃত্রিম। আরো মজার ব্যাপার আছে। আমরা জানি শরৎচন্দ্র সাধুরীতিতে লিখেছেন। সুধীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখেছেন চলিত রীতিতে। কিন্তু দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথের চলিত রীতির ভাবগাম্ভীর্যের পাশে শরৎচন্দ্রের সাধুরীতিকে একেবারেই সহজসোজা মনে হয়। এতে করে কারো কারো মনে হয়, সাধুরীতি কেবল ক্রিয়ার 'হইল', 'করিল'-র ব্যাপার নয়, এটা আবেদননির্ভর। আদতে সুধীন্দ্রনাথ চলিতরীতিতে লিখলেও তার আবেদন বা অ্যাপ্রোচ সাধুরীতির। আর শরৎচন্দ্র সাধুরীতিতে গদ্য লিখলেও এর আবেদন আসলে চলিতরীতির।

অন্যদিকে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা গদ্যরীতি সাধুভাষাতে যে তীক্ষ্ণতার চূড়ান্তে পৌঁছাল সেখানে চলিতরীতির গদ্য একটা নতুন ভাঙনের জন্ম দিল। এবং বিজ্ঞজনের ধারণা আজো চলিতরীতি তার পূর্ণকাঠামো তৈরি করতে পারেনি। সেই ভাঙনের আরেক দফা ঘটল কি দেশভাগের জন্য? দুই বাংলার ভাষা কি আলাদা হয়ে গেল? অনেকেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা যতটা চলিতরীতির দিকে এগুলেন, পূর্ববাংলার লেখকেরা ততটা ধরে রাখলেন ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার। তাদের লেখায় যত আরবি-ফার্সিসহ বিদেশিভাষার থেকে আসা শব্দ ব্যবহার হতে শুরু করল, সেখানে পূর্ববাংলার লেখালেখিতে আরবি-ফার্সির ব্যবহার কম। হুমায়ুন আজাদের মতো কেউ কেউ তো রীতিমতো বিদ্রোহ করেছিলেন যে কীভাবে আরবি-ফার্সিমুক্ত বাংলাগদ্য লেখা যায়।
এর উলটোটাও ঘটেছে। বাংলাদেশে একটি সময়ে এমন অবস্থা ছিল যে ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিরাট একটা ঝামেলার মধ্যে পড়তে হত। কারণ দেশভাগের পরপরই ইসলামিপনা পেয়ে বসে অনেক লেখককে। আমাদের সৌভাগ্য এঁদের বেশিরভাগেরই কোনো অস্তিত্ব এদেশের সাহিত্যে আর পাওয়া যাবে না, যারা ইসলামি সাহিত্য তথা 'পাকিস্তানি বাংলাসাহিত্য' চর্চা করতে চেয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হল, উপন্যাসে এর কোনোটাই হওয়ার নয়, আরবি-ফার্সি তথা বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষাকে ঢেকে দিয়ে! গদ্যকে পুরোপুরি আরবি-ফার্সিহীন করেও নয়। কেননা

উপন্যাস ভাষানির্ভর শিল্প নয়। আর ভাষা ও সাহিত্য যে আলাদা তা তো জোর দিয়ে বলাই বাহুল্য। সাহিত্য সারা বিশ্বের, তা যে-ভাষায়ই রচিত হোক। আর ভাষাটা কোনো জনগোষ্ঠীর নিজের আদান-প্রদানে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে।

উপন্যাসের গদ্য তো বটেই মুখের ভাষা পর্যন্ত মানুষ ভেদে আলাদা। উচ্চারণের ধরন, শব্দের ওপর ঝোঁক, বাক্য ব্যবহারে সামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা। আরো মজার ব্যাপার হল, সেই ব্যক্তি সকলকালেও একই রকমভাবে কথা বলেন না। তারও ভাষা ব্যবহারে বদল ঘটে। ফলে পৃথিবীতে যতটা লোক তত রকমের ভাষাই কেবল নয়, ব্যক্তির নিজের কালকেন্দ্রিক ও কালানুক্রমিক ভাষার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রায়ই বলা হয় যে 'গুছিয়ে কথা বলা'– সেটা যেমন কম লোকেই পারে, তা লেখকের ক্ষেত্রেও ঘটে। আবার গুছিয়ে কথার বলার ভেতরেও যে নিজস্বতা বা কথা বলার স্টাইল আয়ত্ত করে কম লোকেই। উপন্যাস লেখকের ক্ষেত্রেও তা ঘটে। পৃথিবীতে যত উপন্যাস– উপন্যাসের ভাষাও ততগুলো। উপন্যাসও লেখকের কালকেন্দ্রিক স্টাইল ও কালানুক্রমিক স্টাইলের ছাপ নিয়ে রচিত। অনেক সময় একই সময়ে সমান্তরালে লেখা আলাদা আলাদা উপন্যাসের বিষয় ভাষাকে বদল করে, উলটোটাও হয়নি কি? কে জোর দিয়ে বলতে পারে।

আট

বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে এর শুরুই বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে। আর বাংলাদেশের উপন্যাসের শুরুতে পাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে। উপন্যাসের আধুনিক আবেদন, চরিত্র নির্মাণে ও নিজস্ব ভাষা শৈলীতে সেই সময়ের বিচারে ওয়ালীউল্লাহর আত্মপ্রকাশ বিস্ময়কর।

বাংলাদেশের উপন্যাসের ভুবনে তিনি সত্যিকার অর্থেই যুগন্ধর পুরুষ। কিন্তু এটা বললেও আমরা মনে রাখি এদেশের উপন্যাসে শওকত ওসমান, আবু রুশদ, আবু ইসহাক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজিয়া খান, রশীদ করিম, সৈয়দ শামসুল হক, মাহমুদুল হক, শওকত আলী, রিজিয়া রহমান, আবুবকর সিদ্দিক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আহমদ ছফা, ওয়াসী আহমেদ, শহীদুল জহিরের নাম। আবারও বলে নেওয়া ভালো যে, লেখালেখি বিশেষ করে উপন্যাস লেখা তো কোনো দলবদ্ধ কাজ নয়। কোনো অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে সেখানকার উপন্যাসের একটা চারিত্র্য ধরা পড়ে। ফলে এতে সে অঞ্চলের ভাষাভঙ্গির ছাপ পড়ে। কিন্তু সবলেখক দলবেঁধে ঠিক করেন না যে তাঁরা সেই ভাষার উপন্যাসকে সবাই মিলে একটা চেহারা দেবেন। বরং উলটোটাই বেশি ঘটবার কথা। সবাই চান নিজের শৈলী তৈরি করতে। কিন্তু এঁদের কয়জন খুব সচেতনভাবে বাংলাদেশের উপন্যাসে গদ্যের প্রয়োগ নিয়ে ভেবেছেন? বেশিরভাগের চিন্তা ব্যয়িত হয়েছে উপন্যাসের বিষয় ও প্লট নির্মাণে, তথা কাহিনীটাকে উপস্থাপনের জন্য। তারপরও আমরা একটু খেয়াল করলেও দেখে নিতে পারি তাঁদের গদ্যরীতিটিকে:

ক. "বাইরে বৈশাখের উত্তপ্ত দিন।– আজ কোনো উদ্বেগ দরিয়া বিবির ক্লান্তভার শরীরে হানা দিতে পারে না। বেশ ঘুম ধরিয়া গেলো। কিন্তু ঘুম তাহার আবার আচমকাই ভাংগিল। দরিয়া বিবি হঠাৎ অনুভব করে, কার যেন গভীর আলিংগনে সে একেবারে নিষ্পিষ্ট। দরিয়া বিবির মনে হয় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে তার সমস্ত শরীর। (শওকত ওসমান, 'জননী')

খ."বালু যেন পা দুটোকে, ফেননিভ ঊর্মিমালা চোখ দুটোকে, চাপা সমুদ্রধ্বনি আমার শ্রবণযন্ত্রকে আটকে রেখেছে, আর তার মন অবশ হয়ে আছে ঐ ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বিমুগ্ধভাবের ঐক্যতানে।" (রাজিয়া খান, 'বটতলার উপন্যাস')

গ."অন্যান্য দশটা মেয়ের মতোই শৈশবের ক্রীড়ায়, কৈশোরের স্বপ্ন চয়নে এবং যৌবনে সমর্পিত চিত্তে স্বামীর ক্রোড়ে আমার জীবনতরীটি সুখে-দুঃখে, জোয়ার ভাটায় আছাড় খেয়ে সহজেই তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারতো।"

বা

"আমার কোমলবক্ষের কল্পান্বিত তন্ত্রীগুলি জীবনের কোনো কোনো অভিজ্ঞতায় শুষ্ক তৃণের মতো নির্জীব হয়ে গিয়েছিল সত্য।" (রশীদ করিম, 'প্রষণ্ন পাষাণ')

ঘ."হাইকোর্টে রজতশুভ্র কোমলতা সবুজ বিটপীর ফাঁক দিয়ে চোখে নতুন করে অঞ্জন মাখিয়ে দেয়; আর সুরকি রঙের কার্জন হলের প্রশান্ত শোভা বিক্ষুব্ধ মনে তৎক্ষণাৎ শান্তি আনে।" (আবু রুশদ, 'নোঙর')

ঙ. "বিচিত্র ওদের জীবিকা। ওদের আছে জমি। সে জমিতে ধান হয়। ওরা চাষ করে। ওদের আছে গোয়াল। সে গোয়ালে থাকে হালের বলদ দুধের গাই। তবু ওরা সমুদ্রের মানুষ। মনের তরঙ্গে চড়ে চলে যায় দূর দেশে।" (শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সারেং বৌ')

চ. "সারেং-বৌ নবিতুন, ঢেঁকির উপর ও যেন সুসংগত এক তালের ছন্দ, নাচের ঝংকার। খলবলিয়ে হাসে ও। খলবলিয়ে নাচে ওর যৌবনপুষ্ট শরীরখানি। এর মাঝে রসিকতা করে শরবতি। সাধে কি চোখ লেগেছে লুন্দর শেখের। নবিতুন বুয়া, তোর গায়ে যে জোয়ানকির ঢল। আমারই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। শুনে যেন ফূর্তি আরো বেড়ে যায় নবিতুনের। মাথা ঝাঁকিয়ে কোমরখানি দুলিয়ে ঢেউটির মতো ঢলকে পড়ে ঢেঁকির উপর। যুগির বানানো মোটা শাড়িখানাও ধরে রাখতে পারে না ওর ছলকে ঝলকে উছলে পড়া জোয়ানকি। বাঁধন মানে না নিতম্বের দোলা। শাসন মানে না জোড়াবুকের উদ্দাম নাচন, কলকল জোয়ার। আর সেই নাচের ছন্দে দ্রুত বোল তুলে যায় ঢেঁকিতে– ঢেককুরঢুক, ঢেককুর ঢুক। (শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সারেং বৌ')

ছ."গ্রামের কৃষান কিষানী। শিক্ষার আলোকে দৃষ্টি ওদের প্রখর হয়নি। জ্ঞানের চর্চায় বুদ্ধি ওদের শানিত হয়নি। সে অভাবটি পূরণের জন্য ওদের রয়েছে সরল বুদ্ধির একটি অনুভব ক্ষমতা।" (শহীদুল্লাহ কায়সার, 'সংশপ্তক')

জ. "রঙ-বেরং গাউন, শাড়ি ও ওড়নার খসখস, পালিশ করা কারো চকচকে জুতোর মচমচ, বিচিত্র কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপের ঐকতান এখন আর নেই। রাত ১০টা, এক্সিবিশন হলের ভারী দরজা প্রথম দিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম দিনেই পুরস্কার ঘোষণা।

বিদেশি কূটনীতিবিদ, উচ্চ সরকারি কর্মচারী, গণ্যমান্য নাগরিক, সাংবাদিক ও দর্শক নারী-পুরুষে ঘরটা জমজমাট। জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী, হয়তো তাই এত ভিড়। উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার জন্য স্যুট পরা গাট্টাগোট্টা মন্ত্রী মহোদয় উঠে দাঁড়ালেন । ললিতকলার ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তৈরি করা কথাগুলো শেষ করার পর বললেন, রিয়্যালি ইট ইজ মাচ এনকারেজিং দ্যাট নিউ ট্যালেন্টস আর কামিং ফরওয়ার্ড টু এনরিচ দিস ফিল্ড অব ন্যাশনাল গ্লোরি। অ্যান্ড আই অ্যাম্ রিয়েলি হ্যাপি টু অ্যানাউন্স দ্যাট দ্যা পোর্ট্রেট, হুইচ স্টুড ফার্স্ট ইন দিস এক্সিবিশন, সো ফার আই রিমেম্বার, অয়েল পোর্ট্রেট নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি, ইজ নট অনলি এ গুড পিস অব আর্ট, বাট অলসো ভেরি নিয়ার টু এ মাস্টারপিস।

তখন সবার মধ্যে গুঞ্জন পড়ে গিয়েছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র ছবিটা দেখার জন্য সে কী ঠেলাঠেলি। বেশির ভাগ দর্শক ভিড় জমাল গিয়ে সেখানেই। সেই সঙ্গে শিল্পীর খোঁজ নিতেও ছাড়ল না।" (আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র')

ঝ. "অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্যে, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে জিভ তাদের শুকিয়ে আসে।" (আবু ইসহাক, 'সূর্য দীঘল বাড়ি')

ঞ."শষ্যহীন এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি লুটোপুটি আর স্থানবিশেষে খুনোখুনি করে সর্ব প্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে; মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরের প্রদেশেরও, হয়তোবা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য, মুখ-থোবড়ানো নিরাশা, বলে তাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের তর সয় না। দিনমান রক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে ছোটে।" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'লালসালু')

ট. "জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ। শুধু তার রূপেই যে সে মোহিত হয়, তা নয়। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে-অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের মর্মার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু শ্রবণাতীত নয়: কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। বালক বয়সে পর পর তিন বছর লায়লাতুল কদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্‌দা করতে দেখবে। গাছপালার এমন ভক্তিমূলক আচরণে আজ তার বিশ্বাস নাই, কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মনে যে-নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় সে-ধারণা এখনো সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এত সৌন্দর্য কী আদ্যোপান্ত অর্থহীন হতে পারে?" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'চাঁদের অমাবশ্যা')

ঠ. "মানুষ পেছনের পথ চেনে; পেছনের পথ কখনো দূরের নয়, কঠিনও নয়। তবু বালক বয়সে মুহাম্মাদ মুস্তাফার ভয়ের সীমা ছিল না। মানুষ মাত্রই ভীতি বোধ করে– যার কখনো কোনো কারণ থাকে, কখনো থাকে না। মানুষ দোজখকে ভয় করে, ভয় করে ভূতপ্রেত দস্যু ডাকাতকে, ভয় করে রোগব্যাধি শারীরিক যন্ত্রণাকে, মৃত্যুকে, দারিদ্র্যকে, অপ্রশমিত ক্ষুধাকে। আবার সে ভয় করে কেন ভয় করে সে-কথা বুঝে, এবং যে-ভয়ের কারণ সে বুঝতে পারে না, সে-ভয়ই তাকে সর্বাপেক্ষা ভীত করে। সূর্যালোকের আলোকিত উজ্জ্বল দিনে যখন অবাধে চর্তুদিকে মানুষের দৃষ্টি যায় সেদিনও তার মনে হয় এই স্বচ্ছ প্রখর উজ্জ্বলতার অন্তরালে কোথাও যেন অস্বচ্ছতা, কেমন একটা অন্ধকার। তখন এত আলোর মধ্যেও সে অসহায় বোধ করে কারণ কোথাও আশ্রয় দেখতে পায় না। কিন্তু যেখানে আলো নেই সেখানেও কী সে নিরাপদ বোধ করে?" (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, 'কাঁদো নদী কাঁদো')

ড. "একদিন রাতে বাইরে, দূরে, প্রচুর গোলাগুলি চলছিল, তখন হাসনা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে মেঝের ওপর শুয়েছিল; গোলাগুলি থেমে যাবার পর হাসনা হঠাৎ তার অঙ্গে হাত রেখেছিল, প্রথমে মনে হয়েছিল আকস্মিকভাবেই হাতটা এসে পড়ে কিন্তু সরিয়ে নিতে গিয়েই টের পায় ইচ্ছাকৃত এ হাত রাখা; সরিয়ে নেবার মৃদু চেষ্টাতে হাসনা তার অঙ্গ চেপে ধরেছিল প্রবল মুঠিতে; হাসনা তাকে সে রাতে চেয়েছিল, তাহেরের অঙ্গও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল প্রার্থিত ক্রীড়ার জন্য, কিন্তু শরীরের ভেতরে মন নামক স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সত্তাটিকে সে তখন কিছুতেই প্রস্তুত করে তুলতে পারে নাই বরং সেই দুঃশাসনীয় মন তার দেহ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছে হাসনার আমন্ত্রণের ব্যাকুল চাপে। কিছু পরে আবার গোলাগুলি শুরু হয়, নীরব আর্তনাদ করে ফিরে আসে হাসনার হাত, তাহের নিজেকে আবৃত করে হাসনাকে বুকের সঙ্গে নিবিড় জড়িয়ে ধরে গুলিবর্ষণ থেমে যাবার প্রতীক্ষা করে; অচিরে গুলি থেমে যায়, হাসনার হাত আর ফিরে আসে না।"(সৈয়দ শামসুল হক, 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী')

ঢ."দূরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিলো। শ্যামাঙ্গ বুঝলো, যেদিকে মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে, সম্ভবতঃ সেদিকে ব্রাহ্মণদের বাস। গবাদিপশুর দল ঐ দিকেই চললো। শ্যামাঙ্গ বাম দিকের পথ ধরলো। পথ সংকীর্ণ, কখনো আম্রকাননের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা বেণুবীথিকার মধ্যে দিয়ে। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দেখলো কয়েকটি কুটীর, ভয়ানক জীর্ণদশা কুটীরগুলির। শ্যামাঙ্গ অনুমান করলো, সম্ভবতঃ এখানে ডোম শ্রেণীর বাস। এক প্রৌঢ়াকে দেখা গেলো সন্ধ্যার ম্লান আলোতে চাঙ্গাড়ি নির্মাণে ব্যস্ত। নিকটেই কর্দমান নালিকায় শূকরের পাল। একটি উলঙ্গ বালক কুটীরের বাইরে দাঁড়িয়ে মা মা ডাকে কেঁদে যাচ্ছে। শ্যামাঙ্গ লক্ষ্য করলো, বালকটির পঞ্জরোস্থিগুলি ভারী প্রকট। নিকটে গেলে নির্ভুলভাবে গণনা করা যায়।"(শওকত আলী, প্রদোষে প্রাকৃতজন')

ণ."হীরের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল নীলাভাবী। খোকা হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলাভাবীর দু'চোখ দিয়ে। মাঝখানে দুটি বিন্দুর মতো দু'জনকে বসিয়ে অকারণ আনন্দে চারটি দেয়াল যেন হাত ধরাধরি করে

শিশুর মতো নেচে নেচে ঘুরপাক খাচ্ছে; দেয়ালগুলো এখন জর্জিয়ান। লেসের কাজে মোড়া টিপয়ের ছাউনি দুলছে, দুলছে ফুলদানি, দুলছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রজনীগন্ধাগুচ্ছ, ট্রানজিস্টার যেন বনবিড়াল, খাড়া করে মৃদু মৃদু নাড়ছে এরিয়েল-লেজ; হাওয়া, এত হাওয়া আসে কোথা থেকে, সমুদ্রের খুব কাছে তারা, কিংবা একটা জাহাজের ভিতর হাওয়ার গভীর গোপনে সুগোল শূন্যতাবোধ ওজনহীন এক চাঁদের মতো অবিরাম সাঁতার কাটছে।"(মাহমুদুল হক, 'জীবন আমার বোন')

ত. "একনিষ্ঠ মনোযোগী হলে ওসমান দ্যাখে যে ছাদের ঠিক নিচেই গুলিবিদ্ধ একটি যুবক দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা। যুবক অল্পবয়েসী, শরীরের চামড়া কাঁচা ও টাটকা। ·৩০৩ রাইফেলের একটি গুলি তার বুককে গেঁথে রেখেছে দেওয়ালের সঙ্গে। মাথাটা বাঁদিকে ঝুলছে। বুকের নিচে তার দীর্ঘ শরীর রেলিঙে মেলে দেওয়া শাড়ির মতো আস্তে আস্তে কাঁপে। শীতেও কাঁপতে পারে, বাতাসেও কাঁপতে পারে। যুবকের মুখ হাঁ করা, মনে হয় প্রচণ্ড একটি চিৎকার সেখানে জমে রয়েছে। বলা যায় না, যে কোনো সময় এই পুরনো দালান ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কোটর থেকে ছিটকে-পড়া কালো মণিজোড়া বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রয়েছে, তারা গোগ্রাসে সব দেখছে। তার কালো দুটো হাত ডানদিকে ও বামদিকে শক্ত একজোড়া রডের মতো ঝোলানো। সেই দুই হাতের প্রত্যেকটির সঙ্গে গুলি দিয়ে গাঁথা আরো ২ জন যুবক। যুবক ২ জন যমজ, ২ জনেই অল্পবয়েসী, ২ জনেরই চামড়া কাঁচা ও টাটকা। এদেরও একেক জোড়া চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটরের ভেতর থেকে, বেরিয়ে-আসা মণিগুলো যেন পরিচিত ও অপরিচিত যাবতীয় দৃশ্য দ্যাখার জন্য অস্থির। ২ জনেরই হাঁ-করা মুখে সুপ্ত চিৎকার যে কোনো সময় বেরিয়ে ছাদ ফাটিয়ে ফেলতে পারে। তাদের ২ জনের লোহার রডের মতো সেই ২ জোড়া হাত নিচের দিকে বাড়ানো। আবার দ্যাখে, রডের মতো সেই ২ জোড়া হাতের সঙ্গে ·৩০৩ রাইফেলের গুলিতে গাঁথা আরো ৪ জন যুবকের লাশ। কে বলবে এরা আলাদা লোক? অবিকল এক রকম দেখতে ৪ জন যুবকের কোমর থেকে নিচের দিক শীতে কি বাতাসে একটু একটু করে কাঁপে। গোগ্রাসে সব কিছু দেখে নেওয়ার জন্য কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ৪ জনের ৪ জোড়া চোখের ৮টা মণি। একই রকম দেখতে ৪টে মুখে স্থগিত রয়েছে ৪টে দারুণ চিৎকার। এই ৪জন আর আগের ৩ জন– সর্বমোট ৭ জনের চিৎকারে ঘরবাড়ি দালানকোঠা রাস্তাঘাট ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে না? এখানেই শেষ নয়। এই ৪ জনের লোহার রডের মতো হাতে গাঁথা রয়েছে গুলিবিদ্ধ আরো ৮ জনের মৃতদেহ। ঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এরা মেঝে ফুঁড়ে নিচে নেমেছে। নিচে নেমে গেছে গুলিবিদ্ধ মানুষের দীর্ঘ সিঁড়ি।" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'চিলেকোঠার সেপাই')

থ. "ঘরের বাইরে দরজার চৌকাঠে বসে কেরামত ফের চৈত্রের দুপুর দেখে। 'খোয়াবে আগুন জ্বলে দুনিয়া আসমানে,' এর পরের লাইনটি জুত করে মনে করার জন্য মুখে মুখে সে নানান কথা বিড়বিড় করে, ভেতরে মাচায় খসখস আওয়াজ শুনে তার বুক ছমছম করে, ফকির কি এসে হাজির হলো নাকি? ঐ মাচা থেকেই তো সে একদিন

বেশ লম্বা গান করলো একটা। আবার তার খুশিও লাগে ফকিরের ছায়া একবার যদি তাকে ছোঁয়, তা হলে হয়তো গান তার গলায় আসবে আপনাআপনি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে ও একটু আশায় আশায় আবছা অন্ধকার ঘরে ভাবে, না, ফকির আসবে কোত্থেকে? মাচার ওপরে কুলসুম। নাকের কাছে তার দাদার বই নিয়ে প্রাণপণে সে ওটার গন্ধ শুঁকছে। কেরামতের গলা শুকিয়ে যায়, গন্ধে গন্ধে কুলসুম কি বইয়ের সব কথা শুষে নিচ্ছে? গন্ধে গন্ধে সব টেনে আত্মসাৎ করে তার হাতে তুলে দেবে বইয়ের একটা ছিবড়ে? বইয়ের সব অক্ষর শুঁকে সাদা পাতা দেখিয়ে কুলসুম কি চেরাগ আলির নিরক্ষরতা প্রমাণ করে ছাড়বে?" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'খোয়াবনামা')

দ. "মাওলা বক্স তোমার মতো তরলমতি যুবকের সঙ্গে কথা বললে পদে পদে বিরক্ত হতে হয়। জীবনে আমি নিজের ছাড়া অন্য কোনো কেরামতিতে বিশ্বাস করিনি। আমার জীবনটাই একটা মস্ত বড়ো কেরামতি। তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলে উপলব্ধি করতে পারতে আমার জীবনটাই কি একটা কেরামতি। ঊনিশশো ঊনচল্লিশ সালে মুসলিম লীগের চোঙ্গা ফোঁকানো একজন কর্মী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম। গাঁও গেরামের ছেলে। কি এমন বুদ্ধি ছিলো। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে মফস্বল কলেজ থেকে বি এ পাশ করেছিলাম। আমার মতো এমন কতই তো ছিলো। কালের ঝাপটায় কে কোথায় তলিয়ে গেছে কে হিসাব রেখেছে। তুমি নিজের মাথা খাটিয়ে একবার চিন্তা করে দেখো। কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসেছি। ওপরে আসাটা বড়ো কথা নয়। অনেক মানুষ তো ওঠে আসে কিন্তু টিকতে পারে ক'জন? টিকে থাকাই হলো গিয়ে তোমার আসল ব্যাপার। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলাম। আয়ুব খানের মাঝখানের সময়টুকু ছাড়া সবসময়ে মন্ত্রী থেকেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারের আমলেই মন্ত্রী থেকে যেতে পেরেছি। এটি চাট্টিখানি কথা নয়। ক্ষমতার দণ্ড ধারণ করা অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হবে। আমি যখন মারা যাবো ইংলিশ ডেইলিতে এডিটরিয়ালের হেডলাইন দেবে, 'হি ডায়িড লাইক এ সোলজার এট হিজ পোস্ট'। (আহমদ ছফা, 'মরণবিলাস')

ধ. "তখন সেই অত্যন্ত সঙ্কটজনক মুহূর্তগুলো আবু ইব্রাহীম চুপ করে থাকে এবং আমরা এরকমটি সঙ্গতভাবেই ভাবতে পারি যে, আবু ইব্রাহীম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এ কারণেই সে চুপ করে ছিল। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কি কারণ ছিল সেটা আমরা সঠিকভাবে জানি না, কোনো দিনই হয়তো জানব না, হয়তো খালেদ জামিলের যুক্তিতর্কের সামনে তার মনে হয়েছিল যে, কোনোকিছুতেই কিছু এসে যায় না, হয়তো-বা তার মনে অন্য কিছু ছিল। তবে সব অবস্থা বিবেচনায় আমাদের এরকম বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে, আবু ইব্রাহীম সজ্ঞানে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নির্ধারিত ঘটনাটি ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিল; যদিও তার ভেতরে একই সঙ্গে ছিল অনভ্যস্ত অস্বস্তি। তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন খালেদ জামিল একটি সিগারেট ধরায় এবং সে প্রত্যাখ্যান করবে জেনেও তাকে সাধে, তারপর এক

গাল ধোঁয়া ছেড়ে সামনের দিকে তার পা ছড়িয়ে দেয়।" (শহীদুল জহির, 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু')

দৃষ্টান্তের পরিমাণ আরো বাড়ানো যায়। আমাদের দেখার বিষয় হতে পারে বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষায় এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি যা পশ্চিমবঙ্গের লেখকের উপন্যাসের চেয়ে আলাদা কি-না? হতে পারে রচনাশৈলীর দিক থেকে এই গদ্য কতটা ধারণ করতে পারে বাস্তবতাকে, কতটা নির্মাণ করে বাস্তবাতিরিক্ত বিষয়কে, কীভাবে বর্ণনা করে চরিত্রকে।

পাঠক নিশ্চয় খেয়াল করে থাকবেন, শওকত আলীর উপন্যাস থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি ছাড়া প্রথম দিককার গদ্যের চেয়ে পরের দিককার গদ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার কমে আসছে। বেশিরভাগ লেখকের বাক্য দীর্ঘ (শহীদুল্লাহ কায়সার ছাড়া প্রায় সবারই)। তবে প্রথমদিকের লেখকদের বাক্য দীর্ঘ হলেও জটিল নয়, জটিল নয় পরের দিককার আহমদ ছফার গদ্যও। কিন্তু আবেদন অনেকক্ষেত্রেই নজর ফেরাচ্ছে সমাজরাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে। মাহমুদুল হকের গদ্যের জ্যামিতিক বিন্যাসে কাব্যময় দ্যুতি দেখি। অন্য দিকে ইলিয়াসে দেখি গীতলতামুক্ত নিরেট ও একেবারেই ভিন্ন একটি পর্যবেক্ষণ, কাব্যের বদলে এ-যেন চলচ্চিত্রের এমন একটা শট– যেখানে পরিস্থিতি একটি ইমেজ হয়ে ওঠে । আবার অনুভবের ভেতরকার ছবি তা-ও ইলিয়াস নির্মাণ করেন। সৈয়দ হকের গদ্য মনস্তত্ত্ব ও পরিস্থিতি মিলে তৈরি চরিত্রকে দেখায়। কিন্তু এর কোনোটাই উপন্যাসের গদ্যর চূড়ান্ত লক্ষ্য ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ তা সামগ্রিক সংগতি যুক্তি এবং সংযুক্তি ও পূর্বাপর সংগতি মিলে একটি পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম না হয়ে ওঠে।

গদ্যের শৈলীতে নিজস্বতা কি আবেদনে পাঠককে নতুন দৃষ্টি দান করার সক্ষমতার প্রশ্নেও উপন্যাস আর আগের অবস্থানে নেই। পৃথিবীতে সেরা বলে কথিত ১০ টি উপন্যাস হাতে নিয়ে বিচার করতে গেলে একটিকে উপন্যাস বললে– অন্যটিকে খারিজ করে দিতে হয়। উপন্যাস এমনই এক খাপছাড়া, মাপছাড়া সেই আকারহীন দানব হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো উপন্যাস প্রায় কিছু বলে না, কিছু ঘটে না কেবল একটা চক্কর ছাড়া আর কিছু না-ও সেখানে থাকতে পারে। প্লট, চরিত্র এবং ঘটনাক্রম ভেঙেচুরে সেখানে আগের উপন্যাসের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না এক গদ্য আর মানুষের নাম ছাড়া। থাকে কেবল লেখকের দেখা আর তা পাঠককে দেখানোর এক বিরল প্রয়াস।

উপন্যাসের গদ্য সে বিদ্যুৎ সঞ্চার করতে পারে কেবল কোনো গল্প না বলেই। সেখানেই উপন্যাসের নিজস্বতা যাকে কোনো চলচ্চিত্রেও রূপদান (যাকে বলব চলচ্চিত্রে অনুবাদ করা) যায় না। সেখানে কল্পনার ভাষা ও পর্যবেক্ষণের ভাষার লক্ষ্য পাঠকের মননজাত অনুভূতি– যা দর্শনের মতো হতে গিয়েও দর্শন নয়, এ এমন এক অনুভূতিজাত-জ্ঞান যা কেবল উপন্যাসই দেয়। এবং লেখক তার গদ্যে সেই 'টুলস'গুলো নিজের মতো করে এমনভাবেই ব্যবহার করেন অনেকক্ষেত্রেই সেগুলো

তার প্রচলিত শব্দের শরীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। সেই উপন্যাসের গদ্যের দিকে আমরা এখনো যেতে পারিনি।

অনেকেই বলেন, উপন্যাসের জন্ম লেখকের আত্মায়। আদতে চৈতন্যের এমন এক অব্যাখ্যেয় জায়গায় যেখান থেকে জীবনের পরমাণু নিয়ে পাঠকের চৈতন্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেওয়া যায়। যেখান থেকে তলস্তয় 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'আনা কারেনিনা'কে দেখতে পান। দস্তয়েভস্কি লেখকজীবনের প্রান্তে এসে লেখেন বহু বছর ধরে লিখতে চাওয়া 'দ্য ব্রার্দাস কারামাজভ'। মাঝখানে লেখার জন্য মালমশলা জোগাড় করতে কি লাগবে সে অনুযায়ী গবেষণা কি ধ্যান কি দুটোকেই লেখক বেছে নিতে পারেন।

খুব ভালো হত রুশ ভাষায় তলস্তয়ের লেখা উপন্যাসগুলো পড়লে, মূল ফরাসিতে প্রুস্ত, মূল জার্মানে টমাস মান বা কাফ্কা পড়লে। তবে যেটুকু বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা যায় তলস্তয়ের গদ্যের ভারবহন ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা তার সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে এতটাই সংগতিপূর্ণ যে তা ভারসাম্যপূর্ণ না হলে প্রকৃত উপন্যাস হয় না। প্রুস্ত উপন্যাসে ঘটিয়েছেন আইনস্টাইন বিজ্ঞানের জন্য যা করেছেন সেই 'ই' ইজ ইকুয়াল টু 'এম সি স্কয়ার'-এর কাণ্ড। দৃষ্টি ও অনুভবের পারমাণবিক সক্ষমতা। আবার টমাস মানের ভাস্করের মতো খোদাই করা উপন্যাস, যেখানে একটা শব্দ অপ্রয়োজনীয় নয়, যেখানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটি তুলে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কোনো শব্দ প্রতিস্থাপনই করা যায় না; করলে বাক্যটাই আর থাকে না। সেইভাবে গদ্যকে দেখেছিলেন ফ্লবেয়ার কি আমাদের কমলকুমার-অমিয়ভূষণও। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন উপন্যাসের গদ্য হবে উদাত্ত। অত বিশুদ্ধতা দিয়ে মেপে উপন্যাস লেখা যায় না। তবে এর প্রত্যেকটি যে যার মতো করে নিতে পারে। আবার কেবল পাশ্চাত্য কেন, প্রাচ্যের মহাকাব্য, লোককথা ও আখ্যানকাব্য থেকেও তো বুঝে নেওয়া যেতে পারে আমাদের উপন্যাসের নিজস্ব আদর্শকে।

গ্যেটে বলেন, "উপন্যাস হল 'সাবজেক্টিভ ইপোপি' (ঝঁনলবপঃরাব বঢ়ড়ঢ়বব)– আত্মগত মহাকাব্য। লেখক যেখানে জীবনজগতকে তার নিজস্ব *পদ্ধতি*তে বিচার-বিবেচনার করার অনুমোদন পান। এখানে প্রশ্ন হল একটাই, লেখকের একান্ত নিজের কোনো *পদ্ধতি* আছে কিনা; তাহলে বাকিটুকু নিজের থেকেই এসে সাড়া দেবে।" (মৎকৃত অনুবাদ) অন্যদিকে উইলা ক্যাথার 'উপন্যাসের আসবাবপত্র' নামের একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, তলস্তয়ের লেখায় সেই-আমলের বাড়িঘরের বিন্যাস, আসবাবপত্রের ধরন, পোশাকআশাকের ফ্যাশন সব কিছুর খোঁজ মেলে, এইসব মিলিয়ে তিনি মানুষের আত্মিক বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তাঁদের ভেতরকার ব্যাপারগুলোও তুলে ধরেন। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকের চাই শুধু শূন্য একটা ঘর– যেখানে আছে চারটি দেওয়াল আর একটি মাত্র প্যাশন– তা-ই যথেষ্ট লেখকের জন্য।

নয়

গদ্যের চরম লক্ষ্য তো বলতে চাওয়া, বিষয়টি ঠিক হুবহু তেমনভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সব ঔপন্যাসিক সেইরকমের ভাষাশিল্পী হন না, আবার ভাষায় দক্ষতা থাকলেও কেউ উপন্যাস লিখে ফেলতে পারবেন তা তো নয়ই। বাংলা গদ্য ও ফরাসি গদ্যের তুলনামূলক একটা আলোচনায়, লোকনাথ ভট্টাচার্যের কাছে আমরা জানতে পারি– ফরাসি ভাষায় জয়েস ও ফকনারের মতো লেখকের জন্ম হতে পারে না। কারণ ফরাসি ভাষায় অস্পষ্ট করে একটা বাক্যও লেখার সুযোগই নেই। ফরাসির মতো এমন আরেকটি ভাষা পাওয়া দুষ্কর যে-ভাষার গদ্য তার প্রাঞ্জলতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোয় সাধারণ্যের স্বীকৃতি অর্জন করেছে অনেকদিন। অর্থাৎ ছবিটা যত অপরিষ্কার বাংলা গদ্যের পক্ষে ততটাই তা পরিষ্কার ফরাসি গদ্যে। আমাদের বোঝা হয়, ফরাসিতে বিষয়টা হয়তো সবমিলিয়ে জটিল হতে পারে। কিন্তু বাক্যগুলোর জটিল হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য, শক্তি, সংযম –ফরাসি গদ্যের গুণগুলোর সন্নিবেশ করলে এরকমই দাঁড়ায়। অন্যদিকে বাংলা গদ্য কোন আদর্শ ধরে নির্মিত হবে– এ-ও এক আজব ব্যাপার। ইংরেজি গদ্য ও ফরাসি গদ্যের কোনো একটাকে বেছে সেটি করা যায় কি না, বা কেউ কেউ করেছেন– এসব অবান্তর বলে মনে করেন লোকনাথ। লেখার পেছনে যে মন ও মনন তা ইউরোপীয় লেখকের আর বাঙালি লেখকের এক নয়। বাংলা গদ্যের গীতিময়তা, যুক্তির বদলে আবেগের প্রাধান্য তাকে শক্ত শিরদাঁড়া দিতে পারেনি– এটাও তাঁর মতে ভুল। কিন্তু এর বিপরীত উদাহরণও রয়েছে, বিদ্যাসাগর যেমন ছিলেন তাঁর কালে। বাংলাদেশের উপন্যাসের গদ্য সম্পর্কে এই কথাগুলো বিচার করা যেতে পারে। কেউ যে গদ্যকে নিরেট খটখটে করা, অগীতিময়তার চর্চা যে করেননি তাতো নয়।

যাই হোক বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের নজর দিতে হবে আরো অনেক লেখক এবং তাঁদের লেখা উপন্যাসের ওপরে। সত্তরের হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মঞ্জু সরকার, মঈনুল আহসান সাবের, আতা সরকার, সুশান্ত মজুমদার; আশির দশকের নাসরিন জাহান, ইমতিয়ার শামীম প্রমুখের লেখা উপন্যাসের গদ্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে।

যাঁদের নাম ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি তাঁদের কারো কারো লেখা পরবর্তী কালের তরুণ লেখকদের কাছে আর বিবেচ্য বিষয় হিসেবে দেখা দিচ্ছে না। ইংরেজি, রুশ, ফরাসি, জার্মান, আমেরিকান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশসহ বিশ্বসাহিত্যের অনেক উপন্যাস ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে হরদম তাঁদের হাতে ঘুরছে। উপন্যাস মানে যে কেবল একটা কাহিনী বর্ণনামাত্র নয়, এই বিষয়টি দিনে দিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। যেটি নিয়ে আমাদের আগের সমালোচকরা ততটা নির্মম হতে পারেননি।

আর দেখা যায় বাংলা উপন্যাসের পাঠক ও সমালোচক দুইয়েরই উপন্যাস নিয়ে একটু প্রাচীনপন্থী মনোভাব রয়েছে। তারা একটি সংকটময় কাহিনীনির্ভর আর কিছু

চরিত্রের ব্যথাবেদনায় ভরা সংলাপ ও গদ্যে লেখা বর্ণনাকে দুই মলাটের ভেতরে পেয়ে তাকে উপন্যাস হিসেবে মেনে নেন।

আর সমালোচকরা নিজেরা কতটা সততার সঙ্গে স্বীকার করেছেন বলা মুশকিল, কিন্তু তারা যা-ই ভাবুন না কেন, সাহিত্যবিচারে উপন্যাসের গদ্য আলোচনার সুযোগটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আড়ালে পড়ে গেছে।

দশ

যেকোনো দেশের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সে দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর গভীর সম্পর্ক আছে। ওই বিষয়গুলোতে শক্তিমত্তা অর্জনকারী জাতি তার লেখকদের কাছ থেকেই উন্নত মানের সাহিত্য পেয়েছে। তারপরেও সাহিত্যের উৎকর্ষের মান সবদেশে সবকালে এক রকম থাকে না। তাও উন্মেষ-বিকাশ ও ম্রিয়মাণের দশা পার করে। হয়তো আবার ম্রিয়মাণ দশা থেকে ফের উৎকর্ষ লাভ করে। তার মানে কি সাহিত্যে জন্মান্তরবাদ দেখা যায়? কিন্তু এখন পর্যন্ত তা খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি। সেদিক থেকে বাংলাদেশের উপন্যাসের বিরাট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আর তা বাংলা গদ্যে এখানকার লেখকদের শক্ত মেরুদণ্ড দিতে পারার মাধ্যমে ঘটতে পারে। এজন্য উপন্যাসের নান্দনিকতা ও প্রকৃত স্বরূপটা বুঝে নেওয়া জরুরি। আমরা তাহলে ভেতরে ভেতরে পুষে রাখা অনেক দীনতা থেকে মুক্তি পাব। বাইরে থেকে অনেক কিছু লেখকের মনে নানান রসায়ন তৈরি করতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না তা উপন্যাসের বিষয় হয়ে তার নিজের তাগিদ থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে না ততক্ষণ তা উপন্যাস হয়ে ওঠার অভিমুখে যাত্রা করবে না। ফলে ঐতিহাসিক মুহূর্ত, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রান্তিকাল নিয়ে প্রকল্প করে, গবেষণা করে উপন্যাস লেখার চেষ্টা প্রায় ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার অনেক লেখক মনে করেন তিনি যেহেতু একটি বিষয় লিখতে চান কিন্তু তার জন্য তার কোনো উপাত্ত-তথ্যের জোগান নেই, ফলে লিখলে তা উপন্যাস হবে না– এই প্রবণতায় অনেক লেখক তাঁদের মনে জেগে-ওঠা উপন্যাসের কুঁড়িকে উন্মেষেই বিনাশ করে দেন। 'ওহ্! উপন্যাস! না না কেবল তো একটা লিখলাম। পাঁচ ছয় বছর পার হোক তার পর আরেকটা বিষয় ধরে উপন্যাস লিখব।' অথচ উপন্যাস সেভাবেও লেখা হয় না। আবার একেবারেই যে হয় না, তা-ও না।

গদ্যচর্চা উপন্যাসনির্ভর নয়। কবিতা ছাড়া আর সবকিছুই গদ্যনির্ভর। গদ্য যুক্তি-বিশ্লেষণ নির্ভর। যিনি উপন্যাস লেখেন তার গদ্যচর্চা থেকে তাই সরে আসার উপায় নেই। তা পরিকল্পিত না হোক, পরিমিতও না হোক কিন্তু নিয়মিত দিনযাপন ও মানসিক-যুদ্ধের অংশ। কি মনে কি কাগজে কম্পিউটারে। এ থেকে গদ্যলেখকের রেহাই নেই। চর্চার এই অতি সাধারণ বিষয়গুলো অনেকের ভেতরে ঘটে না বলেই বাংলাদেশের উপন্যাসের গদ্যে কত-না সমস্যা বিরাজ করে। বানান সমতার অভাব। শৈলীতে সমন্বয়ের অভাব। ক্রিয়ার ব্যবহারে ভারসাম্যের অভাব। 'ওঠে' কোথায় হবে বা 'উঠে'– তা নিয়ে ব্যাপক গণ্ডগোল দেখা যায় রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত লেখকের গদ্যে।

আমরা ভুলে যাই: সৃষ্টিশীলতা একটা শৃঙ্খলা। তা ভেঙে নতুন শৃঙ্খলা তৈরি হয় মাত্র, কিন্তু বিশৃঙ্খলা দিয়ে সৃষ্টি কোথাও হয় না, কি কাপড়ের কারখানায় কি লেখকের লেখার টেবিলে। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছিলেন, 'এদেশে ফ্লবেয়ারের মতো লেখক তৈরি হয় না, কারণ প্রতিভার অভাব নয়, বরং পরিশ্রমের অভাব'। গদ্য নিয়ে যে খুব কম লেখক সেই পরিশ্রম করেন তা এদেশের প্রায় প্রতিটি উপন্যাস হাতে নিয়ে বলা যায়। নিজস্ব গদ্যশৈলী বা স্টাইল তৈরি করা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য বিষয়।

আমাদের আরো উপন্যাস চাই আর আরো আরো লেখক চাই– যাঁদের নান্দনিকবোধের নতুন দীপ্তিতে বাংলাদেশের উপন্যাস তার সমস্ত দৈন্য কাটিয়ে উঠবে। আর উপন্যাসের গদ্য তো ওই সামগ্রিক প্রচেষ্টার একটা বিশেষ দিক মাত্র। এরও মুক্তি মিলবে অনেক অভিযোগ থেকে।

বড় প্রবন্ধ

পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা

যতীন সরকার

উপক্রমণিকা

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নিশ্চয়ই ভূঁইফোড় নয়, আবহমান কালের বাংলা সাহিত্যের ভূমিতে তার মূল প্রোথিত। তাই পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাসের আলোচনা সে পটভূমিতে সংস্থিত হওয়াই সঙ্গত; অন্তত, বাংলা উপন্যাসের যে অংশে মুসলিম সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা প্রতিফলিত, তাকে স্মরণে রাখা তো বিশেষভাবে অপরিহার্য। কারণ, পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে এবং এ অঞ্চলের উপন্যাসের দর্পণে যে সমাজের রূপ প্রতিবিম্বিত, তা মুখ্যত মুসলিম-সমাজ।

এ কারণে উপক্রমণিকায় প্রাক-পাকিস্তান যুগের মুসলিম-বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা-অঙ্কন অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা ভাষায় উপন্যাসের যে অঙ্কুরোদগম, বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই তার পরিণত ফলভার-নম্র মহীরুহে। অথচ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোনো মুসলিম কথা-শিল্পীর অভ্যুদয় সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কারকে সখেদে মন্তব্য করতে হয়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য আলোক-স্নাত হিন্দু সাহিত্যিকেরা উন্নত রস ও রুচিসম্মত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন, বাঙালি মুসলমান তখনও বাস্তবকে স্বীকার করতে পারেননি, তখনও তাঁরা দোভাষী সাহিত্য সৃজনেই ব্যস্ত।'[১] বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি কেন, সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর মনে তার হেতু-অনুসন্ধান-স্পৃহার উদয় অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যে সাময়িক অবস্থা উপন্যাসের জন্ম-লগ্নকে সম্ভব করে তোলে, তার তাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন, সে স্পৃহার চরিতার্থতার জন্য।

উপন্যাস এমন একটি নতুন শিল্পরূপ, যা সামন্ততন্ত্রী-সমাজ বা রাজতন্ত্রী অভিজাতদের আনুকূল্যে কিংবা সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে সৃষ্ট হতে পারে না। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সে সমাজই উপন্যাসের সূতিকা-গৃহ ও লালন-গৃহ।[২] তেমন সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলা দেশে হয়েছিল বটে, তবে তার স্থপতি ছিল এ-দেশের জনগণ নয়, ব্রিটিশ বণিক। আপন স্বার্থের তাগিদেই তাদের হাতে এ দেশের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান; যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন রূপে তা প্রতিষ্ঠিত ও নতুন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। নতুন অর্থনীতির পত্তনে অনিবার্যভাবেই অভ্যুদয় হয় একটা নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর এবং বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণে যে শ্রেণী গড়ে ওঠে প্রধানত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। এই নতুন অর্থনীতির কল্যাণ-স্পর্শ লাগেনি মুসলমান সমাজে, আর লাগলেও তাতে বিলম্ব ঘটে গিয়েছিল অনেক। তাই, নতুন আদর্শে গড়া নতুন সাহিত্যিক প্রকরণ অবলম্বনের ব্যাপারেও বাংলার মুসলমান সমাজে এই অনিবার্য পশ্চাদ্বর্তিতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' ও কাজী ইমদাদুল হকের 'আব্দুল্লাহ্'[৩] নিয়ে অতি ধীরে ও বিলম্বিত পদক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মুসলিম বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিকের প্রবেশ। (অবশ্য মীর মোশাররফ হোসেনকে মুসলিম বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা-দানের প্রচেষ্টা কোনো কোনো সমালোচক করে থাকেন বটে, তবে সে প্রচেষ্টা যথেষ্ট সত্যনিষ্ঠ নয়। কারণ, বিষাদসিন্ধু, গাজী মিয়াঁর বোস্তানী বা উদাসীন পথিকের মনের কথা–এর কোনোটাই অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গে উপন্যাসের প্রকরণকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারেনি।) 'আনোয়ারা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় লেখক উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য দু'পংক্তি কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন :

সতীর সর্বস্ব পতি, সতী শুধু পতিময়,
বিধাতার প্রেম-রাজ্যে সতত সতীর জয়।

স্পষ্টতই এ জাতীয় চিন্তা সামন্ততন্ত্রের ধারাবাহী এবং ধনতন্ত্রের যুগে যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। সমাজ-পটভূমিতে ব্যক্তির আত্মচেতনা ও আত্মবিকাশের আলেখ্য নির্মাণই নবযুগের উপন্যাসের লক্ষ্য, পক্ষান্তরে 'আনোয়ারা' রচয়িতার মানসিকতা সতীত্বের মহিমা-কীর্তনমূলক প্রাচীন আখ্যায়িকাকারের সমধর্মী। মনোরম আখ্যায়িকার মাধ্যমে বুনিয়াদী আদর্শের প্রচারই এর প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় আকস্মিকতা ও অবাস্তবতা সমস্ত উপন্যাসটি জুড়েই প্রকটভাবে বিদ্যমান। তবু, একটি সার্থক উপন্যাসের অনেকগুলো লক্ষণ এ-বইটিতে স্বাঙ্গীকৃত হয়েছে বলেই, সমালোচককে মন্তব্য করতে হয়,–'এটি একটি জীবন্ত উপন্যাস, প্রচুর ত্রুটি সত্ত্বেও। যে-কোনো কারণে হোক– এবং সর্বত্র অসঙ্গত কারণে নয়–এতদিন ধরে পঠিত হতে পারে এমন একটি উপন্যাস লেখা কৃতিত্বেরই কথা এবং আরও একটি বড় কথা– নজিবর রহমানের আগেও বাঙালি মুসলিম সমাজকে নিয়ে দু'চারখানি উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, অন্তত আংশিকভাবে, এরূপ উপন্যাস লেখার প্রথম কৃতিত্ব ও প্রথম গৌরব নজিবর রহমানেরই।'[৪] নজিবর রহমান তার 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম', বা 'হাসন-গঙ্গা-বাহমনী'তে যদিও 'আনোয়ারা'র গৌরবকে বজায় রাখতে পারেননি, তবু মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধা সহকারেই উচ্চারিত হবে। পরবর্তী কালে তাঁর 'আনোয়ারা'র অনুকরণে মোহাম্মদ কোরবান আলী লেখেন 'মনোয়ারা', ও 'প্রেমের সমাধি'র অনুকরণে শেখ ইদরিস আলী লেখেন 'প্রেমের পথে'। নজিবর রহমান-এর পর সত্যিকারের সার্থক উপন্যাস রচিত হয় কাজী ইমদাদুল হকের হাতে। সমাজ-বীক্ষণের বিচারে তাঁর 'আবদুল্লাহ্'র তুলনা চলে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর সঙ্গে। এ উপন্যাসে মুসলিম সমাজের অন্ধ পীরভক্তি, গুরুপূজা, ধর্মের নামে সংস্কারপ্রিয়তা, পর্দাপ্রথা, আশরাফ-আতরাফ সমস্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে পরিশীলিত মননশীল দৃষ্টিতে। নবযুগের যথার্থ ঔপন্যাসিকের মননশীল ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক; নজিবর রহমানের সে দৃষ্টির অভাব ছিল।

মুসলিম বাংলার উপন্যাসে কাজী ইমদাদুল হক যে ধারার প্রবর্তক, সে ধারারই পরিপুষ্টি কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে', হুমায়ুন কবীরের 'নদী ও নারী', আকবর উদ্দীনের 'মাটির মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাসে। গ্রাম্য মুসলিম-সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য ও আনন্দ-বেদনা চিত্রণে ও বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপনে এ সব উপন্যাসে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় বিধৃত। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালেই বাংলা দেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ সচেতনভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠেন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার তাগিদে। নবজাগ্রত আত্মসচেতনতাই তাঁদেরকে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করে পুরোগামী হিন্দু লেখকদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে উদ্বুদ্ধ করে। (নজিবর রহমানের 'চাঁদ তারা বা হাসন গঙ্গা বাহমনী', ইসমাইল হোসেন সিরাজীর

'রায়নন্দিনী', 'ফিরোজা বেগম', 'তারাবাই' প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।) প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে যে আশাবাদ ও সৃজন-চাঞ্চল্য নিয়ে বাস্তববাদী উপন্যাসের ধারার সৃষ্টি, সে ধারায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর চিহ্নিত কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। তাঁর 'কুহেলিকা' সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে লিখিত রাজনৈতিক ধরনের উপন্যাস। বাংলা ভাষায় রোমান্টিক আবেগ-সমৃদ্ধ সর্বপ্রথম পত্র-উপন্যাস রচনার কৃতিত্বও প্রদর্শিত হয় নজরুলের 'বাঁধনহারা'য়।

কল্লোল-যুগের কথাশিল্পীদের হাতে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন নাগরিক-চেতনার উদ্বোধন, মুসলিম সাহিত্যিক-মানসেও তার বীচিবিক্ষেপ অনুভূত হওয়ার প্রমাণ আবুল ফজলের 'চৌচির' (১৯৩৪) ও 'সাহসিকা' (১৯৪৬) উপন্যাস। 'বুদ্ধির মুক্তি'-আন্দোলনের প্রভাবে উদার জীবন-চিন্তা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ও পরিশীলিত মননের অধিকারী আবুল ফজল মুসলিম-বাংলার কথাসাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচক। সে দিগন্তের ক্রমপ্রসারণশীলতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন কথাশিল্পীর সাধনায়।

এমনিভাবে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পঞ্চম দশকে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার প্রাক্-কাল পর্যন্ত মুসলিম বাংলার উপন্যাসের যে-অভিযাত্রা, তা জীবনের সর্বত্রগামী না হলেও যে বিচিত্রগামী হতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক, রোমান্টিক, ঐতিহাসিক– উপন্যাসের এ-রূপ বিভিন্ন ধারাতেই প্রাক্-পাকিস্তান যুগে মুসলিম শিল্পীদের প্রতিভার স্পর্শ লেগেছিল এবং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠায় এ-সবের ক্ষীণধারায় জোয়ারের সৃষ্টি হয়ে বর্তমানে বিচিত্র গতিতে তা প্রবহমান। সে প্রবাহের স্বরূপ-নির্ণয়ই হবে আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

এক.

পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাসের কুড়ি বছরঃ কালানুক্রমিক বিভাগ

স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় বিশ বছরের উপন্যাসের ধারা পর্যালোচনায় একে কালানুক্রমিকভাবে দুভাগে বিভক্ত করা চলে। **এক.** উনিশ শ' সাতচল্লিশ থেকে সাতান্ন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম দশকের উপন্যাস; **দুই.** উনিশ শ' আটান্ন সন থেকে এ পর্যন্ত (১৯৬৭ সনের প্রথম দিক) প্রকাশিত দ্বিতীয় দশকের উপন্যাস। এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাসকরণ যে নিতান্তই একটা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত, তা নয়। পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের বিচারেও এ বিভাগ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

অবিভক্ত বাংলার কলিকাতা-কেন্দ্রিকতা পরিত্যাগ করে ঢাকায় সাহিত্যের নতুন কেন্দ্রে আত্মস্থ হতেই প্রথম দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। একটি জেলা শহর থেকে রাতারাতি রাজধানী শহরে উত্তরণ ঘটলেও, আকস্মিকভাবেই একটি আধুনিক নগরের চরিত্র লাভ করা ঢাকার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি; আর নগর-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ সমাজের পত্তনও সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়নি। একটি মোটামুটি আধুনিক চরিত্র লাভের

জন্য ঢাকাকে অন্তত দশ বছর সময় নিতে হয়েছিল। এই দশ বছরে সমাজ ও রাজনৈতিক-জীবনে অনেক ঝঞ্ঝা-সংকুল মুহূর্ত অতিক্রম করে, অনেক অনিশ্চয়তা ও আশা-নৈরাশ্যের দোলায় দুলে, দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে (১৯৫৮ সনের অক্টোবরে) এ দেশকে পার্লামেন্টারি শাসন-ব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সন্ধান করতে হল। সমাজে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতা, সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক মূল্যবোধে বিপর্যয় প্রভৃতি লক্ষণ দ্বিতীয় দশকের দিকেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে এ সব লক্ষণের প্রতিফলনের ফলে জটিলতা ও বিচিত্রতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভাববস্তু ও আঙ্গিক– এই উভয় দিক দিয়েই পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকের পূর্ব বাংলার উপন্যাস বহুমুখী ও বিচিত্রগামী।

অথচ, সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে তাল রেখেই যেন প্রথম দশকের উপন্যাসের বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। সে সময়ের উপন্যাস প্রাক-পাকিস্তান যুগের ধারা বেয়ে গ্রাম-কেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক নদীলালিত সমাজের আলেখ্য নির্মাণেই নিয়োজিত। সে সমাজে সমস্যা আছে, জটিলতা নেই; রোমাঞ্চ আছে, বৈচিত্র্য নেই; ব্যাপ্তি আছে, গভীরতা নেই। তবু, এ সমাজ যে সার্থক উপন্যাসের উপাদান হতে পারে না, তা নয়। অবিভক্ত বাংলার উপন্যাস-শিল্পের স্মরণীয় কীর্তির প্রায় সবটাই তো গ্রাম-জীবন-ভিত্তিক। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার্য: এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাম-জীবন নিয়ে ভালো উপন্যাসের সৃষ্টি হলেও, তার কোনোটাতেই কালোত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জীবন-বীক্ষাশীল প্রতিভার উদ্ভব হয়নি বলেও পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম-জীবন নিয়ে কোনো অবিস্মরণীয় সৃষ্টি আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। তাই, এ দশকের শেষে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে বসে সমালোচকের কণ্ঠে নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি ঘটে, –'গত আট-নয় বছরে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তার মহৎ সুপ্রকাশ শিল্পক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি। এ ক'বছরের শিল্পচর্চার ফলশ্রুতিতে আমরা যা পেয়েছি তার প্রধান অংশই ছোটগল্পের অন্তর্গত। কবিতার ক্ষেত্রে কিছু সুফসল জন্মালেও উপন্যাস, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিচুস্তরেই রয়ে গেছে। যে বিপুল জীবন-সন্ধানী অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য-নিয়ামক প্রজ্ঞা উপন্যাস-সৃষ্টির সহায়ক, বোধ হয় তার অভাবই এর কারণ। অবশ্য কিছু কিছু প্রচেষ্টা যে হয়নি এমন কথাও বলছি না। তবু স্বীকার করতে হয় তাদের অধিকাংশই অপূর্ণাঙ্গ। জীবন-রঙের বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্বে অসার্থক।'[৫]

এই 'জীবন রঙের বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে তোলার' প্রচেষ্টাতেই পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসের বিশিষ্টতা। এ দশকের উপন্যাসের সুষ্ঠু পর্যালোচনার পর সম্ভবত একে 'নিচুস্তরের' বলে অভিহিত করা সম্ভব হবে না। সংখ্যাগত ও গুণগত–এই উভয় মানদণ্ডের বিচারেই প্রথম দশক থেকে দ্বিতীয় দশকের পূর্ব পাকিস্তানী উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট।

তাই আমাদের পর্যালোচনায় এই দশক-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। বিষয়বস্তুর বিচারে অবশ্য এই উভয় দশকের উপন্যাসের বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস অপরিহার্য। বিশেষ করে দ্বিতীয় দশকে তো বটেই।

দুই.

পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাস: ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭

পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকে যাঁদেরকে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপন্যাস-সাধনায় ব্রতী রূপে দেখি, তাঁদের নামের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ-যোগ্য এ তালিকায় আছেন: আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, আবু ইসহাক, আবু রুশদ্, আকবর হোসেন, ইসহাক চাখারী, কাজী আফসার উদ্দীন, দৌলতুন্নেসা, সরদার জয়েন উদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম।

অনুসন্ধানের সাহায্যে আরও দু'চারটি নাম হয়তো এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলে, তবে তাতেও এর গুণগত উৎকর্ষের হেরফেরের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। যাঁরা এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, গুণের কথা বাদ দিয়ে সংখ্যার বিচারেও তাঁরা বিপুলতার অধিকারী নন, অন্তত প্রথম দশকে তো ছিলেনই না। অনেকেরই মাত্র একটি বা দুটি উপন্যাসকে ঘিরেই আলোচনা সীমায়িত করতে হয়। তবে দৃষ্টিকোণ বা উৎকর্ষের বিচারে না হলেও বিষয়-পরিবেশনার বিচারে এঁরা সকলে এক পংক্তিভুক্ত। প্রথম দশকে তাঁরা সবাই গ্রাম-জীবনের রূপকার। অবশ্য ব্যতিক্রমের মধ্যে আবু রুশ্‌দের কথা উল্লেখ্য; প্রথম দশক থেকেই তিনি নাগরিক-মানসের অধিকারী। আবুল মনসুর আহমদের 'সত্যমিথ্যা' এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিনের 'খরতরঙ্গ'ও গ্রাম-বাংলার মাটির ফসল নয়; প্রথমটি যোয়ান বোয়ারের ও দ্বিতীয়টি ইভান তুর্গেনিভের গল্পের রূপান্তর।

কালগত ও সাহিত্যিক উৎকর্ষগত বিচারে এ দশকের উপন্যাসের আলোচনা শুরু করতে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লাল সালু' (প্রথম প্রকাশ– ১৯৪৮, পঞ্চম সংস্করণ– ১৯৬৬) থেকে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভণ্ড ও ধূর্ত ধর্মব্যবসায়ী মজিদ, যে গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করে নিজের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছে। সে একটি অজ্ঞাতনামা লোকের কবরকে এক কামেল দরবেশের মাজার রূপে পরিচিত করেছে ও একে একটি লাল সালু দিয়ে আবৃত করে গ্রাম্য জনগণের ভীতি ও শ্রদ্ধা আদায়ের কাজে লাগিয়েছে। এমন চরিত্র আমাদের গ্রামে-সমাজে অপরিচিত নয়, কথাসাহিত্যে এমন চরিত্রের টাইপ হিসেবে উপস্থিতিও বিরল নয়। কিন্তু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মজিদ টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি; একটি বস্তু-ঘনিষ্ঠ কাহিনীর ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব নির্লিপ্ততা সহকারে চিত্রিত এই চরিত্রটি বেশ জীবন্ত ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মজিদ ভণ্ড; প্রতারণার জন্য ধর্মকে কাজে লাগাবার নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনে সে সদা তৎপর ; তবু মাঝে মাঝে সে নিজের কল্পিত ফাঁদে নিজেই আটকা পড়ে যায়,– অবশ্য মানসিকভাবেই মাত্র এবং পরক্ষণেই দুনিয়াদারীর কাজে

ভণ্ডামি করতে বাধ্য হয়েছে বলে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের সাফাই গায় ও সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম আওয়ালপুরে যখন আর-এক পীরের আবির্ভাব হয়ে মজিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে খাটো করে তুলবার উপক্রম করে, তখনও সে পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনার কৌশল-প্রয়োগে ব্যর্থ হয় না। গ্রামীণ গণমনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞানই তার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক। আর তাছাড়া, কৃষিভিত্তিক গ্রাম-জীবনে সম্পন্ন জোতদারদের সঙ্গে ধর্মের ব্যাপারিদের স্বার্থের সম্মিলন ঘটে শোষণের একটা সাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় বলেই খালেক ব্যাপারির মতো লোকের সহায়তা তার আয়াসেই লভ্য হয়েছে। 'জীবন-স্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারি কী করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।" (লাল সালু, পৃ. ৫৫) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌রই বিশ্লেষণী-দৃষ্টিতে এই সামাজিক সত্য প্রতিফলিত হয়েছে বলেই 'লাল সালু' ভণ্ড মোল্লাদের নিয়ে রচিত একটি অতিরঞ্জনমূলক কাহিনী হয়ে ওঠেনি। মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিয়ে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্' রচিত হয়েছিল। কিন্তু, 'আবদুল্লাহ্' ছিল মুখ্যত একটি সমাজ-চিত্র, আর 'লাল সালু' সাধারণ সমাজ-চিত্রের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, মানব-মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও চরিত্র-চিত্রণে সমৃদ্ধ একটি উপন্যাস। অবশ্য, উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রকে লেখক স্পষ্ট করে তোলার প্রেরণা অনুভব করেননি বলে, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যুগের সংঘাত দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আর তাতেই 'লাল সালু' একটি 'ভালো' উপন্যাস হলেও এর পক্ষে 'মহৎ'-সৃষ্টির মর্যাদা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়নি। স্বল্পশিক্ষিত আক্কাস যখন গ্রামে স্কুল বসাতে সচেষ্ট হল, কিংবা মজিদের সব কেরামতি যখন তার দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার ভীতি বা শ্রদ্ধা-আকর্ষণে ব্যর্থ হল, তখনই উপন্যাসটির ঘটনাবিন্যাসে সম্ভাবনার নতুন বীজ উপ্ত হয়েছিল। কিন্তু লেখক সে সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করার তাগিদ অনুভব করেননি, পাঠকের প্রত্যাশা চকিত দীপ্তিতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

গ্রাম-জীবন-বীক্ষায় 'লাল সালু'র সগোত্রের সংখ্যা কম নয়। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' (কলিকাতা–১৯৫৫, পাকিস্তানি সংস্করণ–১৯৬২), শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (রচনাকাল–১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ বা ১৯৫৪) সরদার জয়েন উদ্দীনের 'আদিগন্ত' (১৯৫৬), আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' (১৯৫২ সনে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত), কাজী আফসার উদ্দীনের 'চর ভাঙ্গা চর' (১৯৫১), দৌলতুন্নেসার 'পথের পরশ' ১৩৬৪; ১৯৫৭) ও শওকত ওসমানের 'জননী,[৬] – এ কয়টি উপন্যাস শুধু বিষয়-গৌরবে নয়, শিল্প-সার্থকতায়ও পাঠকের রসানুভূতির পরিতৃপ্তি-বিধানে সক্ষম।

যদিও প্রথম প্রকাশ কলকাতায়, তবু পাক-বাংলার সার্থক উপন্যাসের তালিকায় 'সূর্যদীঘল বাড়ি'র নামটি প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইটি সাহিত্য-

রসিকদের দ্বারা বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত ও অভিনন্দিত। অভিনন্দনের পাশাপাশি এর মূল্যায়ন-প্রচেষ্টাও অবশ্য সক্রিয় এবং তাতে ত্রুটিগুলোও উদ্‌ঘাটিত। জনৈক সমালোচকের মতে– 'এ উপন্যাসে সৃষ্টির আয়োজন যতখানি, আচরণ সে তুলনায় অনেক নিস্প্রভ। ঘটনাগতি বহিরঙ্গে যে পরিমাণ গতিশীল, চরিত্রানুগ অন্তর-ক্রিয়ায় ততখানি গভীর ও নিবিড় নয় বলেই উপন্যাসীয় গুণ অনেকাংশে ব্যাহত ও ব্যর্থ হয়েছে।'[৭] এর চাইতে কড়া মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন আর একজন– 'সূর্যদীঘল বাড়ি' যে উপন্যাসই নয়, এ সত্য যে কোনো সতর্ক পাঠক অনুভব করবেন। বলা যেতে পারে– এ একটি স্কেচধর্মী রচনা এবং গ্রাম-চিত্রাঙ্কণে লেখকের দক্ষতা মন্দ নয়। কিন্তু চিত্রাধিক্যে রচনা গতিহীন।'[৮] এই সমালোচক যদিও মূল উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে এর কাহিনী-বিন্যাসের অসংগতি, ঘটনার অবিশ্বাস্যতা ও অবাস্তবতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন, তবু গ্রামীণ জনগণের সমস্যা ও তাদের সংগ্রামী চেতনার রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বকে অস্বীকার করলে এর মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা অবশ্যই ব্যাহত হবে। গ্রাম-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার শত পাকে নিমজ্জিত নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যেও যে সংগ্রামী চেতনা বিদ্যমান 'সূর্যদীঘল বাড়ি'র নায়িকা জয়গুনে তার অসংশয়িত প্রমাণ উপস্থিত। এ উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের কোনোটাই বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করেছে বলা চলে না। একটা এপিক-ধর্মী ব্যাপ্তি যদিও এ উপন্যাসে নেই, তবু একে 'উপন্যাসই' নয় বলা কোনো মতেই সংগত নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাংলা ভাষার অধিকাংশ উপন্যাসই তো আসলে 'বড় গল্প' মাত্র। তবু, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলোকে যখন উপন্যাসের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয় না, তখন 'সূর্যদীঘল বাড়ি'কে 'স্কেচধর্মী-রচনা' বলা বিচারশীলতার পরিচয়বহ নয়।

গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সু-কঠোর সংগ্রাম ও বলিষ্ঠ জীবন-বোধের পরিচয়-বহ আর একটি উপন্যাস–সরদার জয়েন উদ্দীনের 'আদিগন্ত'। জনগণের সংগ্রামী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা 'সূর্যদীঘল বাড়ি'র মতো এ উপন্যাসটিতেও বিধৃত। তবে বহিরঙ্গে 'আদিগন্ত' অনেক দুর্বল রচনা, এর ভাষা-বিন্যাসেও যথেষ্ট শৈথিল্য বিদ্যমান। বিশেষ করে এর উপসংহারের অতিনাটকীয়তায় উপন্যাসটির শিল্প-সুষমা ব্যাহত ও খণ্ডিত। এর তুলনায় 'সূর্যদীঘল বাড়ি' অনেক বেশি শিল্প-সার্থক রচনা।

এক আধারে পরিবেশিত দুটি সমান্তরাল কাহিনী 'কাশবনের কন্যা'। দক্ষিণ বঙ্গের গ্রাম-জীবনের আনন্দ-বেদনার ভাষারূপ শামসুদ্দীন আবুল কালামের এ উপন্যাসটি। আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণে লেখকের দক্ষতা তারাশঙ্করের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে রাঢ়ের রুক্ষরিক্ত পরিবেশের বর্ণনায় তারাশঙ্করের ভাষা ও ভঙ্গিতে যে দার্ঢ্য প্রকাশিত, সুজলা সুফলা কাশবনের দেশের মানুষ ও প্রকৃতি চিত্রায়ণে তা হত অস্বাভাবিক। তাই শামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনায় একটা গীতিসুরের অনুরণন বিষয় ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধু ভাষায় লিখিত উপন্যাসে আঞ্চলিক সংলাপের ব্যবহারে ও প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লোক-সঙ্গীতের উদ্ধৃতিতে দক্ষিণ বাংলার গ্রাম-জীবনের

করুণ মধুর রূপটি নিপুণভাবে উদ্ভাসিত। সে উদ্ভাসন অবশ্য সর্বত্র স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে রোমান্টিকতা এ উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য করেছে যতখানি, উপন্যাসের নির্লিপ্তি ও বস্তুনিষ্ঠাকে ব্যাহতও করেছে ততখানি। যদিও এর কুশীলবের অন্তরলোকে প্রবেশের প্রচেষ্টায় লেখক আন্তরিক ছিলেন, তবু সুসংগত পরিণতিতে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হননি; এমনকি, শেষ পরিচ্ছেদেও এর কাহিনী দু'টির বিশ্লিষ্টতা ঘুচে সুসমঞ্জস ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে পারেনি। এ-সব ত্রুটি-নির্দেশ কিন্তু উপন্যাসটির শিল্প সার্থকতার খর্বতা-প্রমাণের উদ্দেশ্য-জাত নয়। গ্রাম বাংলার মাটির মানুষের প্রতি যে গভীর মমতা শামসুদ্দীন আবুল কালামের লেখনী-চালনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল, তা তার এই প্রথম উপন্যাসেই শিল্পসঙ্গতভাবে মূর্ত ও স্ফূর্ত। তবে দুঃখের সঙ্গেই উল্লেখ্য তাঁর প্রথম উপন্যাসে সম্ভাবনার যে বিদ্যুৎ স্ফুরণ আভাসিত, পরবর্তী সৃষ্টিগুলোতে তা নিতান্তই ম্লানদ্যুতি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ লেখকের যে চেতনার পরিচয় উপস্থাপিত, তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় 'শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা' বলে আখ্যায়িত করা চলে। কিন্তু, সে চেতনার একটি চকিত দ্যুতি মাত্রই এ উপন্যাসটিতে আভাসিত, সুস্পষ্ট বা সামগ্রিক প্রকাশ এতে অনুপস্থিত। লেখকের ইতিহাস-চেতনা অতি সহজেই রোমান্টিকতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত ও মূল উদ্দেশ্যের কেন্দ্রচ্যুত। অথচ তাঁর অবলম্বিত বিষয় কাহিনীতে এমন একটি সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, যাতে শ্রেণী-সংঘাতের রসোত্তীর্ণ রূপটি অতি সহজেই স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠতে পারত। এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা যদিও কাজী আফসার উদ্দীনের 'চর ভাঙ্গা চর'-এ দীপ্যমান ছিল না, তবু সংগ্রামশীল গ্রাম্য মানুষের প্রতি নিবিড় সহানুভূতির পরিচয় এতে পরিস্ফুট। মানুষের চেয়ে প্রকৃতিই যেন 'চর ভাঙ্গা চর'– এ মুখ্য স্থানের অধিকারী এবং প্রকৃতিকে একটি প্রতীকী তাৎপর্য দানে লেখকের প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার স্বাক্ষর অঙ্কিত।

বৃহৎ কলেবরের 'পথের পরশ' (দৌলতুন্নেসা) উপন্যাসটিতেও গ্রাম্য জীবন-চিত্র প্রকাশিত। গ্রাম-সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এ উপন্যাসের লেখিকাকে পীড়িত করলেও, শ্রেণীসংঘাতের ঐতিহাসিক চেতনা দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ নন। বরং শ্রেণী সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে সমাজ-বিন্যাসের অসামঞ্জস্য দূরীকরণেই তিনি অভিলাষী। তাঁর মতবাদ কতটুকু সমাজবিজ্ঞান-সম্মত তা বিতর্ক-সাপেক্ষ হলেও, একটি বিশেষ মতবাদকে যে তিনি উপন্যাসে উজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন পরম আন্তরিকতার সঙ্গে এবং শিল্পসুষমা খণ্ডিত না করে, তাতেই লেখিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকার অর্জন করেছেন। উপন্যাসের নায়িকা নীনার মধ্য দিয়ে যে প্রেম-ভাবনার প্রকাশ, তাতেও লেখিকার সাহসিকতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত।

যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজ-চেতনা ও শিল্প-চেতনার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস শওকত ওসমানের 'জননী'। উপন্যাসের 'জননী' নামের মধ্যেই আভাসিত যে, মাতৃস্নেহের চিরায়ত সত্য প্রকাশই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্য সাধিত হয়েছে সস্তা সেন্টিমেন্ট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নয়, প্রতিকূল সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামের পশ্চাৎপটে।

বৈষম্য-পীড়িত সমাজ-কাঠামোতে ইয়াকুবের মতো বিত্তশালীরা মাতৃস্নেহের মতো পবিত্র হৃদয়বৃত্তিকেও নিজেদের লালসা চরিতার্থের কাজে ব্যবহার করে এবং মাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত সংগ্রামী জননী দরিয়াকে বেছে নিতে হয় আত্মহত্যার পথ–এই কাহিনীকেই রূপ দিতে গিয়ে লেখক গ্রাম-সমাজের অভ্যন্তরের জটগুলোকে একে একে অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন। রোহিণী চৌধুরী ও হাশেম খানের মতো গ্রাম্য জমিদাররা নিজেদের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়, আর তাতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে সরলচিত্ত গ্রাম্য জনতার অন্তর। চন্দ্রের মতো আত্ম-ভোলা মানুষটিও নিজের অজান্তেই সে বিষে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, তার সরলতা ও স্নেহশীলতায় ফাটল ধরে যায়। হানাফি-লা-মাজহাবী দ্বন্দ্বও সাম্প্রদায়িকতার আর-এক রূপ, বিত্তবানদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজেই তা উদ্ভাবিত ও সাধারণ মানুষের বহু পুরুষানুক্রমিক সম্প্রীতিকে ছিন্ন ছিন্ন করে দিতে উদ্যত। লেখক এই সব কৃত্রিম দ্বন্দ্বকে জয়ী হতে দেননি; নির্বিত্ত মানুষগুলোর মধ্যে তিনি শ্রেণী-সচেতনতার উদ্ভব ঘটিয়েছেন ও হৃদয়হীন বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হয়ে ওঠার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তাঁর বিশিষ্ট জীবন-দৃষ্টির পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আনন্দের কথা এই যে, লেখকের এই উদ্দেশ্য-মূলকতা কাহিনীর গতিধারাকে কোথাও ব্যাহত বা শিল্পদৃষ্টিকে বিপর্যস্ত করেনি। দুই-একটি ক্ষেত্রে অতিকথনও এর সামগ্রিক সাহিত্য-মূল্যকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি।

গ্রাম্য জীবন-চিত্রণ প্রসঙ্গে আকবর হোসেনের উপন্যাসগুলো উল্লেখ্য– শিল্প-সার্থকতার জন্য নয়, জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে। তাঁর 'অবাঞ্ছিত' ১৯৫০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয় যা ১৯৬৭ সনের মধ্যেই সাতবার মুদ্রিত, ১৯৫১-এর 'কি পাইনি'ও ১৯৬৭-তে এসে সপ্তম মুদ্রণের গৌরব-ধন্য। নিছক জনপ্রিয়তা কখনও সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, তা ঠিক। কিন্তু, কোনো গ্রন্থের জনপ্রিয়তার হেতু-অনুসন্ধান সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্বের অন্তর্গত। সে দায়িত্ব পালনের খাতিরেই 'অবাঞ্ছিত' ও 'কি পাইনি' প্রসঙ্গের অবতারণা।

আকবর হোসেনের প্রথম উপন্যাস 'অবাঞ্ছিত'র কাহিনী-ধারার অনুসরণ করা যাক্। 'এতে আছে– কেমন করে জমিদারপুত্র ফিরোজ আর গোমস্তার নাতনী রোকেয়ার মধ্যে প্রণয় জন্মে, উভয়েই উভয়কে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, এমনকি দৈহিক সম্পর্কও বাদ যায় না। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য অতিক্রম করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত বিবাহ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওদিকে বিষবৃক্ষের ফল-স্বরূপ এক অবাঞ্ছিত শিশুর আগমন-সম্ভাবনা দেখা দেয়াতে বৃদ্ধ গোমস্তা ওসমান নাতনীকে নিয়ে দেশত্যাগ করেন। সেখানে রোকেয়ার এক পুত্র জন্মে, মহব্বত। রোকেয়া সারাজীবন নিজেকে ফিরোজের বিবাহিতা স্ত্রীরূপে গণ্য করে অন্য কারো চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয়নি। কিছুকাল পরে ওসমানের মৃত্যু হয়, বৃদ্ধ জমিদার অর্থাৎ ফিরোজের পিতা মহব্বতকে লালন-পালন করে সমস্ত সম্পত্তি তারই নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। এর কারণ বৃদ্ধ জমিদার শেষে সমুদয় অবস্থা জানতে পেরেছিলেন এবং এইভাবে পুত্রের অপরাধের শাস্তি দিয়ে তিনি মহব্বতের প্রতি কতকটা সুবিচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

অভিমানী রোকেয়া আত্মসম্মান নষ্ট করে কোনোদিন ফিরোজের ঘরে ফিরে গিয়ে দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি।'[৯]

এই কাহিনী-সংক্ষেপের সতর্ক অবধানতায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অবাঞ্ছিত' একটি 'ঘটনা-সারালো, ঘটনা-ধারালো ও ঘটনা-ভারালো' উপন্যাস। আর এতেই এর জনপ্রিয়তার হেতু নিহিত। যে কারণে 'আনোয়ারা' 'মনোয়ারা' আজও হাজার হাজার অর্ধশিক্ষিত পাঠকের মনোরঞ্জনে সক্ষম, সেই একই কারণ ক্রিয়াশীল আকবর হোসেনের উপন্যাসেও। অথচ যে ঐতিহাসিক মূল্য 'আনোয়ারা'য় বর্তমান, বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে প্রকাশিত সেই উপন্যাস তা দাবি করতে পারে না। কিন্তু আজও বিপুল সংখ্যক পাঠকের অভিনন্দন লাভে সক্ষম এ জাতীয় উপন্যাসই। আমাদের সাধারণ পাঠকের সামাজিক অবস্থানটিকে অনুধাবন করলেই এর তাৎপর্যের উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে। আমাদের সমাজে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস সম্পন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু উন্নততর কোনো সামাজিক ভিত্তি আজও গড়ে ওঠেনি। তেমনি সত্যিকার আধুনিক শিক্ষার প্রসারে উন্নততর রুচি ও মূল্যবোধেরও পত্তন হয়নি। তাই আমাদের পাঠক-রুচি আজও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার ধারাবাহী এবং এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে নাগরিক ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের দিকটি। এ জাতীয় সামাজিক পটভূমিতে যে সংস্কৃতি-চেতনা গড়ে ওঠে তা খুব সূক্ষ্ম ও সমুন্নত হওয়ার কথা নয়। তাই অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনার সমাবেশে সস্তা রোমান্টিকতা ও যৌন-আবেদনমূলক রূপকথা-ধর্মী চলচ্চিত্র যেমন প্রেক্ষাগৃহের 'বক্স অফিস হিট' করে, তেমনি বাজারে 'হটকেক'র মর্যাদা লাভ করে 'অবাঞ্ছিত' বা 'কি পাইনি'র মতো উপন্যাস। 'কি পাইনি'তে যদিও গ্রাম-জীবনের সঙ্গে নগরজীবনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরে লেখক আত্মপ্রসাদ লাভ করে বলেছেন,– 'নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষদের সারল্যের এবং অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর অর্থপিশাচ স্বার্থান্বেষীরা এতকাল যে ধোঁকাবাজির রাজত্ব চালিয়েছে– তাদের প্রকৃত স্বরূপ এ-গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছি। সে সঙ্গে শহর-জীবনের আওতায়– বিদেশি উলঙ্গ সভ্যতার অনুকরণে আমাদের শিক্ষিত সমাজ ভ্রান্ত প্রগতির নামে কতদূর অধঃপাতে নেমে গেছে তারও একটা আংশিক চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি।'[১০] – তবু 'কি পাইনি'তেও লেখকের শিল্পজ্ঞানের দৈন্যই প্রকট রূপে প্রকাশিত। অনেক বড় বড় আদর্শের ফাঁকা বুলি ও পল্লী-অঞ্চলের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এ বইয়ের সাহিত্য-মূল্য নিতান্তই সামান্য। তাঁর 'মোহমুক্তি' (১৯৫৭) বা 'ঢেউ জাগে' (১৯৬১) সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

এতৎসত্ত্বেও আকবর হোসেনের উপন্যাস নিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা এ কারণে যে, তাঁর মতো লেখকদের জনপ্রিয়তা প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। কথাটা বিশেষ করে মনে এল ইসহাক চাখারীর 'মেঘবরণ কেশ' (১৩৬৩ বা ১৯৫৬) প্রসঙ্গে। গ্রাম ও নগর– এই উভয় সমাজে প্রসারিত পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসটিতে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মতোই লেখকের শক্তির পরিচয় আভাসিত। কিন্তু মনে হয়, তথাকথিত গণ-মনোরঞ্জনের

খাতিরেই যেন সমুন্নত সমাজ-চেতনাসমৃদ্ধ শিল্প-সার্থক সৃষ্টিকর্মে তাঁর অনীহা। শিল্পীজনোচিত নিষ্ঠার অভাবে একটি জীবনমুখী উপন্যাসের সম্ভাবনার অপমৃত্যু মনকে পীড়া দেয়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্প্রসারিত বিস্তৃত পটভূমি-ভিত্তিক জীবন-চিত্রণের প্রয়াসে 'কি পাইনি' ও 'মেঘবরণ কেশ' সার্থক হতে পারেনি যথার্থ শিল্প-জ্ঞানের অভাবে। শিল্প-জ্ঞানের সঙ্গে সমাজ-চেতনা ও আদর্শবোধের সমন্বয়ে সৃষ্ট আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৩৬২ বা ১৯৫৫) ও আবুল ফজলের 'রাঙ্গা প্রভাত' (বাং ১৩৬৩;/ইং ১৯৫৭) সার্থকতার স্পর্শ-মণ্ডিত। রোমান্টিকতার প্রক্ষেপ ও আদর্শের অতিরেক দুটি উপন্যাসেরই প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে সন্দেহ নেই, তবু পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকে এ-দুটি উপন্যাসেই গ্রাম্য-জীবনের একমাত্রিকতা পরিহার করে জীবনকে বিস্তৃত পরিসরে অবলোকনের প্রয়াস সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধ্যান ও ধারণার প্রতিফলনেও উপন্যাস দুটির বৈশিষ্ট্য স্বয়ংপ্রকাশ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত প্রাক্-কালের পটভূমিতে সংস্থিত "জীবন ক্ষুধা'য় অনেকে নূট হামসুনের ছায়াপাত লক্ষ্য করেন।[১১] সে যাই হোক, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আবুল মনসুরের 'জীবন ক্ষুধা' প্রাক্-পাকিস্তান যুগের মুসলমানদের জীবনের ক্ষুধারই নিরাবরণ-অভিব্যক্তি। এ উপন্যাসের নায়ক হালিম সে-দিনের সচেতন মুসলিম সমাজেরই সার্থক প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্যে ক্ষুব্ধ কোনো দরিদ্র বুদ্ধিজীবী হঠাৎ সচ্ছলতার মুখ দেখলে, তার জীবন-দৃষ্টিতেও যে বিপর্যয় দেখা দেয়, হালিমের চরিত্র-চিত্রণে তা-ও প্রকাশিত। 'রাস্তায় যে ভিক্ষুকের পাল দেখিয়া একদিন হালিমের প্রাণে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, সেই ভিক্ষুককেই আজ হালিম মনে করে সভ্য-ভব্য জীবনের কলঙ্ক, সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের উৎপাত, আমোদ-প্রমোদের প্রতিবন্ধক। শহরের আলকাতরা-মোড়া পরিচ্ছন্ন রাস্তার কোণে ডাস্টবিনের আবর্জনা যা সভ্যজীবনের পাশে ভিক্ষুকরাও তাই। তাই হালিম আজ এদের আবর্জনারই মতো এড়াইয়া চলে।" (জীবন ক্ষুধা-পৃষ্ঠা ২২৫)

উনিশ শ' ঊনচল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' প্রভৃতি ঘটনাধারার ক্রমাগতির মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতের মাধ্যমে লেখক তাঁর নিজ জীবন-চেতনাকেও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। কেবল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘাত-সংঘাতই নয়, হালিম-নঈমা-লুৎফুনের প্রেমের কুটিল গতির বিশ্লেষণে জীবনের বহুমুখী দিকের প্রতিফলনেও উপন্যাসকারের নিপুণতা পরিস্ফুট। তাছাড়া বিভিন্ন পার্শ্ব-চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েও সমাজ-জীবনের বহু খণ্ডচিত্র প্রতিফলিত। কিন্তু সে প্রতিফলন সর্বত্র সুমিত হয়নি বলেই উপন্যাসের ত্রুটিগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আযিম সর্দার ও বেগম সাহেবার প্রসঙ্গটি উল্লেখ্য। এ প্রসঙ্গের রূপায়ণে লেখক বাস্তববোধ বিসর্জন দিয়ে

রহস্যময়তার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন। একটি সমাজ-সচেতন সৃষ্টিতে রূপকথাধর্মী অবিশ্বাস্য কাহিনীর প্রক্ষেপ, লেখকের স্বধর্ম-চ্যুতিরই প্রমাণ বহন করে। তবে, 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স'-এর ব্যঙ্গনিপুণ স্রষ্টার একটি নতুন নিরীক্ষা এই 'জীবন ক্ষুধা'। সে-নিরীক্ষা শুধু গল্প ছেড়ে উপন্যাসের প্রকরণ অবলম্বনেই নয়,– ভাষা, আঙ্গিক এবং জীবনবোধেও। ভাষা ব্যবহারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য-চেতনা পরিস্ফুট গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভাষা পরিত্যাগ করে বর্ণনায় সাধু ভাষা ও সংলাপে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ। উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বিভিন্ন শিরোনামার ব্যবহার (যেমন– অবশেষে চাকরি মিলিল, চাকরি শুরু হইল, আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত, হারজিত, চাকরি গেল প্রভৃতি) বঙ্কিমযুগের উপন্যাসের আঙ্গিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যঙ্গ ও পরিহাসের বদলে সহানুভূতির সাহায্যে জীবন-বিশ্লেষণের প্রয়াসে লেখকের নতুনতর জীবনবোধের পরিচয়ও পরিস্ফুট। নতুন নিরীক্ষায় এ উপন্যাস একক ও নিঃসঙ্গ। ভাষা ও আঙ্গিক–কোনো দিক দিয়েই আমাদের তরুণ কথাশিল্পীরা এর অনুকরণে উদ্বুদ্ধ হননি। 'জীবন ক্ষুধার' ভাষায় লেখকের স্বাতন্ত্র্য-চেতনার যে-পরিচয় উদঘাটিত, তা তাঁর তীব্র জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক। কিন্তু সে সঙ্গে এও স্বীকার্য যে, দীর্ঘ সাধনায় আমাদের সাহিত্যের ভাষার যে মান গড়ে উঠেছে, তাকে অস্বীকার করে সাধু ভাষার রীতিতে প্রত্যাবর্তন হবে একটা পশ্চাদ্বর্তী পদক্ষেপ। সেরূপ পদক্ষেপে আমাদের তরুণরা আগ্রহী নন। সরদার জয়েন উদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শওকত ওসমান প্রমুখের কোনো কোনো রচনায় সাধু ভাষার ব্যবহার আছে বটে, তবে এঁদের সঙ্গে আবুল মনসুরের উদ্দেশ্যের সাযুজ্য নেই।

'জীবন ক্ষুধা'র মতো আবুল ফজলের 'রাঙ্গা প্রভাত'ও গ্রাম এবং নগরের পটভূমিকায় বিধৃত উপন্যাস। এর ঘটনার কালসীমা প্রাক্-পাকিস্তান যুগ থেকে পাকিস্তানের কাল পর্যন্ত প্রসারিত। উপন্যাসের প্রথম দিকে নায়ক কামালের বাল্য ও কৈশোর জীবন-পরিক্রমা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপুর কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু, বিভূতিভূষণের নিসর্গ-চেতনা ও নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টি আবুল ফজলের নয়। তাই, তাঁর সৃষ্ট কামালও অপু হয়ে ওঠেনি। সমারসেট মমের The value of art is not beauty, but right action- এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেমন আবুল ফজল উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তেমনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও সৌন্দর্য-স্পৃহায় গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে ওঠেনি। 'রাঙ্গা প্রভাত'-এ মানবতাবাদী আবুল ফজল উচ্চকণ্ঠে মানবতার জয় ঘোষণা করেছেন এবং এর জন্য উপন্যাসের শিল্প-সৌন্দর্যগত ত্রুটিকে যেন অঙ্গীকার করেই নিয়েছেন। এ উপন্যাসে একটি মুসলিম যুবক ও একটি হিন্দু যুবতীর মধ্যকার প্রণয় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিণয়ে পরিণত হয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। এ-জাতীয় প্রণয় ও পরিণয় আমাদের উপন্যাসে এর আগেও বহু ঘটানো হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সে মুসলিম কুমারীর সঙ্গে হিন্দু যুবকের যে প্রণয়চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, বিশ শতকে মুসলিম জাগরণের আমলে তারই প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য

নিদর্শন: সিরাজীর 'রায়নন্দিনী'। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দাঁতভাঙা জবাব বলে এটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। 'রায়নন্দিনী'তে দুটি হিন্দু নারী দুজন মুসলমান বীরকে হৃদয় দান করেছে। এই প্রেমের 'রায়ট' আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের একটি সুলভ মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।'[১২]

পাকিস্তান-যুগের 'রাঙ্গা প্রভাত'-এ 'প্রেমের রায়ট' সংঘটিত হয়নি, বরং রায়টের অবসান ঘটানোর কামনায়ই এই প্রেমের পরিকল্পনা। আদর্শবাদী চারুবাবু সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন দিলেন, আর তাঁর কন্যা মায়া ও ভাবশিষ্য কামাল তাদের প্রেমের সূর্যালোকে সূচনা করল সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত এক নতুন যুগের রাঙ্গা প্রভাতের। এতে লেখকের আদর্শবাদের আন্তরিকতা যেমন প্রকাশিত, তেমনি অত্যুৎসাহজনিত শৈল্পিক বিচ্যুতির পরিচয়ও কিছুটা পরিস্ফুট। উপন্যাসটির মেলোড্রামাটিক পরিসমাপ্তি এর গাম্ভীর্যের হানি ঘটিয়েছে, দুঃখের বিষয়, এমন একটি আদর্শবাদী উপন্যাসও সস্তা রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত নয়। মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসেবেই 'রাঙ্গা প্রভাত'-এর লেখক সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক-মানবতা প্রতিষ্ঠায় শ্রেণী-সংঘাতের অনিবার্যতা সম্পর্কে অমনোযোগী। তাঁর উদার মানব-ধর্মে বিশ্বাস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের অতিরেক উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে একমাত্রিক করে তুলেছে ও বাস্তবানুগতা ব্যাহত করেছে। তবু, এ কথা নির্দ্বিধায় বলব যে, এমন সংকীর্ণতা-বর্জিত উদারজীবন-দৃষ্টি আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ; এবং 'রাঙা প্রভাত' শুধু আবুল ফজলেরই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়,– পাক-বাংলার সাহিত্যেরও এক স্মরণীয় কীর্তি।

পাকিস্তানের প্রথম দশকের উপন্যাস প্রধানত গ্রাম-কেন্দ্রিক এ-কথা বলেও বর্তমান প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই এর ব্যতিক্রমের কথাও উল্লেখ করেছিলাম। আবুল ফজলের 'জীবন পথের যাত্রী' (১৯৪৮) 'রাঙ্গা প্রভাত'-এর পূর্ববর্তী উপন্যাস। সে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা মামুন ও হেনা নাগরিক-চেতনায় দীপ্যমান। এতে উপন্যাসকারের আদর্শবাদিতার ছাপ সুস্পষ্ট; নাগরিক জীবন চিত্রণের চেয়ে স্বকীয় আদর্শের উপস্থাপনায়ই লেখকের অধিকতর মনোযোগ। তাই উপন্যাসটি উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ হয়েও পুরোপুরি শিল্প-সার্থক হয়ে ওঠেনি। আবু রুশ্‌দের চেতনায় নাগরিকতার স্বচ্ছন্দ ছায়াপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর 'সামনে নতুন দিন' (১৯৫৬) উপন্যাসেই এটাও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে, নাগরিক জীবনের সমস্যার গভীরে ডুব দিতে তিনি অনাগ্রহী, এর উপরিতলের ছায়ারৌদ্রের খেলাতেই তিনি তৃপ্ত। তবে পরবর্তী দশকে আমাদের সাহিত্যে নাগরিক চেতনার যে সার্থকতার প্রতিফলন ঘটেছে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল প্রথম দশকেই।

তিন.

পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস : ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৭-র প্রথম ভাগ

পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে বলেই, আলোচনার সুষ্ঠুতার জন্য, বিষয়-বস্তু ও দৃষ্টিকোণের বিচারে এর শ্রেণীবিন্যাস অপরিহার্য। আমরা নিম্নোক্তভাবে এ দশকের উপন্যাসগুলোকে বিন্যস্ত করতে পারি।

১. গ্রাম্য ও আঞ্চলিক জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস: আমাদের উপন্যাসের আলোচনায় বারেবারেই গ্রাম-জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের কথা আসে; পুনরাবৃত্তি হলেও স্মরণ করতে হয় : আমাদের সমাজ মুখ্যত গ্রাম-কেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক। প্রাক্-পাকিস্তান যুগের মতো পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের উপন্যাস-শিল্পীকেও সে সমাজেরই আলেখ্য নির্মাণে নিয়োজিত থাকতে দেখি। তারই ধারা এ দশকেও প্রবহমান থেকে উপন্যাসের এই বিশেষ বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এ দশকে অজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবন-চিত্রায়ণে ঔপন্যাসিকের মনোযোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে মনোযোগেরই ফলশ্রুতি হিসেবে পাই: আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২), শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২), জহীর রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪), সরদার জয়েন উদ্দীনের 'পান্নামোতি' (বাং ১৩৭৩;/ইং ১৯৬৬), তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (বাং ১৩৬৬;/ইং ১৯৫৯) প্রভৃতি। আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণে লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্যের ব্যবহার দেখি : শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাঞ্চনমালা' (বাং ১৩৬৮;/ইং ১৯৬১) ও জসীমউদ্ দীনের 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪)-তে। তাছাড়া এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বর্ণপ্রলেপের ব্যবহারও কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন– মগদের জীবন নিয়ে লেখা বদরুদ্দীন আহ্মদের 'অরণ্য-মিথুন' (১৯৬৩) উপন্যাসটি। বদরুন্নিসা আবদুল্লাহ্র 'কাজল দীঘির উপকথা' (১৯৬২) ও আলাউদ্দীন খানের 'অববাহিকার উপকথা' (১৯৬৫)– এ দুটি নামও আঞ্চলিক উপন্যাস-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

২. নগর-চেতনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে একটি নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। (অবশ্য এর সূচনা পূর্বেই দেখা দিয়েছিল।) এ সমাজের চেতনা ও ধ্যান-ধারণা স্পষ্টতই গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ থেকে পৃথক। যে নতুন ধনিক শ্রেণীটি অতি অল্পদিনের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, অতি সামান্য ব্যতিক্রম বাদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধুতাই এদের সমৃদ্ধির উৎস। এদের কাছে সর্বপ্রকার আদর্শ ও নীতিবোধ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। এ শ্রেণীর মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজের ক্রান্তিকালের রূপটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ সমাজের বাস্তব-চিত্র ধরা পড়েছে, মীজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী' (১৯৬৫) উপন্যাসটিতে। ধনিক শ্রেণীটির উদ্ভবের পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। সে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নৈতিক ক্ষেত্রে সূচনা করেছে এক সর্বনাশা ভাঙনের। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবরোধ-প্রথা ভেঙে গিয়েছে এবং মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ

করেছে, কিন্তু সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ থেকে হয়েছে বঞ্চিত। জীবন-সংগ্রামে আজ মেয়েরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও বেশি পরিমাণে বিপর্যস্ত। এ বিপর্যয় নিয়ে পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকে রচিত উপন্যাসের মধ্যে নাম করা চলে দিল আরা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' (বাং ১৩৭২,/ইং ১৯৬৫) ও হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫)-এর। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের নায়িকা-কেন্দ্রিক উপন্যাস-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য : নীলিমা ইব্রাহীমের 'বিশ শতকের মেয়ে' (বাং ১৩৬৬,/ইং ১৯৫৯), আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যা কুমারী' (বাং ১৩৬৭/ইং১৯৬০), রশীদ করীমের 'প্রসন্ন পাষাণ' (১৯৬৩) এবং 'সিরিও কমিক' উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত, দৌলতুন্নেসার 'বধূর লাগিয়া' (১৯৬২) প্রভৃতির নাম। প্রাক্-পাকিস্তান যুগের কলকাতা-কেন্দ্রিক মুসলিম নাগরিক জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১)। (এটিই লেখকের প্রথম উপন্যাস এবং আদমজী পুরস্কার প্রাপ্ত। 'প্রসন্ন পাষাণ' তার দ্বিতীয় উপন্যাস।) আলাউদ্দীন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬১) ও 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২), আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৬১), আতাহার আহমদের 'পিপাসা' (১৯৫৮) প্রভৃতি উপন্যাসে নাগরিক জীবন-চিত্রণের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের জটিল রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ দশকে নগর-চেতনা ক্রমপ্রসারমান হয়েছে গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন থেকে নগর-জীবনের দিকে অভিসার-যাত্রা আমাদের সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই। সে অভিসার-যাত্রার আলেখ্যই উপন্যাসে পূর্ববর্তী দশক থেকে এ দশকের স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্টীকৃত করেছে। উপরে উল্লিখিত ঔপন্যাসিকরা ছাড়াও আবু রুশদ্, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জহীর রায়হান, নূরুল ইসলাম খান, শহীদ আখন্দ প্রমুখ কথাশিল্পীর বিভিন্ন উপন্যাসে নাগরিক জীবনের বহু বিচিত্র দিকের চিত্র ও চরিত্র প্রকাশমান।

৩. মনোবিকলন-মূলক উপন্যাস: নাগরিক-জীবনের আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়েই এ দশকের কথাশিল্পীরা ব্যক্তিমনের জটিলতার মুখোমুখি হয়েছেন। সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে কত নিরুদ্ধ আবেগ আর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে জীবনের বাঁকা গলি-ঘুজিতে পরিতৃপ্তি-সন্ধানের ব্যর্থ প্রয়াসে রত– আমাদের ঔপন্যাসিকদের সন্ধানী দৃষ্টিতে তা-ও প্রতিফলিত। অবশ্য, 'মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক' নামে উপন্যাসের একটি বিশেষ শ্রেণী নির্দেশ করা এ যুগে পুরোপুরি সম্ভব, সংগত বা নিরাপদ নয়। কারণ, জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য; তাই মনস্তত্ত্ব বাদ দিয়ে কোনো উপন্যাসই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তবু, এমন কিছু কিছু উপন্যাস দেখা যায়, যেখানে বহির্বাস্তবের চেয়ে নায়ক-নায়িকার মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতই মুখ্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের কতকগুলো সূত্রকে অবলম্বন করে যাঁরা উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, তাঁদের উপন্যাসকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করার প্রয়োজন অনিবার্য। এ সব উপন্যাসে মানব-মনের বিভ্রান্তি, অসুস্থতা, বিকৃতি প্রভৃতিই প্রধান হয়ে ওঠে। এ সমস্ত কতকগুলো লক্ষণের কথা মনে রেখেই, একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা-

যোগ্য এ দশকের উপন্যাসের মধ্যে আছে: রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৮), 'অনুকল্প' (১৯৫৯), শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩), সৈয়দ শামসুল হকের 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯), 'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২), 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪) প্রভৃতি।

৪. ইতিহাস-চেতনা-সমৃদ্ধ এপিকধর্মী উপন্যাস: গ্রাম বা শহর-জীবনের একমাত্রিকতা এবং একান্ত সমকালীনতার সংকীর্ণতা পরিহার করে, বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে জীবনকে অবলোকনের প্রয়াসে এ দশকে বেশ কয়েকটি সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– আলাউদ্দীন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (বাং ১৩৭২;/ইং ১৯৬৫) এবং সরদার জয়েন উদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' (পৌষ ১৩৭৩;/ জানুয়ারি ১৯৬৭)। এ-সব উপন্যাসে ঘটনার মূল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের ভূমিতে প্রোথিত। লেখকদের ইতিহাস-চেতনার পরিচয়বাহী এ কয়টি বই আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধি দান করেছে।

৫. ঐতিহাসিক উপন্যাস: কেবল নিকট-অতীতের ঘটনা নিয়ে ইতিহাস-বোধের পরিচয় প্রদানই নয়, অপেক্ষাকৃত দূর-অতীতের সমাজ-জীবনও আমাদের ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টি-কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে যাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা হয়, এ-দশকের পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যে তারও উদ্ভব ঘটেছে। এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য কয়েকটি নাম: ইব্নে রশীদের 'ফাল্গুন করা' (১৯৫৮), চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তান গড়' (১৯৬২), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' (১৯৬৩) এবং সরদার জয়েন উদ্দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (বাং ১৩৭২;/ইং ১৯৬৫)।

৬. বিচিত্র: উপরে বিন্যস্ত শ্রেণীসমূহের কোনোটাতেই পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, অথচ সত্যিকারের স্মরণীয় সৃষ্টিরূপে গণ্য হতে পারে, এমন কিছু উপন্যাসের কথা স্মরণে রেখেই 'বিচিত্র' নামের এই বিভাগটির পরিকল্পনা। এ বিভাগের অন্তর্গত : প্রতীকধর্মী, উদ্দেশ্যমূলক, পরিপূরক, বুদ্ধিপ্রধান, গোয়েন্দা-কাহিনী মিশ্রিত, কারাজীবন-কেন্দ্রিক, অস্তিত্ববাদ-প্রভাবিত প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ সমন্বিত উপন্যাসগুলো। প্রকৃত সাহিত্যগুণ-মণ্ডিত উপন্যাস, 'ক্রীতদাসের হাসি'কে উপন্যাসের সাধারণ সূত্র দিয়ে কোনো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। অথচ, শওকত ওসমানের প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত, এই উপন্যাসটি পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যে শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও একটি অভিনব সংযোজন। অল্পবিস্তর সাহিত্যগুণ সমন্বিত কয়েকটি উপন্যাসের কথা এ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করা চলে। যেমন, উদ্দেশ্যমূলক ও বুদ্ধি-প্রধান উপন্যাস: মোহাম্মদ মোর্তজার 'চরিত্রহানির অধিকার' (১৯৬৬) এবং আবুল হাসনাতের 'মিলন সঙ্ঘ'। পরিপূরক উপন্যাস: চৌধুরী শামসুর রহমানের 'শেষ পর্বে শ্রীকান্ত' (১৯৬০),

গোয়েন্দা কাহিনীর ভেজাল-মিশ্রিত সামাজিক উপন্যাস: আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরীর 'নীল যমুনা' (১৯৬৪), কারা-জীবনের ভিত্তিতে রচিত: সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯), অস্তিত্ববাদ প্রভাবিত: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ইত্যাদি।

শ্রেণী-বিন্যাস উপলক্ষে এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কনের পর, এবার আমরা পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসের কিছুটা বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

চার

গ্রাম্য ও আঞ্চলিক জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস

গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায় যে দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য আমাদের সাহিত্যে বর্তমান, বর্তমান দশকের লেখকেরা তাকে আরও সম্প্রসারিত করে নিয়ে গেছেন আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, অজ্ঞাত-পূর্ব অঞ্চলের সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে। উপন্যাসের পটভূমির এই ভৌগোলিক ও সামাজিক বিস্তৃতি, নিঃসন্দেহে আমাদের কথাশিল্পীদের দেশ ও সমাজ-চেতনার বিস্তৃতির পরিচয়বহ। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণ বিচরণক্ষেত্র থেকে দৃষ্টিকে অপসারিত করে সমাজ-জীবনের অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে দৃষ্টি-নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে, সাহিত্যে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে তাঁরা সচেষ্ট। অজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসে সার্থকতা আনতে হলে, সে সমাজের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পাঠকের চেতনাকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হয়। লেখকের অভিজ্ঞতার গভীরতা না থাকলে এ-ক্ষেত্রে সিদ্ধি প্রায়ই অনায়ত্ত থাকে; 'জীবন জীবন যোগ করা'র পরিবর্তে 'কৃত্রিম পণ্যে সাহিত্যের পসরা' শুধুই ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে। এমন অপ-প্রয়াসের ফলে অপসৃষ্টি যে আমাদের সাহিত্যেও অনেক জমে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরই মাঝে মাঝে দু'চারটি ফলপ্রসূ প্রয়াসও যে আমাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, – তা-ও সত্য।

আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাসের পটভূমিতে আছে– কর্ণফুলী নদীতীরের প্রকৃতি ও জনপদ। এর কুশীলব সমাজের নিম্নতলের বাসিন্দা। নায়ক ইসমাইলকে আমাদের পরিচিত সমাজেও খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু রাঙামিলা, ধলাবী, লালচাচা, নীলমণি প্রভৃতি আমাদেরকে এক অপরিজ্ঞাত লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তবে, এই অপরিজ্ঞাত লোকের জীবন-চিত্রণে বাস্তব ও কল্পনার ভারসাম্য লেখক সর্বত্র বজায় রাখতে পারেননি: ইসমাইলের প্রেম-ভাবনা তথা তার ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে উঠে একটি বিশেষ অঞ্চলের নির্বিত্ত মানুষের জীবন-সংগ্রামের রূপকে ম্লান করে দিয়েছে। ইসমাইলকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহৎ করে তুলতে গিয়ে লেখক কাহিনীতে এত অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে, এতে বইটি কোথাও কোথাও উপন্যাসের ধর্মচ্যুত হয়ে রূপকথার চারিত্র্য অর্জন করে ফেলেছে। তবে এ ত্রুটি উপন্যাসটির খণ্ডাংশের ত্রুটি মাত্র। ঔপন্যাসিকের আধুনিক জীবন-চেতনার উজ্জ্বল উপস্থিতিও এতে বিদ্যমান। তথাকথিত সভ্য মানুষের সমাজের

থেকে দূরে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় আদিম ধরনের মানুষের চেতনায়ও যে কালান্তরের রূপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তারও পরিচয় বিধৃত আছে এ উপন্যাসটিতে। কর্ণফুলী-বাঁধ পরিকল্পনা দেখে অশিক্ষিত ইসমাইলের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"এমন চিকন গাঙ্গ, এমন বন-জঙ্গল, পাহাড়, ডিবির ভিতর এত বড় কাণ্ড ভাবতে পারি নি।...বিরাটি বাঁধ নদীকে আটকে রেখেছে: এধারে ছোটখাট একটি শহর।

রেস্ট হাউস, অফিসারদের ঘরবাড়ি ও বস্তি। স্কুল, সিনেমা হল, বাচ্চাদের খেলার মাঠ সবই আছে। মসজিদও দেখার মতো।

নক্সা ঘরে গেলে একন সব বোঝাতে থাকে। অনেক কিছুই ঢোকে না মাথায় তবুও শুনতে লাগে চমকপ্রদ। বাঁধ দেখা হলো, কর্ণফুলী রাগী মেয়ের মতো ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলে ফেঁপে আড়াই শ' মাইল ডুবিয়ে দেবে। এ জায়গা জুড়ে চুরাশি হাজার লোকের বাস। তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে হবে আরও উঁচু এলাকায়; ইতোমধ্যে গেছেও অনেক পরিবার। যাবে গ্রামকে গ্রাম। বাপ পিতামহর ভিটে-মাটি ছেড়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবু তারা যাচ্ছে, কারণ তারা বোঝে দশের মঙ্গলে দেশের মঙ্গলেই তাদের মঙ্গল। পাহাড়িরা বর্বর নয়।

বিরাট হ্রদের মতো ভাণ্ডারটি কখন পূর্ণ হবে, সেই চাপে পাহাড় কেটে তৈরি সুড়ঙ্গ পথে পানি প্রবল বেগে গিয়ে পড়বে তাদের মুখে বসানো চাকার উপর, কি না বলব? হ্যাঁ জেনেরেটর। এর থেকে জন্ম নেবে বিজলি শক্তি। তা দিয়ে শহরে-বন্দরে আলো জ্বলবে, চলবে শত শত কলকারখানা। মানুষ কাজ পাবে, ফলে মানুষের অভাব অনটন কমে যাবে অনেক।" (কর্ণফুলী– পৃষ্ঠা ১৩৫)

জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনেই আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখকরা পাত্রপাত্রীর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, উপন্যাসের আবহ সৃষ্টির কাজেও তা বিশেষ সহায়ক। আলাউদ্দিন আল আজাদও 'কর্ণফুলী'তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, বেশ মাত্রাতিরিক্ত রূপেই করেছেন। অথচ 'লেখকের কথা'য় তাঁর বক্তব্য পাঠককে বিভ্রান্ত করে তোলে :

"মনে হয় চরিত্রকে অধিকতর 'স্বাভাবিক' করার শৈল্পিক তাগিদ থেকেই এই রীতির (লোক-চরিত্রের মুখে লোক-ভাষার ব্যবহার) জন্ম। কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝিনে, সাহিত্য জিনিসটাই তো কৃত্রিম ও নির্বাচিত? সে হিসেবে প্রাকৃতজনের সংলাপে খানিকটা কৃত্রিমতার আমদানি করলে আপত্তিটা কোথায়? * * * চরিত্রকে 'স্বাভাবিক' করার চেষ্টায় আমি এ বইয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিনি...বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি মাত্র ...শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্য রূপে গণ্য হয়েছে।"

'বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার', 'শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন' প্রভৃতি কথায় লেখক যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন, তার অপনোদন সহজ নয়। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের

কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার উপন্যাসটির শিল্পসিদ্ধিকে দূরান্বিত করেছে মাত্র।

আঞ্চলিক জীবন নিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারও উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সারেং বৌ' (১৯৬২) শিল্পসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্তিরও গৌরব-ধন্য। 'কর্ণফুলী'র মতো এরও পটভূমি রচনা করেছে একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবন-ধারা; তবু সে অঞ্চলের লোক-ভাষার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে এ উপন্যাসের সংলাপে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। আঞ্চলিক জীবনের আবহ ফুটিয়ে তোলার জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দ-প্রয়োগই এর লেখক যথেষ্ট মনে করেছেন। এই পরিমিতি-বোধই লেখককে অমার্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। 'সারেং বৌ' সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে : এ বই 'বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সারেং জীবন-কাহিনীর প্রথমতম আলেখ্য।'[১৩] এ দাবি হয়তো যথার্থ। কিন্তু বিষয়-বস্তুর নতুনত্ব ও অভিনবত্বের জন্যই কোনো বই উৎকর্ষের দাবি করতে পারে না, যদি-না তাতে সৎ সাহিত্য হওয়ার সকল প্রকার উপকরণ বর্তমান থাকে। সকল প্রকার না হোক, অনেক উপকরণই যে 'সারেং বৌ'-এ বর্তমান, –নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যেতে পারে।

জীবিকার অন্বেষণে আকূল সমুদ্রের বুকে ভেসেছে যে কদম সারেং আর শিশু-সন্তান নিয়ে দারিদ্র্য ও দুর্দৈবের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করে চলেছে যে সারেং বৌ– তাদেরই অন্তরের আশা-নিরাশা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এ উপন্যাস। উপন্যাসের মূল চরিত্র দুটি– কদম ও নবীতুন। একশ' সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার পরিসরে উপন্যাসটিতে লেখক এ-দুটি চরিত্রেরই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন। আর যেসব চরিত্র এসেছে, সেসব কেবল প্রধান দুটি চরিত্রের পরিস্ফুটনের খাতিরেই। দুটি চরিত্রের মধ্যেও নবীতুনই প্রাধান্য পেয়েছে, উপন্যাসের নামকরণও করা হয়েছে তাকে লক্ষ্য করেই। এদিক দিয়ে লেখক বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' প্রভৃতি কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য উপন্যাসই নায়িকা-প্রধান। পুরুষের তুলনায় এ দেশে নারীকেই সংসার-জীবনে অধিকতর ঝক্কি ও ঝামেলা পোহাতে হয়, অথচ বিচরণের ক্ষেত্র ও সংগ্রামের সার্মথ্য– উভয়ই তার সীমিত।

এই সীমিত ক্ষেত্র ও শক্তি নিয়ে গুরুতর দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয় বলে, প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব হয় তার সার্বক্ষণিক সহচর। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নবীতুনের চরিত্র-অঙ্কনে 'সারেং বৌ'- এ যে মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর অঙ্কিত, নিঃসন্দেহে তা লেখকের শক্তির পরিচায়ক। তবে লেখক নবীতুনকে শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বের নিষ্ক্রিয় আধার রূপেই চিত্রিত করেননি, তাকে সক্রিয় সংগ্রামী করে গড়ে তুলেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করার মতো সকল হাতিয়ারই গরিব কদম সারেং-এর বৌ নবীতুনের অনায়ত্ত। কিন্তু প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ তাকে অসীম শক্তির অধিকারী করেছে। সে শক্তির বলেই সে অনায়াসে প্রলোভনের দূতী গুঁজা

বুড়িকে অপদস্ত করতে ও লম্পট সুন্দর শেখের লাম্পট্যের সমুচিত জবাব দিতে পেরেছে। এই আত্মমর্যাদাবোধ তাকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে তুলেছে বলেই মুমূর্ষু কদম সারেংকে জীবনের অমৃত দানে সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাসে নবীতুন চরিত্র সত্যই এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

কদমের শক্তির উৎসও আসলে নবীতুনের অনুপ্রেরণার মধ্যেই নিহিত। অকূল দরিয়ার বুকে ভেসেও কদমের অন্তঃকরণে অনুক্ষণ অনির্বাণ রয়েছে নবীতুনের ভালোবাসার শিখা। ক্ষণিকের প্রলোভন পড়ে ক্ষণপ্রেয়সীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে কদম, কিন্তু পরক্ষণেই নবীতুনের প্রতীক্ষমানা মূর্তিটি তার মানস-দৃষ্টিতে দীপ্তিময়ী হয়ে উঠে মুহূর্তেই ছুটে গেছে ক্ষণিকের মোহ।

উপন্যাসটির শিল্পসিদ্ধি সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার পরও স্বীকার্য যে, এর ত্রুটিগুলোও উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুনিষ্ঠতা তথা শৈল্পিক নির্লিপ্ততা ঔপন্যাসিকের জন্য অপরিহার্য। এই নির্লিপ্তিই উপন্যাসকে মহাকাব্যসুলভ গুণের অথিকারী করে। অথচ 'সারেং বৌ'-এর সর্বত্র এমন একটি গীতসুরের অনুরণন প্রত্যক্ষ হয়, যা বাস্তবধর্মী উপন্যাসের জন্য একটি অমার্জনীয় ত্রুটি। উপন্যাসের একেবারে শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর পুনর্গঠনের যে চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন, যা ভাবালুতা-প্রধান 'মরুতীর্থ হিংলাজে'ই শোভা পায়, 'সারেং বৌ'-এর মতো একটি বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসে তা নিতান্তই বেমানান– মেলোড্রামাটিক। শহীদুল্লাহ কায়সার লিখতে বসেছেন বাস্তবধর্মী উপন্যাস, কিন্তু তাঁর রোমান্টিক মানস প্রতিপদেই মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। এ ত্রুটি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে, শহীদুল্লাহ কায়সারের পক্ষে বাস্তবধর্মী মহৎ উপন্যাস সৃষ্টির সাধনায় সিদ্ধি হয়তো দুরধিগম্যই হবে। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'সংশপ্তকে' অবশ্য আমরা তাঁর শিল্পভাবনার উত্তরণ লক্ষ্য করেছি। তবে, সে অন্য প্রসঙ্গ।

জহীর রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসেও আঞ্চলিক জীবনের রূপ প্রকাশিত; তবে সে জীবন সম্পর্কে লেখকের একটি বিশেষ বক্তব্যও এতে আভাসিত। সে বক্তব্য হচ্ছে : বৈচিত্র্যহীন এ জীবন হাজার বছর ধরে পুরুষ-পরম্পরায় একই বৃত্তসীমায় আবর্তিত; সে জীবনে আবর্তন আছে, বিবর্তন নেই। উপন্যাসটির পাঠ সমাপ্তির পর এস. ওয়াজেদ আলীর 'ভারতবর্ষ' নিবন্ধটি কথা ঘুরেফিরে বারবার মনে জাগে। 'ভারতবর্ষে' যা পঁচিশ বছরের পরিধিতে প্রকাশিত, জহীর রায়হানের হাতে তাই হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত। বইটির একেবারে শেষ অংশ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্ত দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়ে মন।

ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন ।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়ল মন্তর । বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী ।

কেউ নেই ।

জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা ।

* * * * * *

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল । চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে । উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো । পরীর দীঘির পারে একটা রাত জাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল । সুরত আলীর ছেলেটা তখনও একটানা পুঁথি পড়ে চলেছে ।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান ।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরান ।
আকাশের চন্দ্র যেন রে ভেলুয়া সুন্দরী ।
দুরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূপের পরী ।

সুর করে ঢুলে ঢুলে একমনে পুঁথি পড়ছে সে । রাত বাড়ছে । হাজার বছরের পুরোন সেই রাত ।"

উদ্ধৃতি কিছুটা দীর্ঘ হল সন্দেহ নেই । কিন্তু উদ্ধৃতির এই দীর্ঘতাই উপন্যাসটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য গঠনের সহায় হতে পারে । এর ভাষার মিষ্টি সুরের আমেজে যে কোনো পাঠকই অভিভূত হয়ে পড়েন । কিন্তু, লেখকের দৃষ্টিকোণ যে বৈজ্ঞানিক চেতনা-নিয়ন্ত্রিত নয়, তা-ও স্বীকার্য । মানুষের সমাজ স্থবির নয় । যত আদিম বা পশ্চাৎপদই হোক না কেন, প্রত্যেক সমাজের অভ্যন্তরেই গতিশীলতা এমন ভাবে কার্যকর যে, তা-ই পরিবর্তনের পথে তার উত্তরণ ঘটায় । পাক-বাংলার গ্রাম বা আঞ্চলিক সমাজেও এ সত্যের প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্য নয় । কিন্তু, 'হাজার বছর ধরে'র লেখকের চেতনায় তার উদ্ভাসন নেই ।

বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্যমিথুন' (১৯৬৩) উপন্যাসে এ সত্যের প্রতিফলন আছে । মগদের জীবন-চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে তাদের সমাজের গতিশীলতা ও উত্থান-পতন লেখকের চেতনাকে আলোড়িত করেছে । কিন্তু, ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের বর্ণনীয় কাহিনীর রাসায়নিক সংমিশ্রণে উপন্যাসটিতে ঘনবদ্ধতার সঞ্চার হয়নি । তবু, মনি আফ্রু, মাচিং, মাবি, চামোথা– প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে লেখকের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা প্রশংসনীয় । তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৯৫৯), বদরুন্নিসা আবদুল্লার 'কাজলদীঘির উপকথা' (১৯৬২), আলাউদ্দীন খানের 'অববাহিকার উপকথা' (১৯৬৫) প্রভৃতি উপন্যাসে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারার কিছু কিছু খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনোটিই অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্প-জ্ঞানের সমন্বয়ে স্মরণীয় সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠেনি ।

আমাদের আঞ্চলিক জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো পাঠ করে দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয় যে, অখণ্ড জীবন-বোধের শৈল্পিক অভিব্যক্তি এগুলোতে সুস্পষ্ট প্রতিফলন লাভ করেনি। প্রায় এক যুগ আগে রচিত তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র সঙ্গে তুলনায় এর সবগুলোই নিতান্ত নিষ্প্রভ, জীবন সম্পর্কে খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক ও ভাবালুতায় আবিল।

বিশিষ্ট অর্থে আঞ্চলিক নয়, কিন্তু অপরিজ্ঞাত ও উপেক্ষিত সমাজ-জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাস সরদার জয়েন উদ্দীনের 'পান্নামোতি' (১৯৬৫)। সভ্য সমাজে অবহেলিত দাই সমাজের বিচরণ ও উপন্যাসের অবয়বে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি জমিদার শক্তিপদ চৌধুরী ও তার পরিবারের উপস্থিতিতে সৃষ্ট এর ঘটনার সংঘাত, জারজ সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের উপলক্ষে অঙ্কিত সমাজের প্রায়-অন্ধকার প্রকোষ্ঠের আলেখ্য। আঙ্গিক বা ভাষা-ব্যবহারে এ উপন্যাসে চমক বা ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত নয়, কিন্তু জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও আন্তরিকতা এর সর্বত্র উদ্ভাসিত। উপন্যাসটির মূল্যায়নের জন্য জয়েন উদ্দীন-প্রসঙ্গে আবদুল গনি হাজারীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা চলে:

"তার উপন্যাসের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নাগরিক ভাষার সঙ্গে গ্রাম্য ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার চরিত্রগুলোকে কাহিনীর প্রেক্ষিতে এমন করে উপস্থিত করা যাতে স্বভাবতই এ কথা আমাদের মনে হয় যে তার মানুষগুলো যেন গ্রামেরই মাটি দিয়ে গড়া, তারই হাওয়ায় যেন তারা নিঃশ্বাস ফেলে পল্লীর সুশ্যামল বনানীর দীর্ঘশ্বাসের চাপা আওয়াজে, যেন সেখানকার মাঠ ঘাট বিলে তাদের হৃদয় ছড়িয়ে রয়েছে মটর ফলের বুকের পুষ্টতায়। এখানে জয়েন উদ্দীনের কোনো জুড়ি নেই। সে যেন গদ্য সাহিত্যের জসীমউদ্ দীন।"[১৪]

এ মন্তব্য শুধু আলোচ্য দশকের 'পান্নামোতি' সম্পর্কেই নয়, পূর্ববর্তী দশকের 'আদিগন্ত' প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

আলোচ্য দশকের উপন্যাসে গ্রাম্য ও আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণে লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্যের ব্যবহার প্রসঙ্গে শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাঞ্চন মালা' ও জসীমউদ্ দীনের 'বোবা কাহিনী'র কথা স্মর্তব্য। যাযাবর বেদের দলের মেয়েরা লোকালয়ের যুবকের সঙ্গে প্রেম ও তার সংঘাতজনিত কাহিনী 'কাঞ্চন মালা' (১৯৬১) ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া'র স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। 'মহুয়া'র আদলে ঢালা-কাহিনীতে সাধু গদ্যভাষার ব্যবহারেও রচনাটি আধুনিক চারিত্র লাভ করেনি; বরং রোমান্স-ধর্মিতা আর অলৌকিকতার আতিশয্যে উপন্যাসকার এতে স্বধর্মভ্রষ্ট। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে একদা ঘোষণা করেছিলেন, – ...'I believe in a thorough, searching and sympathetic treatment of the social questions. When I have dealt with the problems in the lives of the neglected poor peasants of East Pakistan, I have done so not with the specific purpose of bringing about immediate social changes but because I was impelled by a wider love of life. Life to me is a mixture of the joy of union and the

pain of separation and ennobled by love. I have tried in my own way to depict some aspects of that life. '[১৫]

তাঁর এ ঘোষণার আন্তরিকতা লক্ষিত হয়েছিল 'কাশবনের কন্যা'য়, কিন্তু 'কাঞ্চন মালা'য় বাস্তবে পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়ে তিনি লক্ষ্যচ্যুত ও বিপর্যস্ত ।

সরদার জয়েন উদ্দীনের রচনায় 'নাগরিক ভাষার সঙ্গে গ্রাম্য ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণ' লক্ষ্য করে আবদুল গনি হাজারী তাঁকে 'গদ্য সাহিত্যের জসীম উদ্ দীন, বলে আখ্যায়িত করেছেন। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় জসীম উদ্ দীন নিজেও তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় রচিত একটি উপন্যাস দিয়ে আমাদের সাহিত্যে গদ্যশিল্পের এক অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। পল্লীবাংলার শব্দ ও বাচনভঙ্গির ব্যবহার সত্ত্বেও, ব্যাকরণের অনুযায়ী তাঁর 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪)-র ভাষা হয়তো সাধু বাংলা ভাষা বলেই আখ্যায়িত হবে, কিন্তু 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর অমর কবির গদ্য-পদ্যমিশ্রিত ভঙ্গিটিকে বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ। যেমন– পরিবারের একটি ছোট্ট মেয়ের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা–

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্–লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। ভেস্তের ধরিয়া পায়া কান্দে ফাতেমায়, বেটার দরুন শোগ হায়রে সহন না যায়। শূন্য পৃষ্ঠে দুলদুল ফিরিয়া আসিল, সাহেব বানুর পুত্রশোকে আসমান ভাঙিল। আয়রে নিমাই আয়রে কোলে, একবার বুক জুড়া বাছা মা বলিয়ে। কান্দে শচীমাতা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া। রসুলের মদিনা ভাইঙ্গা যায়। 'ফাতেমার কান্দনে ভাসে সোনার বৃন্দাবন'।

* * * * * * *

"দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়। শুকনা ডালের পরে বইসা ডাকে কাগা। ভাজন বেটা মইরা গেলে মার কলিজায় দাগা। বছর শেষে হইয়া আম্ব গাছে আবার আম্ব ফল ধরে– জাম্ব গাছ কালো করিয়া জাম্ব পাকে কিন্তু পন্থের দিকে মা চায়া থাকে। তার .... ফিরিয়া আসে না। নানা কাজের মধ্যে সারাদিন মা ডুবিয়া থাকে।" (বোবা কাহিনী, পৃষ্ঠা ১৮১)

কিংবা অন্যত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে –

"দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়। বিহানের শিশির ধারা দুপুরে শুখায়। বারো জঙ্গ করে মর্দ কিতাবে খবর, তের জঙ্গ লেখা যায়রে টঙ্গির শহর। জেলা স্কুল হইতে পাস করিয়া বছির ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হইতে জলপানি পাইয়া আই-এস-সি পাস করিল। তারপর কলিকাতা যাইয়া এম.বি পাশ করিয়া বিলাত চলিল জীবাণু বিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করিতে। এত পথ সে কি করিয়া পার হইল?" (বোবা কাহিনী, পৃষ্ঠা ২৭৩)

আপাতদৃষ্টিতে জসীম উদ্ দীনের 'বোবা কাহিনী'কে 'নকসী কাঁথার মাঠ' জাতীয় গাথার গদ্য-রূপান্তর বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের এই নতুন প্রকরণ অবলম্বনের মধ্যে জসীম উদ্ দীনের শিল্প-ভাবনা তথা জীবন-ভাবনার রূপান্তরও দৃশ্যমান। তাঁর গাথা কাব্যগুলোর মতো 'বোবা কাহিনী'তে প্রেমই কেন্দ্রীয় ভাবনা নয়,

অন্যতর ও বৃহত্তর জীবন-বোধ এতে রূপায়িত। আজাহের ও বছির– বাস্তবসম্মত জীবন-দৃষ্টিও পরিস্ফুট। আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রয়োগে এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিশ্লেষিত হয়নি, কিন্তু খোলা চোখে যাদের তিনি তাঁর চারপাশে অবলোকন করেছেন, তাদের রূপটি এ উপন্যাসে অবিকৃতভাবেই চিত্রিত। সহানুভূতিশীল কবির বাস্তব-জীবন দৃষ্টির পরিচয় সমন্বিত এ-উপন্যাস আমাদের গ্রাম-জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের অজস্রতার মধ্যেও অনন্যতা দাবিতে স্বপ্রতিষ্ঠ। এ জাতীয় উপন্যাস পাঠের সুযোগ পেলেই, আমাদের সাহিত্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিম সাহেবের একটি আশাবাদী উক্তিতে প্রত্যয় জাগে–

"বাঙালি হিন্দু সমাজে যে শ্রেণী-দূরত্ব ও বর্ণ-দূরত্ব আছে বাঙালি মুসলিম সমাজে সে সামাজিক দূরত্ব নেই বললেও চলে। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে দিনের গড়া-গ্রামের সঙ্গে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনের সাথে আজও তার নিবিড় যোগ। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই লেখক গড়ে উঠবে ও তাঁরাই পূর্ব পাকিস্তানের নয়া সাহিত্য সৃজনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। যে শ্রেণী-দূরত্ব (Class distance) ও সামাজিক দূরত্ব (Social distance)-এর ফলে সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি– এক কথায় সংস্কৃতি, কেবল এক বিশেষ শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে সব প্রতিবন্ধকতা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সমাজে এখন নেই বললেও চলে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প সৃজনে আমরা যদি সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হই তবে আমরা সৃজনের বন্যা এনে দিতে পারি।"[১৬]

পাঁচ.

নগর-চেতনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস

সাহিত্যে সুষ্ঠু নগর-চেতনার প্রকাশ ঘটানো তখনই সম্ভব, যখন দেশে নগর-জীবন তার বিশিষ্ট চরিত্র-অর্জনে সক্ষম হয়। গ্রামীণ-অর্থনীতির ভাঙনের মধ্য দিয়ে নতুন নগর-জীবন যাপন সৃজ্যমান, তখনকার সাহিত্যেও জীবনের একটি মিশ্ররূপের প্রতিফলনই অনিবার্য। আমাদের সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্যেও তাই ঘটেছে। বিশেষ করে আমরা এমনই এক সময় নগর-কেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে আশ্রয় করেছি, যখন বিশ্ব-ইতিহাসে ধনতন্ত্রের মরণঘণ্টা ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তাই সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও ধনতন্ত্রের অবক্ষয়– আমাদের জীবন এই দুটোরই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। এই দ্বিমুখী অবক্ষয় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তাতে আমাদের কথাশিল্পীরাও অস্থিরচিত্ত, জীবনের সমগ্র রূপকে অনুধাবনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ এবং কখনও-বা বিভ্রান্ত।

পরিবর্তমান সমাজের নতুন কাঞ্চন-কৌলিন্যের পরিচয় বিধৃত মীজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী'তে। ঠিকাদারি, মজুতদারি এবং ফটকাবাজি থেকে অর্জিত অর্থ একটা বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর, উৎকোচ, দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও মূল্যবোধহীনতা যার নিত্য সহচর। এ শ্রেণীরই প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্র 'পাতালে শর্বরী'র নায়ক জাভেদ চৌধুরী। সাধারণ

গৃহস্থের ছেলে জোয়ারুদ্দিনই স্বাধীনতা-উত্তর কালের সমাজ-বিন্যাসে পরিণত হয়েছে উদীয়মান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট, বিশিষ্ট শিল্পপতি জাভেদ চৌধুরীতে। এ সমাজেরই নীতিহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার একটি খণ্ডচিত্র –

"পরদিন দুপুরে রহমান এল অফিসে । এসেই বলল, 'বাইরে চল দরকারি কথা আছে।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েই বলল, 'শোন্, তোর.....কন্‌স্ট্রাকশানের বিলটি বাকি ছিল, বলছিলি না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার কি হল রে? কোন খোঁজ পেলে? বড় চিন্তায় আছি।'

– 'শোন বলছি। নতুন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এসেছে ঐ সেকশানে –

ইয়ংম্যান, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও কিছুটা।'

'কে? কি নাম লোকটার?'

'রশীদ ফারুক, আগে আমেরিকান কনসালটেন্ট ফার্মে ছিল।'

'রশীদ ফারুক!!!'

'চিনিস নাকি?'

'না না ...এমনি। কিন্তু কি ব্যাপার, গোলমাল টোলমাল করছে নাকি?'

'না না, তেমন কিছু নয়। তবে অত বড় বিল তো – এমনি কি ছাড়তে চাইবে – হ্যাঁ, রেটটা যাতে করে কম করানো যায়, সেই ব্যবস্থা করবার জন্যই আমার চিনে আসা। লোকটা বিয়ে করেছে একটি উকিল-কাম-ব্যবসায়ীর মেয়েকে। বউর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা অগাধ কিন্তু আবার ঐসব অভ্যাসও আছে, বুঝলি না?' রহমান হেসে ইশারা করে। 'তাই বলছিলাম কি শিগগির যদি রোশেনারা আর শিরিনকে নিয়ে সেদিনকার মতো একটি জমজমাট প্রোগ্রাম করা যায় তবে ব্যাটাকে নরম করে আনতে বিশেষ কষ্ট হবে না। .....প্রিলিমিনারী টক্‌স্ এবং অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি মোটামুটি করে রেখেছি, এখন তুই গ্রিন লাইট আর গ্রিন নোট্‌স-এর ব্যবস্থা করলেই দুরস্ত হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় আমার এখানে আয়–রশীদও আসবে–তোর সঙ্গে ইনট্রোডাকশানটাও হয়ে থাকুক কি বলিস?'

একটু চুপ থেকে জাভেদ বলেন, 'ঠিক আছে।' (পাতালে শর্বরী, পৃষ্ঠা ১০৫-৬) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট জাভেদ, ইঞ্জিনিয়ার রশীদ, উকিল-কন্যা নাসিমা, শিল্পপতিদের রাতের সঙ্গিনী রোশেনারা, শিরীন প্রভৃতির কাহিনী বাস্তবতা-সম্মত ভাবেই 'পাতালে শর্বরী'তে উপস্থিত বটে, তবে এতে বিস্তৃতি ও জীবনের অখণ্ডতা নেই। অথচ, 'ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্নভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখা মাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণা করাও সাধ্যাতীত।'[১৭]

জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র চিত্রণের ত্রুটি শুধু 'পাতালে শর্বরী'রই নয়, আমাদের প্রায় সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে– বিশেষ করে নগর-জীবনের উপস্থাপনায় প্রায় সর্বত্রই– প্রকট

রূপে বিদ্যমান। 'পাতালে শর্বরী' উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সনে প্রকাশিত। পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসের আলোচনায়, কোনো বিশিষ্ট ধারার বাহক হিসেবেও, সর্বপ্রথমেই এ উল্লেখ হয়তো কালাতিক্রমণ-দোষ; কারণ, এ দশকের প্রথম থেকেই নগর-জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়ে কম-বেশি গুণগত উৎকর্ষ লাভেও সক্ষম হয়েছে। তবু নগরও শিল্প-কেন্দ্রিক অর্থনীতির অভিঘাতে সৃষ্ট এই নতুন শ্রেণীটির উদ্ভব, বিকাশ ও চরিত্র– এত স্পষ্টভাবে এর আগে কোথাও প্রতিফলিত হয়নি বলেই নগর-চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাসের আলোচনায় 'পাতালে শর্বরী'কে এই অগ্রাধিকার-প্রদান।

একই বছরে প্রকাশিত দিলআরা হাশেমের 'ঘর মন জানালা'তেও বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কতকগুলো বাস্তব খণ্ডচিত্র প্রকাশিত। নায়িকা নাজমার জীবন-যন্ত্রণা আধুনিক বিপর্যস্ত মানুষেরই জীবন-যন্ত্রণা। কিন্তু তার প্রকাশে লেখিকা ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করে শিল্প-সংযমের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। শিল্প-সংযমের ব্যত্যয় ও জীবনের প্রতি খণ্ডিত দৃষ্টির প্রতিফলন–অন্যান্য লেখকের উপন্যাসেও লক্ষণীয়। উনিশ শ' আটান্ন সনে প্রকাশিত আতাহার আহমদের 'পিপাসা' ঢাকার তরুণ মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-পিপাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অখণ্ড জীবন-বোধের পরিচয় প্রদানে পুরোপুরি ব্যর্থ। শক্তিশালী কথাশিল্পী আলাউদ্দীন আল আজাদও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬১) এবং 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২)-এ তাঁর পূর্বতন জীবন-চেতনা (যে চেতনা তাঁর 'জেগে আছি' ও 'ধানকন্যা'র মতো গল্পগন্থে আভাসিত) থেকে বিচ্যুত। নতুন নগর-চেতনার নামে অবক্ষয়ী জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের পরিচয় তাঁর এ-দুটি উপন্যাসে প্রতিভাত। তবে জীবনের সুস্থতার দিতে তাঁর আকর্ষণ যে দুর্বার, তারও প্রমাণ এ উপন্যাস দুটিতে বিদ্যমান। বিকৃতি ও অবক্ষয়ের মধ্যেও মহত্ত্ব ও সুস্থ জীবন-বোধের প্রদীপশিখাটিকে প্রজ্বলিত রাখার প্রচেষ্টাই 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে'র নায়কের জীবনাচরণে প্রতিবিম্বিত। 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিনে'র বিগতযৌবনা নায়িকার অতৃপ্ত আত্মাও বিকৃতির পঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে সুস্থ জীবন-চেতনার পথে। যদিও হাসান হাফিজুর রহমান অভিযোগ করেছেন,– 'এ দুটো হল তথাকথিত আধুনিক উপন্যাস– আমাদের উঠতি জীবন-ধারায় যন্ত্রযুগের যে ক্ষয়িষ্ণুতার উপরিতলগত ও বহিঃপ্রভাবগত পরোক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারই প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। কোনো ক্রমেই আমাদের জীবনের মূল সুর এখানে উপজীব্য নয়– বরং এক উদ্ভট যৌন-সর্বস্বতা সার্বজনীন উপকরণের উত্তরাধিকারে আধুনিক আঙ্গিক ও ভাবনার ঐতিহ্যে সাম্প্রতিকতার শামিল হতে চেয়েছে এক্ষেত্রে যেন।'[১৮] – তবু এ কথাও স্বীকার্য যে আলাউদ্দীন আল আজাদ ক্ষয়িষ্ণুতার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিনে'র নামকরণের মধ্যেই সুস্থ জীবনে উত্তরণের প্রতি ব্যগ্রতার পরিচয় অভাসিত, খণ্ড থেকে অখণ্ডের প্রতি তাঁর দৃষ্টি যে ক্রমেই স্বচ্ছতর হয়ে আসছে, তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা'য় তা বিশেষ রূপে উদ্ভাসিত।

আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে'র মতোই আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৬১)-এর নায়কও একজন শিল্পী। ক্ষুদ্র-অবয়বের এ উপন্যাসটিতে লেখক নগর-

জীবনের পূর্ণচিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হননি সত্য, তবে নগর-পরিবেশে লালিত এক শিল্পীর মহত্ত্ব-বোধের মধ্য দিয়ে উদার জীবন-ভাবনার শৈল্পিক প্রকাশে তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১)-এর ঘটনার স্থান– শহর কলকাতা, কাল–প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকের পটভূমিকায় বিধৃত এই উপন্যাসের নায়ক তৎকালীন শহরবাসী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ। তার অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা অবলম্বনেই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সে যা দেখেছে, যে সব নরনারীর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের টুকরো ছবি নিজের অনুভূতির রং মিশ্রিত হয়ে এ উপন্যাসের পটে প্রতিফলিত। এদিক দিয়ে এ বই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র সগোত্র। কিন্তু যে পরিপূর্ণ জীবন-বোধ 'শ্রীকান্ত'কে মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, সে-বোধের একান্ত অভাবেই প্রকট হয়ে উঠেছে 'উত্তম পুরুষে'র ব্যর্থতা। মহাযুদ্ধের দুষ্ট প্রভাবে বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, এ উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে তার খণ্ড খণ্ড চিত্র পরিস্ফুট। বিশেষ করে নায়কের বন্ধু শেখরের পারিবারিক জীবনের অবক্ষয়, হঠাৎ-বড়লোক সলিলের চূড়ান্ত নীতিহীনতা,– সবই বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্র। কিন্তু এই খণ্ডচিত্রগুলোর একটা অখণ্ড তাৎপর্য লেখক কোথাও খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তাই স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরেও এ দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক স্থিতধী শিল্পীর পরিচয় দিতে পারেন না, সেদিনকার উভয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে আজকের দিনের পরিণত মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণেরও কোনো তাগিদ অনুভব করেন না। শেখরের বোন চন্দ্রা এবং তার মায়ের নৈতিক অধঃপতনের একটা সমাজবিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সেলিনার পদস্খলনের কোনো তাৎপর্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। 'নারী রহস্যময়ী' এই প্রাবাদিক সত্যকেই লেখক এখানে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন এবং পাঠককেও যেন তা-ই মেনে নিতে বল্‌ছেন।

রশীদ করীমের পরবর্তী উপন্যাস 'প্রসন্ন পাষাণ' (১৯৬৩)ও খণ্ডিত জীবন-দৃষ্টিরই পরিচয়-বহ। 'উত্তম পুরুষ' যেমন নায়ক-কেন্দ্রিক, 'প্রসন্ন পাষাণ' তেমনি নায়িকা-কেন্দ্রিক। 'প্রসন্ন পাষাণ'ও নগর-সমাজের ভিত্তিতেই রচিত। নায়িকা তিশনার জীবনের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় লেখক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কোনো সমাজ-সচেতন জীবন-বোধের পরিচয় অনুপস্থিত।

আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যাকুমারী' উপন্যাসেও শহুরে জীবনই বর্ণিত হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে এর কাহিনীর সূত্রপাত হলেও সে গ্রাম গ্রামীণ বিশেষত্ব-বর্জিত, শহুরে কৃত্রিমতায় পূর্ণ। শহরের তথাকথিত হাই সোসাইটির কৃত্রিম জীবন, বিশেষ করে অনূঢ়া তরুণীদের 'স্বামীমৃগয়া'র তৎপরতা ও সে কাজে তাদের মায়েদের অক্লান্ত সহযোগিতা–'কন্যাকুমারী'তে এ সবের বেশ কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে। লেখকের ভাষাও বেশ ঝরঝরে, বর্ণনা-ভঙ্গিও পাঠকের আগ্রহ জাগ্রত রাখার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু

ওই পর্যন্তই। কাহিনীতে চমৎকারিত্ব থাকলেও তা নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়নি। মেকি আবেগ আর অবাস্তব পরিণতি দিয়ে চমক লাগানোর প্রচেষ্টা কোনো উচ্চ শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। এক ধরনের হালকা কল্পনাবিলাসী পাঠকের মনোরঞ্জন ছাড়া, এ বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য।

নগর-সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত নায়িকার জীবন-সংগ্রামের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫)-এ; বাস্তব-দৃষ্টির সঙ্গে শিল্প-দৃষ্টির অপূর্ব সংমিশ্রণে সৃষ্ট এ উপন্যাসটি। স্কুল-শিক্ষিকা ফরিদা বানু এ উপন্যাসের নায়িকা। তার দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ও জীবন-উপভোগের স্পৃহার চিত্রণে লেখক কোথাও অবাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং একান্ত বাস্তব জীবনের বিবর্ণ আলেখ্যের মধ্যেই সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এক বিষণ্ন স্নিগ্ধতা। দিলআরা হাশেমের 'ঘর মন জানালা'র নায়িকার সংগ্রামী জীবনের কাহিনী বর্ণনায় কল্পনা ও বাস্তবের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও আকস্মিকতায় আশ্রয় সন্ধানী; পক্ষান্তরে, ঔপন্যাসিকসুলভ বস্তুনিষ্ঠা ও সংযমের পরিচয়ে হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' প্রশংসনীয় শিল্প-সার্থকতা-মণ্ডিত। নীলিমা ইব্রাহীমের 'বিশ শতকের মেয়ে' (১৯৫৯) সুখপাঠ্য, নায়িকা মিনার জীবন-চিত্রণে লেখিকার সহানুভূতির পরিচয় পরিস্ফুট। চরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতার আভাস থাকলেও, সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের অখণ্ড তাৎপর্য সন্ধানে লেখিকার মনোযোগের কোনো প্রমাণ এতে পরিলক্ষিত হয়নি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬১) ঢাকার একই বাড়ির বাসিন্দা চারটি পরিবারকে নিয়ে রচিত নাগরিক উপন্যাস। এর চরিত্র চিত্রণে লেখকের নিষ্ঠা ও মনোযোগের পরিচয় ধরা পড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যানে'র মতো এখানেও বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে রোমান্টিকতার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পিত। প্রায় একই ধরনের বিষয় নিয়ে রচিত পশ্চিম বাংলার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠানে' নগর-জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাতের যে প্রয়াস লক্ষিত, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর চাঁদে' তার কোনো চিহ্নও নেই। তাঁর 'নাম না জানা ভোর' (১৯৬২) সম্পর্কেও এ কথাই বলা চলে যে, রোমান্টিক মানসিকতায় তাঁর শিল্পসিদ্ধি ক্রমাগত খণ্ডিত ও ব্যাহত হচ্ছে। প্রায়-অনুরূপ মন্তব্যই প্রযোজ্য জহীর রায়হান সম্পর্কেও। তাঁর 'শেষ বিকেলের মেয়ে' বড় গল্প হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়েও শৈল্পিক ত্রুটির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে পারে না। জহীর রায়হানের মধ্যে শিল্পীর এক অনায়াস-পটুত্ব বিদ্যমান। সে পটুত্বকে একাগ্র অনুশীলনের সাহায্যে তীক্ষ্ণ করে তোলার প্রয়াসে অনীহাই তাঁর শিল্পী-সত্তাকে বিড়ম্বিত করেছে।

নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাব হলেই যে উপন্যাস-শিল্পীকে জীবনের অখণ্ড তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ এবং জীবনের খণ্ডচিত্রে বা রোমান্টিকতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হতে হয়– আমাদের তরুণ ঔপন্যাসিকদের অনেকের মধ্যেই তার প্রমাণ মিলে। শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৫), জুলফিকার হায়দারের 'অনন্যমনা' (১৯৬৭) প্রভৃতি উপন্যাস এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য। জীবন-

দৃষ্টিতে গভীরতা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি না থাকলে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য অবলম্বন করে ঔপন্যাসিককে ভঙ্গি দিয়ে পাঠক ভোলাবার প্রয়াসে উচ্চকিত হতে হয়। বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এই আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি। বিশেষ করে নতুন সৃষ্ট নগর-জীবনের মূল চরিত্র অনুধাবনে অক্ষম হয়ে অনেক লেখককেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ প্রসঙ্গে নূরুল ইসলাম খানের 'মেহের জুলেখা'র (১৯৬৫) কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন,–"মেহের জুলেখা আঙ্গিকের দিক থেকে এক বিচিত্র পরীক্ষা। এ উপন্যাসে আটটি ছোটগল্প আছে, আর এগুলো মিলিয়েই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি। বিচিত্রতর এদের পটভূমিকা, রোমান্টিক এবং সংঘাতময় মনে হল কাহিনীটি। উপন্যাস হিসেবেই কাহিনীটি জমকালো ঠেকবে– কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পেই ছোটগল্পের শুরু, পরিবর্তন ও ক্লাইমেক্স রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের টেকনিক নতুন বলেই আমার ধারণা। এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য বলতে পারবেন পাঠক ও সমালোচক।" ভূমিকাটির পর মূল বইটি পাঠ করলেই এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আঙ্গিক-সাধনা শিল্প-সাধনার নামান্তর নয়। মোটা তুলিতে চড়া রঙের কতকগুলো ছবির পর ছবি এঁকে গেলেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। অবশ্য, নূরুল ইসলাম খানের প্রথম উপন্যাস 'রাজধানীর ইতিকথা' (১৯৬৪)-র চাইতে 'মেহের জুলেখা'য় কিছুটা পরিণতির স্বাক্ষর লক্ষণীয়।

'সিরিও কমিক' উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত, দৌলতুন্নেসার 'বধূর লাগিয়া' (১৯৬২) সম্পর্কেও দাবি করা হয়েছে : 'এই ধরনের উপন্যাস পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে খুব বেশি নেই।' কিন্তু প্রশ্ন জাগে : কিসের এই বিরলতা বা অনন্যতা? গ্রাম-সমাজের পটভূমিতে রচিত 'পথের পরশে' লেখিকার জীবন-বোধের স্পর্শ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু 'বধূর লাগিয়া'তে হাস্যরসের নামে সৃষ্টি হয়েছে ভাঁড়ামির।

নগর-জীবনের রূপায়ণে আমাদের উপন্যাস-শিল্পীরা এমন অগভীর জীবন-চেতনারই পরিচয় দিয়ে আসছেন। তুলনায়, আমাদের উপন্যাসের গ্রাম-চিত্র অনেক বেশি জীবন্ত, ঔপন্যাসিকেরা গ্রাম্য-জীবন-চিত্রণেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ।

ছয়

মনোবিকলনমূলক-উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন : 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।' সেই পদ্ধতিই দেখা দিল 'চোখের বালি'তে।

এ হিসেবে 'চোখের বালি'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। অবশ্য বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক পূর্বসূরী। তবু, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলতে বর্তমানে যে বিশেষ ধরনের উপন্যাস বুঝায়, তা এ কালেরই সৃষ্টি। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেম্‌স্ জয়েস, ডি-এইচ. লরেন্স, প্রুস্ত প্রমুখ

ইউরোপীয় শিল্পীরাই এর স্থপতি। কল্লোল যুগীয় কোনো কোনো বাংলা উপন্যাসে শ্রুত হয় এঁদেরই প্রতিধ্বনি।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যেও নগর-চেতনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিক জীবন-চিত্রণের প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৮) ও 'অনুকল্প' (১৯৫৯) দিয়েই এ ধারার প্রাথমিক সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। (পূর্বে আলোচিত আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ও 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' এবং আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা'য়ও এ ধারার কিছু কিছু লক্ষণ বিদ্যমান। তবে সুস্থ জীবন-ভোগের স্পৃহায় এগুলো বর্তমান-প্রসঙ্গে আলোচিত উপন্যাস থেকে পৃথক।) 'বটতলার উপন্যাস' ক্লেদ-গ্লানির ঊর্ধ্বে জীবনকে অবলোকন করতে পারেনি, মানুষের মনের গহনে কোনো সুস্থ সামাজিক আর্তির সন্ধান পায়নি। এ জাতীয় সকল উপন্যাস সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য প্রযোজ্য। নিজস্ব পরিপার্শ্বের বাস্তব জীবন-বীক্ষা থেকে এগুলোর সৃষ্টি হয়নি। শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩) পাঠ করলেই এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে; ইতালির লেখক আলবার্তা মোরাভিয়ার অবক্ষয়শীল জীবন-দৃষ্টি দিয়ে লেখক তাঁর স্বকীয় দৈশিক ও পারিপার্শ্বিক জীবন-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। যৌন-বিকৃতির ঊর্ধ্বে কোনো সুস্থ জীবনাচরণের কল্পনা এ জাতীয় লেখকদের চেতনা থেকে নির্বাসিত। পশ্চিমের সমাজ-জীবনে যে অবক্ষয় সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, আমাদের জীবনে তা-ই এখনও একমাত্র সত্য নয়। অথচ পশ্চিমের সাহিত্য-পঠনজাত চেতনা দিয়ে যে মনোবিকলনমূলক উপন্যাস আমাদের দেশে সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাস্তব জীবন-চেতনার চেয়ে ভঙ্গি-সর্বস্বতাই প্রকট। পশ্চিমের সাহিত্যেও আধুনিক মনস্তত্ত্ব জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে উপন্যাস-শিল্পের ভাঙনকেই ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। এ সম্পর্কে আমাদের জনৈক সমালোচকের মন্তব্য :

'আধুনিক মনস্তত্ত্বের একটা বিশেষ ধারা গত তিন শত বছরের উপন্যাসের নরনারীর কাছ থেকে তাদের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রই কেড়ে নিয়ে যায়নি, তাদের মানবতাও কেড়ে নিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্র।[১৯] এই সমালোচক তাঁর মন্তব্যের সপক্ষে রাল্‌ফ ফক্সের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ফক্সের মতে,– 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের প্রাথমিক ভ্রান্তিকে আধুনিক ঔপন্যাসিক সঠিক বলে গ্রহণ করে বসেন এবং উন্মাদ ও রুগ্‌ণদের মধ্যেই তাঁর কল্পনার ভিত্তি বার করতে চেষ্টা করেন। কোনো আশার ছবি থাকে না তাঁর সামনে, কিংবা আশার ভিত্তি খুঁজে বার করার সাহস থাকে না তাঁর।[২০]

অন্যত্র:

'আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা যে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, এটা নিঃসন্দেহ। যে ঔপন্যাসিক এঁদের অবদানকে উপেক্ষা করবেন, তিনি যেমন অজ্ঞ, তেমনি মূর্খ প্রমাণিত হবেন। কিন্তু এই সব মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে তথা সামাজিক ব্যক্তি রূপে দেখতে পারেননি। এঁরা জীবন-সম্পর্কে সেই

মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি জুগিয়েছেন, যার প্রভাবে শিল্পকলার লক্ষ্য প্রস্ত এবং জয়েসের লেখায় মানবীয় ব্যক্তির রূপায়ণে নিবন্ধ না হয়ে মানবীয় ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করেছে।'[২১]

আধুনিক মনস্তত্ত্ব তথা মনোবিকলনের ভ্রান্তি সৈয়দ শামসুল হককে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত করেছে বলে মনে হয়। আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল সৈয়দ শামসুল হক যে কয়টি উপন্যাস রচনা করেছেন, তাতে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসাহ, লিপিচাতুর্য ও বাগ্-বিভূতির স্বাক্ষর অঙ্কিত সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের অখণ্ড রূপের উপলব্ধি কোথাও বিধৃত নয়। তাঁর 'এক মহিলার ছবি' (১৯৬৫) বিভিন্ন বর্ণপ্রলেপে এক ভঙ্গিসর্বস্ব চিত্রমাত্র। 'দেওয়ালের দেশ' (১৯৬৫), 'অনুপম দিন' (১৯৬২) ও 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)-তেও লেখক সমাজ-সত্যকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তি-সত্তার রূপায়ণে ব্যস্ত। আত্মকেন্দ্রিকতা ও মনোবিকলন পশ্চিমী উপন্যাসে যে সংকটের সূচনা করেছে, এসব উপন্যাস তারই শৌখিন অনুকৃতি মাত্র। আবার, যথার্থ মনোবিকলনধর্মী উপন্যাসও এগুলো হয়ে উঠতে পারেনি। এ জাতীয় উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের ধারায় একান্তে নিজের জন্য একটি স্থান করে নিয়েছে সত্য, কিন্তু তাতে আমাদের উপন্যাসের সামগ্রিক চরিত্র প্রভাবিত হয়ে পড়বে,– এমন মনে করার কোনো হেতু নেই।

সাত

ইতিহাস চেতনা-সমৃদ্ধ এপিকধর্মী উপন্যাস

'উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে হাজির করেন সে জীবন সামগ্রিক এই কারণে যে সে জীবন সৎ নয়, অসৎ নয়, অশুদ্ধ নয়, নীতিদুষ্ট নয়, নীতিগ্রস্ত নয়; সেই জীবন মানসোৎসুক হংস যে সব সময় উত্তীর্ণ হতে চাইছে; সে জীবন সেই সীতা যে বারংবার অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় দেবে কিন্তু পরীক্ষার কখনও অন্ত হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই অডিসি, ইলিয়াড, রামায়ণ, মহাভারতের মহাকবিরা একদিন ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের আশ্চর্য বোধের সামনে আমাদের যে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার কারণ এই সর্বতোমুখী সমগ্রতা। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান তিনিই পত্নী পুনরুদ্ধারের জন্য বালীবধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন তিনি মহাকবি–একালে মহৎ ঔপন্যাসিক।'[২২]

মহাকাব্যের যুগ যখন শেষ হয়ে যায়, তখন জীবনের সামগ্রিকতাকে ধরে রাখার প্রয়োজনে সাহিত্যের যে নতুন প্রকরণটির উদ্ভব ঘটে, তা উপন্যাস। এই নতুন প্রকরণের মাধ্যমে জীবনের সার্বিক রূপায়ণে ইউরোপীয় সাহিত্যে গত শতাব্দী থেকেই যে তৎপরতা দেখি, বাংলা সাহিত্যে তার সূত্রপাত সম্ভব রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' থেকেই। তার অনেক পরে, মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে সামাজিক জীবনের যথার্থতা ফুটে উঠতে দেখি তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এ। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাসে সামগ্রিক জীবন-রূপায়ণের প্রয়াস দেখা দিয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। পাকিস্তানোত্তর

প্রথম দশকে গ্রাম-কেন্দ্রিকতা, দ্বিতীয় দশকে নবলব্ধ নগর-চেতনার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবন-ধারা এবং মনোবিকলনের প্রতি আগ্রহ জীবনকে সামগ্রিকতার পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড করেই অবলোকন করিয়েছে। বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য দেখা দিলেও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বচ্ছতার প্রকাশ সর্বত্র দৃশ্যমান নয়। 'ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এই সমস্তের সারাৎসার।'[২৩] এ-সমস্তের সারাৎসার যে যথাযথ ব্যাপ্তি আর গভীরতা নিয়ে আমাদের সাম্প্রতিক কালের কিছু সংখ্যক উপন্যাসে স্থান করে নিতে পেরেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমাদের উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বকালের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা– পর পর সংঘটিত এ-কয়টি দুর্যোগের ঘূর্ণাবর্তে সৃষ্ট অশান্ত সমাজ-পরিবেশ অনেক কথা-সাহিত্যিককেই সৃষ্টি-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু দুর্যোগের আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে অনেকেই তাঁদের নিরুত্তাপ নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারেননি, সুস্থ ইতিহাস-চেতনার অভাবে আগুনে তাঁরা শুধু উত্তপ্তই হননি, কেউ কেউ পুড়ে ভস্মসাৎও হয়ে গেছেন। এই ক্রান্তিকালের পটভূমিতে শক্তিমান কথাশিল্পী আবুল মনসুরের 'জীবন ক্ষুধা' রচিত হয়েছিল। আবুল মনসুরের পক্ষে কথাশিল্পীর নির্লিপ্ততা রক্ষা করা তখন সম্ভব হয়নি, কারণ যে ইতিহাস একেবারে তাঁর চোখের উপর নির্মিত হচ্ছিল এবং তিনি ছিলেন যার নির্মাতাদেরই একজন, সে ইতিহাসকে নির্লিপ্তভাবে বিচার করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু, দুর্যোগের ফেনহিল্লোল থেমে যাবার এক যুগ পরেও কেউ যখন উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে শিল্পীসুলভ সংযম ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন না, তখন তাঁর ইতিহাস-চেতনার দৈন্যই চিহ্নিত করে যান। প্রমাণ– রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ'।

এর পরই যখন 'ক্ষুধা ও আশা', 'সংশপ্তক' ও 'অনেক সূর্যের আশা'র মতো উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন কথা-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক সমাজ-চেতনা তথা সুস্থ ইতিহাস-চেতনার অভিব্যক্তিতে বিবেকী পাঠক অবশ্যই পুলকিত হবেন। তিনটি উপন্যাসেরই কাহিনীর মূল প্রোথিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের পটভূমিতে এবং শাখা-প্রশাখা আরও দূর-প্রসারিত।

আলাউদ্দীন আল আজাদ বিশ্বাস করেন : "উপন্যাসের নব উদয়াচল জরাজীর্ণ বিষাক্ত অচলায়তন ভেঙে নতুন পৃথিবীতে মানুষের জাগরণের মধ্যেই শুধু উদ্ভাসিত হতে পারে। সে জন্য, উদ্ভবকালের মতো আজকের ঔপন্যাসিকও মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই যুদ্ধের মানে শুধু সমাজ-পরিবর্তন বা বিপ্লবের একনিষ্ঠ চারণ হওয়াই নয়, একটি উপন্যাসে একটি কুসংস্কারের মাথায় যে আঘাত হানল, সে-ও এই আয়োজনের সঙ্গে শরিক হল। বলা বাহুল্য, এখানেও শিল্পীর স্বাধীনতাই মূল মন্ত্র।

"আর এই সত্য সম্পর্কে যে সচেতন, একমাত্র তারই অধিকার আছে উপন্যাসের সংকট-মুক্তির সেই দুরূহ শিল্পকলাগত সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার, যার অর্থ হল ব্যক্তিগত আত্মব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সমাজগত জীবন্ত বাস্তবতার সম্মিলন ঘটানো। নতুন একজন ফিল্ডিং বা নতুন একজন জয়েসকে চাই না আমরা ; আমরা চাই স্তাঁদাল-

বালজাকের একাত্মতা। এবং তার জন্ম আমাদের দেশের মাটির ঘরেও হতে পারে না কি?"[২৪]

এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দানের প্রয়াসই পরিলক্ষিত হল তাঁর 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪)-য়। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর সঙ্গে ('তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' ও 'কর্ণফুলী') তুলনামূলক বিচারেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আজাদের শিল্পসাধনা বৃহত্তর ও মহত্তর সিদ্ধির পথে ক্রমাগ্রসরমান, 'ব্যক্তিগত আত্মব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সমাজগত জীবন্ত বাস্তবতার সম্মিলন ঘটানো'র সচেতন প্রয়াসে তিনি উদ্বুদ্ধ, 'স্তাঁদাল-বালজাকের একাত্মতা'র অভিনব রূপ হয়তো তাঁর মধ্যেই একদিন দৃশ্যমান হবে। খণ্ড থেকে অখণ্ড জীবন-বোধের দিকে উত্তরণের চিহ্ন হিসেবে 'ক্ষুধা ও আশা'য় গ্রাম ও নগরের সমাজ, নিচুতলা ও উঁচুতলার জীবন, সংগ্রামী ও পরাশ্রয়ী মানুষ– সকলের কাহিনীই একাধারে পরিবেশিত। অবশ্য হানিফ-ফাতেমা-জোহা-জহু– এ সব নিচুতলার মানুষের জীবন ও পরিপার্শ্ব-চিত্রণে লেখক যতটা সার্থককাম, উপরতলার আলী মর্তুজা চৌধুরী, রেজা বা লীনার প্রতি-চিত্রণে ততটা নন। তবু এ উপন্যাসে জীবন-বোধের এমন একটা ব্যাপ্তি আমরা লক্ষ্য করি, যাতে সমস্ত মূল্যবোধের ভাঙনের মধ্যেও সংগ্রামী মানবতার প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। উপন্যাসটি সম্পর্কে আবুল ফজল সাহেবের নিম্নোক্ত অভিমত নির্দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানুষের সৌন্দর্য-বোধকে যেমন তৃপ্তি দেয় তেমনি উদ্বুদ্ধ করে তোলে মহৎ ভাব আর আদর্শকেও। 'ক্ষুধা ও আশা' অনেকখানি সে পর্যায়ে উন্নীত। এ বই পড়ে আমার মনে এ আশা জাগে যে, যে অখণ্ড জীবন-বোধ থেকে মহৎ শিল্পকর্মের জন্ম একদিন এ লেখকের হাত থেকে তা হয়তো আমরা পাব।'২৫

শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক'-এর কাহিনী শুরু হয়েছে পূর্ব বাংলার উপকূল অঞ্চলের দুটি গ্রাম– বাকুলিয়া আর তালতলিকে কেন্দ্র করে। আঞ্চলিক জীবনধারার বিধৃতিতে উপন্যাস অগ্রসর হয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত, তবু এটি পরিণত হয়নি আঞ্চলিক উপন্যাসে। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী মহানগরী কলকাতা পর্যন্ত এর পট বিস্তৃত হয়ে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকেও তার সাময়িক বিচরণভূমি করে নিয়ে সর্বশেষে তার যবনিকা-পতন ঘটেছে এর উৎসভূমি বাকুলিয়াতে এসে। কালের দিক দিয়েও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ দিনগুলো থেকে শুরু করে, তরঙ্গ-সংকুল মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো পেরিয়ে এর বিস্তৃতি ঘটেছে স্বাধীনতা-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সংগঠনের যুগ পর্যন্ত। দেশ ও কাল– দুদিক দিয়েই এর বিস্তৃতি দূরপ্রসারী, এপিকের ব্যাপ্তি নিয়ে সংস্থিত এর কাহিনীর গঠন। তাই কোনো বিশেষ অঞ্চল বা কালের পরিচয় চিহ্ন এঁটে এর অভিধা নির্দেশ করা চলে না। কোনো বিশেষ নায়ক বা নায়িকার জীবন-চিত্র হিসেবে, কিংবা ত্রিভুজ প্রেমের বঙ্কিম গতির অতি সরলীকৃত বিশ্লেষণের পরিচয়বাহী কোনো সাধারণ সংজ্ঞায় উপন্যাস বলেও এটি চিহ্নিত হতে পারে না। 'সংশপ্তকে'র স্রষ্টার সময়-সমাজ ও

ব্যক্তিমানসের জ্ঞান পরিশ্রুত হয়েছে তাঁর সংস্কার-মুক্ত অপক্ষপাত ইতিহাস-জ্ঞানের বকযন্ত্রে। ইতিহাস-বোধের ভ্রান্তিবিলাস যে উপন্যাসের শিল্পরূপের কতখানি ক্ষতি সাধন করতে পারে, বাংলা সাহিত্যে তার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিমল মিত্র পর্যন্ত। প্রচলিত অর্থে যাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে, 'সংশপ্তক' নিশ্চয়ই তার অন্তর্গত নয়। তবুও স্মর্তব্য যে : যে কোনো উপন্যাসের শিল্প-সার্থকতা ইতিহাস-চেতনার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কোনো বিশেষ সময় ও সমাজে বিচরণশীল ব্যক্তির মানস-গঠনের ওপর ইতিহাসের ধারার প্রভাবকে উপলব্ধি করতে না পারলে, পরিচিত নর-নারীর হৃদয়-বেদনা ও সমাজের বাস্তব সমস্যা সমন্বিত একটি বিশ্বাস্য আলেখ্য তথা সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে ওঠে। 'সংশপ্তকে' যে সার্থকতার স্পর্শ লেগেছে, তার অনেকখানিই এর স্রষ্টার ইতিহাস-চেতনার ফলশ্রুতিজাত। তীক্ষ্ণ ইতিহাস-চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই শহীদুল্লাহ কায়সার তাঁর সৃষ্ট কুশীলবদের শ্রেণী-সত্তা ও ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কে সমানভাবে সতর্ক রয়েছেন। কোনো চরিত্রই তাঁর হাতে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য-বর্জিত টাইপ হয়ে ওঠেনি, কিংবা শ্রেণী-সত্তা উপেক্ষিত হয়ে লেখকের আদর্শ প্রচারের যন্ত্রে পরিণত হয়নি। কট্টর সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ফেলুমিঞা আর বণিক অর্থনীতির মিশালে তৈরি জমিদার রামদয়াল– এই দুই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য তাই লেখকের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট প্রতিফলন লাভ করেছে। কাঁচা টাকার সম্পদে রামদয়ালের কাছে হেরে গিয়ে ফেলুমিঞা পূর্বপুরুষের আভিজাত্য গর্বের আশ্রয় নিয়ে তার বিপন্ন আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করতে চেয়েছে–

"এই বাংলা দেশটা, তামাম হিন্দুস্থানটা কাদের ছিল জান?..... সেই যে আকবর বাদশা, তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা ছিলেন। আর ঐ যে নবাব আলীবর্দী, তিনি ছিলেন সুবে বাংলার হর্তাকর্তা মালিক। তাঁদেরই বংশধর আমরা, এই দেশ তো আমাদের। ...কিন্তু ঐ শূয়োরখোর ইংরেজ? কেড়ে নিল আমাদের বাদশাহী তখ্‌ত্। বাদশার জাত, আমরা এখন ভিখিরির জাত। পোয়াবারো ঐ মালাউনদের, জমি জিরাত সবই লুটে পুটে খাচ্ছে ঐ ব্যাটারা।"

এ ক্ষোভ শুধু একক ব্যক্তি ফেলুমিঞার নয়, ফেলু মিঞাদের শ্রেণীর। ফেলুমিঞার বড় ভাইদেরও ক্ষোভ আছে, কিন্তু তার চরিত্র অন্যতর। কারণ, তারা সরকারি চাকরিজীবী, ভূ-সম্পত্তিভিত্তিক গ্রামীণ সামন্তশ্রেণী থেকে তাদের উত্তরণ ঘটেছে কাঞ্চন-কৌলিন্যের দাবিদার নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে। সে শ্রেণীরই প্রাগ্রসর ও সচেতন সদস্য জাহেদ। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর চরিত্র নিয়েই সে পরম আন্তরিকতায় যোগদান করে পাকিস্তান-আন্দোলনে। সে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বর্গ-সংঘর্ষ যে জটিল রূপ পরিগ্রহ করে, তারই পরিণতিতে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গার বিপর্যয়ের মধ্যেও সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের যেখানে ভাস্বর প্রকাশ ঘটেছে, লেখক তাকেই ছেঁকে তুলে এনেছেন।

'সংশপ্তকে'র স্রষ্টার মতো তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাও কেউ কেউ এই ইতিহাস-চেতনার অধিকারী হয়েছে। যেমন, জাহেদ আর রাবেয়া। স্বাধীনতা-আন্দোলন, আত্মনিয়ন্ত্রণ-

অধিকার আন্দোলনের শেষে অর্জিত সাফল্যেও তারা পরিতৃপ্ত হতে পারেনি, বৃহত্তর জীবনানন্দ লাভের জন্য সংগ্রামের বন্ধুর জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রাবেয়া জীবনের কথা শুনতে চেয়েছে, আর জাহেদ শুনিয়েছে, ... 'তখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ আসেনি। দলবদ্ধভাবে শিকার করত, যা পেত এক সাথে ভাগ করে খেত আদিম মানুষ... দলপতি ছিল একান্তভাবেই আজকের নির্বাচিত প্রতিনিধির মতো...। এল গোষ্ঠী-প্রথা...।"

সবাই অবশ্য জাহেদের মতো সমুন্নত চেতনার অধিকারী হয়নি, হওয়া সম্ভব নয় বলেই তাই জীবন-যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত মালু, পরিবেশের চাপে-পড়ে-সিনিক হয়ে ওঠা সেকান্দার মাস্টার, নব্য-অর্থতন্ত্রের ক্লেদের মধ্য-থেকে-উঠে-আসা রমজান, তথাকথিত মারেফতে আশ্রয়-সন্ধানী দরবেশ আর মোজাদ্দেদী সাহেব কাউকেই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কেউই আমাদের অপরিচিত নয়।

তবে সকল চরিত্র-নির্মাণেই লেখক সমানভাবে অপক্ষপাত দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে রিহানার কথা। চরিত্রটি অস্বাভাবিক হয়তো নয়, কিন্তু তার বিকাশ-ধারাকে স্পষ্ট করে তুলবার কোনো প্রয়োজন লেখক অনুভব করেন নি। কেবল মালুর সঙ্গে তার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার অকরুণতার দিকটিকে না দেখিয়ে রিহানার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে স্ফুটতর করার অবকাশও নিশ্চয়ই ছিল। মালুর চোখ দিয়েই আমরা রিহানার সামাজিক অবস্থানটিকে অবলোকন করলাম, তার বা তার দ্বিতীয় প্রেমিকটির অন্তরলোকে আমাদের প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার সম্ভব হল না।

অথচ, সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটির গঠনশৈলীর ত্রুটি বিমুক্তির জন্য লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয় রূপে আন্তরিক। কোনো-একটি বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল ঘটনা অবলোকন না করে, (যে আঙ্গিকটি সাম্প্রতিক কালের অনেক বৃহদায়তন উপন্যাসেই অনুসৃত হয়ে একটা অনিবার্য ত্রুটি রূপে দেখা দেয়) লেখক প্রতিটি ঘটনা ও তার সঙ্গে যুক্ত সকল চরিত্রের প্রাতিস্বিক মর্যাদা দান করেছেন, ও এভাবেই জীবনের সামগ্রিকতার নির্বাক পরিস্ফুটন সম্ভব করে তুলেছেন। একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা নিয়েই যদিও উপন্যাসটির কাহিনী শুরু, তবু আঞ্চলিক জীবন-চিত্রণের নামে লেখক অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী খুলে বা আঞ্চলিক ভাষার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে অপর অঞ্চলের লোকের দুর্বোধ্যতা-জনিত ভীতি উৎপাদনের অপপ্রয়াসে মেতে ওঠেননি। পাঠক-চিত্তে সহজ সঞ্চরণের জন্য এতখানি আন্তরিক প্রয়াসের পর, একটি বৃহদাকৃতির উপন্যাসেও যদি কোথাও অস্পষ্টতা থেকে যায়, তবে তা হয় লেখকের অসাবধানতাবশত, নয় কোনো বিশেষ কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজন-প্রসূত। 'সংশপ্তকে' মনে হয়, উভয় কারণই বিদ্যমান। দাঙ্গা ও দেশবিভাগের পর কাহিনীর পৃষ্ঠ-পট কলকাতা থেকে ঢাকায় অপসৃত হয়েছে। কিন্তু সে অপসৃতি সাধিত হয়েছে কোনো রূপ প্রস্তুতি বা স্পষ্ট বিবরণী ব্যতিরেকেই। তাই, ঢাকাই জীবন-ধারা চলবার বেশ কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পাঠক স্থান-সচেতন হতে পারে না। এ অস্পষ্টতা সম্ভবত লেখকের অসাবধানতা প্রযুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাহেদ ও রাবেয়ার, রাজনৈতিক

চিন্তার বিবর্তন বা তাদের কার্যবিধির বিবরণী প্রদানে লেখক কি ইচ্ছাকৃতভাবে, কিংবা কোনো অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন?

এ ছাড়া, বইয়ের কোথাও লেখক বক্তব্যকে হেঁয়ালি দিয়ে আবৃত করতে চাননি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর অতিবিস্তারের ঝোঁক প্রবল। সে অতিবিস্তার যদিও কোথাও সুখপাঠ্যতার হানি ঘটায়নি, তবু লেখকের একটি বিশেষ মানস-প্রবণতা নিশ্চয়ই এতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সে প্রবণতা অবশ্য তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সারেং বৌ'-এ যতটা প্রবল ছিল, 'সংশপ্তকে' ততটা নয়। তবু মালু-রিহানার মন দেয়া-নেয়ার বিবৃতিতে যে বিস্তার ঘটেছে, তা নিশ্চয়ই সৎ ঔপন্যাসিক সুলভ সংযম বা নির্লিপ্তির পরিচায়ক নয়। তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টি ও যথার্থ ইতিহাস-বোধের অধিকারী হলেও কথাশিল্পী হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিপূর্ণ সিদ্ধি নির্ভর করবে তাঁর রোমান্টিক বৃত্তিকে সংযত করতে পারার ওপর। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শহীদুল্লাহ কায়সারের তুলনার কথা স্বভাবতই মনে জাগে। সমাজ-চেতনা, ইতিহাস-জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের প্রশংসনীয় অধিকারী হয়েও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্টিক মানস তাকে অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। শহীদুল্লাহ কায়সারেরও সেই একই নিয়তি হবে কিনা ভবিতব্যই তা নির্ধারণ করবে।

তবু দ্ব্যর্থহীনভাবেই ঘোষণা করব, শহীদুল্লাহ কায়সার আমাদের কথা-সাহিত্যে একটি অফুরন্ত সম্ভাবনাদীপ্ত নাম আর তাঁর 'সংশপ্তক' একটি উজ্জ্বল সাহিত্য-কীর্তি।

সরদার জয়েন উদ্দীনের 'অনেক সূর্যের আশা'য় (১৯৬৭)-ও 'সংশপ্তকে'র মতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী পাকিস্তান-যুগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন : 'বলা যায় এ কাহিনী অনেক মহান-জীবন ও ঘটনার বাস্তব বিবরণী। কিন্তু যেহেতু এটা উপন্যাস সে কারণে আমাকে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে রূপ ও রসাশ্রয়ী হতে হয়েছে।

'উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়। তবে কালের একটা ছাপ এতে দাগ কেটেছে এবং এর চরিত্রসমূহের কর্মফল ইতিহাস-রূপ লাভ করেছে; তাই, এ উপন্যাস ইতিহাস-আশ্রয়ী।'

লেখক সচেতনভাবে ইতিহাস-বোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন বলেই 'রূপ ও রসাশ্রয়ী' হয়েও উপন্যাসে বাস্তবতার ব্যত্যয় ঘটাননি। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপট সম্পর্কে উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক এখনও চলে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই তা ভাবাবেগ-বর্জিত ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকে। সরদার জয়েন উদ্দীনে সে সত্যনিষ্ঠা বর্তমান বলেই পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তিনি পক্ষপাতহীনভাবে উপন্যাসের মাধ্যমে পরিবেশনে সক্ষম হয়েছেন। চরিত্র-চিত্রণে যে সহানুভূতির পরিচয় এতে বিধৃত, তা যথার্থ সৎ ঔপন্যাসিক সুলভ। হায়াৎ খাঁ নানা ও হেনার মা ঝি—দুটি আদর্শায়িত বাস্তব চরিত্র। ছমির মিঞা, মফিজ, সাফাজ, শাজাহান চৌধুরী, কমল রায়, মিস রডারিক প্রভৃতি ছোট বড় কোনো চরিত্রই অবাস্তব নয়। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ উপন্যাসেরই যে ত্রুটি,—প্রেমের ঘটনা বর্ণনায় অতিরিক্ত ভাবালুতার

আশ্রয় গ্রহণ–তা থেকে 'অনেক সূর্যের আশা'ও মুক্ত নয়। মিসেস সাইপ্রির চরিত্রটিকে অবাস্তব বলা না গেলেও, উপন্যাসে তার প্রতিচিত্রণে লেখকের নির্লিপ্তির পরিচয় অনুপস্থিত। প্রেমের আদর্শায়িত রূপের বিবৃতি দিতে গিয়ে উপন্যাসের কাঠামো দৃঢ়বদ্ধতায় অনর্থক বিপর্যস্ত। তবে খণ্ডাংশের এ ত্রুটির জন্যই উপন্যাসটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে নি। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটিতে সামাজিক বাস্তবতার শৈল্পিক প্রকাশ আমাদের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করে তোলে্ হায়াৎ খাঁ নানার চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে শুধু আদর্শবাদী সংগ্রামের রূপই নয়, আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে শিল্প-শ্রমিকদের উপস্থিতিও লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। গ্রামের কৃষকরা আমাদের উপন্যাসে দীর্ঘদিন থেকেই উপস্থিত; কিন্তু নগর-চেতনার উদ্বোধনেও উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত-জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে ঔপন্যাসিকরা শিল্প-শ্রমিকদের চেতনাকেও ভাষারূপ দিতে প্রয়াসী হননি। 'অনেক সূর্যের আশা'ও শিল্প-শ্রমিকদের নিয়ে রচিত উপন্যাস নয়, তবু হায়াৎ খাঁ নানার প্রসঙ্গে এখানে শিল্প-শ্রমিকদেরও অস্তিত্ব সোচ্চারে ঘোষিত। উত্তম পুরুষে বিবৃত এ-উপন্যাসের নায়ক রহমৎ পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্নে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসার সময় অনেক সূর্যের আশার আলোতে ছিল উজ্জীবিত :

'তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় পূব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠেছে, ঝলমল করে রেঙে উঠেছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলই ভাবছি, ওই ওখানে আলোর পারে সে দেশ–সে স্বপ্নের দেশ–সে আজাদ দেশ আমার! যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব। গরিব-কাঙাল রাজা জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ।

'হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে গাড়ি থামলো, সম্বিত ফিরে সামনে চেয়ে দেখি, সবুজ সুন্দর আজাদ পতাকা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক শান্তির বিমল চাঁদ বুকে নিয়ে পত-পত করে উড়ছে।' (অনেক সূর্যের আশা, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

সে স্বপ্নের দেশ, সে আজাদ দেশে হায়াৎ খাঁ নানার আত্মাহুতি নবতর পথের ইঙ্গিতবাহী, অনেক সূর্যের আশা তাতে ম্লানদ্যুতি হয়নি।

'ক্ষুধা ও আশা', 'সংশপ্তক' এবং 'অনেক সূর্যের আশা'– প্রায় একই পথের অভিযাত্রী হয়ে আমাদের সাহিত্যে পরিপূর্ণ জীবন-বোধ-সমৃদ্ধ উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

আট

ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্স নিয়ে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর উত্তরসূরীরাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁরই অনুসরণে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'র অধিকারী হয়েও ইতিহাসের যথাযথ অনুধাবনে সক্ষম হননি। ইংরেজ লেখকদের দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত রাজপুতানা ও

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তাঁকে ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধে উত্তেজিত করেছিল এবং এরই সঙ্গে তাঁর কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে ইতিহাসের ভেজাল-মিশ্রিত রোমান্স রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইতিহাসের এই ভ্রান্তিবিলাস বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতিতে এমন একটা তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল যে, বিশ শতকের 'নবজাগ্রত মুসলিম সমাজ' বঙ্কিমচন্দ্রের' দাঁত ভাঙা জবাব' দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির নামে অন্যতর ভ্রান্তিবিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস-চর্চা এবং উপন্যাস রচনা– এ দেশে জাতীয়তার নামে সাম্প্রদায়িকতা এবং ইতিহাস-চর্চার নামে সাম্প্রদায়িক গৌরব-গাথার আত্মরতিই বঞ্চিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-উত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যে যখন নতুন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে দেখি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আশাবাদের সঙ্গে সন্দেহ-প্রবণতাও মিশ্রিত হয়ে থাকে। পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো পাঠ করে সে আশাবাদের পূর্ণতা বা সন্দেহপ্রবণতার নিরসন হয় না।

ইব্নে রশীদের 'ফাল্গুন করা' (১৯৫৮) ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও, পারিবারিক ইতিহাসের উপাদান নিয়ে লিখা এ উপন্যাসটিতে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির কথা উত্থাপিত। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' বইটিতে পারিবারিক ইতিহাসের পটভূমিকায় সামাজিক ইতিহাসের পট পরিবর্তনের রূপ যেভাবে প্রকাশিত 'ফাল্গুন করা'য় তা দৃষ্টিগোচর নয়। ত্রিপুরা জেলার ফাল্গুন করা গ্রামের আবু রশীদ সাহেবের পারিবারিক কাহিনী আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে যদি রসসিক্ত করে তুলে ধরতে পারত, তবে এ বই আমাদের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হত। আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩) প্রায় দেড় শতাব্দী কাল আগের ওয়াহাবী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসে গল্পরস জমাতে লেখক যতটুকু সচেষ্ট হয়েছিলেন, কাহিনীর আকস্মিক পরিসমাপ্তি তাকে নিদারুণভাবে ব্যাহত করেছে। দেড় শত বছর আগের কাহিনীকে নতুন যুগের নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করা আবু জাফর শামসুদ্দীনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিশ শতকের সপ্তম দশকেও পুনর্জাগরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কোনো লেখকের কাছ থেকে কাম্য হতে পারে না। প্রায়-অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখা মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' (১৯৬৩)। 'পূর্বদেশ'-এর কাহিনীর পটভূমি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা দেশ। এর নায়ক শমসের গাজী। সংযমের অভাব ও রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি উপন্যাসটিকে শিল্পসিদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। সাম্প্রতিক কালের জীবনে অশান্তি ও নৈরাশ্য প্রকট বলেই অতীতচারী হয়ে স্ব-কপোলকল্পিত রোমান্সের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব ও অজ্ঞাত পূর্বপুরুষের কাল্পনিক শৌর্যবীর্যের কাহিনী দিয়েই নিজেদের ভীরুতাকে ঢেকে রাখব, এমন মানসিকতা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। বর্তমান কালের লেখক যখন ইতিহাসের মুখোমুখি হন, তখন তাঁকে শুধু ঘটনাবলির নিরপেক্ষ ইতিবৃত্তকার সাজলেই চলে না, কিংবা রসসৃষ্টি বা অতীত গৌরব প্রমাণের খাতিরে ঘটনা ও চরিত্রের উপর অস্বাভাবিক

বর্ণপ্রলেপ দিয়ে বিকৃত করার অধিকার জন্মে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের কাজ ইতিহাসের গতিধারার বিধানগুলোকে উদ্‌ঘাটিত করে তার চালক শক্তিগুলোকে স্পষ্ট তুলে ধরা, যাতে ইতিহাসের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের মানুষের একটা সহজ সেতুবন্ধ রচিত হতে পারে। ঐতিহাসিক যেখানে শুধু তথ্যকে উপস্থাপিত করে বা সে তথ্যকে ব্যাখ্যা করেই তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসকারকে সেখানে ঐতিহাসিক কল্পনা-বোধ (Historical imagination)-এর আশ্রয়ে বিশেষ বিশেষ যুগের সর্বস্তরের নর-নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বেগ, দৃশ্য ও ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলতে হয়। অর্থাৎ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস কথা কয়ে উঠবে ও ভবিষ্যৎ পথের দিকে তর্জনী প্রসারিত করে দেবে। আমদের পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এমন কোনো প্রত্যাশাই পূর্ণ হয় না, কোথাও ইতিহাস কথা কয়ে ওঠেনি। চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়' (১৯৬২) মজনু শাহের ফকির আন্দোলনের ইতিবৃত্তমাত্র, এতে গল্পের ভেজাল থাকলেও তা উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসটির কোনো দৃঢ়বদ্ধ কাহিনী নেই, অথচ কতকগুলো চরিত্র আমদানি করা হয়েছে লেখকের আদর্শ প্রচারের বাহক হিসেবে। যেভাবে ফুটনোট-কণ্টকিত করে বইটি রচিত হয়েছে, তাতে একে ঐতিহাসিক তথ্যপুস্তক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারত, যদি লেখক উচ্ছ্বাস-প্রবণতা দিয়ে বস্তুনিষ্ঠতাকে বারবার ব্যাহত না করতেন। একমাত্র সরদার জয়েন উদ্দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫) আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ-স্পৃহার পরিতৃপ্তি বিধানে কিছুটা সক্ষম। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে বাংলা ভাষায় অবিস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যদিও, তবু পাকিস্তানোত্তর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত 'নীল রঙ্ রক্ত'কে অনাবশ্যক সৃষ্টিকর্ম বলে মনে হয় না। ইতিহাসের সত্যকে উপন্যাসের আধারে পরিবেশন করে লেখক এর প্রতিটি চরিত্রকেই জীবন্ত করে তুলেছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সাধারণ মানুষ যে তাদের কৃত্রিম বিভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, সে কাহিনী আমাদেরকে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলে।

শিল্পসার্থকতার বিচারে আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো যে মূল্য বহন করুক না কেন, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে এগুলো এক নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে সার্থকতর ঐতিহাসিক উপন্যাসের দৈন্য ঘুচে যাবে– এ আশা আমরা পোষণ করতে পারি এদেশে আমাদের সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখেই।

বিচিত্র

পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের সঙ্গে দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসের পার্থক্য শুধু সংখ্যাগত বা গুণগতই নয়, প্রকারগতও। জীবনের বহুমুখী ধারার সঙ্গে আমাদের শিল্পীরা যতই পরিচিত হচ্ছেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মেও ততই বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে ও নতুন নতুন

প্রকরণ অবলম্বনে প্রযত্ন দেখা দিয়েছে। তাই গতানুগতিক সংজ্ঞার অবয়বে নতুন সৃষ্টিকে পুরে দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

ভাববস্তু ও আঙ্গিক– উভয় ক্ষেত্রেই চমকপ্রদ অভিনবত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)। এর প্রস্তাবনা অংশে সাধারণ গল্পের বিবৃতিমূলকতা, কিন্তু মূল আখ্যানে অবলম্বিত্ব চিত্রনাট্যের আঙ্গিক। এই নতুন নিরীক্ষার অভাবিত-পূর্বতা সম্পর্কে সচেতন বলেই লেখক বইয়ের মুখবন্ধে এর কিছুটা ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পেশ করেছেন:

'প্রতিধ্বনির সাহায্যে গিরি-কন্দরের গভীরতা এবং দূরত্ব জ্ঞাপনের পন্থায় এই পুস্তক রচিত। বিবরণ বহুলাংশে কম। এ জন্য পাঠকের পক্ষে কল্পনা অপরিহার্য। এমনকি বহু জায়গায় কথোপকথন থেকে স্থানীয় পরিবেশ আন্দাজ করে নিতে হবে। পাঠকের বুদ্ধি এবং কল্পনার উপর নির্ভর করেই সেই সংক্ষেপণের সাহস পেয়েছি।'

এ উপন্যাসটির মর্মগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে অবশ্যই সজাগ রাখতে হবে, তা না হলে এর মূল্যায়নে ভ্রান্তি অনিবার্য। পুস্তকটির আদমজী পুরস্কার-প্রাপ্তির পর বিভিন্ন মহল থেকে ভ্রান্তিজনিত আক্রমণ এ উপন্যাসটির উপর বর্ষিত হয়েছে। মহান সম্রাট হারুনর রশীদ ও তাঁর পত্নী জুবায়দার চরিত্রকে বিকৃত করার অভিযোগ এর বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়েছে। অথচ লেখক মুখবন্ধেই জানিয়ে দিয়েছেন :

'উপন্যাস কাহিনী, ইতিহাস নয়। পাঠক যেন তা ভুলে না যান। এই পুস্তকের কোনো চরিত্রই ঐতিহাসিক নয়, –যদিও তাদের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সে শুধু অতীতের অনুরণনিত কিছু আমেজের প্রত্যাশায় ব্যবহৃত; ধ্রুপদ গায়ক যেমন তানপুরা ব্যবহার করেন সুরের স্থায়ী সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। আবু নওয়াস, আতাহিয়া বিখ্যাত কবি। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতা তাঁদের দীওয়ান থেকে অনূদিত। অবিশ্যি এখানে কবি-চরিত্র আমার কল্পনা মাত্র। অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য।'

ঐতিহাসিক উপন্যাস-বিচারের মাপকাঠি দিয়ে এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারণ করতে গেলে অবশ্যই বিভ্রান্তির কুম্ভীপাকে আবর্তিত হতে হবে। সত্য বটে, এর মূল কাহিনীটি সমকালীন সমাজ-জীবনের নয়, লেখক রূপকথার রাজ্যে মানস-অভিসার করে হারুনর রশীদের বাগদাদের এক কাহিনী এ যুগের পাঠকের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু, সে যুগের কাহিনীর মধ্যে সর্বযুগের এক চিরন্তন সত্যই লেখকের অন্বিষ্ট। 'দিরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বাঁদী কেনা সম্ভব– ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না।'- ক্রীতদাসের হাসি'র নায়কের এ উক্তি নিঃসন্দেহে সর্বযুগের জন্যই সমান তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, এর সবগুলো চরিত্রই এক একটি শ্রেণীর প্রতীক। খলীফা ও মশরুর–অত্যাচারী ক্ষমতামদগর্বীর, তাতারী–উৎপীড়িত মানবতার ও কবি নওয়াস–চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে।

উপন্যাসটির প্রস্তাবনা অংশের দীর্ঘতা নিয়ে পাঠকের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠতে পারে, এবং নায়িকা মেহেরজানের চরিত্রটির সুসঙ্গত বিকাশের অভাবও মনে ক্ষোভ না জাগিয়ে পারে না। এই রকম আরও অনেক ছোটখাটো অসঙ্গতিই নির্দেশ করা যেতে

পারে বৈকি। কিন্তু, তবু এ কথা স্বীকার্য যে : পূর্ব পাকিস্তানের গতানুগতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-বই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এবং এর দোষ-ত্রুটিগুলো উৎকর্ষকে ম্লান করে দিতে পারেনি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখের হাতে যে ধরনের বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস রচিত হয়েছে, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যে তেমনটি আজও দেখা দেয়নি। তবু, আবুল হাসনাতের 'মিলন সঙ্ঘ'-এর নাম এ কারণে উল্লেখ্য যে, কুসংস্কারবর্জিত মুক্ত জীবন-দৃষ্টির পরিচয় এতে উদ্‌ঘাটিত। উপন্যাস রূপে এর শিল্পসিদ্ধি নিতান্ত নগণ্য হলেও, সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তথা সুস্থ জীবন-চেতনার প্রয়াস হিসেবে তা মূল্যহীন নয়। মোহাম্মদ মোর্তজার 'চরিত্রহানির অধিকার' (১৯৬৬)-এ ব্যক্তি-জীবনের সমস্যাকে সমাজতত্ত্বের দর্পণে অবলোকনের প্রয়াস পরিস্ফুট। অবশ্য, লেখকের জীবন-চেতনা যদি উপন্যাসের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত প্রবন্ধের সাহায্য ছাড়া মূল রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশিত হত, তবেই তার শৈল্পিক কৃতিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত।

পাঠকবর্গের অভিনন্দনধন্য কোনো উপন্যাসের নতুন পরিপূরক সৃষ্টি সাধারণের কৌতূহল আকর্ষণে সমর্থ হয়। বাংলা সাহিত্যে তার একাধিক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সে সব দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা-জাত সৃষ্টিই বোধ হয়, চৌধুরী শামসুর রহমানের 'শেষ পর্বে শ্রীকান্ত' (১৯৬০)। শরৎচন্দ্রের ভাষাকে কিছুটা অনুকরণে সমর্থ হলেও তাঁর শিল্পদৃষ্টি 'শেষ পর্বে শ্রীকান্ত'র লেখকের অনায়ত্ত।

কারাজীবনের ভিত্তিতে রচিত কাহিনী পরিবেশিত সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯) উপন্যাসে। অপরাধী-নিরপরাধ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের পরিচয়ে এ বইয়ের চরিত্র ও ঘটনাবলি প্রোজ্জ্বল। অপরাধ, বিচার, জেল প্রভৃতির কাহিনী বিপুলভাবে সাধারণ পাঠক আকর্ষণে সমর্থ বলেই, কারাকাহিনী ও গোয়েন্দাকাহিনী মূলক উপন্যাসে বাজার সরগরম থাকে। সে বাজারের আকর্ষণ থেকে অবশ্য 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ'-এর সৃষ্টি হয়নি। লেখক মানুষের পরিপূর্ণ স্বরূপ অনুসন্ধানের স্পৃহায় চালিত; কিন্তু এ উপন্যাসে কতকগুলো খণ্ডচিত্রের বেশি কোনো কিছু পরিশেনে তিনি সক্ষম হননি। উপন্যাসের সামগ্রিকতার অভাব থাকলেও বইটি সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে বলা চলে না, এটি একটি সৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'নীল যমুনা' (১৯৬৪)-কে কিন্তু 'সৎ সাহিত্য প্রচেষ্টা' বলে আখ্যায়িত করা অসম্ভব। পশ্চিম বাংলার নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখের হালকা কল্পনা বিলাস-পূর্ণ গল্প-উপন্যাসের জনপ্রিয়তায় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীও বিভ্রান্ত। সে বিভ্রান্তিরই ফলশ্রুতি তার 'নীল যমুনা'। গোয়েন্দা গল্পের ভেজালমিশ্রিত কাহিনী ও রহস্য উপন্যাসের আঙ্গিক অবলম্বিত উপন্যাসকে 'সামাজিক কাহিনী' বলে চিহ্নিত করে 'নীল যমুনা'র লেখক পাঠক-প্রতারণা ও আত্ম-প্রতারণার পন্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হয়েছেন। সে উদ্যোগ তাঁকে সাহিত্যিকের সততা থেকে ভ্রষ্ট করেছে। একজন প্রতিশ্রুতিশীল কথাশিল্পীর এই সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।

হত্যা এবং অপরাধ-বোধ নিয়ে রচিত উপন্যাসও অবশ্য সৎ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) তার দৃষ্টান্ত। প্রকরণগত দিক দিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লাল সালু' থেকে 'চাঁদের অমাবস্যা' এক স্বতন্ত্র ধরনের সৃষ্টি। এ উপন্যাসে নায়ক 'যুবক শিক্ষকে'র অন্তর-লোকের চিত্র পরিবেশিত হলেও, এটি গতানুগতিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের অন্তর্গত নয়। নতুন দার্শনিক মতবাদ হিসেবে 'অস্তিত্ববাদে'র কথা বর্তমানে বহুল আলোচিত হলেও আমাদের সাহিত্যে ইতঃপূর্বে তার প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'চাঁদের অমাবস্যা' ঐ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত একটি নতুন নিরীক্ষামূলক উপন্যাস। 'মানুষের জীবন ভঙ্গুর হলেও মূল্যহীন নয়'– এই বোধের দ্বারা চালিত হয়েই যুবক শিক্ষক একটি নারীহত্যার ঘটনাকে অনাবৃত করে দিয়েছে। ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন না করে, কেবল একটি মাত্র তীব্র বোধের ভাষারূপ প্রদানের সাহায্যে জীবনের অস্তিত্বের তাৎপর্যকে অভিব্যক্ত করার কৌশলে 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি অনুপম সৃষ্টি।

উপসংহার

প্রায় বিশ বছরের পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাস-পরিক্রমার উপসংহার, সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

এক॥ উনিশ শ' সাতচল্লিশ থেকে উনিশ শ' সাতান্ন সন পর্যন্ত পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন।

দুই॥ দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভ কাল থেকেই পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাল রেখে উপন্যাসেও বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটে। উপন্যাসের পটভূমিকার স্থানগত ও কালগত বিস্তৃতি সাধিত হয়। অপরিজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবন ও হারানো দিনের কাহিনীর দিকে ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়,– আঞ্চলিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতেই তার প্রমাণ বিধৃত।

নতুন নগর-চেতনা উদ্ভবের ফলে নগর-জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র অঙ্কন ও মনোবিকলনমূলক উপন্যাস সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দেয়। জীবনের খণ্ডচিত্রে পরিতৃপ্ত না থেকে বৃহৎ পরিসরের এপিকধর্মী উপন্যাস সৃষ্টিতেও এ দশকের ঔপন্যাসিকরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাছাড়া, সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, এমন সব বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এ দশকের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে।

তিন॥ আমাদের ঔপন্যাসিকদের বাস্তবদৃষ্টির অভাব না থাকলেও, রোমান্টিকতার অতিরেক থেকে আমাদের উপন্যাস-শিল্প আজও মুক্ত হতে পারেনি।

চার॥ গ্রাম-জীবনের তুলনায় নগর-জীবন আমাদের উপন্যাসে অনেক নিষ্প্রভ। গ্রামের কৃষক আমাদের উপন্যাসে যে মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত, শহরের শিল্পশ্রমিক তা নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক-জীবন নিয়ে কোনো উপন্যাসই এ পর্যন্ত রচিত হয়নি।

পাঁচ॥ পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় দ্বিতীয় দশকের ঔপন্যাসিকরা অনেক বেশি আঙ্গিক-সচেতন হয়ে উঠেছেন। বক্তব্যের শূন্যতাকে ঢাকবার জন্য কোনো কোনো উপন্যাস আঙ্গিক-সর্বস্বও হয়ে উঠেছে। সমাজের নানা স্তরের জীবনের আবহ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখকরা প্রচুর আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করছেন।

পরিশেষে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের উপন্যাস-শিল্পে বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগত ও গুণগত উত্তরণও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অদূর-ভবিষ্যতেই প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে– এমন আশা পোষণ করার পশ্চাতে যথেষ্ট হেতু বর্তমান।

পরিশিষ্ট-১

উল্লেখযোগ্য পূর্ব পাকিস্তানি উপন্যাস

(১৯৪৭-১৯৫৭)

আবুল ফজল

(ক) জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮)

(খ) রাঙ্গা প্রভাত (বাং ১৩৬৪; ইং ১৯৫৭)

আবুল মনসুর আহমদ

(ক) জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫)

(খ) সত্যমিথ্যা (১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ প্রথম দশকে)

[যোয়ান বোয়ারের ঞযব চড়বিৎ ড়ভ খরভব-এর বাংলা রূপান্তর]

আবু ইসহাক

(ক) সূর্যদীঘল বাড়ি (কলকাতা ১৯৫৫)

আবু রুশ্‌দ

(ক) সামনে নতুন দিন (১৯৫৬)

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

(ক) খরতরঙ্গ (১৯৫৭)

(ইভান তুর্গেনেভের গল্প অবলম্বনে)

আকবর হোসেন

(ক) অবাঞ্ছিত (১৯৫০)

(খ) কি পাইনি (১৯৫১)

(গ) মোহমুক্তি (১৯৫৭)

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

(ক) চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৫২ সালে সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত)

ইসহাক চাখারী

(ক) পরাজয় (১৯৫৪)

(খ) মেঘবরণ কেশ (১৯৫৬)

কাজী আফসার উদ্দীন

(ক) চর ভাঙ্গা চর (১৯৫১)

দৌলতুন্নেছা

(ক) পথের পরশ (১৯৫৭)

নজরুল হক

(ক) দুই তরঙ্গ (১৯৫৪)

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

(ক) কাশবনের কন্যা (১৯৫৪)

(খ) আশিয়ানা (১৯৫৫)

শওকত ওসমান

(ক) জননী (প্রথম প্রকাশ ১৯৬১-তে হলেও রচিত হয় প্রাক-পাকিস্তান যুগ)

সরদার জয়েন উদ্দীন

(ক) আদিগন্ত (১৯৫৬)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

(ক) লালসালু (১৯৪৮)

(১৯৫৮ - ১৯৬৭)

আনিস চৌধুরী

(ক) শখের পুতুল (১৯৮১)

আবু জাফর শামসুদ্দীন

(ক) পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৫৮)

(খ) ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩)

আতাহার আহমদ

(ক) পিপাসা (১৯৫৮)

আবদুর রাজ্জাক

(ক) কন্যাকুমারী (১৯৬০)

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

(ক) শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬১)

(খ) নাম না জানা ভোর (১৯৬২)

(গ) নীল যমুনা (১৯৬৪)

আশরাফ উজ্জামান

(ক) শায়ের নামা (১৯৫৮)

আহসান হাবীব

(ক) আরণ্য নীলিমা (১৯৬১)

আলাউদ্দীন আল আজাদ

(ক) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬১)

(খ) শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২)

(গ) কর্ণফুলী (১৯৬২)

(ঘ) ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪)

আলাউদ্দীন খান

(ক) অববাহিকার উপকথা (১৯৬৫)

ইবনে রশীদ

(ক) ফাল্গুন করা (১৯৫৮)

ইসহাক চাখারী

(ক) বোবা জোয়ার (১৯৬২)

কাজী আবুল হোসেন

(ক) বনজ্যোৎস্না (১৯৫৮)

কাজী মাসুম

(ক) ঢেউ জাগে পদ্মায় (১৯৫৮)

গোলাম রহমান

(ক) নেতা ও নারী (১৯৫৮)

চৌধুরী শামসুর রহমান

(ক) শেষ পর্বে শ্রীকান্ত (১৯৬০)

(খ) মস্তানগড় (১৯৬২)

জহীর রায়হান

(ক) শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)

(খ) হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)

জসীম উদ্ দীন

(ক) বোবা কাহিনী (১৯৬৪)

জামসেদ ফয়েজী

(ক) শিলালিপি (১৯৫৯)

(খ) অরণ্য রাগ (১৯৬২)

জুলফিকার হায়দার

(ক) অনন্যমনা (১৯৬৭)

তাসাদ্দুক হোসেন

(ক) মহুয়ার দেশে (১৯৫৯)

দৌলতুন্নেছা

(ক) বধূর লাগিয়া (১৯৬২)

দিলআরা হাশেম

(ক) ঘর মন জানালা (১৯৬৫)

নীলিমা ইব্রাহীম

(ক) পথ প্রান্ত (১৯৫৯)

(খ) বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৯)

নূরুল ইসলাম খান

(ক) রাজধানীর ইতিকথা (১৯৬৪)

(ক) মেহের জুলেখা (১৯৬৫)

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ

(ক) প্রত্যাবর্তন (১৯৬০)

(খ) কাজলদীঘির উপকথা (১৯৬২)

বদরুদ্দিন আহ্‌মদ

(ক) অরণ্যমিথুন (১৯৬৩)

মেসবাহুল হক

(ক) পূর্ব দেশ (১৯৬৩)

মিজানুর রহমান শেলী

(ক) পাতালে শর্বরী (১৯৬৫)

মতিনউদ্দীন আহমদ

(ক) বুদ্বুদ (১৯৬১)

মোহাম্মদ মোর্তজা

(ক) চরিত্রহানির অধিকার (১৯৬৬)

মবিনউদ্দীন

(ক) রূপ হতে রূপে (১৯৬০)

রশীদ করীম

(ক) উত্তম পুরুষ (১৯৬১)

(খ) প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩)

রাজিয়া খান

(ক) বটতলার উপন্যাস (১৯৫৯)

(খ) অনুকল্প (১৯৫৯)

শওকত ওসমান

(ক) ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২)

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

(ক) কাঞ্চন মালা (১৯৬১)

শহীদুল্লাহ্ কায়সার

(ক) সারেং বৌ (১৯৬২)

(খ) সংশপ্তক (১৯৬৫)

শহীদ আখন্দ

(ক) পান্না হলো সবুজ (১৯৬৫)

শওকত আলী

(ক) পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)

সত্যেন সেন

(ক) রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৫৯)

সরদার জয়েন উদ্দীন

(ক) পান্নামোতি (১৯৬৫)

(খ) নীল রঙ রক্ত (১৯৬৫)

(গ) অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

(ক) চাঁদের অমাবশ্যা (১৯৬৪)

সৈয়দ শামসুল হক

(ক) এক মহিলার ছবি (১৯৫৯)

(খ) দেয়ালের দেশ (১৯৫৯)

(গ) অনুপম দিন (১৯৬২)

(ঘ) সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)

হুমায়ুন কাদির

(ক) নির্জন মেঘ (১৯৬৫)

পরিশিষ্ট-২

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১। উপন্যাসের কথা– দেবীপদ ভট্টাচার্য।

২। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা– শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা উপন্যাসের ধারা– অচ্যুত গোস্বামী।

৪। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর– সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। উপন্যাসের শিল্পরূপ– রণেশ দাশগুপ্ত।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত– **(আধুনিক যুগ)** আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

৭। ক্রান্তিকাল– আবদুল হক।

৮। সমকালীন সাহিত্যের ধারা– মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌।

৯। শিল্প সংস্কৃতি জীবন– আহমদ রফিক।

১০। Contemporary writing in East Pakistan– Edited by: Sarwar Murshid.

[এ ছাড়া সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

পাদটীকা

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ২য় সংস্করণ,
পৃষ্ঠা ৭৪।

২. এ প্রসঙ্গেই স্মর্তব্য রাল্‌ফ্‌ ফক্সের উক্তি–`The Novel is the epic form of our modern,
bourgeois society...It did not exist, except in very rudimentary form before
that modern civilisation which began with the renaissance and like every
new art-form is has served its purpose extending and depending human con-
sciousness.'Ñ Ralph Fox : The Novel and the people.

৩. যদিও পুস্তকাকারে 'আবদুল্লাহ'র প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩ সনের দিকে তবু তার রচনা-কাল বিশ শতকের
দ্বিতীয় দশকেই। প্রথমে এটি ধারাবাহিক ভাবে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "৩১৯

পৃষ্ঠাব্যাপী 'আবদুল্লাহ্'র ৪১ পরিচ্ছেদের ৩০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে ইমদাদুল হক এন্তেকাল করেন।

বাকী অংশের জন্য তিনি একটা খসড়া রেখে গিয়েছিলেন। এ-অংশটুকু রচনার ভার পড়েছিল 'আমাদের

দুঃখ' প্রণেতা সাাহিত্যিক আনোয়ারুল কাদিরের উপর।'

-বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- পৃষ্ঠা ২০৭।

৪. আবদুল হক– ক্রান্তিকাল, পৃষ্ঠা ৮৩।

৫. আহমদ রফিক- শিল্প সংস্কৃতি জীবন, পৃষ্ঠা ৫।

৬. যদিও এ উপন্যাসটির মুদ্রণের কাল ১৯৬১ সন, তবু একে পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের অন্তর্গত করে

আলোচনা করাই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেছি। কারণ, এর মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন,– '১৯৪০ সনে

এই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। ***উপন্যাসের কিয়দংশ 'সওগাত' পত্রিকায়

৪৪-৪৫ সনে ছাপা হয়। তখনই পুস্তকাকারে প্রকাশের সুযোগ থাকলে, রচনা ব্রিটিশ আমলেই সমাপ্ত

হতে পারত। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, প্রকাশকের অভাব, আরো নানা ঝঞ্ঝাটে বিলম্বের সীমানা বিশ বছরে

এসে দাঁড়াল।' ঝঞ্ঝাটের দরুন মুদ্রণের বিলম্ব হলেও, প্রাক্-স্বাধীনতা কালেই যে বইয়ের রচনা শুরু আর

স্বাধীনতা-উত্তর কালে যাতে শুধু সমাপ্তিরেখা টানা হয়েছে মাত্র– সে বইয়ের জন্ম ও শৈশবের কথা ভুলে

শুধু তার মুদ্রণকালটাকেই স্বীকৃতি দিলে সম্ভবত এর প্রকৃত মর্যাদা দান করা হয় না।

৭. আহমদ রফিক– শিল্প সংস্কৃতি জীবন, পৃষ্ঠা. ১১।

৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান– আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা. ১২৭।

৯. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন– 'অবাঞ্ছিত'র ভূমিকা।

১০. 'কি পাইনি'র লেখকের মুখবন্ধ।

১১. Jiban Khuda, a novel over which the shadow of Knut Hamsun hovers to

the dis-advantage of the Bengali writer, suggests that man has a mystic

hunger for life, It is mystic in the sense that it is far larger than the complete

satisfactions it demands. Ñ Sarwar Murshid : The treatment of sex in fiction

(Contemporary writing in East Pakistan).

১২. ডক্টর আনিসুজ্জামান : জাতীয়তাবাদ ও আমাদের সাহিত্য– (পরিক্রম, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৬৯)।
১৩. 'সারেং বৌ'-এর প্রথম সংস্করণের পিছনে, মলাটে মুদ্রিত পরিচিতি দ্রষ্টব্য।
১৪. পূবালী, চৈত্র, ১৩৭১।
১৫. Shamusddin Abul Kalam : Social Questions in Bengali Fiction
(Comtemporary writing in East Pakistan : Edited byÑ Sarwar Murshid,
Page – 44)
১৬. এ. কে. নাজমুল করিম : সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অশ্লীলতা, উত্তরণ– ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৬।
১৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃষ্ঠা ৩৬৩।
১৮. হাসান হাফিজুর রহমান : আমাদের সাহিত্যের বিভ্রান্তি উৎক্রান্তি। সৈকত- তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা,
১৩৭৩ (১৩৭০ সনের 'সমকাল' থেকে পুনর্মদ্রিত)
১৯. রণেশ দাশগুপ্ত : উপন্যাসের শিল্পরূপ, পৃষ্ঠা ৫৮।
২০. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯।
২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪।
২২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃষ্ঠা ২৪।
২৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫০।
২৪. আলাউদ্দীন আল আজাদ : উপন্যাসের নব উদয়াচল (জগন্নাথ কলেজ বার্ষিকী– ১৯৬০ পৃ. ৬।)
২৫. আবুল ফজল, পরিক্রম, নভেম্বর ১৯৬৫; পৃষ্ঠা ৩৬০।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর নবচৈতন্য ও উপন্যাসের শিল্পরীতি

র ফি ক উ ল্লা হ খা ন

বাঙালির স্বাধীনতাকামী ও সংগ্রামশীল অস্তিত্বের আত্মপ্রকাশ বিগত চার দশকে বিষয় ও শিল্পরূপের দিক থেকে যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আমরা জানি, বাঙালির সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ভাষা আন্দোলন তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ১৯৪৮ সাল থেকে সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে অঙ্কুরিত হয়ে, ১৯৫২ সালে একটা গণ-আন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে গণজাগরণে রূপ নেয় এবং পরিণামে অবরুদ্ধ জাতীয় চৈতন্যের আত্মসন্ধান, সত্তানুসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের রক্তিম প্রতীকে পরিণত হয়। সময়-পরম্পরায় ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী দীর্ঘ সংগ্রাম, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বক্ষত আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার সংগ্রামশীল ও রক্তিম চেতনার রূপ ও রূপান্তরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বাস্তব মানব-মানবীর অন্তর-বাহিরের বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপকল্প উপন্যাসশিল্প ঐ সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর-কালে আমাদের উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয়ের পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি, তার শিল্পরীতিও অবলম্বিত জীবনের অনিবার্যতায় স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি ও অর্থ-উৎপাদন কাঠামোর রূপ-রূপান্তরের বহুকৌণিক অভিঘাত গ্রাম ও নগরজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে উদ্ভিন্নমান মধ্যবিত্ত ও সংবেদনশীল চৈতন্য এই সব অভিজ্ঞতায় আন্দোলিত ও আলোড়িত হয়েছে। জিজ্ঞাসায়-বেদনায়-আর্তনাদে, সংকটে-সংগ্রামে-দ্বন্দ্বে ও দ্বন্দ্বোত্তরণের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বাঙালির সমাজমানস। আমাদের উপন্যাসিকরা সমাজজীবনের এই বহুমুখী সত্যকেই রূপায়িত করেছেন উপন্যাসে। ফলে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও জঙ্গমতায় উপন্যাসের শিল্পরূপেও সূচিত হয়েছে নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, রুচি, অধীতি ও অনুশীলনও এ ক্ষেত্রে পালন করেছে কার্যকর ভূমিকা। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা এবং মানব-অস্তিত্বের নানামুখী সংকট উপন্যাসের

বিষয়ের মতো শিল্পরূপকেও প্রভাবিত করেছে। এ পর্যায়ে উপন্যাসের উপকরণ-পরিধি যেমন বিস্তৃততর হয়েছে, তেমনি, সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বহুলাঙ্গিক প্রকাশ উপন্যাসবিধৃত চেতনাকে করেছে দ্বন্দ্বক্ষত ও জটিলতা-আক্রান্ত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও গতির রূপায়ণে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা সন্ধান করেছেন অনিবার্য শিল্পরীতি, উদ্ভাবন করেছেন নব-আঙ্গিক, বা রূপকল্প।

১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের উপন্যাস যে নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তা হল আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা-সন্ধানের প্রেরণা। এর ফলে ঔপন্যাসিকগণ লোকপুরাণ, পুরাণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রূপক-প্রতীকে জীবনের সাম্প্রতিক সংকট ও জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করেছেন। অন্যদিকে, স্বাধীনতা-উত্তর জীবনাকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতাজনিত শূন্যতার কারণে ঔপন্যাসিকগণ হলেন মগ্নচৈতন্য-আশ্রয়ী, অন্তর্মুখী। তাঁদের শিল্পরীতিও অনিবার্য কারণেই হল মনোকথনধর্মী, অন্ত র্সংলাপময় আর উপন্যাসবিন্যস্তে

হল উলম্ফনধর্মী। দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে প্রাধান্য পেল কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক চরিত্র পরিচর্যারীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল প্রতীকধর্মিতা, চিত্রকল্পময়তা, অভিব্যক্তিবাদ এবং পরাবাস্তববাদ। অন্তর্মুখী ঔপন্যাসিকের কাছে গদ্য-পদ্যের ব্যবধান অপসারিত হয়ে উপন্যাসের গদ্যরীতিও হয়ে উঠল মনোময়, গীতধর্মী, চিত্রকল্পময়।

প্রথাগত শিল্পরীতির অনুসরণ

বর্ণনাধর্মিতা

বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও উনিশ শতকীয় আঙ্গিকের অনুসরণ প্রলম্বিত হয়েছে। এর কার্যকারণ ঔপন্যাসিকদের প্রথাগত মানসগড়নের মধ্যেই কেবল নিহিত নয়। কেননা, আমরা জানি, যুদ্ধোত্তরকালে কলোনি-শাসন ও জাতিশোষণ থেকে মুক্ত হলেও বাংলাদেশের সমাজচেতনাপ্রবাহের গুণগত রূপান্তর নানা কারণে বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে, আত্মসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধানের পূর্বতন ধারার অঙ্গীকার মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়প্রবাহে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে। জাতিসত্তার ইতিহাসক্রম এবং সমষ্টি-অস্তিত্বের বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা রূপায়ণের প্রয়োজনবোধ থেকেও ঔপন্যাসিকরা প্রথাগত গঠনরীতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। শিল্পরূপের সূক্ষ্মতর বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য সমাজসংগঠন ও মধ্যবিত্তের মানসগড়নের যে রূপান্তর প্রত্যাশিত ছিল, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তা আজও দূরধ্বনি মাত্র। ফলে, প্রথাগত সমাজপ্যাটার্ন তার দ্বন্দ্ব ও গতির রূপায়ণে উনিশ শতকীয় রীতি-প্রকরণেই ঔপন্যাসিকরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাঙালির সমাজজীবনের সম্পূর্ণতাকে এপিক শৈলীতে রূপদান করলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪) উপন্যাসে। ইতিহাসের বিশাল পটকে মহাকাব্যিক আয়তনে রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন বর্ণনাত্মক

গদ্যরীতি। ইতিহাসের বঙ্কিম ঘটনাপ্রবাহ কখনো কখনো নাটকীয় আকস্মিকতায় আন্দোলিত হলেও নাট্যরীতি আবু জাফর শামসুদ্দীনের অন্বিষ্ট ছিল না। বিচিত্র জীবন ও চরিত্রের সমাবেশ সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের নির্লিপ্ত নিস্প্রাণ অবলোকনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে মাত্র। তাঁর 'সংকর সংকীর্তন' এই অভিন্ন ইতিহাসধারারই শিল্পরূপায়ণ। ঘটনাপ্রবাহ, সময়প্রবাহ ও চরিত্রপ্রবাহের ক্রমবিচারে তাঁর 'ত্রয়ী'র প্রথম খণ্ড 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', দ্বিতীয় খণ্ড 'সংকর সংকীর্তন' (১৯৮০) এবং তৃতীয় ও শেষ খণ্ড 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'। ঘটনা উপস্থাপন ও চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মূলত বর্ণনাত্মক রীতি অনুসৃত হলেও ঐতিহাসিক কালের বিশাল আয়তন ও চরিত্রকল্পনার নৈয়ায়িক ক্রম অনেকাংশে রক্ষিত হয়েছে এ ত্রয়ী উপন্যাসে।

শিল্পমানের বিচারে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'দেয়াল' এ ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ কেন্দ্রীয় চরিত্র আবদুল্লাহ সাহেবের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে এ উপন্যাসে অবিচ্ছিন্ন শিল্পবলয় রচনা করেছে। পরিচর্যার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশেষণ ও চিত্ররীতির যথাযথ প্রয়োগের সমান্তরালে নাট্যরীতির প্রয়োগ কখনো কখনো অনিবার্যতা পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের পাক হানাদারবাহিনীকবলিত ঢাকা শহরের আরণ্যক হিংস্র অন্ধকারে। আজীবন পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বশংবদ আবদুল্লাহর চৈতন্যে অভাবিত-পূর্ব ঐ অভিজ্ঞতা এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে। তার আদর্শ, বিশ্বাস, দেশপ্রেম কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আবদুল্লাহর আত্মসমীক্ষা ও আত্মপরীক্ষার সূত্র ধরে প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের বাঙালি জীবনের ইতিহাস বিপ্রতীপ। বিপ্রতীপতা উদ্‌ঘাটন (ভষধংয নধপশ) পদ্ধতিতে বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত এপিক আয়তনের উপন্যাসসমূহে মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসচেতনার বিচিত্রমুখী প্রকাশকে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই নিস্তরঙ্গ, একমাত্রিক গদ্যরীতিতে উপস্থাপন করেছেন। সরদার জয়েনউদদীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫), রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'সমুদ্রবাসর' (১৯৮৬), আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), হরিপদ দত্তের অজগর (প্রথম খণ্ড ১৯৮৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯১) এ-ধারার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

রূপক ও প্রতীকধর্মী উপন্যাস

মহৎ ঔপন্যাসিকরা সহজাতভাবেই তাঁদের শিল্প-উপকরণের মধ্যে প্রতীক ও রূপকের সম্ভাবনা লালন করেন। উপন্যাসের উদ্ভবলগ্ন থেকেই এই শিল্প-অভিপ্রায়ের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। আর্ট ফর্মসমূহের মধ্যে উপন্যাসের জীবনঘনিষ্ঠতা যেহেতু সর্বাধিক, সেজন্য প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সামাজিক-রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা রূপায়ণের একান্তিকতায় রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে কারণে সাম্প্রতিক বিশ্বের জটিল ও দ্বন্দ্বময় মানবপরিস্থিতিতে

ঔপন্যাসিকরা রূপক ও প্রতীককে সচেতন শিল্পকৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শওকত ওসমানই প্রথম ঐ রীতিকে সচেতন শিল্পক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন। ষাটের দশকের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পুনরুত্থান স্বাধীনতা-উত্তরকালেও শিল্পীর আত্মপ্রকাশকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলে, সঙ্গতকারণেই তাঁর কাছে রূপক ও প্রতীক শৈল্পিক অনিবার্যতা লাভ করেছে। 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩) উপন্যাসে শওকত ওসমান রূপকের আশ্রয়ে নিগূঢ় সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ উপন্যাসে দীর্ঘ খরা, বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং পতঙ্গকুলের আক্রমণ, সঙ্ঘশক্তির উন্মেষ প্রভৃতি অনুষঙ্গ প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত। এই সব প্রতীকের আশ্রয়ে সমগ্র উপন্যাসে সচেতন রাজনৈতিক বক্তব্যের অন্তঃসুর প্রবাহিত। উল্লেযোগ্য যে, এ পর্যায়ে আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) উপন্যাসে এক বোবা মেয়ের সবাক হয়ে ওঠার ঘটনাক্রম ষাটের দশকের বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের সমতাৎপর্যে ইঙ্গিতময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সংহত, সুগঠিত ঘটনা একটি কেন্দ্রাভিমুখী লক্ষ্যে বিন্যস্ত হয়েছে এ উপন্যাসে। সামরিক শাসনপীড়িত, অবরুদ্ধ জাতীয় অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে সুবিধাবাদী, প্রতারক ষড়যন্ত্রপরায়ণ এবং পাকিস্তানি আদর্শের ধ্বজাবাহী আবু নসর মোক্তারের বোবা মেয়ে। প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ (ঢ়বৎরঢ়যবৎধষ পযধৎধপঃবৎং ঢ়ড়রহঃ ড়ভ ারবা) থেকে রচিত এই উপন্যাসের কথক কেন্দ্রীয় চরিত্র বোবা মেয়ের স্বামী। উপন্যাসের সংযতবাক্ ঘটনাপ্রবাহে দেশ-বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমরূপান্তর সূক্ষ্ম টানে অঙ্কিত হয়েছে। হাসনাত আবদুল হাই-এর 'তিমি' (১৯৮১) শিল্পস্বভাবের দিক থেকে প্রতীকী বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপন্যাস। সামাজিক অপশক্তির প্রতীক নওয়াজেশ আলীর চরিত্র-প্রকৃতির সঙ্গে জলজগতের সর্বগ্রাসী প্রাণী তিমি'র সাদৃশ্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের উপকরণনির্ভর রশীদ হায়দারের 'খাঁচায়' (১৯৭৫) এবং সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) উপন্যাসেও প্রতীকের চিরায়তিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। রশীদ হায়দার একটি খাঁচার প্রতীকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী-কবলিত বাংলাদেশকে এবং পাখির প্রতীকে শৃঙ্খলিত ও মুক্ত বাঙালি জীবনের স্বরূপ অঙ্কন করেছেন। 'হাঙর নদী গ্রেনেডে'র বিষয়কল্পনা, চরিত্রায়ণ এবং পরিচর্যার মধ্যেও প্রতীকের নিগূঢ় তাৎপর্য আরোপিত হয়েছে।

আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ

বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানবচরিত্র যখন ঔপন্যাসিকের সচেতন শিল্প-অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে, তখনই একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়। উপন্যাসের উপকরণ-উৎস কোনো অঞ্চলের জীবন হলেই আঞ্চলিক উপন্যাস (regional novel) হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন ঔপন্যাসিকের আঞ্চলিক জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, স্থানিক বর্ণিমা। (Local colour) রূপায়ণের শিল্প-দক্ষতা। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পরীতি এক স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এমিলি ব্রন্টি, টমাস হার্ডি, আর্নল্ড বেনেট প্রমুখের উপন্যাসে

আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ নির্বিশেষ চারিত্র্য অর্জন করেছে। উইলিয়াম ফকনারের কৃষিপ্রধান দক্ষিণ আমেরিকার জীবনভিত্তিক উপন্যাসেও আঞ্চলিক জীবনসমগ্রতার সার্থক বিন্যাস ঘটেছে।

ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবন অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু শিল্পরীতির বিচারে সফল উপন্যাসের সংখ্যা কম। গভীরতর জীবনবোধের অভাবে শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্নফুলি' (১৯৬২) পরিণত হয়েছে রোম্যান্টিক আখ্যানে, রোমান্সকর নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশে। এ দিক থেকে শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২) বিষয়বস্তু ও চরিত্রায়ণে অনেকাংশে সফল। 'বহির্বাস্তবের সংঘর্ষে অন্তর্জীবনের সঞ্জীবনী প্রেরণা ও সাহসের যোগফলে নবীতুন স্থান-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে মানব-অস্তিত্বের প্রতিনিধি।' স্বাধীনতা-উত্তরকালে আঞ্চলিক জীবনরূপায়ণের সচেতন শিল্প-অভিপ্রায়ে বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। রিজিয়া রহমানের 'উত্তর পুরুষ' (১৯৭৭), ধবল জ্যোৎস্না (১৯৮১), সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮১)ও 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪) এবং সেলিনা হোসেনের 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) এ-ধারার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ সকল উপন্যাসে প্রকৃতি পটভূমি (নধপশমৎড়ঁহফ) মাত্র নয়, মানুষের মতোই স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিদ্যমান। কখনো সে মানুষের জীবনায়নের সহচরী শক্তি, আবার কখনো-বা বিরুদ্ধতায় ভয়ঙ্কর।

মহাসমরোত্তর নব্যশিল্পনীতি

আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসে বিচিত্র মাত্রা যুক্ত হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে উদ্ভূত ঔপন্যাসিকরাও এ-পর্যায়ে যুদ্ধোত্তর বহুভুজ চেতনার সঙ্গে সাধর্ম্যসূত্রে নব-নব রীতি উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকরা রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার বিশাল সঞ্চয় নিয়ে চেতনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লাবিক পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মোচন করেন, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের জন্যেও সে-রূপ যুগান্তকারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। স্বাধীনতা-পূর্ব উপন্যাসপ্রবাহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর যে নিঃসঙ্গ শিল্পযাত্রা লক্ষ করি, তার মূলে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় জীবনাভিজ্ঞতা ও শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় মানুষের বহির্জীবনচেতনার ক্ষেত্রে সে খণ্ডায়ন ঘটতে থাকে, তার ফলে নবজাত শিল্পচৈতন্য প্রথাগত সবকিছুরই ধহঃর বা বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। অস্তিত্ব-ধারণা, ঘটনা, সময়, মানুষ, শিল্প, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব প্রতিটি প্রসঙ্গেই নবতাৎপর্য সন্ধানে মনোযোগী হন ঔপন্যাসিকরা। বহির্বাস্তবতার বিচূর্ণ ভগ্নস্তূপ বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় যেন পূর্ণচ্ছেদ স্থাপন করে। মানবীয় মূল্যবোধ ও সম্পর্কই শুধু বিপর্যস্ত হয় না, সমগ্র প্রকৃতিজগৎ থেকেই যেন মানবত্ব অন্তর্হিত হয়। ফলে মানুষের ত্রিমাত্রার জ্যামিতিক অবয়বের পরিবর্তে চতুর্মাত্রা চেতনাই অন্বিষ্ট হয়ে

ওঠে। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের ফর্ম সন্ধানের ক্ষেত্রে এই নতুন অভিজ্ঞতার জগতে পরিভ্রমণ করেছেন। সময় ও অস্তিত্ববোধের যুগান্তকারী পরিবর্তন উপন্যাসের শিল্পরূপকেও করেছে নবমাত্রিক, স্বাতন্ত্র্যাভিসারী।

অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণ

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের বহুভূজ জটিল, দ্বন্দ্বময় ও অন্তর্মুখী চেতনা উন্মোচন-সূত্রে ইনার রিয়েলিটিধর্মী উপন্যাসের উদ্ভব। মানব-অস্তিত্বের নানামুখী টানাপড়েন নবমাত্রিক প্রকরণশৃঙ্খলায় এ-জাতীয় উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এ ধারার সূত্রপাত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর হাতে। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম রূপায়িত হয়েছে 'অস্তিত্বজিজ্ঞাসু আতঙ্কিত মনের মুক্তিলাভের জটিলতর অন্তর্বাস্তবতা'। 'ওয়ালীউল্লাহর চরিত্রগুলোকে, লক্ষ করি, অস্তিত্বের চেতনা-অবচেতন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে; শুনি তাদের নিঃশব্দ আর্তনাদ; দেখি তারা দু'হাতে ভেঙে ভেঙে চলেছে অন্ধকার; শোনা যায় তাদের কষ্টচালিত শ্বাস-প্রশ্বাস। এভাবেই ভীতিশিহরিত নিরস্তিত্বের গুহাপথ অতিক্রম করে, আত্মপ্রবঞ্চক 'কীটপতঙ্গ সদৃশ আরেফ আলীরা হয়ে ওঠে সূর্য-প্রতিম, টান টান প্রতিবাদী।' স্বাধীনতা-উত্তর কালের জটিল সমাজবাস্তবতা, অস্তিত্ব মুক্তচিন্তা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে ধাতব প্রতিবন্ধকতার ক্রম-বিস্তার, যুদ্ধোত্তরকালের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গজনিত মর্মন্তুদ অন্তর্দাহ এবং আত্মসন্ধান, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মস্বীকারোক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঔপন্যাসিকদেরকে এ-ধারার উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এবং শিল্পরীতি বিচারে এই অন্তর্বাস্তবতাধর্মী উপন্যাস স্বাধীনতা-উত্তরকালের এক সফল প্রবাহ।

সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসসমূহে এই নবমাত্রিক শিল্পরীতির বহুকৌণিক বিন্যাস ঘটেছে। জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্প-অভিজ্ঞতার আন্তরক্রিয়ায় তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই ফর্ম-সচেতনতার সাক্ষ্যবাহী। 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪), 'অন্তর্গত' (১৯৮৪) এবং 'স্তব্ধতার অনুবাদ' (১৯৮৬) এ-ক্ষেত্রে শিল্পসাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করেছে। এইসব উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ, পটবিন্যাস, চরিত্রায়ণ, সময়ের ব্যবহার, ভাষারীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পসতর্ক নিরীক্ষা প্রযুক্ত হয়েছে। 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' এবং 'অন্তর্গত' উপন্যাসের উপকরণ একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার অব্যবহিত-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রকরণের ব্যবহারে এ-দুটি উপন্যাস 'মর্মদাহ ও স্বপ্নস্মৃতিচারণায় অপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার একক হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকগত পরীক্ষার দিক থেকে 'স্তব্ধতার অনুবাদ' অধিকতর পরিণত ও নিপুণ সৃষ্টি। এ-উপন্যাস 'অন্ধকারে নিমজ্জিত নষ্ট মস্তিষ্কের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিন্যস্ত অনুভূতির প্রতিচিত্র; যা মূলত হয়ে উঠেছে উল্লম্ফনধর্মী, স্থাপনকাল-বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্ন-ব্যাকরণময়। তিমিরবিনাশী হতে গিয়ে, আত্মনিষ্কাশন-আত্মখননের এমন কঠোর শ্রম, মুষ্টিমেয় ঔপন্যাসিকই, আমাদের দেশে স্বীকার করেছেন।' লেখক ও চিত্রপরিচালক ফয়সাল হোসেন এবং মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসমাইলের অভিজ্ঞতালোক, আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান, আত্মখনন ও আত্মহনন সূত্রে

যুদ্ধোত্তর বাঙালিজীবনের এক গভীরতর সত্য উন্মোচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষণবিন্দুর সঙ্গে ফয়সাল হোসেনের দৃষ্টিকোণ সমীকৃত হয়ে এ-উপন্যাসে চেতনাবৃত্ত নির্মাণ করেছে। চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে যে inner realization of truth আমরা প্রত্যাশা করি, স্ড়ব্ধতার প্রতীকে সেই ব্যাখ্যাতীত নিগূঢ় জীবনসত্যের উন্মোচন ঘটেছে। 'মানুষের অভিজ্ঞতা অসীম এবং অপূর্ণতাই তার স্বধর্ম।' উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে উচ্চারিত হেনরি জেমসের এই উক্তি সর্বজনবিদিত। শিল্পীর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা সংবেদনশীলতা ও বহুমাত্রিকতায় নবতাৎপর্য লাভ করে। রশীদ হায়দারের 'অন্ধকথামালা' (১৯৮২) উপন্যাসের বিষয়ও মুক্তিযুদ্ধ। সময়ের ভগ্নক্রমিক ব্যবহার, স্মৃতি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমান্ড়রাল বিন্যাস, এবং স্বপ্নচিত্রের বিচিত্র প্রয়োগ এ-উপন্যাসের প্রকরণকে করেছে বিশিষ্ট। মৃত্যুমুখ বেলাল হোসেনের আত্মকথনসূত্রে কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবৃত্তে ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক শিল্প-অভিপ্রায় রূপায়িত হয়েছে।

শামসুর রাহমানের 'অক্টোপাশ' (১৯৮৩) ব্যক্তির আত্মসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণের নিপুণ শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসে বহির্জগতের ঘটনা এবং ক্রিয়াশীলতার ভূমিকা গৌণ। উদ্বেগ, ভীতি ও মনস্ড়াপে কেন্দ্রীয় চরিত্রের যন্ত্রণাদগ্ধ, আতঙ্কিত ও মীমাংসাহীনতার বৃত্তবন্দি জটিল আত্মস্বরূপ শামসুর রাহমানের অন্ড়র্ময় অবলোকনে অভিব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তমানসের জটিল থেকে জটিলতর বাস্ড়বতার দিকে ধাবমানতা এ উপন্যাস থেকে অনুধাবন করা যায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অন্ড়র্বাস্ড়বতা বা inner-reality-ধর্মী উপন্যাসচর্চার প্রসার উল্লেখযোগ্য। সমাজদেহের জটিল ক্ষত মধ্যবিত্তের মনোজগৎকে যে রক্তিম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে, বাস্ড়বতার সরল মাত্রায় তার রূপায়ণ সম্ভব নয়। ফলে জীবনপ্যাটার্নের নবতর অন্ড়র্ময় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনে অনিবার্য আঙ্গিক সন্ধান করলেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা। 'চেতন থেকে অবচেতনে চরিত্রের যাওয়া-আসা, ছিন্নভিন্ন চরিত্রের স্বীকারোক্তি, আন্ড়ঃ-সংলাপ, চিন্ড়ার উল্লম্ফনধর্মী স্বেচ্ছাচারের ছদ্মবেশে অর্থপূর্ণ আত্মকথন; আত্ম-অনুসন্ধানের আত্মদহন; বোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে নিরন্ড়র মুখোমুখি হওয়া; মনের অনাবিস্কৃত গহ্বরে চেতনার হেড-লাইট-জ্বালা – ইত্যাদি ইনাররিয়ালিটি-ধর্মী উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।' পূর্বে আলোচিত উপন্যাসমূহে এ ধারার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। হুমায়ুন আহমেদের 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২) ও 'শঙ্খনীল কারাগার'(১৯৭৩), রাহাত খানের 'এক প্রিয়দর্শিনী' (১৯৮৩), 'ছায়া দম্পতি' (১৯৮৪), 'খেলোয়াড়' (১৯৯১), সুকান্ড় চট্টোপাধ্যায়ের 'একজন' (১৯৭৫) মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬) রশীদ করীমের 'প্রেম একটি লাল গোলাপ' (১৯৭৮); বশীর আল হেলালের 'কালো ইলিশ' (১৯৭৯) ও 'শেষ পানপাত্র' (১৯৮৬); সেলিনা হোসেনের 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯) ও 'পদশব্দ' (১৯৮৩); রাজিয়া খানের 'চিত্রকাব্য' (১৯৮০) ও 'হে মহাজীবন' (১৯৮৩) হাসনাত আবদুল হাই-এর 'আমার আততায়ী, (১৯৮০); মঞ্জু সরকারের 'তমস' (১৯৮৪), 'নগ্ন আগন্তুক' (১৯৮৬), ও 'প্রতিমা উপাখ্যান' (১৯৯০); শামসুর রাহমানের 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১৯৮৫), ও 'নিয়ত মন্ড়াজ' (১৯৮৫), শওকত আলীর 'অপেক্ষা' (১৯৮৫) , আল মাহমুদের 'ডাহুকী' (১৯৯২), হুমায়ুন আজাদের 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল' (১৯৯৪) ও 'সবকিছু ভেঙে পড়ে' (১৯৯৫); মঈনুল আহসান সাবেরের 'পাথর সময়' ;

শহীদুল জহিরের 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' (১৯৯৫); নাসরীন জাহানের 'উড়ুক্কু' (১৯৯৩), 'চন্দ্রের প্রথম কলা' (১৯৯৫) এ-ধারার উপন্যাসের বৈচিত্র্যের সাক্ষ্যবাহী। এই শ্রেণীর উপন্যাসে সময় ও ঘটনার সরল বিন্যাস পরিত্যক্ত হয়েছে। চরিত্রের বহির্জগতের পরিবর্তে মূল্য পেয়েছে চেতন-অবচেতনের বিচিত্র গতিবিধি। চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতির সচেতন প্রয়োগ কোনো কোনো উপন্যাসের শিল্পমানকে আন্তর্জাতিক রীতির সমধর্মী করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকে এ জাতীয় উপন্যাসের সংখ্যা সর্বাধিক। পাঠকের মনোরঞ্জন ও ব্যবসায়িক সাফল্যের কল্যাণে কোনো কোনো লেখক ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু সবকালেই উপন্যাসের শিল্পরীতি মননশীল অনুধ্যানের বিষয়। লোকরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষা সাময়িক ও স্থূল; আর শিল্প চিরকালের বিষয়। শিল্পীর লক্ষ্য বর্তমানের পাঠক নয়, চিরকালের পাঠক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), সতীনাথ ভাদুরীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯-১৯৫১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'লালসালু' (১৯৪৮) উপন্যাসের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৮), 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' (১৯৯৫), 'মুখের দিকে দেখি' (২০০৬) এবং 'আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু' (২০০৯) উপন্যাস বিষয় ও আঙ্গিকভাবনায় এই নবচেতনার সাক্ষ্যবাহী। জাতীয় ইতিহাসের অন্তঃস্রোতের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির বহুস্তরীভূত চেতনালোক উপন্যাস তিনটিতে অসাধারণ দক্ষতায় রূপায়িত হয়েছে। শহীদুল জহির বাঙালি জীবনের মূল প্রবাহকে তাঁর গতিশীল সংস্কৃতিভাবনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। এ-কারণে তাঁর উপন্যাসের বর্ণনারীতিও প্রচলিত form ভেঙে ভেঙে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের পরিচর্যা ও ভাষারীতি ব্যক্তির অবচেতনের (personal unconscious) সমান্তরালে সমষ্টির অবচেতনকে (collective unconscious) ধারণ করেছে। পরাবাস্তব আঙ্গিককে তিনি নতুন সম্ভাবনায় নিয়ে গেছেন। 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসে নিঃশব্দতার ভাষা-ব্যাকরণ বাংলা সাহিত্যে অভিনব। উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক নির্মাণে শহীদুল জহির তাঁর কালকে অতিক্রম করে গেছেন। শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ' (১৯৮৫) উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর প্রকরণ সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাবাহী এই উপন্যাসে সমাজের মাত্রা এবং ব্যক্তির মাত্রাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। **কোরাস** অংশে যাত্রী বোঝাই চলমান বাসের পটভূমিতে কাহিনীর উন্মোচন। ভাষা আন্দোলনে শহীদ সন্তানের পিতার নিঃশব্দতা এবং দীর্ঘশ্বাস অতঃপর তার জিজ্ঞাসা ও ক্রন্দনে সকল যাত্রীর মধ্যে আলোড়ন এ-অংশের উপজীব্য। **একাকী** অংশে আত্মকথনের ভঙ্গিতে সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক বাঙালি জাতিসত্তার অন্তরিত হাহাকারকেই যেন রূপায়িত করেছেন। এ-উপন্যাসেও বহির্গামী ঘটনা তাৎপর্যহীন। চেতনার বহুমুখী প্রসারণ ইতিহাসের জটিল ও দ্বন্দ্বক্ষত প্রান্তসমূহ স্পর্শ করেছেন। ক্লাসিক গুণমণ্ডিত গদ্যের মধ্যে শওকত ওসমান সঞ্চার করেছেন সাম্প্রতিক চেতনা ও প্রকরণের অন্তর্গুণ। উপন্যাসের শেষাংশে জাতীয় ইতিহাসের অস্বাভাবিক, অভূতপূর্ব, রক্তাক্ত, জটিল ও দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি-পরম্পরার গভীর অনুভব জেমস্ জয়েসীয়

গদ্যশৈলীতে রূপায়িত হয়েছে। একজন শহীদের আত্মকথন জাতিসত্তার মর্মমন্থনের বাণীরূপ হয়ে উঠেছে।

মিথ-ঐতিহ্য, ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন : নব-আঙ্গিক

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমকালীন ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্বের বিমিশ্র বাস্তবতার বিপ্রতীপ শক্তি-উৎস আবিষ্কারের অভিপ্রায় থেকে ঔপন্যাসিকরা মিথ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-আশ্রয়ী উপন্যাস রচনা করেছেন। জাতিসত্তার গভীরে যে প্রাণময় সত্তা সংগুপ্ত থাকে, যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিকের কাছে তা-ই হয়ে ওঠে নবমাত্রিক জীবনচেতনার প্রেরণাশক্তি। এ পর্যায়ের প্রকরণসতর্ক ঔপন্যাসিকরা মিথ বা পুরাণকে কেবল উপকরণ বা বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তাঁদের সৃষ্টিতে মিথ হয়ে উঠেছে গঠনকৌশলের নিগূঢ় প্রক্রিয়া (use of myth as a structuring device) স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে মিথ-ঐতিহ্য ও ইতিহাস উপন্যাসের উপকরণ-প্রকরণের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। সময় ও সমাজসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদনশীল শিল্পচৈতন্য আত্মসন্ধান ও শক্তি অর্জনর জন্য মিথ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই শিল্পক্রিয়া স্বাভাবিক এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত এ ধারার উপন্যাসে ইতিহাসের বহির্ঘটনার পরিবর্তে তার শাশ্বত অন্তর্সত্য গৃহীত হয়েছে। ইতিহাসের বহির্ঘটনাপ্রবাহের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কিন্তু তার অন্তঃশীলা জীবনরহস্য যা বহির্বাস্তবতার অজ্ঞাত থেকে যায়। নির্মাণ করে ইতিহাসের দর্শন। শিল্পীর চেতন অবচেতনে ইতিহাসের এই অন্তর্ময় প্রবাহের ভূমিকাই সর্বাধিক। সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩) ও 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪), অজয় ভট্টাচার্যের 'অরণ্যানী' (১৯৮৪), সৈয়দ শামসুল হকের 'আয়না বিবির পালা' (১৯৮৪) এবং মুহম্মদ নূরুল হুদার 'জন্মজাতি' (১৯৯৪) এই নবমাত্রিক জীবনান্বেষার শিল্পরূপ।

নব্যবাস্তবতাবোধ: আঞ্চলিক জীবনের রূপায়ণ

জীবনের বস্তুস্বভাবকে অনিবার্য রূপাঙ্গিকে প্রকাশের অভিপ্রায় উপন্যাসশিল্পের এক আবহমান বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর সূত্রপাত হলেও সাম্প্রতিককালের ঔপন্যাসিকদের বোধের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা এ ধারায় নবমাত্রা যোগ করেছে। যুদ্ধোত্তরকালে আঞ্চলিক জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রয়াসে ঔপন্যাসিকদের বাস্তবদৃষ্টি হয়ে ওঠে বহুমুখী ও অনুপুঙ্খচারী। আবু বকর সিদ্দিকের 'জলরাক্ষস' (১৯৮৫) ও 'খরাদাহ' (১৯৮৭) উপন্যাসে জীবনের যে বস্তুস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, শিল্প-অভিজ্ঞতার দিক থেকে তা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। এ দুটি উপন্যাসে মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের জীবনপ্যাটার্ন ও অস্তিত্বসংগ্রামের স্থানিক (ষড়পধষ) রূপ ও রঙ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। খুলনা-বাগেরহাটের নিম্নাঞ্চলের মানুষেরা প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভ্যস্ত। কিন্তু এর সঙ্গে যখন 'ইতর প্রশাসন'-যন্ত্র যুক্ত হয়ে নিম্নবিত্ত-বিত্তহীনের জীবন, জীবিকা ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়, তখন সর্বস্বহারা

মানুষের দীর্ঘ দিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ হিংস্রতায় উদ্দাম হয়ে ওঠে। গোনজোরালি ও জরিনের অস্তিত্বরূপ ও তার সংগ্রামকে এই বাস্তবতার আলোকেই উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। 'জলরাক্ষস'-এ জীবন নির্বাচন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথাস্থিতবাদী (naturalistic) শিল্প-নিরীক্ষা অনেকটা সফল হয়েছে। প্রকৃতির বর্ণ ও বর্ণান্তর, চরিত্রস্বভাবের সঙ্গে প্রকৃতিরূপের সঙ্গতি নির্মোহ নিরাসক্তিতে রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। 'খরাদাহ' উপন্যাসের পটভূমি উত্তর বাংলার খরাপীড়িত ভূ-প্রকৃতি ও তার অন্তর্গত মানব-মানবী। 'পাথুরে লাল মাটি, লু-হাওয়ার হলকা, দয়ামায়াহীন খরা, পোড়া কালো নরনারী, তাদের গনগনে মেজাজ' এ উপন্যাসে অধিকতর সংহত সুগঠিত রূপাবয়ব লাভ করেছে। জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে আবুবকর সিদ্দিক প্রথাগত শিল্পরীতির অনুশাসন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অগ্রসর হয়েছেন। পটভূমির বিন্যাস, চরিত্রায়ণ, ভাষারীতি– সকল ক্ষেত্রেই তাঁর নবসৃষ্ট শিল্পরুচি কার্যকর হয়েছে।

এপিক ফর্ম : যুদ্ধোত্তর নন্দনতত্ত্ব

স্বাধীনতা-উত্তর সমাজকাঠামোতে জীবনের যৌথায়নের সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। জীবনের ছক ভেঙেছে। সেই সঙ্গে সময়ধারণার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী রূপান্তর সাধিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা, নতুন মানচিত্র ও জীবনধারায় প্রথাগত মূল্যচেতনা, জীবনধারণা অভাবিতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। জাতিসত্তার প্রশ্নে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক ইতিহাস ও সময়সতর্ক শিল্পীর জন্য হয়ে উঠেছে নবতর সৃজনবেদনার কার্যকারণ। অস্তিত্বগত বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের যৌথ ভূমিকা সত্ত্বেও শিল্পীর সমগ্রতা-অন্বেষী শিল্প-অভিপ্রায় অনিবার্য প্রকরণ সন্ধান করেছে। ব্যক্তির আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের প্রয়োজনবোধ এ পর্যায়ের রাজনীতিসতর্ক ঔপন্যাসিকদেরকে ঐতিহাসিক ঘটনা, সময় ও চরিত্রপ্রবাহের প্রতি মনোযোগী করেছে। কিন্তু প্রথাগত শিল্পরীতির অনুশাসন ঐ সব উপন্যাসের আবেদনকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে পারেনি। শিল্পের বিবর্তন মূলত প্রকরণনির্ভর। অবশ্য প্রকরণের নবত্ব অনেকাংশে বিষয় বা চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মহাকাব্যিক রূপাঙ্গিকে সমাজসত্তার মর্মমূল-উৎসারিত আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও যন্ত্রণার রূপায়ণে যুদ্ধোত্তর প্রকরণের প্রতি খুব কম ঔপন্যাসিকই মনোযোগী হয়েছেন। শওকত আলীর 'ত্রয়ী' 'দক্ষিণায়ণের দিন-কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' (১৯৮৫-৮৬) এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৯৬) ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) এই নব শিল্পধারার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শওকত আলীর ট্রিলজিতে বিশ শতকের ষাটের দশকের কুণ্ডলায়িত সময়ের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র ও সময় 'কেন্দ্রীয় রস-আবেগে ঘূর্ণিত, দ্রবীভূত ও স্ফটিকায়িত' হয়ে রূপ লাভ করেছে। ১৯৬৫-১৯৬৯ কালপরিসরের ঘটনা বিধৃত হলেও চরিত্রচেতনার সূত্রে সময়ের বিশাল আয়তন এতে বিধৃত হয়েছে। শওকত আলীর উপস্থাপনভঙ্গি মূলত বর্ণনাত্মক হলেও পটবিন্যাস ও চরিত্রায়ণের নিগূঢ় পদ্ধতি উপন্যাসের আঙ্গিককে করেছে নবমাত্রিক।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে এপিক ফর্মের চিরায়ত রূপের মধ্যেই আধুনিক জীবনের জটিল সংকটকে রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সমাজের প্রথাগত অবরুদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ষাটের দশকে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বরূপ ও জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বময়। বাঙালি জাতির অস্তিত্বসংগ্রামের আবহমান চেতনাকে সর্ব-আয়তনিক করে জীবনের চলমান রেখা ও টোনের সঙ্গে মিথ-ইতিহাস ও ঐতিয্যের অনিবার্য সম্পর্কসূত্র নির্দেশ করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'খোয়াবনামা' রচনা করেন। বাঙালিজীবনের বিচিত্র পট, মানব-অস্তিত্বের সংকট ও শ্রেণীসংগ্রামের রক্তিম অন্তঃস্রোত এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপকে অসাধারণত্ব দান করেছে। বিচিত্র ঘটনা, উপ-ঘটনা ও চরিত্রের যে সমাবেশ এ উপন্যাসে লক্ষ করি, তা কেবল জীবনের বহির্বাস্তবতাকেই নয়, সমাজবাস্তবতার অন্তঃস্থ গভীরতর সত্যকেও উন্মোচন করে। এ ধারার উপন্যাসের সাম্প্রতিক সংযোজন হরিপদ দত্তের 'জন্ম জন্মান্তর' (২০০০)। বাঙালিজীবনের প্রাকৃত স্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়সীমা পর্যন্ত এ উপন্যাসের ঘটনাংশ প্রসারিত। ব্যক্তির ভেতর-বাইরের সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিচিত্র ঘটনার অন্তর্বয়ন এর এপিক শৈলিতে নতুনত্ব আরোপ করেছে। মিথ-উৎস, প্রত্ন-ইতিহাস, গোষ্ঠী, সমষ্টি ও ব্যক্তির অস্তিত্ব রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের শিল্পসতর্কতা বিস্ময়কর। স্বাধীনতার পর স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতি হিসেবে তিন দশক কাল আমরা অতিক্রম করেছি। সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জীবন হয়েছে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। এইসব অভিজ্ঞতায় ঔপন্যাসিকগণ বাঙালি-অস্তিত্বের নিগূঢ় উদ্বেগ, জটিল জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বময় জীবনের বহুকৌণিক সত্য রূপায়ণে মনোযোগী হয়েছেন। সমাজ ও জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয়ের মতো এর শিল্পরীতিরও বিবর্তন ঘটেছে। এভাবেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের উপন্যাস বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের সমগ্রতার শিল্পরূপে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অস্তরাগ এবং একবিংশ শতাব্দীর আগমনী বিশ্বজীবনে বিচিত্রমুখী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে এক দশক সময়কাল আমরা অতিক্রম করে এসেছি। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ অতীত কর্মের সমীক্ষা এবং সম্মুখচলার প্রস্তুতি। সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জীবনঘনিষ্ঠ মাধ্যম উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নতুন শতাব্দীর উপযোগী বিষয়ভাবনা ও শিল্পমাত্রা সংযোজিত হবে,এটাই প্রত্যাশিত।

রি ষি ণ প রি ম ল

বাংলাদেশের মানুষের অজেয় বীরত্ব ও বিশাল আত্মত্যাগের ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস সুদীর্ঘ সূত্রে গ্রথিত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এদেশের মানুষের আশা ছিলো দেশের সব অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থে বিশেষ এলাকার প্রয়োজন অনুসারে এবং বিশেষ এক লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তানের রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে। এ কারণেই পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার সাথে বাঙালি একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। স্বল্পকথায়, পূর্ববাংলার নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশাভঙ্গের কারণেই মূলত পাকিস্তানের শাসকচক্রের সাথে পূর্ববাংলার জনগণের বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী প্রথম হতেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। তারা বাঙালি মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান মনে করত না। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনৈসলামিক ও হিন্দু-ঐতিহ্য হতে উদ্ভূত বলে মনে করত এবং পূর্ববাংলায় ভারতের প্রভাব বেশি মনে করে তারা বাঙালিদের প্রতি আরো বেশি সন্দিহান হয়। এসব কারণেই পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে রেখে প্রকৃত মুসলমান বানাতে ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে বাঙালিদের হিন্দু-সংস্কৃতির মূল উচ্ছেদ করতে তৎপর হয়ে উঠে। বাঙালিদের দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার। এই ন্যায়সংগত দাবিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকচক্র সিদ্ধান্ত নেয় যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ভাষার প্রশ্নে বাঙালিরা প্রথম আন্দোলনে নামে এবং রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মূলে এই ভাষা-আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা কার্যকর। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রথম পাকিস্তানি শাসক ও শোষক এবং তাদের তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধে বাঙালি মনের বিদ্রোহ প্রকাশ পায় এবং সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপীড়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অভাব ও ইসলামের নামে পূর্ববাংলাকে উপনিবেশে রূপান্তরিত করা বাংলাদেশের জন্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের জন্ম নিহিত রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদে।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রাণ পায় অর্থাৎ বাঙালিরা উপলব্ধি করে যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম তাদের রাজনৈতিক শক্তি বিকশিত করে। এরপর যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত করণ, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি এবং সামরিক সরকারের দমননীতি সত্ত্বেও ১৯৬২ সালের ছাত্র-আন্দোলন ও ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা আন্দোলনে বাঙালি জাতি আত্মবিশ্বাস লাভ করে। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এর দৃঢ় প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালি হত্যায় নামে। নিরস্ত্র বাঙালি জাতীয় চেতনায় দুকূল ছাপিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয় এবং দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতার বিজয়পতাকা ছিনিয়ে আনে। '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে অপরিমেয় ত্যাগ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, রক্তপাত ও সাফল্যের সূর্যোদয়ে গৌরবময়। ইতিহাসের যে গতিশীল ও দ্বন্দ্বময় ধারা পলাশির বিপর্যয় (১৭৫৭) থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), দেশবিভাগ (১৯৪৭), ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫১), ১৯৫৪-র নির্বাচন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনে সেই ঐতিহাসিক নিয়মেরই চরম পরীক্ষা।'[১] এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি এক বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের গুণগত রূপান্তরের পথ যেমন প্রশস্ত হয় তেমনি দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন ও নিপীড়ন জাতির সৃষ্টিশীলতায় যে 'সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎস্পর্শী কল্পনার পুঞ্জীভবন' ঘটেছিল তার গঠনমূলক রূপায়ণের পথও বাধামুক্ত হয়। বাঙালির ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় শুরু থেকেই তারা অস্তিত্বের প্রশ্নে সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে ইতিহাস ও জাতীয় জীবনের মাইলফলক রূপে চিহ্নিত করে তারা চিন্তা-চেতনায় একীভূত হয়ে এদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে ত্বরিতগতি দান করেছে। ১৯৪৭-এর পর 'আমাদের সঙ্কট-সমস্যার, সংহতির, সংগ্রামের ও বিজয়ের চারটি স্তম্ভ, চারটি বীকন রশ্মি, চারটি মিনার। এক. বায়ান্ন'র ভাষা সংগ্রাম, দুই. বাষট্টির শিক্ষাদ্রোহ, তিন. ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং চার. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এগুলোই আমাদের ঐতিহ্যের সম্পদ।'[২] এরকম ঐতিহ্য ও চেতনাশ্রয়ী হয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের ক্রমিক বিস্তার।

উপন্যাস জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প হওয়ায় তা সমকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতাকে ধারণ করে। একারণেই 'আমাদের সমকালীন সব

আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক সঙ্কট-সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ-চেতনাকেই সম্পদ ও সম্বল করা ফলপ্রসূ বলেই আবশ্যিক।'[৩] কেননা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পরিবর্তিত জীবনের ছায়া সাহিত্যের জগতটাকেও পরিবর্তিত করেছে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকেই এ পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে – যা একাত্তরে বাঙালি-জীবনের আত্মা ও দেহে সঞ্চালিত হয়। 'বাহান্নর আন্দোলন ছিল মূলতই ঢাকা-কেন্দ্রিক, কিন্তু তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল সমগ্র দেশব্যাপী। আর একাত্তরের ঘটনাস্থান গোটা বাংলাদেশ – সংকটের চেহারা ভয়াবহ – প্রতিক্রিয়া একেবারে প্রত্যক্ষ এবং মর্মমূলস্পর্শী। তখন নগর গ্রাম সব একাকার হয়ে যায়। সব মানুষ যেন অকস্মাৎ গ্রামবাসী হয়ে যায়। বাহান্নতে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি এবং মানসিক অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়েছিল। একাত্তরে তার গোটা অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।'[৪] কিছু দেশদ্রোহী দালাল ছাড়া সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষ জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে কলম ছেড়ে অস্ত্র ধরেছিল আবার কেউ কেউ বন্দুককে অভিনব কলম ভেবেছিল। বেদনাবহ ও মহিমাময় এই অনাস্বাদিত ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য ধরনের সাহিত্য সৃজন এদেশের সাহিত্যিকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ এক অপরিহার্য উপাদান। কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যে এর ব্যত্যয় দুর্লক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ-প্রাণিত উপন্যাসগুলোতে আমরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ মার্চের নির্মম হত্যাকাণ্ড , যুদ্ধচলাকালে সারাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর বর্বর অত্যাচার-নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সাহসী সংগ্রাম, যুদ্ধচলাকালে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ দুঃস্বপ্নভরা দিনযাপন, বর্বর শত্রুর দ্বারা বন্দিশিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন, পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দালাল-দোসর দ্বারা নারী ধর্ষণ এবং হত্যা প্রভৃতি আলেখ্যের পাশাপাশি নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন-সাধ-নির্ভর চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখি। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে বাঙালির যে আত্ম-অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তা মূলত মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ঐতিহ্যের অনুসারী।

১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব কালসীমায় রচিত যে সব উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটেছে সেগুলোর মধ্যে আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *রাঙা প্রভাত* (১৯৫৭), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), *রাজা উপাখ্যান* (১৩৭৭), শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৫-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫), আবু রুশদের (জ. ১৯১৯) *ডোবা হল দীঘি* (১৯৬৬), *নোঙর* (১৯৬৮), সরদার জয়েন উদ্‌দীনের (১৯২৩-১৯৮৬) *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭), আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) *সূর্য তুমি সাথী* (১৯৬৭), আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১)

নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), ইন্দু সাহার (জ. ১৯৪০) *কিষাণ বউ* (১৯৬৮), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৯৮) *উত্তরণ* (১৯৭০), জহির রায়হানের (১৯৩৩-১৯৭২) *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯), *আর কত দিন* (১৯৭০), জহিরুল ইসলামের (জ. ১৯৩১) *অগ্নিসাক্ষী* (১৯৬৯) প্রভৃতি অন্যতম।

রাঙা প্রভাত উপন্যাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তথা পূর্ববাংলার গণতন্ত্র ও মানবতা বিকাশের অস্থির ও দ্বন্দ্বময় সময়ের জীবন-ব্যবস্থা বিশেষত মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত মানসতার অগ্রসরমান দিকটি উপস্থাপিত। কামাল চরিত্রের অনুষঙ্গে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক সংকট, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নতুনতর বোধ, আদর্শভিত্তিক তথা চেতনা-উজ্জীবিত জীবনধারা গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এতে বিধৃত। *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে মধ্যযুগের বাগদাদের খলিফা হারুনর-রশীদের রাজত্বকালের পটভূমিকায় পূর্ববাংলার স্বৈরশাসন-শৃঙ্খলিত অবস্থা বর্ণিত। ঔপন্যাসিক পূর্ববাংলার মুক্তিকামী জনগণ ও তাদের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এ উপন্যাসে প্রতীকায়িত করেছেন। *রাজা উপাখ্যান*ও প্রতীকী উপন্যাস। এতে সামরিক স্বৈরশাসক শাসিত এদেশের শোষণের ইতিহাস, অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী এবং প্রগতিশীল চেতনার গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে চিত্রিত। *সংশপ্তক* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বকাল থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত ক'বছর পর্যন্ত সময়ের তথা রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগবদলের এক সন্ধিক্ষণের কাহিনী। এ উপন্যাসের মহাকাব্যিক পরিসরে গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-নৈরাশ্য, নারীর লাঞ্ছনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রগতিশীল বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের ইতিহাস-চেতনা ও সমাজবাদী জীবনাদর্শের স্পর্শে সংস্থাপিত। গ্রাম-শহরের প্রেক্ষিতে এতে দুশ্রেণীর মানুষের জীবনবোধ ও কর্মোদ্যোগ চিত্রিত – এক মধ্যবিত্ত সামন্তবাদী সমাজভুক্ত মানুষ; দুই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, আত্মমুক্তি-অন্বেষী সচেতন মানুষ। *ডোবা হল দীঘি* উপন্যাসে দেশভাগ থেকে ভাষা-আন্দোলনের সময়সীমায় সংঘটিত ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে শহুরে নব্য মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর জীবনকথা বিবৃত। *নোঙর* বিভাগোত্তরকালে পূর্ববাংলার চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতার কাহিনী। *অনেক সূর্যের আশা* উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কবলিত ভারতবর্ষ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-শোষণ, পাকিস্তান-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী চার বছরে স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র বিধৃত।

সূর্য তুমি সাথী একটি বিশেষ অঞ্চলের জনসাধারণের লোক-সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি, ঈর্ষা-দ্বেষ প্রভৃতি সম্বলিত জীবনালেখ্য। তবে এতে সাম্প্রদায়িকতা ও ভূমিহীনদের কথা উচ্চকিত। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন এবং কৃষক সমিতি গঠন করে সাধারণ কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের সামন্ত সমাজব্যবস্থার কবল থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। *নীড় সন্ধানী* উপন্যাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন,

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, বিভাগোত্তর ভারত-পাকিস্তানের রাজনীতি, শাসকগোষ্ঠীর অভিন্ন চারিত্র্য ও কর্মকাণ্ড, তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মীয় সংখ্যালঘু-সংকট প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত। তবে বিভাগোত্তরকালের সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যার অন্তর্গূঢ় কারণ সন্ধানের প্রয়াস এতে লক্ষণীয়। *কিষাণ বউ* উপন্যাসে সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণ-নির্যাতন হতে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামশীলতা বিষয় রূপে প্রতিপাদ্য। এতে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গদেশের অন্তরালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত-পরবর্তী ক'বছরের পূর্ববাংলার সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক মার্কসীয় দর্শনের দীক্ষায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দুর্দশা এবং সে সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে প্রগতিশীল চেতনায় উজ্জীবিত একদল সংগ্রামশীল মানুষের চিত্র এঁকেছেন।

উত্তরণ উপন্যাসে দেশভাগের পূর্বাপর সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি, ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংকট প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিন্যস্ত। সাধারণ সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের সামাজিক পরিচিতি, অবস্থান, তাদের জীবনযাত্রার সংকট-স্বরূপ বিশ্লেষণার্থে ঔপন্যাসিক সরাসরি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-চেতনার উল্লেখ করেছেন। নিম্নবিত্ত মালেক চরিত্রের সংগ্রামময় জীবনের বোধ-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সময়-সমাজ-মানুষ সম্বন্ধে তার চেতনাগত রূপান্তরই এতে উপস্থাপিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, নব্য-স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতায় মালেক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় মালিক কর্তৃক শ্রমিক শোষণের কৌশল ও পরিসীমা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাবলি বিন্যস্ত। পূর্ববাংলায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশের দিকটির উন্মোচন এতে লক্ষণীয়। *আর কত দিন* উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ-ফ্যাসিবাদ-বর্ণবাদে আক্রান্ত বিশ্বমানবতার বিপর্যয় এবং তার আগ্রাসন থেকে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামশীলতার ছবি অঙ্কিত। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানকালীন সত্য ঘটনা ও বিপ্লবাত্মক উপাদান এবং তার কিছুকাল পূর্বের বিস্ফোরণ-উন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতি *অগ্নিসাক্ষী* উপন্যাসে বিধৃত। বাস্তববাদী ও সাম্যবাদ-প্রাণিত জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে যৌথ সংগ্রামীজীবন গঠনে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

এসব উপন্যাসে প্রধানত দুই ধরনের জীবন-চেতনা উপস্থাপিত হয়েছে– কোনোটিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী জীবন-চেতনা আবার কোনোটিতে সমাজবাদী জীবন- চেতনা। তবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতিরোধের মনোভাব তথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে তা উৎসারিত হয়েছে।

যুদ্ধ মানবজীবনকে ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর তা কালজয়ী ও মহৎ সাহিত্যের উপাদান হিসেবে সাহিত্যজগতকেও প্রভাবিত করে। যুদ্ধের প্রেরণায়, দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু দেশে বহু লেখক সগৌরবে বিকশিত হয়েছেন। তাঁরা স্বজাতি ও স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে দেশীয় সীমার বাইরে এনে বিশ্বের সংগ্রামী, আত্মত্যাগী মানুষের রক্তক্ষরণ ও বিজয়ের ঘটনার সাথে মিশিয়ে বিশ্বমানের সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন। ফলে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার হয়েছে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে কোনো উপন্যাস রচিত না হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের সাহিত্যে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। এ সময়ের উপন্যাসে আবেগ-উচ্ছ্বাসের সাথে জড়িত আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিমাণগত রূপান্তরের সাথে সাথে বাঙালির চেতনার ক্ষেত্রেও গুণগত বিকাশ ঘটে। নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালির চিন্তা-চেতনায় মেধা-মননে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে জাতির প্রত্যাশার দিগন্তকে সুবিস্তৃত করে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ক'বছরের মধ্যেই বাঙালির চৈতন্যে পরাজয়ক্লিষ্টতা প্রকাশিত হতে থাকে। সোনালি ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথে অতীত তার পাণ্ডুর ছায়া ফেলে। সমালোচকের ভাষায় :

> জাতিসত্তা পুনরায় নিক্ষিপ্ত হল অতীত-গর্ভে; বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হল মূল্যবোধের স্তম্ভগুলি; গণতন্ত্র হল সমরাস্ত্র শাসিত; জাতিশোষণ রূপান্তরিত হল শ্রেণী-শোষণে; সহস্র কোটিপতির রস-সরবরাহে আমাদের অস্তিত্বমূল শুকিয়ে গেল। রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হল ছিন্নমূল সব ভাড়াটে কুশীলব; ছদ্মবেশের আড়ালে দেখা গেল তাদের অতীত-কঙ্কাল।[৫]

ফলে স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি জাতির জনজাগরণকে ধারণ করে এদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের যাত্রা শুরু হলেও তা আর বজায় থাকেনি।

স্বাধীনতার মূল্যবোধের বিপন্ন পটভূমিতে এ দেশের উপন্যাসিকদের জীবনস্পর্শী চেতনালোক হয়েছে বিক্ষত ও রক্তাক্ত। এতে উপন্যাসের নতুন বিষয় ও জীবনাদর্শ সন্ধানের উদ্দেশ্যটি স্থিত হয়ে স্বচ্ছ সুগভীর কোনো জীবনদর্শনে উপনীত হওয়ার আগেই দ্বিধা ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। 'নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিকূলতার আবর্তে বাংলাদেশের মানুষের জীবন কয়েক বছরের মধ্যেই আবার দ্বন্দ্ব-সংকুল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন মূল্যবোধের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। আবার হতাশায় আক্রান্ত হয় সমাজজীবন।'[৬] যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, হতাশা, নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রভৃতির ছায়া এ সময়ের উপন্যাসে অনিবার্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের স্বপ্নভঙ্গ, সামাজিক অবক্ষয়, অনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে রচিত উপন্যাসের সংখ্যাও প্রচুর। এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কোনো কোনো উপন্যাসে ক্রোধে আবার কোনো কোনো উপন্যাসে ক্ষোভ ও হতাশায় রূপান্ত

রিত হয়ে প্রকাশিত। তবে একথা সত্য, মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা-উত্তরকালের উপন্যাসে নতুন উপাদান সংযোজন করেছে – যা বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের বিষয় অপেক্ষা ভিন্নতর। মুক্তিযুদ্ধের এই রক্তস্নাত হতাশা ও ব্যর্থতার ক্ষতবিক্ষত চেতনাই স্বাধীনতা-পরবর্তী উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও অনুষঙ্গযুক্ত উপন্যাসগুলোকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : এক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস। দুই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালের ঘটনায় যুদ্ধ-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের প্রত্যক্ষ ঘটনা-সমৃদ্ধ উপন্যাসে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা, মুক্তিসংগ্রামের শুরু, সংঘর্ষ, রক্তপাত, অকথ্য নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহে ফেরা প্রভৃতি বিধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জাহান্নম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩), *জলাংগী* (১৯৭৪), রশীদ করীমের (জ. ১৯২৫) *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩), সৈয়দ শামসুল হকের (জ. ১৯৩৫) *নীল দংশন* (১৯৮১), *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* (১৯৮৬), শওকত আলীর (জ. ১৯৩৬) *যাত্রা* (১৯৭৬), রাবেয়া খাতুনের (জ. ১৯৩৫) *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪), মকবুলা মনজুরের (জ. ১৯৩৮) *শিয়রে নিয়ত সূর্য* (১৯৮৯), মাহমুদুল হকের (১৯৪৩-২০০৮) *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), *খেলাঘর* (১৯৮৮), রশীদ হায়দারের (জ. ১৯৪১) *খাঁচায়* (১৯৭৫), *অন্ধ কথামালা* (১৯৮২), আমজাদ হোসেনের (জ. ১৯৪২) *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫), ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের *বন্দী দিন বন্দী রাত্রি* (১৯৭৬), আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫), *অলাতচক্র* (১৯৯০), মিরজা আবদুল হাইয়ের (১৯১৯-১৯৮৪) *ফিরে চলো* (১৯৮১), *তোমার পতাকা* (১৯৮৪), শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫), সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (জ. ১৯৫৩) *জীবনতরু*, সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬), মাহবুব সাদিকের (জ. ১৯৪৮) *বারুদগন্ধ দিন* (১৯৭৩), বেগম জাহান আরার *অয়নাংশ* (১৯৮৩), হুমায়ূন আহমেদের (জ. ১৯৪৮) *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৩), *সৌরভ* (১৯৮৪), *আগুনের পরশমনি* (১৯৮৬), *১৯৭১* (১৯৮৬), ইমদাদুল হক মিলনের (জ. ১৯৫৫) *কালো ঘোড়া* (১৯৮৩), *ঘেরাও* (১৯৮৫) উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালের ঘটনায় যুদ্ধ-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাসগুলোতে স্বাধীনতাউত্তর কালের স্বপ্নভঙ্গ, সামাজিক অনৈতিকতা, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন অথবা তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে যাওয়া, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না-হওয়া প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮১), *অন্তর্গত* (১৯৮৪), *এক যুবকের ছায়াপথ* (১৯৮৭), *ত্রাহি* (১৯৮৯), রিজিয়া রহমানের (জ. ১৯৩৯) *রক্তের অক্ষরে* (১৯৭৮), *একটি ফুলের জন্য* (১৯৮৬), রশীদ হায়দারের *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* (১৯৮২), আমজাদ হোসেনের *অস্থির পাখীরা* (১৯৭৬),

যুদ্ধে যাবো (১৯৯০), হারুন হাবীবের (জ. ১৯৪৮) *প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম* (১৯৮২), শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) *জীবন ও রাজনৈতিক-বাস্তবতা* (১৯৮৮), ইমদাদুল হক মিলনের *মহাযুদ্ধ* (১৯৮৯), *নিরাপত্তা হই* (১৯৮৯), মঈনুল আহসান সাবেরের (জ. ১৯৫৮) *পাথর সময়* (১৯৮৯), *পরাজয়* (১৯৯০), *কেউ জানে না* (১৯৯০), মঞ্জু সরকারের (জ. ১৯৫৩), *প্রতিমা উপাখ্যান* (১৯৯০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দুই

বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো কথাসাহিত্যেও বিশেষত উপন্যাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিষয় হিসেবে নবতর সংযোজন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে আনোয়ার পাশার *রাইফেল রোটি আওরাত* সর্বপ্রথম লিখিত উপন্যাস। যুদ্ধ চলাকালে এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে এটি লিখিত হয়েছিল অর্থাৎ ১৯৭১-এ যখন অবরুদ্ধ ঢাকায় দেশপ্রেমিক জনগণ সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছিল সেই দুঃসহ ও ভয়াবহ পরিবেশে অবস্থান করে আনোয়ার পাশা এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে ২৫ মার্চের কালরাত্রির হত্যাকাণ্ডের এবং তৎপরবর্তী কয়েক দিনের হত্যাযজ্ঞ ও অগ্ন্যুৎসবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ উপন্যাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনের নির্মম ও নারকীয় অভিজ্ঞতা বর্ণিত। যেমন :

> নীলক্ষেতের পরিত্যক্ত রেল লাইনের দু'পাশে বাস করত হাজার হাজার গরীব মানুষ। নানা সময়ে ঝড়ে-বন্যায় গ্রামবাঙলার লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা শহরে এসেছে – তারাই এখানে এসে হয়েছে বস্তিবাসী। সেই গরীব মানুষের বস্তি পুড়িয়ে অশেষ বীরত্ব দেখিয়ে গেছে পাক-ফৌজ।[৭]

এ উপন্যাসে আনোয়ার পাশা বাস্তববাদী শিল্পীর নিরাসক্তিতে একাত্তরের ২৫ মার্চের নারকীয় অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছেন। এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া সুদীপ্ত শাহিনকে এবং পাঠককে একই সাথে আতঙ্কিত, রক্তাক্ত ও শিহরিত করে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুদীপ্ত শাহিন তার অবস্থানগত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও সংশয় থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার সাথে মিলিত হতে পেরেছিলেন। তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন নিরাপত্তাহীন ঢাকা শহরের স্থান থেকে স্থানান্তরে। তবুও মুক্তিযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন এবং স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থেকেছেন। এ উপন্যাসে চিত্রশিল্পী আমান চরিত্রের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে লেখকের আশাবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সুদীপ্ত শাহিন মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অস্ত্রধারণ না করে বরং অস্ত্রধারীদের সহযোগী শক্তিরূপে নিয়োজিত ছিলেন। মূলত আনোয়ার পাশা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা তার গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিক নিজেই সুদীপ্ত শাহিন। তাই আত্মজৈবনিক বিশ্লেষণই তাঁর রচিত *রাইফেল রোটি আওরাত* উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে।

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম উপন্যাস *জাহান্নম হইতে বিদায়*। এ উপন্যাসটিও *রাইফেল রোটি আওরাত*-এর মতো যুদ্ধ চলাকালে রচিত এবং ১৯৭১ সালেই ভারতের কলকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের নারকীয় গণহত্যার বিভীষিকাময় বর্ণনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র স্কুলশিক্ষক গাজী রহমান রাজধানী ঢাকা থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, 'খোলা এবং তাজা চোখসহ' লাশের সারি, কাটা মুণ্ডু-ধড়হীন হাত, মৃত 'উলঙ্গ রমণীর দুই ঊর্ধ্বমুখী পায়ের মাঝখানে বেয়নটের খোঁচা।'[৮] পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্র তাণ্ডবে হতশ্রী বাংলাদেশকে শওকত ওসমান জাহান্নমের প্রতীকে দেখাতে চেয়েছেন। ফলে *জাহান্নম হইতে বিদায়* উপন্যাসে মধ্যবিত্ত গাজী রহমানের স্বদেশ থেকে পলায়নপর মানসিকতার রূপায়ণ ঘটেছে। *জাহান্নম হইতে বিদায়* কাহিনী-নির্ভর নয়, চিত্রধর্মী উপন্যাস। তবে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতা বা গাজী রহমানের সমগ্র জীবনচিত্র এতে স্থান পায়নি। গাজী রহমানের অভিজ্ঞতা-সূত্রে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের খণ্ড খণ্ড চিত্র বা জীবন-রূপ এ উপন্যাসে সাংকেতিকভাবে অঙ্কিত– যা সামগ্রিকতার ইঙ্গিতবাহী। এ উপন্যাসে গাজী রহমান ঔপন্যাসিকের বিবেক রূপে চিহ্নিত। উপন্যাসটির কলেবর সংক্ষিপ্ত, কাহিনী-বিন্যাসে কল্পনার স্থান গৌণ। তাঁর *নেকড়ে অরণ্য* উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরের যুদ্ধ-সংঘাতময় দিনগুলোতে বাঙালি নারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে- তারই বাস্তবচিত্র *নেকড়ে অরণ্যে* বিধৃত। একটি বিরাট গুদামঘরে শত বন্দিনীর সাথে তনিমা, জায়েদা, সখিনা, আমোদিনী ও চাষি-বৌ রশীদার বন্দি জীবনের দুঃখ-দুর্দশাময় কাহিনী ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবে বাস্তবানুগ করে নির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ 'যে যন্ত্রণার বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছে তাকে এবং স্বাধীনতাকে একত্রিত করে মনের মধ্যে রাখা হয়েছে এই বইটিতে।'[৯] *নেকড়ে অরণ্য* পাকিস্তানি বাহিনীর হিংসা ও লালসায় বিপন্ন বাঙালি নারীর বিনষ্ট জীবনরূপের চিত্রায়ণ এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন ঘটনার গ্রন্থন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামের একটি অনন্য দলিলরূপে পরিগণিত। এ উপন্যাসও কাহিনী-নির্ভর নয়, চিত্রধর্মী– স্মৃতিচিত্রের ধরনে রচিত। এতে কাহিনী বা চরিত্রগুলোর বিকাশ ঘটেনি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ একটি দিকের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসটির *নেকড়ে অরণ্য* নামকরণ যুক্তিযুক্ত। *দুই সৈনিক*-এর বিষয়েও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে রাজনৈতিক মতাদর্শের যে কোনো মূল্য ছিল না এবং তারা যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারীদেরও ক্ষতিসাধন করেছিল সে কথাটি ঔপন্যাসিক এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কিছু সংখ্যক স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালির পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে দোসরতা তৈরি করে বাঙালিকে হত্যার সহযোগিতা করে– এ তথ্যও এতে পরিবেশিত। ঔপন্যাসিক পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে বাঙালির এরূপ দোসরতা যে

আত্মহত্যারই নামান্তর– এ সত্যই এ গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হলেও যুদ্ধ হত্যা-অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের বর্ণনা এখানে অনুপস্থিত। *দুই সৈনিক* উপন্যাসের কাহিনীর পরিসর স্বল্পায়তন। একমুখি বা সরলরৈখিক মূলকাহিনী সীমিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত। এর কাহিনীর প্রথমাংশ বর্ণনাত্মক এবং অপরাংশ নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে গঠিত। শওকত ওসমানের *জলাংগী* উপন্যাসেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'পঁচিশে মার্চের অব্যবহিত ঘটনাক্রম, জাতীয় জীবনের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা, পাকিস্তানি অপশক্তির পাশব বর্বরতা, গ্রামাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের বস্তুনিষ্ঠ বিন্যাস এ-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।'[১০] বাঁকাজোল গ্রামের প্রতীকে শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত গ্রামবাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। *জলাংগী* খণ্ডিত চিত্র নয়। এ উপন্যাসে জনজীবন, যুদ্ধ, অত্যাচার ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পটভূমি তৈরির ইঙ্গিতসহ যুদ্ধ, যুদ্ধকালীন বাস্তবতা, রাজাকার-আলবদর বাহিনীর অপতৎপরতা, পাকিস্তানি সৈন্যদের নারকীয় তাণ্ডব-বর্বরতা এবং পৈশাচিক উল্লাস-বিকৃতি স্বল্প কলেবরে এতে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে প্রস্ফুটিত।

আমার যত গ্লানি উপন্যাসে রশীদ করীম মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসের দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব উন্মোচন করেছেন। বিভাগোত্তর কাল থেকে শুরু করে একাত্তরের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন ঘটনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিশেষত ১৯৭০-এর প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত দেশ, নির্বাচন, গণপরিষদের অধিবেশন, শেখ মুজিব, ৭ মার্চের ভাষণ, যুদ্ধের মুখোমুখি দেশ প্রভৃতি প্রসঙ্গ মধ্যবিত্ত মানসের প্রেক্ষিতে এতে উত্থাপিত হয়েছে। এখানেও পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের চিত্র উপস্থাপিত। যেমন :

> পঁচিশ তারিখের রাতে ট্রাক-ভর্তি মরা মানুষ দেখা গেছে। একটা-দু'টা নয়। ডজন ডজন ট্রাক। একটা দু'টা মরা মানুষ নয়, শত শত। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সকলে আবার মরেওনি। পাশে, ওপরে, নীচে, মরা লাশ; সেই অনড় স্তূপের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একটা হাত একবার নড়ে ওঠে।[১১]

তবে তৎকালীন রাজনৈতিক তরঙ্গক্ষুব্ধতা ও গতিশীল ঘটনাস্রোতের মধ্যে প্রধান চরিত্র এরফান মিঞার রতিচেতনা, আত্মগত অনুভব এ গ্রন্থে প্রধান হয়ে উঠেছে। আত্মকথন রীতি বা ঔপন্যাসিকের জবানীতে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত।

সৈয়দ শামসুল হকের *নীল দংশন* ও *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাসদুটিও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্রনির্ভর। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে বাঙালি মাত্রকেই নির্যাতনের শিকারে পরিণত করেছিল এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংসের নিমিত্তে সংস্কৃতিবান লোকদের হত্যা করেছিল *নীল দংশন* উপন্যাসে এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। এর কাহিনীতে একাত্তরের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাংলাদেশ আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি পশুশক্তির ক্রমাগত নির্যাতনে নিরীহ বাঙালিও যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসের নজরুল চরিত্রটি তার উদাহরণ। ঔপন্যাসিক

সৈয়দ শামসুল হক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এর ঘটনা সাজিয়েছেন। একাত্তরের যুদ্ধারোপিত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সমগ্র দেশের হত্যা-ধ্বংস তুলে ধরেছেন। তাঁর বর্ণনায় :

> সমস্ত শহরের ওপর দিয়ে গুলীর ঝড় বয়ে গেল, ট্যাংক গড়িয়ে গেল, বাড়ী ধ্বসে পড়ল, লাশের পাহাড় জমে উঠল রাস্তার মোড়ে মোড়ে।[১২]

নীল দংশন কাহিনী-নির্ভর নয়, চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস। কাহিনী-অংশ বর্ণনাত্মক হলেও চরিত্রের সংলাপকে কেন্দ্র করে নাটকীয় ঢঙে উপন্যাসটি সুগঠিত। বাস্তববাদী ঢঙে লিখিত হলেও কাহিনীটি এলিগরি বা রূপকের ন্যায় বিন্যস্ত। তাছাড়া কাহিনীর পরিণতিতে তা আর বাস্তবিকই বাস্তবতার নিগড়ে বাঁধা থাকে না। *নীল দংশন* উপন্যাসের পটভূমি, কাহিনীর বিস্তার ও চরিত্রচিত্রণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা গভীর মনোযোগের দাবিদার। সৈয়দ শামসুল হকের *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাসে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও বিহারীরা যে শুধু ঢাকা শহরে নয় বাংলাদেশের মফঃস্বল শহরগুলোসহ গ্রামে-গঞ্জে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং বাঙালি নারীদের অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছে তার শব্দরূপ লিপিবদ্ধ। বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলো পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হতে শুরু করে ২৫ মার্চের তিন-চার মাস পরে। তারা সমগ্র দেশে যে হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ চালিয়েছে তার চালচিত্র ঔপন্যাসিক জলেশ্বরীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন :

> জনপদে এখন কন্টিকারি ও গুল্মলতার বিস্তার, শস্য অকালমৃত, ফল কীটদষ্ট, ইঁদারা জলশূন্য। সড়কগুলো শ্বাপদেরা ব্যবহার করে এবং মানুষ অরণ্যে লুকায়। দিন এখন ভীত করে, রাত আশ্বস্ত করে। বাতাস এখনো গন্ধবহ, তবে কুসুমের নয়, মৃত মাংসের।[১৩]

নিষিদ্ধ লোবানে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনার পাশাপাশি রতিচেতনার আধিক্যও প্রবল। *নিষিদ্ধ লোবানে* জলেশ্বরীর প্রতীকে সমস্ত বাংলাদেশকেই ধারণ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হত্যার পর তাদের যে শেষকৃত্য করত না একথাটিও এখানে উল্লেখিত। পাকিস্তানি সৈন্যরা পশু ও বাঙালিদের এক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের অজস্র মৃতদেহ শেয়াল-শকুনের খাদ্যরূপে ফেলে রাখত। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস এতে অপমানিত বোধ করে এবং প্রতিবাদ জানায় অভাবনীয় ও অসম্ভব পদ্ধতিতে। *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাসটি স্বল্প-পরিসর এবং অল্প কটি চরিত্রের সমাবেশে গঠিত। বিলকিস চরিত্রকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর শ্রীবৃদ্ধি। বিলকিস জীবনবোধে উদ্দীপ্ত, মৃতব্যক্তিকে সম্মান দিয়ে সে জীবনের মর্যাদা দিতে চায়। বিলকিস ভিন্ন অন্যান্য চরিত্রের বিকাশ লক্ষযোগ্য নয়। বলা যায়, এটিও চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস। এতে মুক্তির-সংগ্রাম বা বিজয় লাভের দৃশ্য অনুপস্থিত। উপন্যাসটি নাতিদীর্ঘ হলেও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা-সমৃদ্ধ হওয়ায় ব্যতিক্রমধর্মী। নজরুল ও বিলকিস চরিত্র দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও স্বদেশ ও স্বসমাজের ক্রান্তিকালে চূড়ান্ত সম্ভাবনাময়, তৎপর ও সক্রিয় হয়ে

উঠেছিল। 'মধ্যবিত্ত মানুষও, স্বশ্রেণীর সমাজভূমি থেকে নিজের শেকড় ছিঁড়ে গেলে কী অভাবিত মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে, মধ্যবিত্ত মানসসীমা অতিক্রম করে অসামান্য সম্ভাবনায় দীপ্তিমান হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত মেলে সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' এবং 'নীল দংশন' উপন্যাস দু'টিতে।'[১৪] তাঁর এই উপন্যাস দুটি নিরীক্ষাধর্মী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাদের পাশব অত্যাচারের বিভিন্ন পটভূমিতে দুটি সাধারণ মানুষের আন্তর্জাগতিক ক্রম-রূপান্তরের বাস্তবতা এ গ্রন্থ দুটিতে চিত্রিত। উপন্যাস দুটিতে মুক্তিযুদ্ধ-কালের বাঙালির সামগ্রিক জাগরণের ছবি নেই, এটি সমগ্র যুদ্ধের একটি খণ্ডাংশের শিল্পরূপ– তবে *নীলদংশন* ও *নিষিদ্ধ লোবান* উপন্যাস দুটি দর্পণের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র রূপ এতে প্রতিফলিত হয়। তাঁর *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* উপন্যাসের কাহিনীও মুক্তিযুদ্ধের চালচিত্র-সংবলিত। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটন ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত বাঙালির মানস-সংকট এতে প্রকটভাবে উপস্থাপিত। হাদী চরিত্রের স্মৃতিচারণে কাহিনীর সূত্রপাত। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্-কালে সে দেশত্যাগ করে লন্ডনে যায় এবং প্রবাসী বাঙালিদের সাথে তার সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সূত্রে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িকতা, ভারতের সমর্থন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উন্মোচিত হয়েছে। বলা যায়, এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-চলাকালে প্রবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালির চারিত্র্য, চিন্তা-স্রোত তথা যাপিত-জীবনের রূপায়ণ। এ উপন্যাসের কাহিনীর পরিসর স্বল্প, এতে কাহিনী বা চরিত্র নয়, ঘটনাই মুখ্য। বিষয়ের ভিন্নতা তো বটেই, নিরীক্ষা-ধর্মিতার জন্যও *মৃগয়ায় কালক্ষেপ* উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ।

শওকত আলীর যাত্রা উপন্যাসটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের সময়কালের পটভূমিতে রচিত। এর প্রকাশকাল ১৯৭৬ সালে হলেও রচনাকাল ১৯৭২। ২৫ মার্চের কালরাতে সংঘটিত নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের পর মার্চের শেষ ও এপ্রিলের শুরুর দিনগুলির ঘটনাবলি এতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিষয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক আক্রমণে ভীত ঢাকাবাসীর নিরাপদ আশ্রয়-সন্ধান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ। *যাত্রা* উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত নয়, যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতা-স্মৃতি-কল্পনার সমন্বিত নির্মিতি। শওকত আলীর বর্ণনার প্রাখর্য ও প্রত্যক্ষতার দৃঢ়তার জন্যে এতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের উত্তাল পরিস্থিতি ও যুদ্ধবন্দি নানা সমস্যামূলক ঘটনার জান্তব পরিবেশের বাস্ত বানুগ উদ্ভাসন ঘটেছে। যেমন:

> ওদিকে উত্তরে শহরের আকাশে এখনো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ডাইনে থেকে বাঁয়ে, গোনা যায় আজ – একটা, দুটো, তিনটে-চারটে, পাঁচটা – ঐ যে আরেকটা, ওদিকে বাঁয়ে আবার আরেকটা আরম্ভ হচ্ছে। তবু গোনা যায়। গতকাল গোনা যেতো না।[১৫]

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অধ্যাপক রায়হান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। একসময় প্রগতিশীল রাজনীতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে আশাবাদী কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দোদুল্যমান, সংশয়গ্রস্ত। এ চরিত্রটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার 'না-

ঘরকা না-ঘাটকা' স্বভাব- বৈশিষ্ট্যের। রায়হান চরিত্রে মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রকটতা প্রবলভাবে দৃশ্যমান। তিনি পঁচিশে মার্চের পূর্বে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকা ত্যাগে মনস্থির করেন কিন্তু পথের অসুবিধার কথা ভেবে তা থেকে বিরত হন। পরবর্তীকালে ঢাকা আক্রমণের পর বুড়িগঙ্গা পার হয়ে গ্রামের পথে যাবার সময় আহত ছাত্র হাসান অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে ফেলে রেখে চলে যেতে চান। পথ চলতে অক্ষম হাসানকে তিনি বোঝা মনে করে বিরক্তবোধ করেন। তাঁর স্বগতোক্তিতে তা স্পষ্ট :

> কী দায় পড়েছে যে পথের একটি অপরিচিত রুগ্ন মানুষের দেখাশুনা করতে হবে। চারিদিকে এমনি অসহ্য অবস্থা – তার নিজেরই সবকিছু অনিশ্চিত, সে নিজেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে উঠতে পারছে না – তবু তাকেই কেন এ দায়িত্ব নিতে হবে?[১৬]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নেতৃত্বদানের সুযোগ পেয়েও যুদ্ধে না গিয়ে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তা ও পুরনো জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন। একাত্তরের যুদ্ধগন্ধী সময়ের জীবন-যন্ত্রণা ও অত্যাচারিত, নিগৃহীত মানুষের নানাবিধ সংকট-সমস্যার মধ্যেও উপন্যাসের অন্য চরিত্র হাসান আশাবাদী। সে রায়হানের মতো আত্মসুখ সন্ধানী এবং সে কারণে গ্লানিবোধে ভারাক্রান্ত নয় বরং যুদ্ধজয়ের আকাঙ্ক্ষা বুকে চেপে উচ্চারণ করে, 'এখন আমাদের জীবনের আরেক নাম হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা।'[১৭] এ উপন্যাসে মধ্যবিত্তের চিরন্তন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দেশের জন্য আত্মত্যাগের মহিমা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। *যাত্রা* বর্ণনামূলক উপন্যাস, দিনলিপি বা ডায়েরি সদৃশ রচনা। বলা যায়, ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনীর প্রতিচ্ছায়ায় পরিব্যাপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক চিত্র এখানে নেই। স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ঐক্যের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায় না। চরিত্রগুলোর সংলাপে খেদ-প্রকাশক শব্দ উচ্চারিত হলেও ঔপন্যাসিকের বর্ণনা-চাতুর্য ও মন্তব্যের ভাষায় উষ্মা বা ক্ষুব্ধতাবাচক শব্দের ব্যবহার দুর্লক্ষ। উপন্যাসের কাহিনী গতিশীল। উপস্থাপন-ভঙ্গি বর্ণনাত্মক, কোথাও কোথাও ঔপন্যাসিক নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। সে কারণে সংলাপে কাহিনীর দীর্ঘ-অংশ গঠিত। *যাত্রা* উপন্যাসে পাকিস্তানি হানাদারের চরিত্র চিত্রিত হয়নি, তাই উর্দু ভাষার ব্যবহার নেই।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার আরও স্পষ্ট রূপায়ণ রশীদ হায়দারের *খাঁচায়*। এই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ নগরজীবনের কাহিনী বিধৃত। ঢাকা শহরের ত্রিতল ফ্ল্যাটে অবরুদ্ধ ও আতংকগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের অসহায়তা, নিরাশা, সংশয় এ গ্রন্থের উপজীব্য। অবরুদ্ধ পরিবারের সদস্যরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিন্তু যুদ্ধ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। কখনো তাস খেলে, পান করে, রেডিও শুনে ভয়ভীতিতে দিন কাটায়। তারা আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধ দেখে এবং ইন্দিরা গান্ধীর রেডিও ভাষণে স্বাধীনতার আশ্বাস খোঁজে। মধ্যবিত্ত নগরজীবনের আত্মপরতা ও স্বপ্নবিলাসের মধ্যেও এ উপন্যাসে এক খণ্ডিত বাস্তবতার চিত্র রূপায়িত। কথাশিল্পী রশীদ হায়দার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পরিপার্শ্বে ঘটে যাওয়া বিচিত্র ঘটনা প্রভৃতির আলোকে যুদ্ধকালীন সময়ের নিরাপত্তাহীন বাঙালির অস্তিত্বের-সংকট রূপায়িত

করেছেন। উপন্যাসটি প্রত্যক্ষযুদ্ধের উন্মাতাল পরিস্থিতিতে রচিত হয়নি, তবে ঔপন্যাসিকের বর্ণনার প্রাখর্য, তাঁর অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও কল্পনার প্রসারতা একে যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তব পরিবেশ দান করেছে। *খাঁচায়* উপন্যাসের কলেবর ক্ষুদ্র, কাহিনী সংক্ষিপ্তাকার। এতে যুদ্ধের তীব্রতা বা সামগ্রিক অবস্থা, যুদ্ধের অনিবার্যতায় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বা আত্মত্যাগ প্রভৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা নেই। তবে গৃহবন্দি ক'টি পরিবারের কিছু মানুষের যুদ্ধের উত্তাল পরিস্থিতির অস্বস্তি-অস্থিরতা বা টেনশন ও বন্দিত্ব থেকে মুক্তির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার শব্দরূপ নির্মাণে ঔপন্যাসিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *খাঁচায়* বর্ণনাত্মক উপন্যাস। ঔপন্যাসিক পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কবলিত বাংলাদেশকে 'খাঁচা'র এবং বন্দি পাখিকে শৃঙ্খলিত বাঙালির প্রতীকে অবলোকন করেছেন। *অন্ধ কথামালা* উপন্যাসটি রশীদ হায়দারের পরিণত সৃষ্টি। এর ক্যানভাসে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধারা উঠে এসেছে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের অব্যবহিত পরে একটি ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা করতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে বাঙালি যুবক বেলাল হোসেন বেলটু। তার বন্দিত্ব, নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যত ও মৃত্যুতাড়না এবং সেই অবস্থায় তার স্মৃতিতে ভিড় জমানো অতীতের ঘটনাবলি এই উপন্যাসে বিন্যস্ত। বেলাল তার কয়েক বন্ধুর সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রতিরোধকল্পে একটি ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। বেলালের উক্তিতে ব্রিজ অপারেশনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় :

> কথা হয় মোকসেদই প্রথম উঠবে, ওর এ্যালার্ম দেয়া টেবিল ঘড়ি আছে। তিনটের ওদিকে উঠে গনি, নওরেশ ও কাশেমকে ডেকে শেষে আমাকে ডাকবে, আমরা আড়াই মাইল দূরে বুড়িদ'র সাঁকো উড়িয়ে দিতে যাবো।[১৮]

কিন্তু অপারেশন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই বেলালের এক বন্ধু তাকে শত্রুপক্ষের হাতে ধরিয়ে দেয়। *অন্ধ কথামালা* উপন্যাসে কাহিনী নির্মাণে রশীদ হায়দার ফ্ল্যাশ-ব্যাক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়ে বেলাল নামক জনৈক যুবকের অন্তর্ময় স্মৃতিচারণার মাধ্যমে একটি জনপদ ও তার বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। ফলে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ের ব্যঞ্জনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অন্তর্বাস্তবতা-ধর্মী উপন্যাসে অর্থাৎ উপন্যাসে বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্ময়তা প্রাধান্য পেলে বিষয় গৌণ হয়ে পড়ে। এ কারণে *অন্ধ কথামালা* বিষয়সমৃদ্ধ উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বস্তুসমগ্রতার উপস্থিতি এখানে ব্যাপকতর হয়ে ওঠেনি। বরং সময়ের দিক থেকে কাহিনীটি মাত্র কয়েক ঘণ্টার হলেও 'বেলাল নামক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় জাগ্রত স্মৃতি ও অনুভবের মধ্যে রশীদ হায়দার একটা জনপদ, তার অন্তর্গত ব্যক্তি ও সমষ্টি, ব্যক্তির প্রত্যাশা, অপ্রাপ্তি, সংকট ও যন্ত্রণার যে স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তা বাঙালি জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ-শিহরণে তরঙ্গিত ও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।'[১৯] আর তা বেলাল চরিত্রের আত্মকথন রীতিতে উন্মোচিত হওয়ায় *অন্ধ কথা*মালা অন্তর্বাস্তবতা-ধর্মী শিল্পরূপে পরিণত হয়েছে। *অন্ধ কথামালা* বিশ্লেষণ-ধর্মী নয়, এর কাহিনীর বিন্যাস 'চিত্রধর্মী, অতিনাটকীয় ও কাব্যময়'। এ উপন্যাসে বেলাল চরিত্র সৃজনে ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবন-ভাবনার পরিচয় পাওয়া

যায়। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-উদ্ভূত ঘটনার মধ্যে সমষ্টিগত জীবনের সমগ্রতাকে অভিব্যক্ত ও খণ্ডের মধ্যে সমগ্রতা নির্মাণের দক্ষতার কারণে *অন্ধ কথামালা* সার্থকতা লাভ করেছে।

মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের খবরাখবর সংবলিত উপন্যাস। এর রচনাকাল ১৯৭২ সাল হলেও ১৯৭৩ সালে *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* প্রকাশিত হয়। একাত্তরের উন্মাতাল অসহযোগ আন্দোলন থেকে ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে রচিত হলেও *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে প্রতিবাদ ও দ্রোহের পরিবর্তে লিবিডোই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে সাহসী কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা কোনো প্রতিরোধের কাহিনী না থাকায় এটিকে নিষ্ক্রিয় রোমান্টিকতা আক্রান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণার শব্দরূপ বলাই শ্রেয়। এ উপন্যাসের নায়ক খোকা সমাজ-সত্তা-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। সে ও তার বন্ধুরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করে দেশে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে পারে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। এরপরও তারা দেশের সংকট থেকে দূরে থাকে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের পলায়নপর মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী *জীবন আমার বোন* মূলত প্রেম ও রতিচেতনার আবহমণ্ডিত। মাহমুদুল হক এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশ নিরাপদে থাকার আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলেছে তাদের ছবি এঁকেছেন। এছাড়া মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদ, তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতির ব্যবহার ইত্যাদি অঙ্কিত হয়েছে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র খোকা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সে দ্বিধান্বিত। সে প্রবলভাবে কামসচেতন ও রিরংসাতাড়িত। প্রধান নারী চরিত্র নীলাভাবীও অনুরূপ। মাহমুদুল হক অন্তর্ভাবনার ঔপন্যাসিক। তাই চরিত্রগুলোর আত্মবিশ্লেষণে তিনি বেশি আগ্রহী। *জীবন আমার বোন* অন্তর্বাস্তবতা-ধর্মী উপন্যাস, তবে এ উপন্যাসের প্রধান সুর রোম্যান্টিক। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সদর্থক চেতনা এখানে অনুপস্থিত। তাঁর *খেলাঘর* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ স্পষ্টতর। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকের যুদ্ধ-কেন্দ্রিক একটি বিষাদময় ঘটনা এর ভিত্তিভূমি। পাকিস্তানি বাহিনীর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়া এবং তাদের প্রতিরোধে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের প্রস্তুতির চিত্র এতে বিধৃত। এর কাহিনীর প্রধান চরিত্র তিনটি – রেহানা, ইয়াকুব ও মুকুল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত রেহানার জীবনকথা তার স্মৃতিচারণে বিবৃত। আর রেহানাকে আবর্তন করেই ইয়াকুব চরিত্রের বিকাশ। মুকুলের জীবনভাবনা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই ক্রম-অগ্রসর। তার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। *খেলাঘর*-এর কাহিনী স্বল্পায়তন, সাধারণ ও জটিলতাহীন তবে সুগ্রথিত।

সেলিনা হোসেনের *হাঙর নদী গ্রেনেড* মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গ্রামীণ জীবনের ঘটনাপ্রবাহের আবেগায়িত শব্দরূপ। এই উপন্যাসে মূল ঘটনাটি অনেক পরে। বিস্তারিত পটভূমি নির্মিত হওয়ার পরে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯৪৭-এর

বিভাগোত্তর সময় থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত এ গ্রন্থের পটভূমির বিস্তার। এই বিস্তৃত পটভূমিতে উঠে এসেছে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের পরিণতি ও আকাঙ্ক্ষা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও নারী নির্যাতন, রাজাকার বাহিনীর অপতৎপরতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা ও বিষয়বস্তুর এরূপ ক্রমবিন্যাসে ঔপন্যাসিকের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল সন্ধানের প্রয়াস লক্ষণীয়। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সামষ্টিক প্রাপ্তির আশায় আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। উপন্যাসটিতে কেন্দ্রবিন্দু বুড়ি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বাদ বুড়ি চরিত্রটির মনোজগতের নানামুখি প্রক্রিয়ায় এবং সেই সাথে হলদী গাঁয়ের প্রতীকী অবস্থানে সম্পন্ন হয়েছে।

হাঙর নদী গ্রেনেডের কাহিনী একরৈখিক নয়। প্রারম্ভিক অংশের চেয়ে শেষাংশের কাহিনীর গতি দ্রুত। এতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চরিত্র নেই। সবকটি চরিত্রের উৎস গ্রাম, কিন্তু উপন্যাসে গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষিত হয়নি। কাহিনী বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি ও গভীর জীবনোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বুড়ি চরিত্রচিত্রণে ঔপন্যাসিকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা লক্ষযোগ্য। জলিলের মুখে অগ্নিকাণ্ডের নির্মম বর্ণনা শুনে, সলীমের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে, রাজাকার বাহিনীর হাতে কলীমের মৃত্যু ও ফুলির ধর্ষিত হওয়া দেখে স্বাধীনতার জন্য অজপাড়াগাঁয়ের বুড়ির মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগে। তারপর মুক্তিযোদ্ধা কাদের ও হাফিজকে বাঁচাতে নাড়িছেঁড়া ধন বোবা সন্তান রইসকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সেনাবাহিনী সোল্লাসে তাকে হত্যা করে। রইসের মৃত্যুতে বুড়ি বিচলিত হয় না। সে ভাবে এবং সিদ্ধান্ত নেয় 'বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধু মাত্র রইসের একলার মা নয়।'[২০] বুড়ির এ ভাবনা শুধু আত্ম-প্রবোধ নয় চেতনার উদ্বোধন, উত্তরণ – আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার সীমা অতিক্রম করে সমষ্টির স্বার্থে জীবন উৎসর্গীকরণ। বুড়ি চরিত্রের এ চেতনাগত উত্তরণ ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবন-ভাবনা ও আশাবাদী জীবন-চেতনার দ্যোতক। 'বুড়ির মাতৃ-ইমেজ হলদী গাঁয়ের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে সমগ্র বাংলাদেশেই প্রসারিত করে দেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। গ্রামীণ জীবন-কাঠামো, যুদ্ধের অভিঘাতে তার রূপান্তর, চরিত্রসমূহের বাস্তবানুগ ক্রিয়াশীলতা এবং সর্বোপরি বুড়ির আত্ম-উজ্জীবন এ উপন্যাসের জীবনদর্শনকে করেছে সমগ্রতাস্পর্শী।'[২১] যদিও ঔপন্যাসিক *হাঙর নদী গ্রেনেডে* স্বাধীনতার চরম প্রাপ্তিসংবাদ পরিবেশন করেননি তবে তা ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশমান। সংকেতময়তার নানামুখীন আশ্রয় নিয়েছেন ঔপন্যাসিক। হলদী গ্রাম শুধু একটি গ্রাম নয়, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক। 'বুড়ি' চরিত্রের মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ দেশের মুক্তিকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতীকায়িত হয়েছে।

আমজাদ হোসেনের *অবেলায় অসময়* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামবাংলার চিত্র বিন্যস্ত হয়েছে। এর বিষয় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলা। আত্মরক্ষার নিমিত্তে ছুটে চলার পথেই

তারা প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশের শ্যামল গ্রাম বর্বর পাকিস্তানি সেনারা কতটা নির্মমভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে। একই সাথে তারা এ-ও অনুভব করেছে যে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে গণমানুষের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। যুদ্ধচলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর সন্ত্রাসময় প্রলয়ংকরী চিত্র অংকিত করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন :

> নিজের গ্রাম বলতে এখন শুধু ভয়ংকর আকাশ-ছোঁয়া একটা আগুন, বিরাট একটা সবুজ তেপান্তর বোঝাই অজস্র ধোঁয়া। অসংখ্য কচি কচি সবুজ গাছ-গাছালির পোড়া পোড়া একটা গন্ধ। হাজার হাজার মানুষের দৌড়া-দৌড়ির একটা বিকট শব্দ। অসংখ্য আর্তনাদ, চীৎকার। বুট জুতার লাথি। বুকে বুকে বেয়োনেট মারার নৃশংসতা। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে লাখো লাখো গোলা-বারুদের আকাশ-ফাটানো আওয়াজ।[২২]

অবেলায় অসময় উপন্যাসে যুদ্ধের ধ্বংসচিত্র ও নিরাশ্রয় মানুষের এতটুকু আশ্রয়ের জন্য হাহাকার রূপায়িত হলেও যুদ্ধরত বাঙালি জাতির 'সংগ্রামশীল জীবনাকাঙ্ক্ষা' প্রাধান্য লাভ করেনি। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাতেই ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত 'এক- নৌকো বিধ্বস্ত মানুষ' নিয়ে 'সন্ত্রাসময় একটা অন্ধকারে, অচেনা অজানা অনিশ্চিত অকূল পথের দিকে' অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসের সমাপ্তি।

রাবেয়া খাতুনের *ফেরারী সূর্য* উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধকালীন আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের চিত্র পাওয়া যায়। তবে এ উপন্যাসে নাগরিক জীবনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি পশুশক্তির বর্বরতার কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী প্রতিরোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ উপন্যাসের পটভূমি একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঢাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি। এ গ্রন্থে গেরিলা তৎপরতার ঘটনাগুলোর পাশাপাশি যুদ্ধকালীন সময়ের বিপন্নতা-নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অসহায়তা ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। রাশা চরিত্রের অভিব্যক্তিতে এর প্রমাণ মেলে :

> জানালার ধারে কাৎ করা মাথাটা। বিস্ফারিত চোখ, গড়ানো আধ শুকনো রক্তের দাগ। মাথার ঘিলু তখনো গড়াচ্ছে। এইমাত্র গরাদের ফাঁকে মগজ ঠোকরাতে এসে উড়ে গেল যে কাক ছুটে। সেদিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলো না রাশা।[২৩]

একাত্তরের রক্তাক্ত ও বেদনাময় কাহিনী নিয়ে রচিত মকবুলা মনজুরের *শিয়রে নিয়ত সূর্য* উপন্যাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর বেদনাময় কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে।

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের *বন্দী দিন বন্দী রাত্রি* যুদ্ধকালীন সময়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবিধ প্রসঙ্গের চিত্ররূপ। শিল্পগতভাবে উপন্যাসটি সাফল্যস্পর্শী না হলেও মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত ও নির্যাতিত বঙ্গনারীদের হাহাকার এবং তাদের জন্য প্রার্থনা এতে উজ্জ্বলপ্রভ :

> নতুন স্বাধীনতা পাওয়া বাঙলায় ফুলের মতো ফুটে ওঠা উন্মুখ কলিগুলো পাকিস্তানী পশুসৈন্যদের ধর্ষণের যে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের বোঝা বহন করছে, ওদের অন্ধকার

জীবনে যেন বিধাতা তুমি সূর্য হয়ে দেখা দাও। এই অনাদৃতা হাজারো নারীর, এই পৃথিবীতে সম্মানজনক স্থান দাও।[২৪]

এ উপন্যাসের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আবেগ পরিস্ফুট।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘটনা বা চরিত্রনির্ভর না হলেও মুক্তিসংগ্রামের মূল আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপন্যাস আহমদ ছফার *ওঙ্কার*। 'একজন বোবা মেয়ের পরিবর্তন-পরম্পরার রূপায়ণে বাঙালি জাতিসত্তার জাগরণের অন্তর্সত্য' এ উপন্যাসে বিধৃত। ঔপন্যাসিক একটা বোবা মেয়ের 'কথা বলে ওঠার' প্রতীকে বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তার প্রথম শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র এবং বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতীয় পুরাণ মতে, ওঙ্কার হচ্ছে আদ্যধ্বনি-সকল ধ্বনির মূল। বাহ্যজগতে সেই ধ্বনি শ্রুত হোক বা না হোক চেতনে ও মননে তা সর্বদা বিরাজিত। সেই চেতনা বোবা মেয়েতে ছিল। তাই সে মুক্তি চেয়েছে, বাঁচার অধিকার চেয়েছে, অন্যসব সভ্যসমাজের মুক্ত-অবাধ-স্বাধীন মানুষের মতো। ফলে তার দাবির স্বপক্ষে জেগে ওঠার জন্য সে আন্দোলিত হয়েছে। তার সর্বাঙ্গ বোবাত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। এ যেন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনে অবরুদ্ধ অথচ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ – যা বোবা মেয়েটির মতো মুক্তির সংগ্রামে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা ধরা পড়েছে এভাবে :

> মিছিলটা একেবারে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে। গোটা মিছিলটা যেনো বাংলাদেশের আগ্নেয় আত্মার জ্বালামুখ। সমস্ত বাংলাদেশের শিরা উপশিরায় এক প্রসব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটা চীৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি ... চারপাশের সবকিছু প্রবল প্রাণাবেগে থরথর কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী, সমুদ্র, পর্বত কাঁপছে, নরনারীর হৃদয় কাঁপছে। ... আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে।[২৫]

বোবা মেয়ের এই রক্তাক্ত আত্মঘোষণায় আহমদ ছফা বাঙালি জাতির জাগরণ, ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সত্তায় উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ইঙ্গিতময়তায় স্বাধীনতার প্রশ্নে ঔপন্যাসিকের আশাবাদ প্রকাশিত। আবুল ফজলের ভাষায়, 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচণ্ড আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু কোথাও লিখিত হয়েছে এমন আমার জানা নেই।'[২৬] বস্তুত বোবা মেয়ের চিৎকারের প্রতীকাবরণে ঔপন্যাসিক বাঙালির তথা বিশ্বমানবের মুক্তির 'ওঙ্কার' গীতবদ্ধ করেছেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসটিতে বোবা মেয়েটি হয়ে ওঠে 'রুদ্ধকণ্ঠ শৃঙ্খলিত বাংলাদেশ'। আহমদ ছফার *অলাতচক্র* মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব-অভিজ্ঞতার চালচিত্র। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি এতে উপস্থাপিত। মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা, শরণার্থীর আশ্রয়, তাদের আর্থিক-মানসিক সহযোগিতা-সমর্থন প্রদানে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছিল। কলকাতার থিয়েটার রোড, স্বাধীন বাংলা সরকার প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এসব ছাড়া ভারত সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা, হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব সৃষ্টির কার্যকারণ, তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিতর্ক, মুজিব-তাজউদ্দীন প্রসঙ্গ প্রভৃতি দানিয়েল চরিত্রের দৃষ্টিতে উপন্যাসে বর্ণিত। অন্যদিকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্ব দানের দ্বন্দ্ব, মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্তের মানসিক টানাপড়েন, মুক্তিযুদ্ধে পক্ষশক্তি-বিপক্ষশক্তি এসব প্রসঙ্গও এতে সন্নিবেশিত। বলা বাহুল্য মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলিই এর মূল উপজীব্য। এ উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় লক্ষণীয়। মাত্র ক'টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের অস্থির ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি তিনি সুগ্রথিত করেছেন।

মিরজা আবদুল হাইয়ের *তোমার পতাকা* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ক্ষীণ। গাজীপুরের এক সেবাপরায়ণ মানবদরদী ডাক্তার সুবল দাসকে হিন্দু হওয়ার অপরাধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। *তোমার পতাকা* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ক্ষীণ হলেও ঔপন্যাসিকের হাতে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের শহর ছেড়ে গ্রামে পালানোর দৃশ্য বাস্তবানুগভাবে চিত্রিত হয়েছে।

> ঢাকা শহরে কামান গর্জাল। ট্যাংক সব গুঁড়িয়ে দিল। ঢাকা ছেড়ে লোক পালাচ্ছে। এক কাপড়ে, বৌ বাচ্চার হাত ধরে, কাদা পানি ভেঙ্গে নদী সাঁতরে আসছে গ্রামে। গ্রাম থেকে ছুটছে আরও দূরে।[২৭]

তবে তাঁর *ফিরে চলো* উপন্যাসে জীবনাভিজ্ঞতার নতুন দিক প্রকাশিত হয়েছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি পরিবারের বন্দি-মানসিকতা রূপায়িত *ফিরে চলো* উপন্যাসে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূলবিষয়-কেন্দ্রিক না হলেও আটকে পড়া বাঙালিদের উদ্বেগ, অসহায়তা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত সত্ত্বেও দুর্নিবার স্বদেশপ্রেম এ গ্রন্থের বিধৃত। পাকিস্তানের রাজধানীতে আটকে-পড়া বাঙালি সরকারি কর্মচারীদের অসহ জীবন-যাপন, মানসিক বন্দিত্ব প্রভৃতি আলমগীর খান ও তার পরিবারের কাহিনীসূত্রে উদঘাটিত হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধচলাকালে তো বটেই, ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি রাষ্ট্রীয় ও জাতিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণমুক্ত হলে তারা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে পাকিস্তান-প্রশাসনের প্রতিকূল আচরণে জটিল সমস্যার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। ঔপন্যাসিক তাদের এই সংকটাপন্ন অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> কয়েক হাজার মাইলের সীমারেখা চিহ্নিত পাকিস্তান নামক বিরাট জেলের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্দী কয়েক লক্ষ বাঙালী। জেল সুপারের অফিস ইসলামাবাদে। এ বন্দীত্বে স্বাধীনতা প্রচুর, যতক্ষণ না সীমান্ত ডিঙানোর চেষ্টা করা হয়। বাঙালীর সীমান্ত পার হওয়া দেশের প্রচলিত আইনে কোন অপরাধ ছিল না। তবু বাঙালী ধরা পড়ত। জেলে পচত।[২৮]

তবে সদ্য স্বাধীন স্বদেশের জন্য বাঙালিরা পাকিস্তান নামক বৃহৎ জেলের বিরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে। তারা আইনের শৃঙ্খল ও বিরুদ্ধ পরিবেশের বেড়াজাল ডিঙিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতের হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রা উপেক্ষা করে বন্দিত্ব পরিহারের আকাঙ্ক্ষায় স্বদেশের পথে যাত্রা শুরু করে। মিরজা আবদুল হাই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে স্বদেশের পথে অগ্রসরমান সাহসী বাঙালিদের অন্ত রবাহিরকে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে উপস্থাপন করেছেন। 'কেবল উপকরণের অভিনবত্বে নয়, ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা ও তার রূপায়ণদক্ষতা 'ফিরে চলো' উপন্যাসকে অনন্যতা দান করেছে।'[২৯] বিষয়গৌরবে এবং স্বদেশে ফিরে আসার প্রবল আকাঙ্ক্ষার আবেগাকুল চিত্রাঙ্কনে বিশিষ্ট মিরজা আবদুল হাইয়ের *ফিরে চলো*।

শামসুর রাহমানের অদ্ভুত *আঁধার এক* উপন্যাসে যুদ্ধচলাকালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মানসরূপের পরিচয় বিধৃত। এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র কবি ও সাংবাদিক নাদিম ইউসুফ ২৫শে মার্চে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দ্বন্দ্বময় টানাপড়েনের মধ্যে যদিও তার চেতনালোকে লাশ, গুলি, ব্যারিকেড, মর্টার, চিৎকার, আগুন, কারফিউ, রেডিও, ভয়ানক আওয়াজ; ছুটোছুটি, কুকুরের ডাক, ট্রাক, জিপ, হত্যা প্রভৃতি ক্রিয়া করে তবুও সে ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাতেই নিমগ্ন থাকতে চায়।

> সে ভুলে থাকতে চায় ঢাকার কথা। ঢাকা থেকে সে পালিয়ে এসেছে বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে, অনেক আত্মীয়-স্বজনকে পেছনে ফেলে রেখে। ওর বড় ভাই ফাহিম সাদেক স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঢাকায় রয়ে গেছেন। পলাশতলীতে আসেননি। পরে আসবেন, আরো দু'চারটা দিন দেখে। নাদিমের শ্বশুর-শাশুড়িও ঢাকায়। ওঁরা অবিশ্যি আসবেন না। আসার সময় বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, কারো খবর নিতে পারেনি নাদিম। উপায় ছিল না। এমন সন্ত্রস্ত ছিল যে, রাস্তাঘাটে বেরোয়নি পর্যন্ত।[৩০]

বস্তুত তার সংবেদনশীল মন কখনও সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পারেনি। তাই সমষ্টি জীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। 'অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মখননের যে জটিল প্রক্রিয়া কবি-সাংবাদিক নাদিম ইউসুফের চরিত্রভাবনায় রূপলাভ করেছে আত্মকেন্দ্রিক, সংবেদনশীল অথচ দায়িত্বসচেতন নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনপ্যাটার্ন-এর সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ।'[৩১]

মধ্যবিত্ত মানসিকতার গণ্ডি পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের চিত্র সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের *জীবনতরু* উপন্যাসে বিধৃত। এ উপন্যাসের শ্যামল চরিত্রটি মধ্যবিত্ত-মানসিকতা থেকে দূরবর্তী। সে বাবা-মার অজ্ঞাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। তার এই ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্নে দ্বিধাহীনতার মূলে রয়েছে 'মৃত্তিকামূলসংলগ্ন জীবনচেতনার অঙ্গীকার'। ফলে শ্যামলের মৃত্যুকে অতিক্রম করে এদেশের তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ঐকান্তিকতা ও মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-চেতনার উত্তরণ ঘটে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক অবলোকনের ক্ষেত্রে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনবলয়ে আবর্তিত হলেও সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় *জীবনতরু*

উপন্যাসে একটা আশাবাদী মীমাংসায় পৌঁছেছেন। তিনি এ উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ের মর্মমূলস্পর্শী জীবনচেতনার রূপায়ণে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। জীবনবোধের প্রশ্নে *হাঙর নদী গ্রেনেড* ও *অন্ধ কথামালার* মতো *জীবনতরু* উপন্যাসটি তুলনামূলকভাবে সফলতর সৃষ্টি।

মাহবুব সাদিকের *বারুদগন্ধ দিন* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ স্পষ্ট। এটি ১৯৭৩ সালে রচিত এবং *সাপ্তাহিক বিচিত্রার* বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর দালাল-রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের চিত্র এখানে বিধৃত। কেন্দ্রীয় চরিত্র বামপন্থী মানস ঢাকা থেকে এক পাহাড়ি অঞ্চলের কুমারপাড়ায় জনৈক মুক্তিযোদ্ধা যুবকের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং একটি ব্রিজ অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে যুবকটি নিহত হলে মানস পাড়াটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে মুক্তি-আকাঙ্ক্ষী মানুষদের সংগঠিত করে। হানিফ, আনজা নামের দালাল-রাজাকাররা এর বিরোধিতা করলে সংঘর্ষ বাঁধে। হানিফ ধরা পরে এবং আনজা পালিয়ে গিয়ে শহর থেকে সেনাবাহিনী আনে। এ প্রতিরোধ যুদ্ধে মানস মারা যায়। মৃত্যুকালে তার মানস-পটে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তথা বিজয়ের ছবি ভেসে ওঠে। লেখকের ভাষায় :

> মুক্তাররা তখনই দাঁড় করিয়ে দিলো শ্যামাকে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি লেপ্টে রইল মানসের। মনে হলো তার আত্মার দরোজা খুলে গেছে। আশ্চর্য এক শান্ত নগর, এক সবুজ গ্রাম, মানুষ ঘরবাড়ি, গভীর সবুজ বনভূমি সেই দরজা দিয়ে একের পর এক বেরিয়ে এলো। মানসের মনচৈতন্যে উড়ছিলো শ্যামার ঘনসবুজ শাড়ির আঁচল – সেখানে তার বুকের তাজা রক্ত ভোরের প্রথম সূর্য্যের মতো জ্বলছে।[৩২]

মানসের মনে উদ্ভাসিত এ ছবি একই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সদর্থক চেতনার ও বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের ইঙ্গিত বহন করে। সীমিত চরিত্র ও সংক্ষিপ্ত কাহিনীর এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক একাত্তরের যুদ্ধগন্ধী দিনের উত্তাল অবস্থা আপন অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন।

বেগম জাহান আরা রচিত *অয়নাংশ* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালির দেশত্যাগ, নিরাপদ আশ্রয়-সন্ধান, তাদের শঙ্কাময় ও উৎকণ্ঠিত জীবনচিত্র। প্রতিবেশি দেশ ভারত অভিমুখে দলবদ্ধভাবে যাবার সময় তারা মুক্তিযোদ্ধা-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল কামনা করত। 'সোনার বাংলা' গান ও বাংলাদেশের পতাকা তাদের স্পন্দিত করত। দেশত্যাগী অগণিত অচেনা নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের একত্রে দলবদ্ধ পথচলা, তাদের মানসিকতা মনিরা চরিত্রের জীবনের বাস্তবতায় বিশ্লেষিত। এ উপন্যাসে ১৯৭১ সালের দেশব্যাপী ব্যাপক বন্যা যে মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে লেখিকা তারও উল্লেখ করেছেন :

> এ বছরের বন্যাকে স্বাগতম জানিয়েছে এপার বাংলার যুদ্ধপাগল মানুষেরা। বর্ষায় অধিকাংশ গ্রামগুলো দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। চারদিকে থৈ থৈ পানির মধ্যে গ্রাম।

যেন প্রাকৃতিক পরিখায় ঘেরা মাটির মানুষের মাটির রাজত্ব – তাই এবারের বর্ষা আশীর্বাদ। এবারের বর্ষা স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় সৈনিক।[৩৩]

এ উপন্যাসের সালাম ও জমিলা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। সালামের চাচা তথাকথিত শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান। সে দেশমাতৃকার মাটি ছুঁয়ে তাকে হত্যার শপথ নেয়। অপরদিকে জমিলার স্বামী পাকিস্তানি বাহিনীর দালাল হওয়া সত্ত্বেও সে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় কামনা করে। এ দুটি চরিত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের স্বাধীনতা প্রত্যাশী ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত গণমানুষের প্রতিনিধি।

হুমায়ূন আহমেদের *শ্যামল ছায়া*, *সৌরভ*, *আগুনের পরশমনি*, ১৯৭১ প্রভৃতি উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র বিধৃত হয়েছে। তাঁর *শ্যামল ছায়া* একদল মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক একটি থানা আক্রমণের ঘটনায় বিন্যস্ত। *শ্যামল ছায়ার* কাহিনী খুব বিস্তৃত নয়। একদল মুক্তিযোদ্ধার অপারেশনের ঘটনা এতে বিবৃত। পাঁচজনের স্মৃতিচারণে কাহিনী বর্ণিত। আত্মজৈবনিক ধরনের উপন্যাসোপম রচনা। আত্মকথন রীতির সুবিধা হল অভিজ্ঞতাটি ভেতরের দিক থেকে দেখা যায় এবং এর ফলে মনের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষতার প্রতিভাস সৃষ্টি হয়। একটি থানা আক্রমণের ঘটনায় ঔপন্যাসিক যুদ্ধকালীন সময়ের প্রত্যক্ষ চিত্র আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন।

হুমায়ূন আহমেদের *সৌরভ* উপন্যাসে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের একটি দ্বিতল বাড়ি এবং সে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেদের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন শহরবাসী মানুষের হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা, অত্যাচার–নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপিত। এ উপন্যাসের কাহিনীও সংক্ষিপ্ত। বিষয়বস্তু রশীদ হায়দারের *খাঁচায়* উপন্যাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। *আগুনের পরশমনি*তে ট্রেনিং-প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় ফিরে আসার এবং ঢাকায় অপারেশন করার ঘটনা চিত্রিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের মানুষ অনিশ্চিত, দুর্বিষহ ও রক্তাক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে এক কালো অধ্যায় অতিক্রম করেছে– এ তথ্য এখানে পরিবেশিত। ১৯৭১ উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে একটি হতদরিদ্র গ্রাম নীলগঞ্জকে কেন্দ্র করে। সেই গ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারের ও নারী ধর্ষণের চিত্র এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমে তারা মুক্তিবাহিনী ও হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন করতে গ্রামে ঢোকে; কিন্তু কেউ তাদের কবল থেকে রক্ষা পায় না। এ উপন্যাসের কলেবর ক্ষুদ্র, বর্ণনা সাদামাটা।

ইমদাদুল হক মিলনের *ঘেরাও* ও *কালো ঘোড়া* উপন্যাসে যুদ্ধকালীন উত্তপ্ত সময়ের ঘটনাপ্রবাহ স্থান পেয়েছে। ২৫ মার্চের কালরাত্রির পরে ঢাকার নিকটবর্তী একটি শহরের আতঙ্কিত জনসাধারণের পলায়নের চিত্র দিয়ে উপন্যাসটির সূচনা। তাছাড়া *ঘেরাও* উপন্যাসে তারুণ্য-শক্তির সদর্থক বিকাশ ঘটেছে। আবার প্রৌঢ়দের দ্বিধা-অবিশ্বাসও চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্ববিরোধী ও হতাশাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশমান। *কালো ঘোড়া* উপন্যাসে স্থানীয় চেয়ারম্যানের শান্তি কমিটিতে যোগদান এবং তার পাশব অত্যাচার ও নারী ধর্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর *কালো ঘোড়া* উপন্যাসে যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তবতা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের বাস্তব পরিস্থিতিও চিত্রিত; দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই সঠিক নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা বিপথগামী হওয়ার পর পরই দেশে নানাবিধ অব্যবস্থা দেখা দেয়। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মহীনতা ও অর্থ উপার্জনের সংস্থানের অভাব তাদের বিপথগামী করে তুলেছে। *ঘেরাও* এবং *কালো ঘোড়া* দুটি উপন্যাসের কাহিনী স্বল্প কলেবরে আবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্র বা সামগ্রিক চিত্র এগুলোতে বর্ণিত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চিত্র-সমৃদ্ধ এসব উপন্যাসে আমরা যুদ্ধ-চলাকালের উত্তাল-অস্থির সময়ের দিনগুলিতে নানাস্তরের মানুষের আশা-নিরাশার ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করি। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও পটভূমিতে এদেশের মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুশ্চিন্তা, সাহস, স্বদেশপ্রেম ও মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনায় আত্মত্যাগের অনুভূতিতে যেভাবে আন্দোলিত-অনুরণিত-উদ্বেলিত হয়েছিল তার বহুমাত্রিক চিত্র এসব উপন্যাসে সংস্থাপিত হয়েছে। এসব উপন্যাসে বিষয়গত ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও ঔপন্যাসিকদের উপস্থাপন ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থানিক পটভূমির পার্থক্যের কারণে উপন্যাসগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ যথেষ্ট শক্তিশালী, আবেদন সৃষ্টিকারী ও মর্মস্পর্শী এবং কোনো কোনো উপন্যাসে তা উচ্চকণ্ঠ, আতিশয্যপূর্ণ ও অতিনাটকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তিন

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালের ঘটনায় যুদ্ধ বিশ্লেষণমূলক উপন্যাসগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ বিনষ্টের কথা প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী*, *অন্তর্গত*, *ত্রাহি*, *এক যুবকের ছায়াপথ* প্রভৃতি উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের নানাবিধ চিত্র উপস্থাপিত। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সেই আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই এসব উপন্যাসের সৃষ্টি। *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত নয়, মাত্র দুদিনের ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত-পরবর্তী ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া এই উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবন-ভাবনা এ উপন্যাসকে করেছে ব্যাপ্ত ও সুদূরপ্রসারী চেতনায় উদ্দীপিত। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহের মাস্টারের চিন্তায় ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবনাদর্শের পরিচয় মেলে :

> ... দেশ শুধু রাজধানী ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়, ঢাকা বরং দেশের একটা মুখোশ মাত্র, দেশ আসলে ছড়িয়ে আছে সারা দেশে, তাই সে অনুভব করছিল, দেশের অভ্যন্তরে তার যাওয়া প্রয়োজন এবং নিজের ক্ষেত্রে দেশের জন্যে কিছু করা আশু কর্তব্য।[৩৪]

এটি মুক্তিযুদ্ধাশ্রয়ী উপন্যাস নয়, মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গবাহী উপন্যাস। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জলেশ্বরীর স্থানীয় সংকটের প্রতীকে স্বাধীনতা-উত্তর প্রত্যন্ত অঞ্চলের

সংকট ও সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর *অন্তর্গত* উপন্যাসটি স্বগতোক্তি বা স্বকথনরীতিতে কাব্যাকারে রচিত। এ উপন্যাসের কাব্যময় বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার সীমাহীন মর্মন্তুদ যাতনা। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন জাতীয় জীবন থেকে যুদ্ধার্জিত মূল্যবোধের ক্রমাগত বিলুপ্তি প্রত্যক্ষ করে আশাভঙ্গের বেদনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এককভাবে শাণিত হয়ে এক সামাজিক অপশক্তিকে হত্যা করে। এতেও সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বরং একসময়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের ফাঁসি হয়ে যায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে একাত্তরের পরাজিত শক্তির কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ ক্রমেই তাৎপর্য হারিয়ে ফেলছে এবং বিনষ্ট হচ্ছে– এ কথাই সৈয়দ শামসুল হক *অন্তর্গত* উপন্যাসে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের অন্তর্লোক উন্মোচন-বিশ্লেষণার্থে অন্তর্বাস্তবতা-ধর্মী বা ইনার রিয়েলিটি-ধর্মী যে নতুন শিল্পরীতির উদ্ভব হয় সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে তার বহুকৌণিক বিস্তার বিন্যাসিত। তাঁর *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* ও *অন্তর্গত* উপন্যাস এই নতুন মাত্রার শিল্পরূপ। তাঁর *ত্রাহি* উপন্যাসে একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ একাত্তরের পরাজিত শক্তি তথা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধবিরোধী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও সেই অপশক্তির কাছে পরাভূত। *এক যুবকের ছায়াপথ* উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সানোয়ার-এর জবানিতে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার মূল্যবোধহীন অবক্ষয়িত সমাজের যুবশ্রেণী দ্বারা বেদখল হয়ে যাওয়ার প্রতীকে ঔপন্যাসিক স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের স্থানে পাকিস্তানি মূল্যবোধগুলোর প্রতিস্থাপনের কথা বুঝিয়েছেন। অর্থ, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, সংস্কৃতির শূন্যতা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত বাংলাদেশ যে ক'বছরের মধ্যেই স্বাধীনতার মূল্যবোধ হারাতে বসেছে – এ সত্যই এ গ্রন্থে উন্মোচিত হয়েছে।

রশীদ হায়দারের *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের অন্তর্দাহ ও সন্তাপের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'নষ্ট জোছনায়' এবং 'এ কোন অরণ্য' শীর্ষক দুটো উপন্যাসোপম রচনার যুগলবন্দি-রূপ রশীদ হায়দারের 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য'।[৩৫] এ উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর সময়ের সর্বব্যাপী হতাশা-ব্যর্থতা, রাজনৈতিক শূন্যতা, সমাজজীবনের বিপর্যয়, সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধাদের চৈতন্যের পরাভব ও বিপথগামিতা চিত্রিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামিতা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি বরং 'তারা কেন বিপথগামী হল'– এই অনিবার্য ও রক্তাক্ত প্রশ্ন এ গ্রন্থে উত্থাপন করেছেন। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ঔপন্যাসিক পুনরায় মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন আর এখানেই *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* উপন্যাসটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের

বিপথগামিতা বা তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রসঙ্গ আমজাদ হোসেনের *অস্থির পাখীরা* উপন্যাসে বিধৃত। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী-সময়ের ঘটনায় এর কাহিনী নির্মিত। মুক্তিযোদ্ধারা যে অস্ত্র হাতে নিয়ে চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে, সে অস্ত্র যুদ্ধ-পরবর্তীকালে লুটতরাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা রোকন এতে মর্মাহত হয়, আত্মগ্লানিতে ভোগে। সে অন্যায়-অপকর্ম মেনে নিতে পারে না – প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে এক সময়ের সহযোদ্ধারা তার দুচোখ উপড়ে ফেলে। তাঁর *যুদ্ধে যাবো* উপন্যাসের কাহিনীও প্রায় একই ধরনের। তবে সময়ের দূরত্বে দেড়যুগ পরের ঘটনা এতে সন্নিবেশিত। সেগুলো হল : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা যুদ্ধ করেনি বা স্বাধীনতার পক্ষশক্তি ছিল না – যুদ্ধশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের কাছেই অস্ত্র সমর্পণ করা, যুদ্ধের সময়ের সুবিধাবাদীদের স্বাধীন দেশের অভিভাবকত্ব গ্রহণ, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনার অবক্ষয় এবং দেশপ্রেমহীন সুবিধাভোগী সুযোগ-সন্ধানী শ্রেণীর উত্থান প্রভৃতি। এতসব ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও জলজ্যান্তভাবে এসেছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা সূর্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমাগত আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেননা সূর্যরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সমষ্টির প্রয়োজনে, ব্যক্তির সুখ-সম্পদের জন্য নয়। কিন্তু টুলটুলের নৃশংসভাবে ধর্ষিত ও খুন হওয়ার ঘটনায় সে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে ওঠে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনার বিনষ্টির মধ্যেও রোকন ও সূর্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে। তারা শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। এ চরিত্র দুটি ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবনভাবনার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুজ্জীবনের পরিচয় বহন করে।

হারুন হাবীবের *প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম* উপন্যাসটির বিষয় বাংলাদেশ ও যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রাম। বাংলাদেশ ও যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিযুদ্ধের অভিন্ন বোধ এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। উপন্যাসের নায়ক হাসানের বুকে লুকিয়ে আছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বুলেট। অপরদিকে যুগোস্লাভিয়ার ইয়াসমিনকা সেদেশের দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিসংগ্রামের মূর্তিময় সত্তা। হাসান যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসার জন্য যুগোস্লাভিয়া যায়। সেখানেই পরিচয় ঘটে ইয়াসমিনকার সঙ্গে। তাদের সংগ্রাম ও সংরাগের ব্যঞ্জনায় হারুন হাবীব বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও বাঙালির দেশপ্রীতিকে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন। 'মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, বিজয়ের উল্লাস আর ত্যাগের মহিমা যেমন ছড়িয়ে আছে এ-উপন্যাসে, তেমনি আছে হাসান-ইয়াসমিনকার রোম্যান্টিক প্রেমের প্রতীকে শাশ্বত বিশ্বজনীনতা।'[৩৬] এ উপন্যাসে হারুন হাবীবের ইতিহাসভাবনা ও বাঙালি জাতিসত্তার উজ্জীবনের চেতনা সুস্পষ্ট। হাসানের আবেগসিক্ত সংলাপে উচ্চারিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সেই রৌদ্রস্নাত চেতনা :

> ... একাত্তরের মৃত অথবা জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী আবুল হাসানরাই বাংলাদেশ। এ সত্যের মৃত্যু মানেই-তো বাঙালির ইতিহাস থেকে উনিশশ' একাত্তর সালটা

নেই। নেই পল্টন ময়দান, ঘেরাও আন্দোলন, নেই রেসকোর্স উদ্যানের স্বাধীনতা পাগল লাখো জনতা, নেই ২৫ মার্চের কালো রাত, নেই তেইশ-চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নেই সাভার-এর জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মিরপুরের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। বায়ান্ন থেকে সত্তরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসই তো বাংলাদেশ।[৩৭]

বিষয়ের দিক থেকে *প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম*, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* বা রশীদ করীমের *আমার যত গ্লানির* চেয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

রিজিয়া রহমানের *একটি ফুলের জন্য* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নভঙ্গের চিত্র উপস্থাপিত। *রক্তের অক্ষর* উপন্যাসে ইয়াসমীন বীরাঙ্গনা সম্মানে ভূষিত কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে তার কোনো প্রতিষ্ঠা না ঘটায় বারাঙ্গনা রূপে তাকে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে হয়। পরিশেষে বারাঙ্গনা পরিচয়েই হীরুগুণ্ডার ছুরিকাঘাতে ইয়াসমীনের মৃত্যু ঘটে। মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্মান যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সমাজবাস্তবের এই ভিন্নতর রূপটি এই উপন্যাসে রূপায়িত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর বীরাঙ্গনাদের পুর্নবাসনের নিমিত্তে তাদের চাকুরি, বিয়ে প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা হলেও পরবর্তীকালে তা থেমে যায়। যুদ্ধশেষে ইয়াসমীনের বীরাঙ্গনাদের সাথে স্থান হয়। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী বাস্তবতায় বীরাঙ্গনারা বার বার আর্থ-সামাজিক ও মানসিক সংকটের মুখোমুখি হয়। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার বা জীবনের নিরাপত্তা দানেও রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়। তাছাড়া বীরাঙ্গনা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মানসিক দ্বন্দ্ব বা টানাপড়েন এবং বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে উত্থাপিত। *একটি ফুলের জন্য* উপন্যাসেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়নের চিত্র বিন্যস্ত। রিজিয়া রহমান কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মজীবন চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপর্যস্ত সমাজব্যবস্থার ছবি অঙ্কন করেছেন। একাত্তরে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে 'একটি ফুল' রূপী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ত্যাগের মূল্যায়ন স্বাধীন দেশের কোনো সরকারের আমলেই যথাযথভাবে করা হয়নি। তাদের সামনেই উত্থান ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মূল্যবোধ ও আদর্শ সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণ :

যারা কখনও একটা স্টেনগানের ট্রিগার টিপে দেখেনি তাদের অনেকে হয়ে বসল মুক্তিযোদ্ধাদের গার্জিয়ান। তারাই জাল মুক্তিযোদ্ধার দল বাড়াল সনদের কালোবাজারী করে।[৩৮]

তবে এ উপন্যাসের পরিসরে ব্যর্থতা, হতাশা, পরাভবের সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠার মধ্যেও ঔপন্যাসিক আশা ও শুশ্রূষার সন্ধান করেছেন। তিনি এ উপন্যাসে যুদ্ধোত্তর সময় ও সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতির স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন এবং তিনজন মুক্তিযোদ্ধার আত্ম-জীবন রূপায়ণের মাধ্যমে তা উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। কাহিনী পরিবেশনের এ

প্রক্রিয়া বিশেষ অভিনব। তাছাড়া একাত্তরের পরাজিত শক্তির পুনরুত্থান এবং ষাটের দশকের আইয়ুবী শাসনের পুনঃব্যবহারের কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে একদিকে ঔপন্যাসিকের সমকাল ও রাজনীতি সচেতনতা অন্যদিকে সত্য প্রকাশে তার দায়িত্বশীলতা প্রকাশিত।

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক-বাস্তবতা* উপন্যাস স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের নিরাসক্ত শিল্পরূপ। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের-পরবর্তীকালের যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা, রাজনীতিতে তাদের পুনর্বাসন, সামরিক স্বৈরশাসন প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির উত্থান ও ক্ষমতায়নের আলেখ্য এবং সমকালীন বাস্তবতা ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসূত্রে এতে বর্ণিত। বলা যায়, ক্রমাগত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং সমকালীন বাস্ত বতা নিশ্চিহ্ন-প্রায় হওয়ার এবং ধারাবাহিকভাবে পরাজিত শক্তির সদম্ভ ক্ষমতায় আরোহণের কার্য-কারণ-সন্ধান এর মূল সুর। মজিদের বাস্তুত্যাগ আর বদু মওলানার পুনরুজ্জীবন স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় দেড়যুগের বিভিন্ন পট-পরিবর্তনের ফলাফল। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার নিখাদ বর্ণনাও এ উপন্যাসে বিধৃত। দালাল-রাজাকারদের হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ঔপন্যাসিক তার নিরাবেগ বিবরণ দিয়েছেন। যেমন :

> ... সেদিন রাতে ইসমাইল হাজাম দেখে, প্রাইমারি স্কুলের আধো অন্ধকার ঘরে ছুরি হাতে অপেক্ষমান একজন মানুষ। সে, সেই অন্ধকারের ভেতর জবাইয়ের এই অস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখে বুঝতে পারে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই অস্ত্রের ধাতুতে ধার তোলা হয়েছে এবং এই উন্মুখ অস্ত্র এবং অস্ত্রধারী রক্তপান বিনা তৃপ্ত হয় না। ...
> ... ইসমাইল হাজামসহ আবদুল গণি তিনটে তালিকার একুশ জনকে শনাক্ত করতে পারে এবং জানায় যে তাদের সকলেই মৃত। তার কাছ থেকে শোকাহত এবং ক্রুদ্ধ লোকেরা জানতে পারে যে, এদের প্রত্যেককে জবাই করে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং মস্তকহীন ধড় রাতের বেলায় রিকশা ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে পুঁতে ফেলা হয়।[৩৯]

উপন্যাসটির কাহিনীর পরিধি অল্প। সীমিত পরিসরেই ঔপন্যাসিক প্রতিটির ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। এ উপন্যাসটি একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ বিনষ্টির অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির দলিল-স্বরূপ।

ইমদাদুল হক মিলনের *মহাযুদ্ধ, নিরাপত্তা হই* প্রভৃতি উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত চিত্রিত হয়েছে। তিনি এসব উপন্যাসে স্বাধীন বাংলাদেশের যুবসমাজের বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপনকে বিন্যস্ত করেছেন। *মহাযুদ্ধ* উপন্যাসের বিষয়বস্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালের সামাজিক অবক্ষয়, সর্বগ্রাসী হতাশা, অর্থনৈতিক মহামন্দা ও নৈরাজ্য। উপন্যাসের চরিত্র সীমিত ও গল্পটি ক্ষুদ্র – একটি ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনামাত্র। সেই ক্ষুদ্র গল্প-

পরিধিতে ঔপন্যাসিক সমকালীন সমাজজীবনের নৈরাজ্য-নৈরাশ্যের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন। *মহাযুদ্ধ* উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নানাবিধ সংকট দেখা দিলে রাষ্ট্রক্ষমতা যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণে অসমর্থ হয় তবে সমগ্র দেশের জনগণই দুর্বিপাকে পড়ে। এ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ঘটে-যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত। স্বাধীনতা অর্জনের তিন বছর পরের বাংলাদেশের নগরজীবনের বাস্তবতা *নিরাপত্তা হই* উপন্যাসে চিত্রিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালের নৈরাজ্য, খুন-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি-ধর্ষণ, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি এর কাহিনীতে বিন্যস্ত। *নিরাপত্তা হই* উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে মন্টু চরিত্রের মানসিক টানাপড়েন ও তার ব্যক্তিক জীবন-সমস্যাকে কেন্দ্র করে। যৌবনশক্তির একদিকে যেমন ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে অপরদিকে ঠিক তেমনি তার মঙ্গলসূচক দিকটিও রয়েছে। মন্টু মঙ্গলশক্তিরই প্রতীক। মুক্তিযোদ্ধা মন্টু পুনর্বাসিত না হয়েও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনাকে সঠিকভাবে লালন করেছে, নৈতিকতার স্খলন ঘটতে দেয়নি। এ চরিত্র-কল্পনা ঔপন্যাসিকের সদর্থক জীবন-ভাবনার পরিচয়-জ্ঞাপক।

মঈনুল আহসান সাবেরের *পাথর সময়*, *পরাজয়*, *কেউ জানে না* উপন্যাস তিনটিতে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির পুনরুত্থানের কথা ব্যক্ত হয়েছে। *পাথর* সময় উপন্যাসে একাত্তরের পরাজিত শক্তির সামাজিক উত্থান ও দাপট এবং স্বাধীনতার সুফল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত থাকার কাহিনী বিধৃত। লেখক সচেতনভাবে এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার সাথে বর্ণনা করেছেন। *পাথর সময়* উপন্যাসের 'সে' ও 'বিডি' একাত্তরের পরাজিত শক্তি। তারা পাকিস্তানি সেনাদের বাঙালি নারী উপহার দিয়ে নগদ পয়সা কামিয়েছে। তারাই আবার স্বাধীন বাংলাদেশে নির্ঝঞ্ঝাটে কালো টাকা বানাচ্ছে ও রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করছে। এটি বর্ণনাত্মক উপন্যাস, এর বর্ণনা অত্যন্ত সহজ-সরল। সারল্য এই উপন্যাসকে ভিন্নতর গতি দিয়েছে। মঈনুল আহসান সাবেরের উপন্যাসগুলোর প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সরল বর্ণনা। তাঁর উপন্যাসে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিবার্যতা এবং ব্যক্তিমানুষের সংকটাপন্ন অবস্থা তীব্রতা পায় না। তাঁর *পরাজয়* ও *কেউ জানে না* উপন্যাস দুটিতে স্বাধীনতার সতের বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার পরিবারবর্গও যে সামাজিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছে এবং সামাজিক গ্লানি ও নিগৃহীত হওয়া থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদেরকে স্বাধীনতার মূল্যবোধবিরোধী একাত্তরের পরাজিত শক্তির সহযোগিতা কামনা করতে হচ্ছে – এ সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। *পরাজয়* উপন্যাসের নামকরণেই নিহিত রয়েছে উপন্যাসের মূলবক্তব্য। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্বাধীন দেশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধার পরিবার-পরিজন হয়েছে চরমতম অবহেলার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অপশক্তি চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, হয়েছে সমাজ-শক্তির নিয়ন্তা প্রভু। স্বাধীন দেশে এরকম হওয়ার কথা ছিল না। অথচ প্রতিমুহূর্তে অর্থনৈতিক সংগ্রামে,

আদর্শিক সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি পরাজিত হচ্ছে। এই গ্লানি থেকে মুক্তির পথ যদিও লেখক চিহ্নিত করেননি তবুও সামাজিক দায়বোধ থেকে এই সত্য চিত্র বিন্যস্ত করে তিনি সদর্থক জীবন-ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের যারা যুদ্ধ দেখেনি, শুধু গল্প শুনেছে তাদের চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হওয়ার স্বপ্ন দেখায় *পরাজয়* উপন্যাসটি। *কেউ জানে না* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির মানসিক অস্থিরতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নৈতিকতা-বিরুদ্ধ শক্তির এই ক্ষমতা বা শক্তির উৎস কোথায় এবং উত্থানের কারণ কী তা বারবার ঔপন্যাসিক শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এতে ঔপন্যাসিকের সামাজিক দায়বদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কোন ফাঁক গলে কিংবা কী কৌশলে বিডির মতো অপশক্তিরা ক্রমশ সমাজের উপরিকাঠামোতে স্থান করে নিয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। সাহানাও হয়েছে এবং ভেবেছে এই অপশক্তির উত্থান কবে রোধ হবে তা 'কেউ জানে না'। নঞর্থক ভাবনাকে সদর্থক ভাবনায় উজ্জীবিত করেছেন ঔপন্যাসিক। এখানেই নামকরণের সার্থকতা নিহিত। দুটি উপন্যাসের কাহিনীই সংক্ষিপ্ত। ঔপন্যাসিকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা সহজ-সরল, আটপৌরে। তাঁর সরল বর্ণনাভঙ্গি উপন্যাস দুটিকে গতিশীল করেছে।

মঞ্জু সরকারের *প্রতিমা উপাখ্যান* উপন্যাসে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের স্বপ্নভঙ্গের প্রতিলিপি চিত্রিত। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা রণজিৎ। সে স্বাধীন দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষে আক্রান্ত হয়েছে এবং সবশেষে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিত্বই মুখ্য হয়ে ওঠার কথা ছিল অথচ অসাম্প্রদায়িক শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এদেশে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবস্থান সুদৃঢ়। এ যেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ভারতের সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের নবতর মেরুকরণ। এই বিষয়টি *প্রতিমা উপাখ্যান* উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ভিন্নতর দিক। এ উপন্যাসে প্রতিমার প্রেম উপলক্ষ মাত্র, মূল উদ্দেশ্য উঠতি ধনিক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থসিদ্ধি; সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা এবং ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা রণজিৎকে দেশত্যাগে বাধ্য করা। ঔপন্যাসিক এতে মার্ক্সীয় দর্শনজাত যূথবদ্ধ সমাজব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিক উদ্বিগ্নতার দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে। রণজিতের উক্তিতে তা প্রকাশিত :

> 'উঠতে বসতে নিজেদের হিন্দু ভাবেন। আর কথায় কথায় ইন্ডিয়া পালাই পালাই করেন। এই জন্যে তো মা, মানুষ তোমার ভিটা দখলের সাহস পায়, বামনবাড়ি নিয়া নানান চক্রান্ত করে। দেশটা কি কেবল মুসলমান হাজির বাপের সম্পত্তি? হামরা যুদ্ধ করি স্বাধীন করি নাই এ দেশ?'[৪০]

এক কথায়, এ উপন্যাসটি সমকালীন বাস্তবতার তথা সামরিক স্বৈরশাসকের দেশ শাসনের চিত্রের শিল্পোত্তীর্ণ শব্দরূপ।

মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গযুক্ত উপন্যাস সংখ্যাবিচারে প্রচুর। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে অন্যান্য সকল শাখার মতো উপন্যাসেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাত্রিকতা সংযোজিত হওয়ায় উপন্যাসের বিষয়ের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। এ সমস্ত উপন্যাসে বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ বা প্রকরণগত রূপান্তর পরিলক্ষিত না হলেও ঔপন্যাসিকদের প্রকাশ কুশলতা ও ভাষা প্রয়োগের নিপুণতা লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতাসম্পন্ন কোনো উপন্যাস আজ পর্যন্ত রচিত না হলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কোনো কোনো উপন্যাস স্বদেশ-সমাজ-সমকালের জীবনার্থ ধারণ করে তীক্ষ্ণ শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। একথা সত্য, পরিমাণে প্রচুর হলেও 'যুদ্ধরত সমগ্র জাতিসত্তার প্রাণস্পন্দন' প্রতিটি উপন্যাসে বিধৃত হয়নি। এ উপন্যাসগুলোতে খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপায়িত হয়েছে এবং সেগুলোর অধিকাংশই অতিনাটকীয়তা ও ভাবালুতাবর্জিত নয়। তবু একথা বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলো পূর্বতন বাংলা উপন্যাসের সীমানা-প্রাচীর ভেঙে শুভ ও মহৎ মূল্যবোধসম্পন্ন পরিসরে প্রসারিত হয়েছে এবং ঔপন্যাসিকগণ নিজস্ব চেতনার মাত্রামাফিক মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম-উৎসারিত জীবন-জিজ্ঞাসা এসব উপন্যাসে সংস্থাপিত করে বাংলাদেশের উপন্যাসের সীমানাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ:২৩৭

২. আহমদ শরীফ, *সঙ্কট : জীবনে ও মননে*, বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ:৬৮

৩. ঐ, পৃ:৬৮

৪. সারোয়ার জাহান, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ-উপন্যাস', *একুশের প্রবন্ধ '৮৮*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ:২৭

৫. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'স্বাধীনতা-উত্তর, বাংলাসাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ-উপন্যাস' বিষয়ক পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা, একুশের প্রবন্ধ, '৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ:৯৭

৬. শাহীদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ:২০৩

৭. আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ:৫৬

৮. শওকত ওসমান, জাহান্নম হইতে বিদায়, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ:২৬

৯. উদ্ধৃত, অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, ইউরেকা বুক এজেন্সি, রাজশাহী, ১৯৯৫, পৃ:১৭৪

১০. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ:৩১৪

১১. রশীদ করিম, *আমার যত গ্লানি*, আদিল ব্রাদার্স এ কোং, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ:২৭৬

১২. সৈয়দ শামসুল হক, *নীল দংশন*, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ:৫৪

১৩. সৈয়দ শামসুল হক, *নিষিদ্ধ লোবান*, অনন্যা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ:৬২

১৪. সারোয়ার জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ:২৯-৩০

১৫. শওকত আলী, *যাত্রা*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬, পৃ:১২

১৬. *শওকত আলী, যাত্রা, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬, পৃ:২৮*

১৭. শওকত আলী, *যাত্রা*, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬, পৃ:৯১

১৮. রশীদ হায়দার, অন্ধ কথামালা, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ:১৭

১৯. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ:৩১৮

২০. সেলিনা হোসেন, *হাঙর নদী গ্রেনেড*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ:১১৭

২১. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ:৩১৯

২২. আমজাদ হোসেন, 'অবেলায় অসময়', *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ফাল্গুন-১৩৯৮, পৃ:৯৯-১০০

২৩. রাবেয়া খাতুন, 'ফেরারী সূর্য', *মুক্তিযুদ্ধের সাতটি উপন্যাস*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ:২৫৬

২৪. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, *বন্দী দিন বন্দী রাত্রি*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ:১১২

২৫. আহমদ ছফা, *ওঙ্কার*, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২য় সং ১৯৮২, পৃ:৪৭

২৬. আবুল ফজল, 'অভিমত', *ওঙ্কার*, প্রাগুক্ত

২৭. মিরজা আবদুল হাই, *তোমার পতাকা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ:১৯৯

২৮. মিরজা আবদুল হাই, *ফিরে চলো*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ:৪০

২৯. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ:৩২১

৩০. শামসুর রাহমান, *অদ্ভুত আঁধার এক*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ:১৩

৩১. রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ:৩২২
৩২. মাহবুব সাদিক, *বারুদগন্ধ দিন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ:৫২
৩৩. বেগম জাহান আরা, *অয়নাংশ*, তরুণ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ:৮৮-৮৯
৩৪. সৈয়দ শামসুল হক, 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী', *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ:৪৪২
৩৫. বিশ্বজিৎ ঘোষ 'বাংলাদেশের উপন্যাস', *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ:৩৯
৩৬. ঐ পৃ:৪০
৩৭. হারুন হাবীব, *প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০১, পৃ:৩৯
৩৮. রিজিয়া রহমান, *একটি ফুলের জন্য*, পৃ:২৫
৩৯. শহীদুল জহির, *জীবন ও রাজনৈতিক-বাস্তবতা*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ:২৬-২৭
৪০. মঞ্জু সরকার, *প্রতিমা উপাখ্যান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ:৩২

বড় প্রবন্ধ

বাংলাদেশের উপন্যাস

বিশ্বজিৎ ঘোষ

উপন্যাস হচ্ছে আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প-প্রতিমা, যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত ; শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ আর তাঁর স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। বুর্জোয়া সমাজের শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে, মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্তসমাজ-কাঠামো ভেঙে দেয়ার অভীপ্সা নিয়ে উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-সেবিত সমাজই উপন্যাসের আদি-জনয়িতা। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে

ব্যক্তিমানুষের যে সংগ্রাম– তারই মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় Ralph Fox -এর সেই উদ্ধরণযোগ্য উক্তি:

The Novel is the epic-form of our modern, bourgeois society... It did not exist, except in very rudimentary form before that modern civilization which began with the renaissance and like every new art-form it has served its purpose extending and deepening human consciousness. [১]

অবক্ষয়িত সামন্তসমাজকে ভেঙে দিয়ে ষোল-সতের শতকের ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক-শ্রেণী এবং সামাজিক-শক্তির জন্ম হল এবং তখনি ঘটল আধুনিক রূপকল্প উপন্যাসের আবির্ভাব। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশ ঘটে; শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হাতেই বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্‌গম। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে শতবর্ষ বিলম্বিত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে রাখে ঐতিহাসিক অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ নব্য-শিক্ষিতের সমবায়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ক্রমবিকাশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী। পূর্ববাংলার নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর চেতনা-স্নাত কয়েকজন শিল্পীর সাধনায় রচিত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রাথমিক ভিত্তি।

ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী মর্মমূলে সামন্ত-মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজ-সংগঠনের-চিন্তা চেতনা, উদার মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে গঠন করল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। অপরদিকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল লেখক ও শিল্পীরা গঠন করল 'প্রগতি' লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৯)। এই দুই সংগঠনের শিল্পীদের মানস-ভূমিতে পূর্ববঙ্গ উপ্ত করেছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ; এবং এঁরাই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জীবন-চেতনায় অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে আমাদের ঔপন্যাসিক-চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন স্রোতে। একটি স্রোতের উৎসে ছিলেন সামন্ত-মূল্যবোধে বিশ্বাসী উপন্যাসিকরা; অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথাকোবিদদের সাধনায়। প্রথম স্রোতটি নির্মাণ করেছেন মোহাম্মদ নজিবুর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), কোরবান আলী, শেখ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫) প্রমুখ; আর দ্বিতীয়টি কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আকবর উদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। তবে এ-ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, অসম সমাজ বিকাশের কারণে বিশ শতকের সূচনা কাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসলোকে বুর্জোয়া ভাবধারার

ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল এবং সত্যসন্ধ। কারণ 'যতক্ষণ বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষরত, সে-পর্যন্ত বুর্জোয়া চেতনা-প্রবাহ সত্যসন্ধ।' [২]

নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৯) এবং 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) উপন্যাসত্রয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে পূর্ববাংলায় বিকাশমান মুসলিমসমাজের জীবন-ভাবনা এবং জীবনবিশ্বাসের বিশ্বস্ত শিল্প'-প্রতিমা। 'আনোয়ারা'র নুরল এসলাম, 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়ার রহমান এবং 'গরীবের মেয়ে'র নুর মহম্মদ– এই তিন নায়ক-চরিত্রের আচার আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত ধরতে চেয়েছেন সমকালীন মুসলিমসমাজের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম এবং সংশয়-সংকটের আলেখ্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নজিবর রহমানের সকল উপন্যাসের অন্তর্স্রোতেই প্রবাহিত হয়েছে সামন্ত মূল্যবোধের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক তাঁর সবটুকু মনোযোগ ব্যয় করেছেন সতীত্বের মহিমাকীর্তনে– যা একান্ত সামন্ত-মূল্যবোধজাত। তবে নুরল এসলামের আর্থিক-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্তদের বিকাশের কথাই পরোক্ষে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। লেখকের ইঙ্গিত অনুভবসঞ্চারী:

এইরূপে নুরল এসলাম বাণিজ্য প্রাসাদাৎ অল্প সময় মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসন দ্বিতল-সৌধরাজিতে শোভিত হইল। নুরল এসলামের অর্থ-সাহায্যে ও স্বজাতিপ্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্র লোকের শিক্ষার জন্য স্বগ্রামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন। [৩]

'প্রেমের সমাধি,' 'গরীবের মেয়ে,' 'পরিণাম' কিংবা 'হাসনগঙ্গা বাহমনী'তে নজিবর রহমান 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেও, পূর্ববাংলার উপন্যাস সাহিত্যের ভিত্তি-নির্মাণে এ-গ্রন্থগুলোর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর নয়। মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মনোয়ারা' (১৯২৫) এবং শেখ ইদরিস আলীর 'প্রেমের পথে' (১৯২৬) নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' এবং 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ মাত্র। 'আনোয়ারা'র মতোই 'মনোয়ারা' এবং 'প্রেমের পথে উপন্যাস পতি-ভক্তির মহিমাকীর্তনে হয়েছে সমাপ্ত।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে কাজী ইমদাদুল হক হচ্ছেন সেই শিল্পী, যিনি উপন্যাস রচনায় প্রথম মনোযোগী হলেন সমকালের প্রতি। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, উদার মানবতাবাদী, মননশীল এবং যুক্তিবাদী শিল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন ঔপন্যাসিক। তাঁর 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম-সমাজের পীরভক্তি, ধর্ম-সংস্কার পর্দা-প্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য– ইত্যাদির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রতিবাদ। 'আনোয়ারা'র মতো এটিও সমকালীন মুসলিম জীবনবিশ্বাসের শিল্পিত ভাষ্য। তবে আনোয়ারার ঘটনাসংস্থান কিংবা চরিত্রচিত্রণ প্রক্রিয়া যেখানে স্রষ্টার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং নীতিবোধ-নিয়ন্ত্রিত, সেখানে 'আবদুল্লাহ্'র ঘটনাংশ, চরিত্রসৃজন-

কৌশল কিংবা পরিপ্রেক্ষিত-উন্মোচন একান্তই মানবতা-শাসিত। মধ্যবিত্তের বিকাশের ফলে মুসলিম-সমাজের ভিত কিভাবে নড়ে উঠেছে তার চিত্র আছে, আছে গ্রামীণ সমাজের নানামাত্রিক জটিলতা; তবু স্রষ্টার ধর্মনিরপেক্ষ উদার-মানবতাবাদী দর্শনই 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের মৌল-অভিজ্ঞতা। কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণে লেখকের বক্তব্য অনুধাবনীয়:

আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও- যে মানুষ হলে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা কত্তে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে মনে কত্তে পারে। এই কথাটুকু তোমরা মনে রাখবে ভাই,– অনেকবার তোমাদের বলেছি, আবার বলি, হিন্দু-মুসলমানে ভেদজ্ঞান মনে স্থান দিও না। আমাদের দেশের যত অকল্যাণ, যত দুঃখ-কষ্ট এই ভেদ-জ্ঞানের দরুণই সব। এইটুকু ঘুচে গেলে আমরা মানুষ হতে পারব– দেশের মুখ উজ্জ্বল কত্তে পারব।[৪]

পূর্ববাংলার চর-অঞ্চলের মুসলিম কৃষকসমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা আর আশা-নিরাশার চালচিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে কাজী আব্দুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। মতি আর লালুর প্রেমের রোম্যান্টিক পটে এখানে উন্মোচিত হয়েছে সামন্ত-সমাজের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত মধ্যবিত্তের ভাববাদী প্রতিবাদ– যা কাজী আবদুল ওদুদের জীবনার্থের মৌল-সত্য। 'নদীবক্ষে' উপন্যাস সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মন্তব্য এখানে স্মরণীয়- "আপনার লিখিত 'নদীবক্ষ' উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছ খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি...।"[৫]

কল্লোলিত পদ্মার তীরবর্তী সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা নিয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছে হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'। এ-উপন্যাসের একটা প্রাণময় অস্তিত্ব-ঘোষক চরিত্র হিসেবে নদীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। পদ্মার নিষ্ঠুর বৈরিতার বিরুদ্ধে তার তীরবর্তী মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায়; কিন্তু নির্মম পদ্মা, গ্রীক-ট্রাজেডির অমোঘ নিয়তির মতো, মানুষের স্বপ্নকে দেয় ভেঙে। তবু প্রমত্ত পদ্মার প্রতিবেশী সংগ্রামী আর স্বাপ্নিক নজু মিয়া-আসগর-বসির-মালেক-কুলসুম-নুরু তখনো মাথা নত করে না। পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েও তারা আবার নতুন আশার স্বপ্ন বোনে, পাড়ি জমায় সুদূরের ভেসে ওঠা কোনো-এক সোনালি-রূপালি দ্বীপে।

যেমন কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা ইমদাদুল হকের উপন্যাস, তেমনি হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'ও ভাববাদী মানবতা-চঞ্চল জীবনদৃষ্টির শিল্প-প্রতিমা। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, 'নদী ও নারী' উপন্যাসে হুমায়ুন কবিরের সর্বজ্ঞ-সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে স্বচ্ছল কৃষিজীবীদের প্রতি। জীবনাচরণের-দৃষ্টিতে কৃষক হলেও সম্পত্তি-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তারা অকপটেই উন্মোচন করে দিচ্ছে তাদের সামন্ততান্ত্রিক

মনোবৃত্তি। তবু একথা মানতেই হবে, আশাবাদে প্রত্যয়ী হুমায়ুন কবির মূলত নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাবসত্যময় আবেগ-জীবনেরই রূপকার।

বিপরীতধর্মী দুই সামাজিক-শ্রেণীর বিরোধের পটভূমিতে বিন্যস্ত এবং জনৈক লতিফ দারোগার বিপর্যস্ত জীবনকাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত আকবরউদ্দিনের 'মাটির মানুষ' (১৯৩১) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে বিশ শতকের প্রথম দিককার গ্রাম-বাংলার স্থিরচিত্র আর চলচ্চিত্র। চরিত্র-চিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিচারে আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' বিভাগ-পূর্ব কালের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশল এবং মনোবিশ্লেষণ রীতিকে অঙ্গীকার করে এ-পর্বেই ঘটে আবুল ফজলের দীপ্র আবির্ভাব। 'কল্লোল' (১৯২৩)-'কালিকলম' (১৯২৬)-'প্রগতি'র (১৯২৭) ঔপন্যাসিকদের হাতে বাংলা সাহিত্যে যে নাগরিক-চেতনার উদ্বোধন, আবুল ফজলই প্রথম তা আমাদের উপন্যাসে অঙ্গীভূত করলেন; এবং এ-অর্থেই তিনি পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য এক নতুন মাত্রার জনয়িতা। 'চৌচির' (১৯২৭), 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৯৪০) এবং 'সাহসিকা' (১৯৪৬) উপন্যাসে তিনি মনোবিশ্লেষণ-রীতিতে উপস্থাপিত করেছেন মানুষের অন্তর্জীবন ও বহিঃজীবন-চেতনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুসলিম মধ্যবিত্ত মানুষের মৌল-লক্ষণ সমাজবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং একই সথে সমাজ সংশ্লিষ্ট কর্মচেতনা 'চৌচির' উপন্যাসের নায়ক তসলিম চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শিল্পমূর্তি লাভ করেছে।[৬] এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় 'চৌচির' সম্পর্কে আবুল ফজলের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য:

আপনার 'চৌচির' গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েছি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে– এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি । আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা ক'রে রইলুম।[৭]

আবুল ফজলের 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাস নাগরিক-মধ্যবিত্তের হার্দিক রক্তক্ষরণের শিল্প-প্রতিমা; আর 'সাহসিকা' হচ্ছে বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বপ্নিল জীবনের বিশ্বস্ত শব্দরূপ। নাগরিকচেতনার প্রথম অঙ্গীকারে, চেতনাপ্রবাহ-রীতির সীমিত বিন্যাসে, বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্র্য, সমাজ-অচলায়তনে বন্দী নারী-ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে এবং প্রকরণ-পরিচর্যার পরীক্ষা-প্রবণতায় আবুল ফজলের এই ত্রয়ী উপন্যাস উন্মেষ-পর্বের পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যে সংযোজন করেছে স্বতন্ত্র এবং সুদূরসঞ্চারী মাত্রা।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সৈনিক আবুল ফজলের উপন্যাসে উদার মানবতাবাদী-চেতনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্পীদের রচনার শিল্প-সার্থকতা আবুল ফজলের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অযৌক্তিক। 'কল্লোলে'র চেতনা আবুল ফজল মেধা দিয়ে অনুভব

করেন মাত্র, প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতায় তা সমৃদ্ধ নয় মোটেই কারণ পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর তখনো শৈশব-কাল। তাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর শতবর্ষের অন্ত-অসঙ্গতি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং বিপন্ন মূল্যবোধের শব্দরূপ তাঁর রচনায় প্রত্যাশিত নয়।[৮] এ-প্রসঙ্গে 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' 'উপন্যাসের লেখকের কথা' শীর্ষক শেষ পরিচ্ছেদ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা এখানে অনিবার্য:

..আধুনিক মানুষকে নিয়ে গল্প লিখিতে বসাই এক ঝক্‌মারি ব্যাপার। জানাইবার মতো, লিখিবার মতো কী সংবাদই বা ইহাদের আছে? আজ সকলের মনের দুর্গ মনেই তো ধসিয়া পড়িতেছে। কোনো ভয়াবহ বিস্ফোরণ আজ কোথায়? কাজেই, বলাবাহুল্য, কিছু একটা অঘটন ঘটিবার সমস্ত আশা রশিদ নিজ গুণেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই গল্পের অকালমৃত্যু সে-ই ডাকিয়া আনিয়াছে। লেখকের বিন্দু-বিসর্গ দায়িত্ব ইহাতে নাই।[৯] প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষ এবং নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে ধারণ করেই পূর্ব-বাংলার উপন্যাসের অভিযাত্রা। এ-পর্বের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধসমূহ, তবু মানবতাবাদী চেতনার শিল্পরূপ অঙ্কনের প্রয়াস এ-পর্বে, সীমিত হলেও, একেবারে উপেক্ষিত নয়। বিভাগ-পূর্ব কালের উপন্যাস প্রধানত গ্রামজীবন-কেন্দ্রিক; তবে কখনো কখনো সেখানে এসেছে বিকাশমান নগরজীবনের খণ্ডিত ছবি। প্রাক্- সাতচল্লিশ পর্বের এই উত্তরাধিকারের ওপরেই নির্মিত হয়েছে বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস সাহিত্য।

দুই

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান' নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে পূর্ববঙ্গের উঠতি মধ্যবিত্তশেণীর অগ্রযাত্রা হল বাধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববাংলার উঠতি পুঁজিবাদীগোষ্ঠী এবং নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণী অনুভব করল তাদের অস্তিত্বের অন্তর্সঙ্কট। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজির আর্থিক স্বার্থেই পূর্ববাংলা রূপান্তরিত হল আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ-বিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা শিল্পীর চৈতন্যকে অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করল। ফলত বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী শিল্পীর মানসলোকে উপ্ত হল সংকটের বীজ।

আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হল ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত হল, অনেকটা অসংগঠিত এবং আকস্মিকভাবে, ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ভাষা-আন্দোলন। আমাদের রাজনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির অন্ত র্ভুবনে ভাষা-আন্দোলন সঞ্চার করল স্বাধিকার-প্রত্যাশী চৈতন্য। বায়ান্নর রক্তিম প্রতিবাদ পূর্ববাংলার জনমনে যেমন তোলে ঊর্মিল আলোড়ন; তেমনি সামন্ত মূল্যবোধসিক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুদৃঢ় পলল ভিতও হয়ে পড়ে শিথিল। মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক এবং মার্কসীয় চেতনাপুষ্ট শক্তিসমূহ পূর্ববাংলার সমাজজীবনে প্রায় সকল স্ত

রে অতিদ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে– যার ফলে ১৯৫৮-র সাধারণ নির্বাচনে বেণিয়াপুঁজি ও সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগ, সকল প্রয়াস সত্ত্বেও, পরাজিত হয়; এবং প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট অর্জন করে বিপুল বিজয়। অতঃপর ১৯৫৮-র আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বার বার মন্ত্রিসভার পতন সুগম করে দেয় পাকিস্তানি সামরিক-জান্তার ক্ষমতা-দখলের পথ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন-পূর্ব কাল-পরিসর এ-দেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্যায়। তাই আলোচ্য সময়-সীমায় রচিত উপন্যাসসমূহ আমরা বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম পর্ব হিসেবে বিবেচনা করেছি। সময়ের এই পর্ব-বিভাজন মোটেই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নয়; সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ-বিভাজন অবশ্যই সমাজসত্য-সম্মত।

বিভোগোত্তর কালে প্রথম দশকে উপন্যাস রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯). আবু ইসহাক (১৯২৬-), আকবর হোসেন (১৯১৭-১৯৮১), কাজী আফসারউদ্দীন (১৯২১-), আবু রুশদ (১৯১৯-), ইসহাক চাখারী (১৯২২-), সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-৮৬), শওকত ওসমান (১৯১৭-), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-), আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (১৯৩১-) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশ আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হলেও ঢাকা শহরের প্রকৃত নগরায়ণ বিলম্বিত হয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই। ফলত আমাদের শিল্প সাহিত্য ও নাগরিকচেতনার অনুপ্রবেশ হয় বিলম্বিত। তবু সীমিত অর্থে হলেও, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল এবং আবুল রুশদের শিল্পকর্মে নগরচেতনার প্রতিভাস দুর্লক্ষ নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বাদ দিলে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকরা আঙ্গিক-নির্মিতি, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-প্রসাধনে একান্তই অসতর্ক, অমনোযোগী এবং অমিতাচারী।

আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় আবুল ফজলের দু'টি উপন্যাস– 'জীবন পথের যাত্রী' (১৯৪৮) এবং 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭)। 'জীবন পথের যাত্রী' ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা 'কল্লোলী'য় নাগরিক-চেতনার বৃত্তে অনুসন্ধান করেছে জীবনের সুস্থ মূল্যবোধ। তবে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন-পর্যবেক্ষণ অন্তে শুভ্রতা আর সুস্থতার জন্যে আবুল ফজলের আকাঙ্ক্ষা এবং সে আকাঙ্ক্ষার শিল্পমূর্তি-সৃজনে এ-উপন্যাসে ঘটেনি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন। গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিকায় বিস্তৃত 'রাঙ্গা প্রভাত' উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের প্রতি আবুল ফজলের আন্তরিক বিশ্বাস। আদর্শবাদী চারুবাবুর ভাবশিষ্য কামালের সঙ্গে তাঁর কন্যা মায়ার প্রেমের রোম্যান্টিক-মেলোড্রামাটিক পটে, রাঙ্গা প্রভাতের প্রতীকে, লেখক এখানে শোষণহীন-

সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এক সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৬০), তেমনি আবুল ফজলও যাত্রা শুরু করেছেন ফ্রয়েড থেকে, আর পরিণতিতে গ্রহণ করেছেন কার্ল মার্কসকে। তবে মার্কসবাদী-চেতনা প্রকাশে 'রাঙ্গা প্রভাত' উপন্যাসে আবুল ফজল শৈল্পিক-সংযম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন; ফলে এটি পরিণত হয়েছে একান্তই উদ্দেশ্যপ্রধান রচনায়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণীয় :

> তিনি সচেতনভাবে উদেশ্যপ্রধান শিল্পী। তাঁর রচনার নায়ক-নায়িকা প্রধানত সমাজসেবী, দেশদরদী । প্রচলিত অর্থে ধর্মান্ধ নয়, উদার মানবধর্মে বিশ্বাসী। এ-উপন্যাসে পাকিস্তানের পটভূমিতে মুসলিম তরুণ ও হিন্দু তরুণীদের মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কল্পনা করেছেন। তবে উদ্দেশ্যপ্রধান রচনার সাধারণ দুর্বলতা: বক্তৃতাময় সংলাপ, ভাবার্দ্রতা, একমুখী আদর্শ চরিত্র ইত্যাদি থেকে 'রাঙ্গা প্রভাত' মুক্ত নয়।[১০]

গ্রামীণ-জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১)[১১] উপন্যাসে শব্দবন্দী হয়েছে লেখকের উদার মানবতাবাদী জীবনজিজ্ঞাসা। পশ্চিমবাংলার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে মহেশডাঙা নামক গ্রামের কোনো এক দরিয়া-বিবির রূপকে এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সমাজ-শৃঙ্খলে বন্দী গ্রামীণ নারীর নীরব সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের ইতিকথা। 'জননী' মনীষাদীপ্ত উপন্যাস নয়, বরং আবেগধর্মী। প্রতিকূল সমাজ-প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তীব্র জীবনসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে চিরায়ত বাঙালি-মাতৃস্নেহ। সমাজ-সত্য আছে, আছে গ্রামীণ জোতদারের লিবিডো-তাড়িত বিকৃত বাসনার চিত্র– তবু 'জননীর' মুখ্য উপজীব্য মাতৃত্বের গৌরব-গাথা। যেমন সমাজসত্যউপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্যে, তেমনি প্রকরণ-পরিচর্যায় শওকত ওসমানের 'জননী' পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

ঘটনাংশ এবং প্রকরণের শৈল্পিক সমন্বয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' (১৯৪৮) বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটি দীপ্তিমান এবং অনতিক্রান্ত শিল্প-প্রতিমা। এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্বের অন্তর্সংকট। বহির্মুখী জীবন নয়, বরং মজিদের অভ্যন্তর সংকট-সংশয় এবং নৈঃসঙ্গ্য এ-উপন্যাসের মৌল-প্রতিপাদ্য। মজিদ-চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন পূর্ববাংলায় ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও ভণ্ডামীর চিত্র। ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরবর্তী রচনা 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) কিংবা 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে যে-অস্তিত্বের অভীপ্সা, তার পূর্বাভাস 'লালসালু'তেই লক্ষণীয়। লালসালুতে আচ্ছাদিত 'মাছের পিঠের মতো মাজারের' দিকে জমিলার পদাঘাত-সঙ্কেত অস্তিত্বের শুদ্ধ-সত্তায় উত্তরণেরই প্রতীক-চিত্র। আত্মস্থ রচনাশৈলী, পরিস্রুত ভাষা, পরিমার্জিত গীতময়তা এবং প্রতীক-উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমন্বয়ে 'লালসালু' হয়ে- উঠেছে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। 'লালসালু' উপন্যাসে লেখকের প্রকরণ-সতর্কতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লালসালু'তে ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রধানত ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট এবং প্রতীকী-

পরিচর্যা। যেমন, প্রকৃতির অনুষঙ্গে, তাহেরের বাপের নিরস্তিত্ব হওয়ার প্রতীকী-পরিচর্যা:

> দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া, আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই, মহব্বত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মত আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শো করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতীর মত ঠেলে এগিয়ে যায়।[১২]

আবু ইসহাকের স্কেচধর্মী রচনা 'সূর্যদীঘল বাড়ী'তেও (১৯৫৫) চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ-জীবনের কুসংস্কার, মহাজনী শোষণ, জোতদারের বিকৃত-লালসা, দরিদ্র মানুষ জয়গুন-হাসুদের জীবন-সংগ্রামের ছবি। জয়গুনদের গ্রাম ছেড়ে শহরে নির্বাসন আসলে গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্কেত। বিষয়-গৌরবে ব্যতিক্রম হলেও, লেখকের অমীমাংসিত জীবনদৃষ্টি, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-প্রগতির ধারা অনুসন্ধানে মধ্যবিত্তসুলভ ভ্রান্তি ক্ষুণ্ন করেছে 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র শিল্পমূল্য। তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ধর্মজীবীর শোষণে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উন্মূলীত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী অসংখ্য জয়গুন-হাসুদের জীবন-যাপনের বিশ্বস্ত রূপবন্ধ।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ (১৯৫২ সালে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬০) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে জীবন-বীক্ষণের প্রতিশ্রুতি আছে; তবে সে-প্রতিশ্রুতি অতি-রোম্যান্টিকতার মোহাবেগে সহসাই দ্বিধান্বিত। লেখকের সমাজবোধ ও ইতিহাসচেতনা বুর্জোয়া রোম্যান্টিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। ফলত প্রাথমিক-প্রতিশ্রুতি বিচ্যুত হয়ে উপন্যাসটি মহৎ-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অঙ্কুরোদ্গমের পরেই বিনষ্ট করেছে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর ভাষাবোধ এবং পরিচর্যা-সচেতনা তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্প-চৈতন্যেরই স্বাক্ষরবহ।

গ্রামীণ মানুষের জীবন-যাপনের একদিন-প্রতিদিনের শব্দরূপ কাজী আফসারউদ্দীনের 'চর ভাঙ্গা চর' (১৯৫১)। এটিই পূর্ববাংলার প্রথম উপন্যাস, যেখানে ঔপন্যাসিক, সীমিত হলেও, সচেতনভাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। মানুষ নয়, বরং প্রকৃতিই 'চর ভাঙ্গা চর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। বর্গীর আক্রমণ থেকে পাঠান এবং মোঘল আমলে ধলেশ্বরী-চরের সংগ্রামশীল মানুষের জীবন-চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। কাজী আফসারউদ্দীনের 'কলাবতী কন্যা' (১৯৫৬) এবং 'নোনা পানির ঢেউ' (১৯৫৮) এ-পর্বের দুটো জনপ্রিয় উপন্যাস, দৌলতুন্নেছার 'পথের পরশ' (১৯৫৭); ইসহাক চাখারীর 'পরাজয়' (১৯৫৪), 'মেঘবরণ কেশ' (১৯৫৫) প্রভৃতি উপন্যাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্ম-ভীরু, স্থবির এবং অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত গ্রাম-জীবনের বিশ্বস্ত রূপচিত্র। তবে নন্দনতত্ত্বের বিচারে, শিল্প হিসেবে এ-গুলোর মূল্য যে অকিঞ্চিৎকর, এ কথা বলাই বাহুল্য। ঘটনাভুক পাঠকের সুখদ মনোরঞ্জনের কারণে আকবর হোসেনের 'অবাঞ্ছিত' (১৯৫০), 'কি পাইনি' (১৯৫১), 'মোহমুক্তি' (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাস এ-পর্বে লাভ করে সহজ জনপ্রিয়তা; শিল্পবোধ এবং সমাজচেতনার

অভাবে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, আকবর হোসেন কোনো উপন্যাসেই সচেতন পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেননি।

আবু রুশদ 'সামনে নতুন দিন' (১৯৫৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণা নগরজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন; তবে শিল্পসচেতনতার অভাবে তাঁর এ-প্রয়াস শিল্পিত হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্তের জীবনসংকট নয়, বোধ করি, নগরজীবনের উপরিতলের চিত্র অঙ্কনেই তিনি অধিক উৎসাহী। কেন্দ্রানুগ শক্তির অভাবে জনৈক রহমান সাহেবের জীবনের ঘটনাগুলো একসূত্রে মিলিত হতে পারেনি এবং এখানেই এ-উপন্যাসের আঙ্গিকগত সঙ্কট। তবু আবু রুশদের 'সামনে নতুন দিন' উপন্যাস এ-অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ যে, ষাটের দশকে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে নাগরিক-চেতনার যে প্রতিভাস, তার প্রাথমিক প্রকাশ এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'আদিগন্ত' (১৯৫৬) গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের ভাষাচিত্র। সমাজসচেতন-আশাবাদ ধ্বনিত হলেও, ভাষা-ব্যবহার ও পরিচর্যার শৈথিল্যে এবং মননশীলতার অভাবে শিল্প-বিচারে 'আদিগন্ত' দুর্বল সৃষ্টি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) উপন্যাস নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ-বাংলার মাঝিদের জীবনকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো লেখকের মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতার চোরাগলিতে আত্মসমর্পণ করেছে; সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অন্তরধর্মে তারা দ্বিধাগ্রস্ত, ভাবাবেগপূর্ণ এবং উচ্ছাসপ্রবণ। তবু এ-উপন্যাসের কবিতাস্পর্শী শব্দস্রোতে প্রতিদিনের নদীময় দক্ষিণবাংলা কল্লোলিত যেন। এ-পর্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর আরো তিনটি উপন্যাস– 'আশিয়ানা' (১৯৫৫), 'আলম নগরের উপকথা' (১৯৫৫) এবং 'জীবনকাব্য' (১৯৫৬)। যুগ-পরম্পরায় প্রসারিত 'আলম নগরের উপকথা'[১৩] উপন্যাসে উপকথা এবং ইতিহাসের ঘটেছে পরস্পর অন্তর্বয়ন-মিলন। এ-উপন্যাস লেখকের ইতিহাসজ্ঞান, সময় ও সমাজ-অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। অবক্ষয়িত সামন্ত-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রাচীন সমাজকাঠামো-ভাঙনের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে উৎসারিত হয়েছে নতুন সমাজ-নির্মাণের অভিলাষ।

গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিতে বিধৃত এবং শিল্পচেতনা ও সমাজ-বোধের সমন্বয়ে রচিত আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৯৫৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক হালিম নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের সচেতন প্রতিনিধি। এ-উপন্যাসের বিস্তৃত পটে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত-ছাড় আন্দোলন. তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনা। জীবনার্থ, ভাষা-ব্যবহার এবং ঘটনা-বিন্যাসের বিচারে 'জীবন ক্ষুধা' আবুল মনসুর আহমদের একটি নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকর্ম।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত অধিকাংশ উপন্যাসেই উৎসারিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের বুর্জোয়া মানবতাবাদী জীবন-ভাবনা। আলোচ্য কালসীমায় রচিত প্রায় সব উপন্যাসেই উদ্ভাসিত হয়েছে পূর্ববাংলার গ্রামীণ-জীবন। এ-পর্বের ঔপন্যাসিকরা ঘটনা-নির্বাচনে প্রধানত গ্রামমুখীন। তবে আবুল ফজল, আবু রুশ্‌দ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের রচনায় নাগরিকচেতনার সীমিত প্রকাশ এ-পর্বেই

লক্ষণীয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার অন্তর্জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার উন্মোচন-প্রয়াসও এ-পর্বের উপন্যাসের অন্যতম স্বভাবলক্ষণ। প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এ-সময়ের অধিকাংশ উপন্যাসই মহৎ-সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি, কেবলমাত্র লেখকদের সংশয়ী এবং দ্বিধান্বিত সমাজবোধের জন্য। প্রাক্-সাতচল্লিশ সময়ের ঔপন্যাসিক-মূল্যবোধের সঙ্গে এ-পর্বে যুক্ত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একাকিত্ববোধ এবং অন্তরমুখিতা, আবুল ফজলের নাগরিক-চেতনা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সমাজবাদী জীবনভাবনা এবং শামসুদ্দীন আবুল কালামের নঞর্থক রোম্যান্টিকতা। প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ মুসলিমসমাজের জীবনচিত্রণ আলোচ্য পর্বে আর প্রাধান্য পায়নি, বরং তার জায়গায় এসেছে শাহরিক মধ্যবিত্ত-জীবন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বায়ান্নর রক্তিম উজ্জীবনের ফলেই এ-পর্বের উপন্যাসসমূহ জীবনকেন্দ্রিক, সত্য-অন্বেষী এবং মৃত্তিকামূলসংলগ্ন।

তিন

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন পূর্ববাংলার শিল্পীদের মনে-মননে-স্নায়ুতে যে প্রগতিশীল চেতনার জন্ম দিয়েছিল, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরে প্রবর্তিত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে তা সাময়িকভাবে তা হয়ে গেল স্তব্ধ। পূর্ববাংলায় নেমে এল সামরিক শাসনের বর্বর অত্যাচার। নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সামনে তখন অবরুদ্ধ-সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল, ধাতব অস্ত্রধারীর নিষ্ঠুর নিপীড়ন। বন্দী-সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের শিল্পীরা শৃঙ্খলমোচনের পথ-নির্দেশ নয়, বরং হন্যে হয়ে খুঁজলেন এক চিলতে নিরাপদ আশ্রয়। স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববাংলার প্রগতিশীল যে-সব শিল্পী সময়ের প্রথম পর্বে সত্যসন্ধানী এবং জীবনকেন্দ্রিক, ১৯৫৮ সালের পর তাঁরাই হলেন জীবন-পলাতক, ক্রমবিকাশে শংকিত এবং আত্ম-রোমন্থনে পরিতৃপ্ত। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের মতোই এঁরা তখন বেতার, টেলিভিশন, বি, এন, আর, লেখক সংঘ এবং প্রেস-ট্রাস্টের আচ্ছাদনে পরিণত হলেন ঔপনিবেশিক শাসকের বেতনভুক সেবাদাসে। কেউ-বা আবার সমাজবাদী জীবনভাবনাকে সরাসরি প্রকাশ করতে ভীত হলেন, আশ্রয় নিলেন রূপক-প্রতীক ও রূপকথা-পুরাণের জগতে। কতিপয় ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্টলোকে হাতছানি দিল ফ্রয়েড– ফলে আমাদের ঔপন্যাসিক চৈতন্যে এল লিবিডো-তাড়িত, রিরংসাপ্রিয়, পলায়নবাদী এবং বিবরসন্ধানী নঞর্থক জীবনভাবনা এবং এ-ভাবেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের পচনশীলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল পূর্ববাংলার বেশ কিছু ঔপন্যাসিক। সমকালীন ঔপন্যাসিক-চৈতন্যের এই সংকট সংশয় ও পরাভব কিভাবে আমাদের কথা-সাহিত্যকে গ্রাস করেছিল, সমালোচকের লেখায় তার রূপ ধরা পড়েছে:

আমরা যেমন এক রুদ্ধ ঘরে বাস করছি। সব দরজা জানালা বন্ধ, বাইরে আকাশ তাম্রাভ, হাওয়া নেই এবং পাখিগুলির কণ্ঠ স্তব্ধ। আমাদের ঘরে গুমোট হাওয়া

বহুব্যবহৃত। আমরা শান্ত, নিঃসংগ, বিফল আত্মকড়ূয়নে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি, একটা বিশ্রী ঘানির সংগে যুক্ত অবস্থায় অর্থহীন পরিক্রমণে আমরা আমাদের সময়কে ক্রমাগত পুড়িয়ে নিঃশেষ করছি।[১৪] বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ, যুগ-সংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পীচৈতন্য অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি। সামরিক-শাসনের ভয়ে আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক সমাজ-সংক্ষোভ আর জীবন-সত্য ভুলে গেলেও, ব্যতিক্রম যে দু'একজন ছিলেন না, এমন নয়। স্বৈর-শাসনের শৃঙ্খলে বাস করেও কোনো কোনো ঔপন্যাসিক ছিলেন সত্য-সন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজভাবনায় নিঃসন্দিগ্ধ।

১৯৫৮ সাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব-পর্যন্ত সময়-সীমায় আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে ধরা পড়েছে উপর্যুক্ত দুটি প্রধান চেতনাস্রোত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, সব কিছুর মতোই, আমাদের সাহিত্যেও এল পরিবর্তন। তাই ১৯৫৮ থেকে স্বাধীনতা-পূর্ববতী সময়ে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহকে আমরা বিবেচনা করব দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস হিসেবে।

জীবন জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে 'জননী'র স্রষ্টা শওকত ওসমান এ-পর্বে সংরক্ত-সমকাল এবং সমাজ-বাস্তবতা এড়িয়ে গেলেন; আশ্রয় নিলেন রূপক-প্রতীক ও রূপকথা পুরাণের জগতে। আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত হয় তার চারটি উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'সমাগম' (১৯৬৭), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮) এবং 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০)। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে আইয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার শোষিত মানুষের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে প্রতীকী-ব্যঞ্জনায়। 'প্রতিধ্বনির সাহায্যে গিরি-কন্দরের গভীরতা এবং দূরত্ব-জ্ঞাপনের পন্থা'য় রচিত 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে শওকত ওসমান স্বকাল-সমকাল থেকে যদিও পলাতক, তবু বিষয়-ভাবনা এবং আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব–ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না'–নায়কের এ-উক্তি সর্বকাল, সর্বদেশের জন্যই সমান সত্য। তাঁর 'রাজা উপাখ্যান'ও প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। সাহসী হরমুজ কর্তৃক দু'টো গোখরা সাপ দ্বারা শৃংখলিত সম্রাট জাহুক ও অন্যান্যদের মুক্তিলাভের রূপকচিত্রে এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী ও মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিকথা। ষাটের দশকে সামরিক-শাসনের শৃঙ্খলমোচনের জন্য মুক্তিকামী বাঙালির সংগ্রাম-সংকল্প ও প্রত্যয়-প্রত্যাশা এ-উপন্যাসে শিল্পিত ভাষ্যে রূপায়িত হয়েছে।

শওকত ওসমান 'সমাগম' উপন্যাসে বিচরণ করেছেন রূপকথার রাজ্যে। 'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক। ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক। ....মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসেবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ। ...সুখীতর, আরো সমৃদ্ধিতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী'[১৫] –এই-ই হচ্ছে 'সমাগম' উপন্যাসে শওকত ওসমানের মৌল-অভিজ্ঞা। নগরজীবনের পটে বিন্যস্ত 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসে শওকত

ওসমান পুঁজিবাদী সমাজের হীন ষড়যন্ত্র এবং শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের এ-সব উপন্যাসে রূপকের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অবরুদ্ধ জাতিসত্তার স্বাধিকারস্পৃহা। আঙ্গিকগত অভিনবত্বে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে শওকত ওসমানের উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম।

দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দু'টো উপন্যাস- 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ-কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার পদাঘাত-সঙ্কেতে অস্তিত্বের যে অভীপ্সা প্রতীকায়িত– এ-দু'টো উপন্যাসে সেই অস্তিত্বচেতনা হচ্ছে আরো বলয়িত এবং সুস্পষ্ট। ভয়-ভীতি অতিক্রম করে 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খতিব মিঞা উত্তীর্ণ হয়েছে পরম নির্ভীক সত্তার শুদ্ধ জাগরচৈতন্যে। 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ মানবমুখীন এবং কল্যাণময় অস্তিত্ববাদী দর্শনে হয়েছেন স্থিতধী। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশেষত্ব হল– তিনি বিষয়াংশ-নির্বাচনে এবং আঙ্গিক-নির্মিতিতে সতত নিরীক্ষাপ্রিয় ও পরীক্ষাপ্রবণ। তাঁর শিল্পী-চৈতন্য ক্রম-অগ্রসরমান; স্বাতিক্রমণই তাঁর জীবনার্থের মূলকথা। চরিত্রের অভ্যন্তর সংকট ও সংক্ষোভ উপস্থাপনে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর উপন্যাসে কখনো ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট পরিচর্যা, কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট : আবার কখনো-বা পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা। যেমন, 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে বিকৃত-বিপর্যস্ত মুহাম্মদ মুস্তফার অস্তিত্বহীনতা উপস্থাপনে পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা:

> সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে: সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপ্টাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে, পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করছে যেন।[১৬]

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস আমাদের নিয়ে যায় অস্তিত্বের প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিমিশ্রসত্তা থেকে শুদ্ধসত্তার অভিমুখে।'[১৭] দৃষ্টিকোণ-নির্বাচনে, ভাষা-প্রয়োগে, প্রতীক-চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে এবং জীবনার্থের প্রাতিস্বিকতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ত্রয়ী উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে সূর্য-প্রত্যাশী স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী।

পঞ্চাশের দশকে মার্কসবাদী চেতনায় আত্মস্থ আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীও এ-পর্বে অনুসন্ধান করলেন জীবনের সহজ নিরাপত্তা এবং সমর্পিত হলেন রোম্যান্টিক নীলিমাভ্রমণে। এ-পর্বে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসেই 'শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬১),

'নাম না-জানা ভোর' (১৯৬২) এবং 'নীল যমুনা' (১৯৬৪)] তিনি হারিয়ে ফেললেন 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এর বস্তুনিষ্ঠা ; সংরক্ত সমকাল ভুলে গিয়ে আত্মমগ্ন হলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতায় । তাঁর 'শেষ রজনীর চাঁদ' ঢাকা শহরের একই বাড়ির বাসিন্দা চারটি পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত একটি শাহরিক-জীবনের উপন্যাস । 'নাম না-জানা ভোর' উপন্যাস নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তান ভাগ্যান্বেষী আলমের উচ্চবিত্তশ্রেণীতে উত্তরণের ইতিকথা । 'নীল যমুনা' উপন্যাসে গাফ্ফার চৌধুরী নীহাররঞ্জনীয় গোয়েন্দা গল্পের রহস্য- উন্মোচনে হয়ে পড়েছেন বিভ্রান্ত । তবে নগরচেতনার প্রকাশ এবং স্বতন্ত্র ভাষা ও আঙ্গিক-নির্মিতির জন্য গাফ্ফার চৌধুরীর এ-সব উপন্যাস আমাদের কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পকর্ম ।

'কাশবনের কন্যা' রচয়িতা শামসুদ্দীন আবুল কালামও আলোচ্য পর্বে জীবন-পলাতক । সংক্ষুব্ধ পঞ্চাশ-ষাটের দশক বিস্মৃত হয়ে 'কাঞ্চনমালা'য় (১৯৬১) তিনি বিচরণ করলেন বেদে জীবনভিত্তিক লোককাহিনীর ধূসর জগতে । 'কাঞ্চনমালা'র কাহিনী নিরাবিল পুঁথির জগতে প্রসারিত । ... সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।"[১৮] তবে লোক-কাহিনীকে আধুনিক জীবনচেতনার অঙ্গীকারে উপন্যাসের অবয়বে উপস্থাপনে শামসুদ্দীন আবুল কালাম যে সম্পূর্ণ সফল হননি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'র (১৯৬৭) বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক বিপর্যয়, মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং জীবন-সংগ্রামের বহুমাত্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে রচিত 'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাসের কালসীমা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত । ইতিহাস-আশ্রয়ী এই উপন্যাস ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ আমাদের সমাজ-চৈতন্যকে প্রতিবাদ-বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তোলে । উত্তম পুরুষে বিবৃত এ-উপন্যাসের নায়ক রহমৎ অনেক সূর্যের আশার আলোয় উদ্ভাসিত :

> তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠেছে; ঝলমল করে রেঙে উঠেছে দিগন্ত । মনে মনে কেবলই ভাবছি, ঐ ওখানে ঐ আলোর পারে সে দেশ–সে স্বপ্নের দেশ– সে আজাদ দেশ আমার! যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব । গরীব-কাঙ্গাল-রাজা-জমিদার সব যেখানে সমান; সব একই মানুষ ।[১৯]

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্ত-অসঙ্গতি এবং লুপ্তপ্রায় দাই-সম্প্রদায়ের জীবনযন্ত্রণা নিয়ে গড়ে উঠেছে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'পান্নামোতি' (১৯৬৫) উপন্যাস । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং কৃষক-সমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ– বাংলার এই আয়ত ইতিহাস জয়েনউদ্‌দীনের ' নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ । এই উপন্যাসে লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংগ্রামীচেতনা । 'মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন

জিতবেই'– পাবনার নীল-বিদ্রোহের নায়ক তোতামীরের (বা তিতুমীর) এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক পরোক্ষে প্রকাশ করে দেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামশীল চৈতন্য।

১৯৫৮ সাল থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব কালসীমায় রচিত আমাদের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি যেমন বিচিত্রমুখী এবং বৈচিত্র্যসন্ধানী; তেমনি এ-পর্বে আবির্ভূত নতুন ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক। সময়ের এ-পর্বে যে-সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), আলাউদ্দিন আল-আজাদ (১৯৩২-), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), রাজিয়া খান (১৯৩৬-), শওকত আলী (১৯৩৬-), জহীর রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), মিজানুর রহমান শেলী, হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), আবদুর রাজ্জাক (১৯২৪-১৯৮১) রশীদ করিম (১৯২৫-), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২-), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১), নীলীমা ইব্রাহীম (১৯২১-), দিলারা হাসেম, আহমদ ছফা (১৯৪৩-), আবদার রশীদ (১৯৩০-), ইন্দু সাহা (১৯৪০-), খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াছ (১৯২৪-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-) প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের রচনায় উপস্থাপিত হল মধ্যবিত্ত-জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতা আর অতলান্ত শূন্যতা। ব্যক্তির বিনষ্টি-চিত্রণই এ-পর্বের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট যেন। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সংক্ষুব্ধ সমকাল এঁদের অনেকের রচনাতেই অভিব্যঞ্জিত হল না– বরং উদ্ভাসিত হল তাঁদের আত্মরতিমূলক রিরংসাপ্রিয় পলায়নী মনোবৃত্তি। এ-পর্বের ঔপন্যাসিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– রূপকল্প-নিরীক্ষা, ঘটনাংশ-নির্বাচন এবং ভাষা-নির্মিতিতে তাঁরা সতত পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্য-অন্বেষী, কিছুটা দুঃসাহসীও বটে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-রীতি প্রয়োগে এবং আত্মমগ্ন চেতনায় ব্যক্তিকশূন্যতা চিত্রণে যাঁরা সমধিক আগ্রহী, তাঁরা হচ্ছেন রাজিয়া খান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক এবং শওকত আলী। বিপন্ন এবং সংক্ষুব্ধ বর্তমানে দাঁড়িয়ে এঁরা খুঁজেছেন ব্যক্তি-মানুষের অতলান্ত বেদনাকে, পরম যন্ত্রণাকে। ব্যক্তির দায়িত্ব এঁদের রচনায় স্বীকৃত হল না;[২০] বরং সেই সর্বশূন্য বিবিক্ততা আর অতলান্ত নৈঃসঙ্গ্যের মাঝে এঁরা জীবনের অর্থ খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াসে মেতে উঠলেন। সমষ্টি-অভিজ্ঞান থেকে এঁদের নায়ক-নায়িকা ক্রমশই একক ব্যক্তি-অভিজ্ঞায় অন্তর্লীন হতে চাইল; ফলে ষাটের দশকে এসে আমাদের উপন্যাসে এল তিরিশের 'কল্লোলী'য় একাকিত্ববোধ আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনা।

রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯) এবং 'অনুকল্প'-এর (১৯৫৯) মঈন-সুমিতা-হেটি-তরু-শামসী-রেণু-আশরাফ–সকলেই প্রেম আর শান্তির প্রত্যাশী: কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আধুনিক নাগরিক-চৈতন্যের যন্ত্রণা এবং মরুভূ শূন্যতায় তারা নিঃশেষিত-প্রায়। নগরবাসী আধুনিক মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, দুর্মর নিঃসঙ্গতা এবং

অতলান্তিক শূন্যতা উদ্ভাসিত হয়েছে রাজিয়া খানের উপন্যাসদ্বয়ে; এবং দুটি উপন্যাসেই শতাব্দীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং ক্লেদ-গ্লানি আর আত্মরতির পঙ্কে নির্দেশিত হয়েছে জীবনের পরিণতি। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা এবং ব্যক্তিক-মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে রাজিয়া খানের ভাষা কবিতাস্পর্শী, আবেগসিক্ত এবং গীতিধ্বনিময়।

'জেগে আছি' (১৯৫০) কিংবা 'ধানকন্যা' (১৯৫১) গল্পগ্রন্থে আলাউদ্দিন আল-আজাদের মৃত্তিকা-সংলগ্ন জীবনচেতনা 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০) কিংবা 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২) উপন্যাসে শতাব্দীর অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পঙ্কস্রোতে নিমজ্জিত- প্রায়। মধ্যবিত্ত নাগরিক-জীবনের চালচিত্র এই উপন্যাস দুটি সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) বিশ্লেষণ অনুভবসঞ্চারী :

> এ-দু'টো হল তথাকথিত আধুনিক উপন্যাস– আমাদের উঠতি জীবনধারায় যন্ত্রযুগের যে ক্ষয়িষ্ণুতার উপরিতলগত ও বহিঃপ্রভাব-গত পরোক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারই প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। কোনোক্রমেই আমাদের জীবনের মূল সুর এখানে উপজীব্য নয়–বরং এক উদ্ভট যৌন-সর্বস্বতা সার্বজনীন উপকরণের উত্তরাধিকারে আধুনিক আঙ্গিক ও ভাবনার ঐতিহ্যে সাম্প্রতিকতার শামিল হতে চেয়েছে এ-ক্ষেত্রে যেন।[২১]

তবে জীবনের সুস্থতা আর কল্যাণের প্রতি আলাউদ্দিন আল-আজাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই বিকৃতি এবং অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করেও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে'র নায়ক জাহেদ উপন্যাসের পরিণতিতে সুস্থ জীবনবোধে পরিস্রুত হতে সচেষ্ট হয়েছে। 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসে অপগত-যৌবনা বিলকিসের অবরুদ্ধ যৌনাকাঙ্ক্ষা বিকৃতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েও পরিণতিতে প্রত্যাবর্তন করেছে সুস্থ-স্নিগ্ধ জীবনার্থে; এবং এভাবেই শীতের কুয়াশা কাটিয়ে লেখক পৌঁছে যেতে চান প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল ঊষায়।

আলাউদ্দিন আল-আজাদের এই বাসন্তি-যাত্রা সাফল্য অর্জন করেছে 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৫) উপন্যাসে এসে। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-যুগ সংক্ষোভ-স্বাধীনতা সংগ্রাম–এই বিস্তৃত ক্যানভাসে রচিত 'ক্ষুধা ও আশা' ইতিহাসচেতনা-সমৃদ্ধ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল-আজাদের শিল্পচেতনা মহত্তর জীবনার্থের সাধনায় প্রাগ্রসরমান। আলাউদ্দিন আল-আজাদ বিশ্বাস করেন : "উদ্ভবকালের মতো আজকের ঔপন্যাসিকও মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই যুদ্ধের মানে শুধু সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লবের একনিষ্ঠ চারণ হওয়াই নয়, একটি উপন্যাসে একটি কুসংস্কারের মাথায় যে আঘাত হানল, সেও এই আয়োজনের সঙ্গে শরিক হল।[২২] 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস এই বিশ্বাসেরই শিল্পিত স্বরগ্রাম। সমাজসত্য-আশ্রিত এবং মননশাসিত এই উপন্যাসে জীবন-বোধের যে প্রকাশ লক্ষ করি, তাতে অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশ এবং বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মধ্যে বাস করেও আমরা আত্মলগ্ন হই সংগ্রামী মানবতার প্রতি। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত খণ্ড-খণ্ড জীবনচিত্র এ-উপন্যাসে কেন্দ্রানুগত-শক্তির আকর্ষণে একই মোহনায় মিলিত হয়েছে। হানিফ-

ফাতেমা-জোহা-জুহু-এ-সব নীচুতলার মানুষের জীবন-চিত্রণে ঔপন্যাসিক যতটা সার্থকতা অর্জন করেছেন, উপরতলার মুর্তজা-রেজা বা লীনার চরিত্র-চিত্রণে ততটা নন। বিষয়-নির্বাচনে ও প্রকরণ-পরিচর্যায় 'ক্ষুধা ও আশা' বাংলা সাহিত্যের একটি শিল্প-সফল উপন্যাস।

কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী-মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, এইসব প্রাত্যহিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাস। কাহিনীর মানবমুখীন পরিণতির মধ্য দিয়ে এখানেও অভিব্যঞ্জিত হয়েছে লেখকের আশাবাদী মানসতা। কল্লোলিত কর্ণফুলী, তার বুকে ভেসে-চলা মাঝি সম্প্রদায়, কর্ণফুলী-তীরবর্তী জনপদ, বিশেষ অঞ্চলের মাটি আর মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ–সবকিছু এ-উপন্যাসে একান্ত হয়ে গেছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলনের সুখদ-অনুষঙ্গ সৈয়দ শামসুল হকের মানসলোকে সঞ্চার করেছে আত্মমগ্ন-চেতনা, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যবোধ, রিরংসাজাত আত্মরতি এবং রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাস। সৈয়দ শামসুল হক, উপন্যাস-রচনার শুরু থেকেই, মানব-সম্পর্ক নির্মাণে 'লেবার' (Labour) নয়-বরং 'লিবিডো'কেই (Libido) প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর চারটি উপন্যাস–'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২) এবং 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)। ঘটনাংশ-নির্বাচন এবং আঙ্গিক-পরিচর্যায় এ-সব উপন্যাস তাঁর সযত্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের অখণ্ড রূপের উপলব্ধি এর কোনোটিতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ আমরা জানি, "ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্নভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখা মাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণা করাও সাধ্যাতীত।"[২৩]

সৈয়দ শামসুল হকের 'এক মহিলার ছবি' দৃষ্টি-আকর্ষণী বিচিত্র বর্ণ-প্রলেপে অন্ত-অসঙ্গতিসম্পন্ন সমাজ-পরিবেশে লালিত-বর্ধিত এক মহিলার আত্মমগ্ন চেতনার ভঙ্গিময় কথকতা। দ্বৈত-ভালোবাসা এবং নারীর সন্তান-আকাঙ্ক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর 'দেয়ালের দেশ'। অবচেতন দ্বৈত-ভালোবাসার দ্বন্দ্ব কবিতাস্পর্শী শব্দ-স্রোতে রূপায়িত হয়েছে 'অনুপম দিন' উপন্যাসে। একদিন অপরাহ্ন তিনটা থেকে পরদিন ভোর ছ'টা–এই পনের ঘণ্টার সময়-সীমায় বন্দী করে, যখন বাইরে পড়ছে একটানা বৃষ্টি, জরিনা-মাসুদ-রোকসানা-আলীজাহ্–এইসব সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্রের হৃদয়তল-উৎসারিত অন্তর্জ্বালা এবং সত্তাবিচ্ছিন্ন একাকিত্বের যন্ত্রণা শিল্পমূর্তি পেয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসে। আত্মকেন্দ্রিকতা এবং মনোবিকলন যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য–এ-সব উপন্যাস তারই প্রভাবজাত। যন্ত্রণাদগ্ধ এবং নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত মানুষের অন্ত-অসঙ্গতি উন্মোচনে সৈয়দ শামসুল হকের ভাষা উপমাবহুল, গীতময়, আবেগ-স্নিগ্ধ এবং কবিতা-সিক্ত। 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাস থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা :

বিকেলে নাবলো বৃষ্টি। তখন উঠে এলো ছাদে। বড় বড় গাছ দোলানো, আকাশ নেভানো বৃষ্টি। কেবল দিগন্তের কাছে বলয়ের মতো একফালি উজ্জ্বলতা। আর বাতাস। নিম গাছের বড় ডালটায় দু'টো কাক ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। তার চারদিক থেকে কি একটা আয়োজন যেন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। জরিনার মনে হলো, এই তার আপন পৃথিবী। কতকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে এমনি একটি বৃষ্টির– যে বৃষ্টি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে ছাদে, যে বৃষ্টিতে ভেজা যায়; সে বৃষ্টির আড়ালে সাদেক, রোকসানা, আলীজাহ্ সবাই দূরে সরে যায়।[২৪]

সমাজ-প্রতিবেশে বন্দী একটি মেয়ের বাঁচার স্বপ্ন কিভাবে হারিয়ে গেল, যন্ত্রণা আর বেদনায় কিভাবে তার জীবন নিঃশেষিত হল- এইসব কথা নিয়ে শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩)। বিকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ জীবনের কল্পনা এ-উপন্যাসেরও হয়েছে অবরুদ্ধ। পশ্চিমী সাহিত্য-পাঠের প্রভাবজাত এ-উপন্যাসে উপেক্ষিত হল সমাজ-সত্য; বাস্তবজীবন নয়, বরং ভঙ্গি-সর্বস্ব আত্ম-নিমজ্জন এবং অবক্ষয়ী জীবনচেতনাই এখানে পেল প্রাধান্য।

শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে উপকূলবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবন-ধারা। বিষয়-গৌরবে অভিনব 'সারেং বৌ' "বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সারেং জীবন-কাহিনীর প্রথমতম আলেখ্য।"[২৫] জীবিকার অন্বেষণে অসীম সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে কদম সারেং আর দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংগ্রাম করেছে নবিতুন–এদের জীবনের আনন্দ-বেদনা স্বপ্ন,-স্বপ্নভঙ্গ আর সংগ্রাম-সাহসের শব্দরূপ এ-উপন্যাস। কদম এবং নবিতুন চরিত্র-নির্মাণে লেখকের অসামান্য সাফল্য স্মরণে রেখেই এ-কথা বলতে হয়–শৈল্পিক নির্লিপ্তির অভাব, রোম্যান্টিকতার হাতছানি এবং গীতিসুরের বাহুল্য উপন্যাসটির শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ন করেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ধ্বনিত হয়েছে আশায় উজ্জীবিত সংগ্রামী মানুষের সাহসী উচ্চারণ :

দেখল চরের দূরপ্রান্তে সবুজ রেখা। আর দেখল কয়েক হাত দূরে বঙ্গোপসাগরের ঝিলিমিলি নীল। শান্ত সংযত আর সুন্দর। কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নে রে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দূর।[২৬]

পূর্ববাংলার উপকূলবতী দু'টি গ্রাম–বাকুলিয়া আর তালতলিকে কেন্দ্র করে রচিত শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। স্রষ্টার সমাজচেতনা, ইতিহাসজ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষরবাহী 'সংশপ্তক' উপন্যাস পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। দুটি অখ্যাত গ্রামের জীবনধারাকে অবলম্বন করে নির্মিত হলেও, এ-উপন্যাসের পট বিস্তৃত হয়েছে পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে কলকাতা মহানগরী পর্যন্ত। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে উঠে এসেছে সামন্ত-আভিজাত্যের শেষ নিঃশ্বাস, পূর্ববাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন কলকাতা-জীবন এবং বিভাগকালীন ঢাকার চালচিত্র। চল্লিশের দশকের সংক্ষুব্ধ এবং কল্লোলিত পূর্ববাংলা 'সংশপ্তক' উপন্যাসে শব্দবন্দী যেন। স্রষ্টার

ইতিহাসচেতনা এবং সমাজবাদী জীবনাদর্শের স্পর্শে উপন্যাসের চরিত্রগুলো উচ্চকিত হয়েছে দ্রোহে-বিদ্রোহে; বৃহত্তর জীবনানন্দের আকাঙ্ক্ষায় তারা বেছে নিয়েছে সংগ্রাম-সঙ্কুল পথ। 'মহাভারতে' যে সংশপ্তক সেনার উল্লেখ আছে; যাদের কপালে অঙ্কিত মৃত্যুর পাঞ্জা, তারা মরে তবু লড়ে যায়; তেমনি লড়ে আর মরে 'সংশপ্তক'-এ চিত্রিত পূর্ববাংলার সাহসী মানুষ। উপন্যাসের সমাপ্তিতে সকল বাধা-বিপত্তি-হতাশা-বেদনাকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বিজয়ের সূর্যমূখী আশা :

বড়খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল্ কল্ জোয়ার বড় খালে। শাঁই শাঁই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সবকিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা—আমি আসব। আমি আসব।[২৭]

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার সত্যেন সেনের উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটে আলোচ্য কালসীমায়। এ-পর্বে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসসমূহ হচ্ছে 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৯৫৯); 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯), 'অভিশপ্ত নগরী, (১৯৬৭), 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'আলবেরুণী' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯); 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' (১৯৬৯), 'কুমারজীব' (১৯৬৯), 'সেয়ানা' (১৯৬৯), 'উত্তরণ' (১৯৭০), 'মা' (১৯৭০), এবং 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' (১৯৭১)। আমাদের পাতি-বুর্জোয়া সাহিত্য-জগতে সত্যেন সেন হতে পারেন স্বল্প-পরিচিত সাহিত্যিক ; কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান কোনো সূত্রেই বিস্মরণীয় নয়। মার্কসবাদের দিকে জনচেতনাকে জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে সত্যেন সেনের মতো কেউ লেখেননি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতেও বাংলা সাহিত্যে সত্যেন সেন সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা। গতানুগতিক প্রেম-বর্ণনায় মানস-যাত্রা, কারা-জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে সে-যাত্রায় অগ্রগমণ, আর শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় আকাঙ্ক্ষিত উত্তরণ—এই হচ্ছে সত্যেন সেনের শিল্পী-মানসের ক্রমবিকাশ-রেখা।[২৮]

সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' কারাজীবনের অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ ; আর 'পদচিহ্ন' হচ্ছে পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে হিন্দু-সম্প্রদায়ের স্বদেশ-ত্যাগের ইতিকথা। তাঁর 'পুরুষমেধ' ইতিহাস-আশ্রয়ী রূপক উপন্যাস। বৈদিক যুগে রাজা বৃষকেতু রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বরুণদেবের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে এক বছরবয়সী এক শূদ্র-শিশুকে বলি দিয়ে পুরুষমেধ-এর অনুষ্ঠান করলেন। দীর্ঘ দিন ধরে শোষিত-নির্যাতিত শূদ্রদের মধ্যে প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধুমায়িত হয়ে উঠছিলো, এই শিশুহত্যার মধ্য দিয়ে তা প্রতিবাদে-বিদ্রোহে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দূর অতীতের এই কাহিনীর রূপকে সত্যেন সেন এখানে ধরতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনে বন্দী পূর্ববাংলার সংক্ষোভ-সংগ্রাম-দ্রোহ-বিদ্রোহের ইতিহাস। এ-প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি স্মরণীয় :

ধর্মীয় অন্ধতা ও অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন সেই স্মরণাতীত যুগকে বহু পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগিয়ে এসেছি। পুরুষমেধ একটা বর্বর প্রথা, এ কথা আমরা সবাই

বলব। কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে আলোকিত আধুনিক জগতের মানুষ আমরা–আমরা কি সেই বর্বরতা থেকে মুক্ত? বিংশ শতাব্দীর সু-সভ্য যুগে ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে, শ্রেণী-স্বার্থের নামে যে জগৎ-জোড়া ব্যাপক পুরুষমেধ অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে–হিংস্রতা, বীভৎসতা ও অমানুষিকতার দিক দিয়ে তা কি প্রাক্-সভ্যতা যুগের পুরুষমেধকে ছাড়িয়ে যায় না? ...সুদাস আর ইদার সন্তান খেতুর কথা বলতে বলতে আজকের দিনের আমাদের সমাজের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক খেতুদের ভয়ার্ত করুণ মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাদের কথা কেমন করে ভুলে থাকব?[২৯]

সত্যেন সেনের 'কুমারজীব' বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস ; আর 'আলবেরুণী' হচ্ছে মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম জ্ঞানসাধক আলবেরুণীর জীবন ও জ্ঞানসাধনার কথকতা। 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত কৈবর্তদের সংগ্রাম-সাহস আর বিদ্রোহের কাহিনী। তবে ইতিহাস-আশ্রয়ী সাহিত্য যেমন নয় অতীত সত্য-ঘটনার অবিকল অনুস্মৃতি, সেখানে যেমন থাকে ইতিহাসের সঙ্গে কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য ; সত্যেন সেনের এ-সব উপন্যাসেও তেমনি আছে ইতিহাসের অস্থি-মজ্জায় কল্পলোকের সৌরভ।

সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাসদ্বয় কাহিনী-সূত্রে সম্পর্কিত ; দুটি উপন্যাসেরই বিষয়াংশ বাইবেলের 'বুক অব দি প্রোফেট : যেরেমিয়া' খণ্ড থেকে সংগৃহীত।[৩০] রাষ্ট্রনেতা-ধর্ম-নেতা ও সমাজের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্দেহ-বিদ্বেষ, আবার সাধারণ মানুষকে শোষণের সময় এদের মধ্যেই ঐক্যবোধ, ধর্মের নামে পুরোহিতশ্রেণীর অত্যাচার ও ভণ্ডামী, যেরুজালেমের সামাজিক বৈষম্য এবং দাসশ্রেণীর বিদ্রোহ–অতীতের এই বিশাল ক্যানভাসে গড়ে উঠেছে 'অভিশপ্ত নগরী'র কাহিনী। যেরেমিয়ার মানবকল্যাণকামী সংগ্রাম কিভাবে ব্যর্থ হল, আর ধ্বংস হল যেরুজালেম নগরী–তা নিয়েই সত্যেন সেনের এই মহৎ শিল্পকর্ম। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে য়িহুদি জাতির পতনের ইতিহাস। য়িহুদি সমাজপতিদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রক্ষণশীল মনোভাব, মানবিকতার পরিবর্তে শাস্ত্রীয়-বিধানের জয়গান, উগ্র জাতীয়তাবাদী-চেতনা এবং পরজাতি-বিদ্বেষ য়িহুদি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল –দূরতম এই ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'পাপের সন্তান'। সত্যেন সেন-ই বাংলা সাহিত্যেও প্রথম ঔপন্যাসিক–যিনি বাইবেলের কোনো কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন শিল্প-সফল উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় :

সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' এক উচ্চাশী সাহিত্য প্রয়াসের দুটি খণ্ড।... এ ধরনের উচ্চাশী ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় বিশেষ লেখা হয়নি। ঘটনার কাল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতকে, স্থান যিরূশালেম, কাহিনী ওল্ড টেস্টামেনট– প্রাচীন বাইবেলের "যেরেমিয়া" অধ্যায় থেকে গৃহীত। স্বভাবতই

হাউয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ লেখকদের বাইবেলভিত্তিক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। বাংলায় এ-ধরনের উপন্যাস এই প্রথম। সম্পূর্ণ নতুন, স্বাদে বৈচিত্র্যে অভিনব।[৩১]

পদ্মাপারের গ্রামের ছেলে মালেক–ধমনীতে যার ছিল গ্রামীণ জোতদারের রক্ত, অস্তিত্ব জুড়ে ছিল ভয়-ভীতি আর দ্বিধা-সংশয়-কলকাতার ময়দানে মে-দিনের জনসমুদ্র, শ্রমিকশ্রেণীর ইস্পাতদৃঢ় সংগ্রাম আর সাধারণ মানুষের সাহচর্যে এসে হয়ে-ওঠে রাজনীতি-সচেতন সাহসী সূর্যপ্রতিম এক শ্রমিক–এই হচ্ছে সত্যেন সেনের দীর্ঘায়তন উপন্যাস 'উত্তরণ'-এর ঘটনাংশ। স্পষ্টতই এটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সত্যেন সেন তাঁর সব উপন্যাসেই সচেতনভাবে মার্কসীয় রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' ব্যতীত কোনো উপন্যাসেই সত্যেন সেন রূপকল্প-নির্মাণ কিংবা পরিশ্রুত ভাষা ব্যবহারে সচেতন নন– কখনো তাঁর উপন্যাস আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাবে।

যেমন সত্যেন সেন, তেমনি জহির রায়হানও নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে সংগ্রাম আর সচেতনতার আলো প্রজ্বলন এবং স্বদেশকে প্রাগ্রসর করার আন্ত রগরজে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মার্কসীয় জীবনভাবনা আর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম-সাহস-সাফল্যই বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে যখন আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক–কখনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, আবার কখনো-বা জাগতিক মোহের কাছে– ভুলে গেলেন সমাজসত্য আর যুগ-সংক্ষোভ, তখন সমাজ-সতর্ক এবং রাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন দায়িত্ববান নির্ভীক শিল্পী। তাঁর 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০) রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প; তবে কাহিনী-গ্রন্থণে অসতর্কতা ও অসংলগ্নতার জন্যে এটি অন্তরধর্মে দুর্বল রচনা। জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত 'আবর্তন-সঙ্কুল অথচ বিবর্তনহীন' পূর্ববাংলার গ্রামীণ-জীবন। বিষয় ভাবনায় গৌরব-দীপ্র 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে এ-উপন্যাস। সামরিক-শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও, একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত 'আরেক ফাল্গুন' পাঠ করে আমরা হয়ে-উঠি সাহসী মানুষ ; আসাদ-মুনিম-রসুল-সালমার মতোই নির্ভিক-চিত্তে আমরাও বলে উঠি-'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব।' তাঁর 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দচিত্র। প্রতীকধর্মী উপন্যাস 'আর কতদিন'-এ (১৯৭০) অবরুদ্ধ এবং পদদলিত মানবাত্মা সমস্ত ভয়-ভীতি অতিক্রম করে নবজাগ্রত জীবনচেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ-উপন্যাসে জহির রায়হান আঁকতে চেয়েছেন পৃথিবীর অত্যাচারিত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা। পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক শোষণের চিত্র ছাপিয়ে 'আর কতদিন'-এ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ-ফ্যাসিবাদ আর বর্ণবাদের ভয়াল রূপ হয়েছে উন্মোচিত :

ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায় ।
ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায় ।
আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা, আফ্রিকাতে ।
আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলি করে ।
আর আমার ভাই । তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে ।
করেছে । কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতো ।[৩২]

জহির রায়হানের উপন্যাস প্রকরণ-পরিচর্যায় পরিশ্রুত ও পরিমার্জিত নয়, কিন্তু জীবনার্থ এবং সমাজভাবনায় নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর এবং ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ । তাঁর শিল্পীসত্তায় সমাজবাদী-চেতনার সঙ্গে রোম্যান্টিক মানস-প্রবণতা উপ্ত করেছে যে অন্ত র্দ্বন্দ্বের বীজ, তাই তাঁর উপন্যাসকে কখনো করেছে অতি-নাটকীয়, কখনো সংক্ষুব্ধ সমকাল-বিচ্যুত, কখনো চরিত্রচিত্রণে অবিশ্বস্ত, আবার কখনো-বা শিল্প-সুমিতিতে অসংলগ্ন । জহির রায়হানের উপন্যাসের ভাষা আবেগ-প্রবণ, চিত্রাত্মক, চিত্রনাট্যধর্মী এবং কবিতাস্পর্শী । যেমন 'আরেক ফাল্গুন' থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা :

আকাশে মেঘ নেই । তবু, ঝড়ের সঙ্কেত ।
বাতাসে বেগ নেই । তবু, তরঙ্গ সংঘাত ।
কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না । বরকতের
খুন ভুলবো না । যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে । পৃথিবী
কাঁপছে । ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিক–
বিদিক ।

শুধু উত্তর নয় । দক্ষিণ নয় । পূর্ব নয় । পশ্চিম নয় ।
যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে
বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ
স্মৃতি অমর হোক ।[৩৩]

আনোয়ার পাশার প্রথম উপন্যাস 'নীড়-সন্ধানী' (১৯৬৮)আত্ম-জৈবনিক রচনা ।[৩৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে যায় এবং বিপর্যস্ত করে তোলে মানুষের সুস্থ-জীবন– সে-সমাজসত্যকে পটভূমি করে রচিত হয়েছে 'নীড়-সন্ধানী' । সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভুলে গিয়ে মানুষে মানুষে গড়ে উঠুক নতুন মিলন-সেতু এমনি একটি আশাবাদী উচ্চারণ উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিষুতি রাতের গাথা'ও (১৯৬৮) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্ররূপ । এ-উপন্যাসে তিনি পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চিত্রিত করেছেন শ্রেণীচেতনার আলোকে, মানবিক দৃষ্টিকোণে । এই দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা সমকালীন পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের জীবন-বিশ্বাস ও জীবন-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ

করি। স্রষ্টার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস দু'টির সাহিত্যিক-মূল্য হয়তো বেশি নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এগুলো মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম।

এ-পর্বে প্রকাশিত হয় আবু রুশদের তিনটি উপন্যাস–'ডোবা হল দীঘি' (১৯৬৬), 'নোঙর', (১৯৬৮) এবং 'অনিশ্চিত রাগিণী' (১৯৬৯)। আবু রুশদের উপন্যাসসমূহে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মুসলিম-মধ্যবিত্তের সংস্কার-চেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশ-বিভাগোত্তর সময়ের সামাজিক সংকট। তাঁর 'ডোবা হল দীঘি'তে নেই জীবনার্থের গভীরতার কোনো স্বাক্ষর, কিংবা ঘটনা-সংস্থান ও প্রকরণ-পরিচর্যায় প্রত্যাশিত সতর্কতা। 'নোঙর' আবু রুশদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার যে-সব মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার উদ্বাস্তু হল এবং পরে নতুন রাজধানী ঢাকায় স্থায়ী হল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুর্ভোগের কাহিনী 'নোঙর' উপন্যাসে পরিচিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি একটি সংকট-কালের আবহ-চিত্র।'[৩৫]

আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) এবং 'প্রসন্ন পাষাণ' (১৯৬৩) তিরিশ-চল্লিশের যুগে কলকাতাবাসী মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের অন্ত রঙ্গ ছবি। 'উত্তম পুরুষ'-আর নায়ক শাকের সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এক তরুণ; তার অনুভব-অভিজ্ঞতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের ঘটনাংশ। মহাযুদ্ধের পঙ্কস্রোতে হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধের ভাঙন, মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং রোমান্টিক প্রেমের পটে জীবন-অনুধ্যান–এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে 'উত্তম পুরুষ'। উপন্যাসের নায়ক শাকের কলকাতা থেকে ঢাকা আগমনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ফলে উপন্যাসটি হয়ে পড়েছে জীবনের খণ্ডাংশের প্রতিচিত্র–এখানে নেই পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবনচেতনা। এই অসঙ্গতি আর অপরিণতি উপন্যাসের শিল্প-সিদ্ধিকে করেছে খণ্ডিত। রশীদ করিমের 'প্রসন্ন পাষাণ'-এ চিত্রিত হয়েছে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত-নারীর জীবনচিত্র। নায়িকা তিশ্‌নার জীবন-অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সংকট, জটিল মনস্তত্ত্ব এবং প্রেম-আকাঙ্ক্ষা উন্মোচনে রশীদ করীম যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক- নিরাশক্তির অভাব এবং কাহিনী-গ্রন্থণে অসতর্কতা, চরিত্র-চিত্রণে সাফল্য সত্ত্বেও, 'উত্তম পুরুষ' এবং 'প্রসন্ন পাষাণ'-এর শিল্পমূল্য করেছে ক্ষুণ্ন।

গ্রামীণ-পরিবেশে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যা-কুমারী'তে (১৯৬০) শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে শহুরে কৃত্রিম জীবনধারা। অতি-নাটকীয়তা আর ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ 'কন্যাকুমারী'তে একই সাথে আছে সামন্ত-অবশেষের শেষ-নিঃশ্বাস, আবার উঠতি বুর্জোয়া-সমাজের জৌলুষ এবং শহুরে চাকচিক্য। 'কন্যা-কুমারী'র কাহিনী সংহত নয়, এবং এটি আদি-অন্ত আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক-সংযম ও পরিমিতিবোধের অভাবে। চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য অনস্বীকার্য, এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন চরিত্রের সেন্টিমেন্টের ওপর। বস্তুত, 'কন্যা-কুমারী' একাধারে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্টের আধার।[৩৬]

সময়ের এ-পর্বে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর রূপ কল্প-নির্মাণ। ইবনে রশীদের 'ফাল্গুন করা' (১৯৫৮), মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' (১৯৬৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন' (১৯৬২), চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়' (১৯৬২), খালেক দাদ চৌধুরীর 'রক্তাক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬), এবং পূর্বে আলোচিত সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫), সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯), 'কুমারজীব' (১৯৬৯), প্রভৃতি এ-ধারার অন্যতম উপন্যাস। মোঘল আমলের শেষপাদে অন্যায়-অত্যাচার, অরাজকতা-অবিচার আর মগ-হার্মাদ-বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের শ্যামল প্রান্তরে, এসব অত্যাচার রোধকল্পে, একদা অমিতপৌরুষ আর বিক্রম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক চরিত্র শমসের গাজী। এই শমসের গাজীর জীবনের বিচিত্র-ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ'। দক্ষিণ বাংলার মগদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন উদ্ভাসিত হয়েছে বদরুদ্দীন আহমেদের 'অরণ্য মিথুন' উপন্যাসে। তবে এখানে ইতিহাসের সঙ্গে মূল আখ্যান অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারেনি।[৩৭]

ফকির মজনু শাহের জীবন ও কীর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্ত ানগড়'। আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচিত হয়েছে দেড় শতাব্দী পূর্বের ওয়াহাবি আন্দোলনের পটভূমিকায়। ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা চুরুলিয়ার গুলাম নবী এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওয়াহাবি আন্দোলনকে একাত্ম করে দিয়েছেন লেখক, এবং এ-ক্ষেত্রে তার সাফল্য বিস্ময়কর। শিল্প-সার্থকতার বিচারে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলো যে-মূল্যই বহন করুক না কেন, পূর্ববাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ধারায় এগুলো নিঃসন্দেহে সংযোজন করেছে নতুন এক মাত্রা।

এ-পর্বে গ্রাম কিংবা বিশেষ কোনো অঞ্চলের জীবন-চিত্র নিয়ে রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের তালিকাটি এ-রকম : তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৯৫৯) বদরুন্নিসা আবদুল্লাহর 'কাজল দীঘির উপকথা' (১৯৬২), আলাউদ্দিন খানের 'অববাহিকার উপকথা' (১৯৬৪), এবং জসীমউদ্‌দীনের 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪)। মিজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী' (১৯৬৫), নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে' (১৯৫৯), দিলারা হাসেমের 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫), হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫), শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৫), নূরুল ইসলাম খানের 'রাজধানীর ইতিকথা' (১৯৬৪), আহসান হাবিবের 'অরণ্য নীলিমা' (১৯৬১)–প্রভৃতি উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ পূর্ববাংলার অবিকশিত নগর-জীবনের বহুভুজ-জটিলতা এবং বিচিত্র জীবনচেতনা উন্মোচিত হয়েছে।

আলোচ্য পর্বে রচিত উপন্যাসসমূহ গ্রামজীবন অতিক্রম করে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠেছে। তুলনা-সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ঔপন্যাসিকরা গ্রামীণ-

জীবনচিত্রণে যতটা স্বচ্ছন্দ এবং বস্তুনিষ্ঠ, নগর-জীবনচিত্রণে ততটা নন।[৩৮] তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রভাবে এ-পর্বে নবীন উপন্যাসিকদের রচনায় এসেছে আধুনিক নাগরিক চেতনা, লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলন এবং যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী অবক্ষয়ী মূল্যবোধ। কিন্তু একই সাথে একথা এখানে স্মরণীয় যে তিরিশের শ্রম আর সিদ্ধিকে এঁদের কেউই সাহিত্যে-ক্ষেত্রে যথার্থভাবে অঙ্গীকার করতে পারেন নি। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটও এ-সময়ের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় এ-পর্বের ঔপন্যাসিকরা অনেক বেশি আঙ্গিক-সচেতন; বিষয়াংশ-নির্বাচন, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-পরিচর্যায় অধিকাংশ ঔপন্যাসিক পরীক্ষাপ্রবণ ও বৈচিত্র্যসন্ধানী। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের এই উত্তরাধিকারের ওপরই নির্মিত হয়েছে বিদেশি শত্রুমুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্য।

চার

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে চেতনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে গুণগত বিকাশ। স্বাধীনতার সোনালি প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে, উপন্যাসে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী; দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর উত্তরণের কথাচিত্র নির্মাণে তাঁরা মোটেই উৎসাহী নন। এ-কারণেই নঞর্থক জীবনভাবনায় বিশ্বাসী কতিপয় ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণ করতে গিয়েও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে কেবল চিত্রিত করেন পাকিস্তানি ঘাতক সৈন্য-কর্তৃক নারী-ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ। তবে এ-পর্বের উপন্যাসে আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর-সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি, কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞা মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাস-সাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক।

স্বাধীনতা-যুদ্ধে নিহত আনোয়ার পাশা সংগ্রাম-সঙ্কুল সময়ে রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' (১৯৭৩)। এখানে আছে ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক উপাদান এবং এর নায়ক সুদীপ্ত শাহিন আনোয়ার পাশারই প্রতিচ্ছবি যেন। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় এবং শ্রেণীচরিত্র অতিক্রম করে সুদীপ্ত শাহিন সামিল হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তিমস্রোতে। আত্ম-সমীক্ষা থেকে বিপ্লবীচেতনায় নায়কের এই উত্তরণ বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। একাত্তরের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক-বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড আর

বহ্ন্যুৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা এ উপন্যাস একদিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, অপরদিকে আবেগসিক্ত সার্থক সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন কাহিনীর সমাপ্তিতে হয়ে-ওঠে নির্ভীক সাহসী মানুষ; চরম বিপর্যয় আর রক্তস্রোতের মধ্যে অবস্থান করেও শেষ পর্যন্ত তার কণ্ঠ থেকে ভেসে-ওঠে এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী :

পুরনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা, তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতোদূরে? বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।[৩৯]

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে শওকত ওসমান লিখেছেন চারটি উপন্যাস-'জাহান্নম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩), এবং 'জলাঙ্গী' (১৯৭৬)। 'দুঃখিনী জননী বাংলাদেশ ও তার বীর সন্তান মুক্তিফৌজদের জন্য' উৎসর্গিত 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা, মানুষের অসহায়তা এবং বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রৌঢ় শিক্ষক গাজী রহমান শওকত ওসমানেরই বিবেক যেন। তাঁর 'নেকড়ে অরণ্য' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়-ভিত্তিক কোনো ঘটনা নয়; এবং এখানে নেই কোনো মুক্তিযোদ্ধার অসীম বীরত্বের কথা কিংবা বিজয়ের উল্লাস–বরং আছে, সমস্ত উপন্যাস জুড়েই আছে, নারী-ধর্ষণের স্থূল বিবরণ। যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের রিরংসাবৃত্তির শিকার কতিপয় বন্দিনী নারীর জীবন-যন্ত্রণার আলেখ্য এ-উপন্যাস। তবে স্রষ্টার সুগভীর জীবনবোধের অভাবে 'নেকড়ে অরণ্য' শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের নারী-ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণে; তাঁর অভিজ্ঞতাহীনতার কারণেই এখানে ফুটে-ওঠেনি বন্দিনী নারীদের জীবনবেদনার গভীরতা। হাজী মখদুম মৃধা নামক জনৈক রাজাকারের দালালি এবং শেষ পর্যন্ত তার বিপর্যয় নিয়ে গড়ে-উঠেছে শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক'। যেমন সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) নামক কাব্য-নাট্যে, তেমনি শওকত ওসমানের এ-উপন্যাসেও আমরা সীমিত মনোযোগেই লক্ষ করি, স্রষ্টার সর্বজ্ঞ-সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে পাক-বাহিনীর দালাল রাজাকার-আলবদরদের ওপর। 'জলাঙ্গী' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে এক ভীরু মুক্তিযোদ্ধার ছবি, যার কাছে যুদ্ধের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রেম এবং অবশেষে নিহত হয়েছে রাজাকারের হাতে। শওকত ওসমানের কোনো উপন্যাসেই একাত্তরে বাঙালির রক্তিম উজ্জীবনের ইতিহাস নেই, শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা বারুদের গন্ধ নিয়ে কোনো মুক্তিযোদ্ধা তাঁর উপন্যাসের নায়ক হতে পারেনি; মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তিনি এঁকেছেন কিছু খণ্ডচিত্র মাত্র।

শওকত আলীর 'যাত্রা' (১৯৭৬) উপন্যাসে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পাশবিক আক্রমণে ভীত ঢাকা শহরের বিচিত্র-শ্রেণীর মানুষ গ্রামের পথে যাত্রা করেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। প্রথম অবস্থার ভয়-ভীতি-দ্বিধা-সংশয় কাটিয়ে মৃত্তিকা-সংলগ্ন সংগ্রামশীল গ্রামীণ মানুষ অচিরেই হয়ে-ওঠে এক

একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাদের মধ্যে জেগে-ওঠে প্রতিরোধের দুর্নিবার সাহস। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে অগ্নিকুণ্ডে থেকেও এ-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছে; অধ্যাপক হাসানের সংলাপে ধরা পড়েছে এই আশাবাদ :

আশাবাদী না হয়ে যে আমাদের গত্যন্তর নেই।... আমাদের কাছে এখন দুটি মাত্র পথ হয় মৃত্যু নয়তো লড়াই। যেহেতু একটা জাতি মরে যেতে পারে না– সেহেতু তাকে লড়াই করতেই হবে। আর জয়ের আশা না থাকলে কেউ লড়াই করতে পারে না। যেহেতু আমরা মরে যেতে পারি না সেহেতু আমাদের জয়ী হতেই হবে। এখন আমাদের জীবনের আরেক নাম হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা।[৪০]

সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' (১৯৮১) ও 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১) নামক উপন্যাসোপম রচনা দুটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ নয়, বরং একটি খণ্ডিত পরিচ্ছেদের শব্দরূপ। 'নিষিদ্ধ লোবান'-এ লেখক সংগ্রাম আর বিজয়ের চিত্র নয় বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের রিরংসাবৃত্তির উল্লাস অঙ্কনেই অধিক উৎসাহী। যুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'তে[৪১] স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এসেছে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের কথা, এবং এটি অনেকটা পরিণত সৃষ্টি। উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহের এ-সত্যে আত্মস্থ হয় যে, মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যায়নি, কারণ সমাজে এখনো আছে অশুভ শক্তির পাঁয়তারা। তাই তাহেরের আত্মোপলব্ধিতে জ্বলে-উঠে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা :

সে জানে, মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্ত মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ তো সম্ভব? ঘটনা যখন অরণ্যের রীতিতে ঘটে তখন সেই একই রীতিতে তার উপসংহারও টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামের এ-এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক লহমায় অশুভ শক্তি-সমূহ অন্তর্হিত হয়নি; এখনো অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে।[৪২]

এ-উপন্যাসের ভাষারীতি প্রায়শই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়ক তাহেরের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসু মানসতা উন্মোচনে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এক্সপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যা।

যেমন :

এতক্ষণ পর যেন নিমজ্জমান চেতনা একটা অবলম্বন খুঁজে পায়; তাহের অবিলম্বে সেটা আঁকড়ে ধরে, অচিরে তার কপাল স্থাপিত হয় টেবিলে এবং টেবিল একটা ভাসমান নৌকার মতো সহসা দুলে উঠে দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় অত্যন্ত সাবলীল গতিতে।[৪৩]

গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭-) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) উপন্যাসে উঠে এসেছে একাত্তরের গ্রামীণ জীবনের আলোড়ন-

সংক্ষোভ-স্বপ্ন। উপন্যাসের নায়িকা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে, এবং এভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রক্তিম-স্রোতে। হলদী গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় বেড়ে-ওঠা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোতে অবগাহন করে হয়ে-ওঠে সূর্য-প্রতিম। বুড়ির অপর নাম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—ও যেন হাজার লক্ষ সন্তানহারা গর্বিতা মাতৃভূমির শাশ্বত শিল্প-প্রতিমা। এক রইসের মা থেকে বুড়ির উজ্জ্বল উত্তরণ ঘটে, ও হয়ে-যায় লক্ষ রইসের সার্বজনীন মা :

নিঃসীম বুকের প্রান্তরে হু হু বাতাস বয়ে যায়। বুড়ি হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারে না। ছুটে বেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো দু'টো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দু'টো উপেক্ষা করতে পারে না। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমূলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রইসের একলার মা নয়।[৪৪]

যুদ্ধকালীন সময়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সংকট, আশা-নিরাশার সংশয় এবং চেতনাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব শব্দরূপ পেয়েছে রশীদ হায়দারের (১৯৪১-) 'খাঁচায়' (১৯৭৫) উপন্যাসে। এ-উপন্যাসে খাঁচায় বন্দী একটি টিয়েপাখির মুক্ত হওয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রতিভাসিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশের মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা। আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে অভিনব 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮২) উপন্যাসে রশীদ হায়দার মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামীণ মানুষের আত্মিক জাগরণ যেমনি তুলে ধরেছেন, তেমনি উপস্থিত করেছেন পাকিস্তানের দালালদের হীন ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের কাহিনী। টুয়েন্টি নাইন খেলতে খেলতেই গ্রামের একদল যুবক মিলিটারি আসার সংযোগ-সেতু উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে, কিন্তু তাদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়; ধরা পরে পরিকল্পনার অন্যতম সাথী বেলাল হোসেন। এই বেলাল হোসেনকে যখন বন্দী অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে, সে-সময়কার তার বিচিত্র অনুভূতি আর স্মৃতি নিয়ে গড়ে-উঠেছে এ-উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ দিনের কাহিনী হলেও, ফ্ল্যাস-ব্যাকে এ-উপন্যাসে উঠে-এসেছে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষের যাপিত-জীবন, ধরা পড়েছে সামন্ত-শাসক ও ক্ষমতাবানদের শোষণের চিত্র। 'নষ্ট জোছনায়' এবং 'এ কোন অরণ্য' শীর্ষক দুটো উপন্যাসোপম রচনার যুগলবন্দী-রূপ রশীদ হায়দারের 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য' (১৯৮২)। তাঁর 'নষ্ট জোছনায়' চিত্রিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর-কালের সর্বব্যপী হতাশা, সমাজের নানা ভাঙচুর ও বিপর্যয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চৈতন্যের পরাভব ও বিপথগামিতা। যে যুদ্ধের শুরুতে 'শূন্যে বজ্রমুষ্ঠি তুলে বলত,.... এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমাদের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে,.... যে-শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে তাতে আর কোনো দিন হানাহানি হবে না'[৪৫] – যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, তাদের শরীর থেকে বারুদের গন্ধ মুছে যেতে-না-যেতেই, কেন তারা

বিপথগামী হল এই অনিবার্য রক্তাক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। তবে উপন্যাসের সমাপ্তিতে, রুবীর দৃষ্টিকোণে, ঔপন্যাসিক মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন এবং এখানেই এ-উপন্যাসের বিশিষ্টতা।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও মাহমুদুল হকের (১৯৪০-) 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬) উপন্যাস লিবিডো-তাড়িত ও নিষ্ক্রিয় রোম্যান্টিকতা-আক্রান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণারই শব্দরূপ। এখানে নেই সাহসে জ্বলে-ওঠা কোনো মুক্তিযোদ্ধার কথা, কোনো প্রতিরোধের কাহিনী। বাঙালির রক্তিম উজ্জীবনের সময়ও যেহেতু মাহমুদুল হকের নায়ক খোকার 'পলায়ন ছাড়া কোনো ভূমিকা নেই, তাই তার বিকৃত মানসিকতায় অর্ধেন্দু দস্তিদার-প্রীতিলতা-আনোয়ারা-মতিয়ুরের বাংলাদেশ হয়ে-যায় ' একটা বাংলা মদের বোতল ', 'সস্তা মদের দোকান', 'ছমছমে ঘুটঘুটে বেশ্যালয়', 'লক্ষ বছরের বেতো ডাইনী মাসি' ইত্যাদি ইত্যাদি।[৪৬] তাঁর 'অশরীরী', এবং 'মাটির জাহাজে'ও আছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ; কিন্তু কোনো উপন্যাসেই মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধের সদর্থক-চেতনা প্রকাশে প্রয়াসী নন।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এই বিস্তৃত পটভূমিতে বিন্যস্ত 'আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩) উপন্যাসে রশীদ করিম বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ-উন্মোচনে মোটেই আগ্রহী নন; তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ ধারণ করেও 'আমার যত গ্লানি' পরিণত হয় উত্তম-পুরুষের জবানীতে স্রষ্টার আত্মধিক্কার এবং ব্যক্তি-জীবনের গ্লানিময় আলেখ্য। রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-) 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪) উপন্যাসের কাহিনী গৃহীত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন নাগরিক জীবন থেকে ; এবং এখানে আছে যুদ্ধের কথা, প্রতিরোধের কথা, পশু-শক্তির বর্বরতার কথা। তবে ভাষারীতি এবং আঙ্গিকগত দুর্বলতার কারণে এটি হতে পারেনি উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্পকর্ম। আমজাদ হোসেনের (১৯৪২-) 'অবেলায় অসময়' (১৯৭৫) উপন্যাসে পাক-বাহিনীর আক্রমণে ভীত কতিপয় নর-নারী এক মাঝির নৌকায় ভেসে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এবং এ-পথেই তারা দেখেছে গ্রাম বাংলার বীভৎস ধ্বংস-চিত্র, অনুভব করেছে গণমানুষের চৈতন্যের জাগরণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালি সরকারি কর্মচারীদের বন্দী-মানসের শব্দরূপ মিরজা আবদুল হাই-এর 'ফিরে চলো' (১৯৮১) উপন্যাস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়ভিত্তিক না-হলেও, এ-উপন্যাসে ধরা পড়েছে প্রবাসী বাঙালির দুর্নিবার স্বদেশপ্রীতির কথা। এই দেশপ্রেমের জন্যেই, আইনের নিগড় আর প্রতিকূল পরিবেশের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে, হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা সত্ত্বেও, বন্দী-বাঙালি সাহসী হয়ে উঠেছে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে স্বদেশযাত্রায়।

বাংলাদেশ এবং যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম' (১৯৮২) উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, বিজয়ের উল্লাস আর ত্যাগের মহিমা যেমন ছড়িয়ে আছে এ-উপন্যাসে; তেমনি আছে হাসান-

ইয়াসমিনকার রোম্যান্টিক প্রেমের প্রতীকে শাশ্বত বিশ্বজনীনতা। উপন্যাসের নায়ক, যার বুকের পাঁজরে লুকিয়ে আছে পাক-বাহিনীর বুলেট, হাসানের আবেগসিক্ত সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে একাত্তরে বাঙালি জাতিসত্তার রক্তিম উজ্জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল চেতনা :

একাত্তরের মৃত অথবা জীবিত স্বাধীনতাসংগ্রামী আবুল হাসানরাই বাংলাদেশ। এ সত্যের মৃত্যু মানেই-তো বাঙালির ইতিহাস থেকে একাত্তর সালটা নেই। নেই, পল্টন ময়দান, ঘেরাও আন্দোলন, নেই রেসকোর্স উদ্যানের স্বাধীনতা-পাগল জনতা, নেই ২৫শে মার্চের কালো রাত, নেই তেইশ বছরের পাকিস্তানী দুঃশাসন-বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নেই সাভার-এর জাতীয় শহীদ মিনার, মীরপুরের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। বায়ান্ন থেকে সত্তরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসই বাংলাদেশ।[৪৭] উল্লিখিত উপন্যাসসমূহে ছড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ, তবে এর কোনোটিই মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মিলিত বাঙালির চৈতন্যের জাগরণকে যথাযথভাবে অঙ্গীভূত করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ধারণা অভিজ্ঞতা-পরিস্রুত নয়, বরং স্মৃতি আর শ্রুতি-নির্ভর। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তাঁদের উপন্যাসসমূহেও নেই প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ ; অধিকাংশ উপন্যাসই স্মৃতিচারণমূলক, কল্পনানির্ভর কিংবা আবেগ-উচ্ছ্বাসের মনোময় কথকতা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা আর বিপর্যয় থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে পথ-নির্দেশ নয়, বরং সর্বব্যাপী হতাশা আর 'নিখিল নাস্তি'র গর্ভে বিলীন হতে চাইলেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা এবং এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ-অবিনাশী চেতনা খণ্ডিত ও বিপথগামী হল। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পস্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত করতে দেয়নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরাও। এ-কারণেই একটি স্বাধীন জাতির সুদূরস্পর্শী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শিল্পে-সাহিত্যে যথার্থভাবে হল না রূপায়িত। চতুর্থত, এবং সম্ভবত এটিই প্রধান কারণ, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা, এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগ-উচ্ছ্বাস তাড়িত, সেখানে স্বভাবতই ফুটে উঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। সময় পেরিয়ে তখন আসবে নতুন প্রজন্মের ঔপন্যাসিক, হয়তো তার হাতেই লেখা হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা কালোত্তীর্ণ একটি উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৪-১৮১৫) অনেক পরেই রচিত হয়েছে লেভ টলস্টয়ের কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ার এন্ড পীস' (রচনাকাল : ১৮৬৫-৬৮)। গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে রচিত, বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত উজ্জীবনের মর্মমূল-উৎসারিত, কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাসটি এখনও অনাগত কালের প্রত্যাশা মাত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটা কমেছে, তুলনামূলকভাবে বেড়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এ-পর্বে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন, উৎসাহী হলেন; যন্ত্রণা-

দগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট-জীবনের শিল্পমূর্তি সৃজনে। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন হতাশার অন্তঃসারশূন্য অতল গহ্বরে ; এবং সবাই মিলে লিখলেন একটি উপন্যাস, যার মৌল বিষয় নাস্তি–'নিখিল নাস্তি'।

'প্রেম একটি লাল গোলাপ',(১৯৭৮), 'একালের রূপকথা' (১৯৮০) এবং 'সাধারণ লোকের কাহিনী' (১৯৮১) উপন্যাসত্রয়ে রশীদ করীম মূলত যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা ও বিপর্যয়ের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন ; সমাজ-সংলগ্ন ব্যক্তিজীবনের সুস্থ, সুন্দর এবং অখণ্ডরূপ তাঁর কোনো উপন্যাসেই প্রতিবিম্বিত হয়নি। তাঁর 'প্রেম একটি লাল গোলাপ' উপন্যাস নাগরিক উচ্চবিত্ত জীবনের জটিলতা ও অবক্ষয়ের চিত্র; আর 'সাধারণ লোকের কাহিনী' হচ্ছে নাগরিক মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের পাঁচালি। রশীদ করীমের উপন্যাসের ভাষা ও চরিত্রের কথা বলার ভঙ্গি সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী, এবং তাঁর উপন্যাস সাংগঠনিক দিক দিয়েও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৩) উপন্যাস যৌনতার বিকার, মনোবিকলন এবং অস্বাভাবিক মানসিক-জটিলতার শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক বাবর নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লিবিডো-তাড়িত হয়ে ; সে যৌনবিকারগ্রস্ত এবং পাতি-বুর্জোয়া জীবনদর্শনে আত্মস্থ। বাংলাদেশের এক মফস্বল শহরের বিচিত্র মানুষ, তাদের কুসংস্কার, অস্তিত্বের সংকট, ভবিষ্যৎ স্বপ্নময়তা আর দ্বিধা-সংশয় নিয়ে গড়ে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'দূরত্ব' (১৯৮১) উপন্যাস। আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বহুভুজ জটিলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকার উপস্থাপনে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। আঙ্গিক-নির্মিতি, ভাষা ব্যবহার এবং প্রকরণপ্রসাধনে পরীক্ষা-প্রিয় সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস পাঠক-নন্দিত, সুখপাঠ্য এবং সুখদ।

সুদূর বেলুচিস্তান থেকে আসা, সম্রাট আকবরের এক সৈনাপত্য মুরাদ খানের বংশধরদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার আধারে, ১৫৭৪ থেকে ১৯৪৭ সাল এই প্রায় চারশত বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রতিচিত্রিত হয়েছে রাজিয়া খানের 'প্রতিচিত্র' (১৯৭৬) উপন্যাসে। তবে আরম্ভ এবং পরিণতিতে অসংলগ্নতা উপন্যাসটির সাংগঠনিক ভিতকে করেছে দুর্বল। ষাটের দশকে বাংলদেশে যে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব এবং সত্তরের দশকে যাদের পূর্ণ বিকাশ, তাদের নৈতিক অধঃপতন, বিচ্যুতি, মূল্যবোধের অসঙ্গতি এবং একই সাথে মননশীলতা, রুচিবোধ ও আভিজাত্য অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে রাজিয়া খানের 'হে মহাজীবন' (১৯৮৩) উপন্যাসে। সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ উপস্থাপনে এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-বিশ্লেষণে রাজিয়া খানের উপন্যাস বাংলাদেশের কথা-সাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের 'শ্রীমতি ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি' (১৯৭৩) স্বাধীনতা-উত্তর কালের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং উপন্যাসের নায়ক শ্রীমান তালেব আলির বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে। জয়েনউদদীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঔপনিবেশিক

শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাস আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের এক শিল্পিত দলিল। ব্যক্তিক সংকট এবং বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং এখানে উঠে এসেছে কল্লোলিত চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাঙালির চৈতন্যের উত্তরণের কথা, উজ্জীবনের কথা।

'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচয়িতা আবু জাফর এ-পর্বে রচনা করেন মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪)। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত এ উপন্যাসে, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর আধারে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য-পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস। তবে যে-কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণে এ জাতীয় উপন্যাসে খণ্ড-খণ্ড চিত্র পূর্ণায়ত জীবন-বৃত্তে হয়ে-ওঠে অখণ্ড তা 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'য় দুর্লক্ষ। তাঁর 'প্রপঞ্চ' (১৯৮০) আমাদের দেশের পেশাজীবী রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামীর স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ থাকলেও, আবু জাফর শামসুদ্দীনের কোনো উপন্যাসেই নেই প্রকরণ-পরিচর্যা ও আঙ্গিক-নির্মিতিতে প্রত্যাশিত প্রযত্নের ছাপ।

এ-পর্বে প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩) প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। পঙ্গপালের আক্রমণে বিপর্যস্ত অখ্যাত গৌরগ্রাম এখানে স্বদেশের রূপক। পঙ্গপালের হাত থেকে মুক্তির জন্যে, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন গৌরগ্রামের মানুষ অবশেষে সফল হয় 'পঙ্গপাল নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানে'–তারা এগিয়ে আসে মশাল হাতে, যেন দীপালি-উৎসব চারদিকে। পঙ্গপাল ধ্বংসের রূপক-চিত্রে শওকত ওসমান জাতিক-আন্তর্জাতিক সামাজিক-পঙ্গপালদের অনিবার্য ধ্বংসের কথাই উচ্চারণ করেছেন এ-উপন্যাসে। বিষয়-গৌরবে বিশিষ্ট আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় নিপীড়িত বাঙালির জীবনাবেগের প্রেক্ষাপটে রচিত এ-উপন্যাসের শব্দস্রোত প্রতীকী-ব্যঞ্জনায় বোবা-নায়িকা যেন হয়ে-ওঠে কণ্ঠরুদ্ধ শৃঙ্খলিত বাংলাদেশ।

দিলারা হাশেমের 'স্তব্ধতার কানে কানে' (১৯৭৭) উপন্যাসে কলকাতার বিরাশি নম্বর এ্যান্থনি বাগান লেনের এক পঙ্গু মেয়ে, নাম যার হুমায়রা, একে একে বলছে তার জীবনযন্ত্রণার কথা, তার গোপন অক্ষম প্রেমের কথা। প্রেমের সঙ্গে পঙ্গুত্বের দ্বৈরথে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হুমায়রার অতলান্তিক বেদনা উন্মোচনে এ-উপন্যাসে লেখক অর্জন করেছেন অসামান্য সাফল্য। মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ে, যে প্রত্যাশার সঙ্গে মেলাতে পারেনি প্রাপ্তির, স্বপ্নের সাথে সূর্যালোকের–সেই মেয়ে সায়েরা – তার নৈঃসঙ্গ্য আর বেদনার কথা নিয়ে দিলারা হাশেমের গীতল উপাখ্যান 'আমলকীর মৌ' (১৯৭৮)। রোম্যান্টিক প্রেমের আধারে 'স্তব্ধতার কানে কানে' উপন্যাসে আছে চলমান কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলিম-জীবন ; আর 'আমলকীর মৌ'-এ আছে, পার্শ্ব চরিত্রের জীবনচিত্রণ-সূত্রে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-অনুষঙ্গ।

শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে, লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে সামন্ত-মহাসামন্তদের

অত্যাচার-অবিচার, অন্ত্যজ-প্রাকৃত-জনের প্রতিরোধ আর তুর্কিদের বঙ্গ-বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজে-সংস্কৃতিতে উঠেছিল যে ঊর্মিল আলোড়ন–সেই দূরায়ত ধূসর ইতিহাসের শিল্পিত-ভাষ্য এ-উপন্যাস। আজকের মতো, ইতিহাসের সেই প্রদোষকালেও, প্রাকৃতজনেরা, প্রতিনিয়ত শোষিত হয়েছে, তবু কখনো কখনো তাদের মধ্যে জেগেছে প্রতিরোধ চেতনা ; সামন্তশাসক আর বর্হিশত্রুর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠেছে অন্ত্যজেরা, বৌদ্ধেরা– নতজানু দাসত্ব থেকে তারা চেয়েছে মুক্তি। উপন্যাসের নায়ক শ্যামাঙ্গ, যে একজন মৃৎশিল্পী, সামন্ত-মহাসামন্তের অভিরুচির কাছে নিজের শিল্পদৃষ্টির পরাভব মানতে পারেনি, এ-জন্যেই তাকে ছেড়ে দিতে হল শিল্পের সাধনা ; তবু কালের সীমানা পেরিয়ে তার উত্তরাধিকার বেঁচে থাকে অনাগত সময়ের স্রোতে :

যদি কোনো পল্লী বালিকার হাতে কখনো মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কিনা–আমাদের বিশ্বাস, কোনো-না-কোনো পুত্তলিতে অবশ্য পাওয়া যাবে–আর যদি পাওয়া যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎশিল্পই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বের শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগা মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও।[৪৮]

সেই তিনি যার নাম এ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪– খ্রি. পূ. ৩২২), প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেমন বলেছেন–ইতিহাস হচ্ছে সত্য ঘটনার বিবরণ, আর ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কালের ওপর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য,[৪৯] তেমনি শওকত আলীর এ-উপন্যাসেও আছে ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে কল্পলোকের তনু-মন। তবে এই কল্পনায় নেই মনগড়া ইতিহাস, বরং আছে ইতিহাসের মনোময় বিন্যাস।

এই উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান পরিণত হয়েছে শিল্পে এবং এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য অনতিক্রান্ত। সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 'গবেষণার সঙ্গে এই বইতে যুক্ত হয়েছে দরদ, তথ্যের সঙ্গে মিলেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অনুপম ভাষা।'[৫০]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে রিজিয়া রহমান (১৯৩৯-) তাঁদের অন্যতম। বিষয় বৈচিত্র্যে এবং শৈল্পিক-উৎকর্ষে তাঁর উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের তালিকাটি এ-রকম : 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' (১৯৭৪), 'উত্তর পুরুষ' (১৯৭৭), 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), 'অরণ্যের কাছে' (১৯৭৯), 'শিলায় শিলায় আগুন' (১৯৮০), 'অলিখিত উপাখ্যান' (১৯৮০), 'ধবল জ্যোৎস্না' (১৯৮১), 'সূর্য সবুজ রক্ত' (১৯৮১) এবং 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪)। তাঁর 'ঘর ভাঙ্গা ঘর' বস্তি-জীবনের ক্লেদাক্ত যন্ত্রণার শব্দরূপ; আর 'রক্তের অক্ষর' হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাত্যহিকতার ভাষাচিত্র। চট্টগ্রামে হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচার এবং পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিনতা নিয়ে গড়ে-উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'উত্তর পুরুষ'। বাংলাদেশে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার এবং প্রতিষ্ঠাচিত্রণ-সূত্রে এ-উপন্যাসে ফুটে

উঠেছে আরাকান-রাজ সন্দ-সুধর্মার অত্যাচারের কাহিনী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বীরত্বের কথা, পর্তুগিজদের গোয়া-হুগলি-চট্টগ্রাম দখলের ইতিহাস। এ-উপন্যাসের ব্যতিক্রমী চরিত্র বনি, যে পর্তুগিজ নাগরিক হয়েও, বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, ভালোবেসেছে এদেশের শ্যামল প্রকৃতি আর শ্যামল মানুষেকে এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে পর্তুগিজ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসে রিজিয়া রহমান বাঙালির ইতিহাস-সন্ধানী এবং একই সঙ্গে সমকালস্পর্শী। শ্রম-অধ্যবসায়-ইতিহাসজ্ঞান এবং শিল্প-চেতনার আন্ত রমিলনে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। এখানে ইতিহাসকে তিনি স্বচ্ছন্দ-প্রয়াসে পরিণত করেছেন শিল্পে এবং শিল্পের দাবিতেই, সঙ্গতকারণে, ইতিহাসের ধূসরতায় মিশেছে কল্পনার সৌরভ। রিজিয়া রহমান এ-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন শতাব্দী পরম্পরায় প্রবহমান এই ব-দ্বীপের অবহেলিত-উপেক্ষিত-অধিকারহীন মানুষের যাপিত-জীবন; আর সে-সূত্রেই এ-উপন্যাসে উঠে এসেছে বাঙালি জাতিগঠনের অতীত ইতিহাস। এ-প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য:

বাংলাদেশের জাতিগঠন ও ভাষার বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসের সৃষ্টি।... আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশশ' একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যাপ্তির মধ্যে এ-উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে।... বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশি ক্ষমতালিপ্সু এবং সম্পদলোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই অবহেলিত উপেক্ষিত এবং উৎপীড়িত। জাতি হিসেবে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক মর্যাদা তারা কোনোদিন পায়নি। 'বং থেকে বাংলা' যেমন একদিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটিই প্রকাশ করেছে, তেমনি কী করে দুদীর্ঘ দিনে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্রণের চেষ্টা করেছে।[৫১]

ভারত উপমহাদেশের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত বেলুচিস্তানের স্বাধীনচেতা মানুষ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজিক-অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার, তাদের দেশ-প্রেম আর স্বাজাত্যবোধের গর্ব-গৌরব আর সাহসের অনুপম শিল্পরূপ রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'শিলায় শিলায় আগুন'। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ ও কালাতের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ-উপন্যাস। তবে লেখকের সচেতন শিল্পদৃষ্টির স্পর্শে, এক বেলুচিস্তানের কাহিনীর আধারে, এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শোষিত মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা।

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাত্যহিকতার ভাষাচিত্র; আর 'ধবল জ্যোৎস্না' হচ্ছে তরঙ্গ-উত্তাল সুনীল বঙ্গোপসাগরের হাঙর-শিকারী জেলে, রবার বাগানের শ্রমিক আর পাহাড়ি ঝরনায় পা ডুবিয়ে অন্য-জীবন প্রার্থনা করা এক মেয়ে–এদের আধারে, সাগরতীরের মানুষের ধবল বেদনা আর রূপালি স্বপ্নের শিল্পরূপ। বিন্দিয়া-লছমী-শিউরাম-অর্জুন-হরমতী-চন্দনী-রাজিন্দর-হরিয়া আর

চামেলী–এই সব চা-পাতা সংগ্রহকারীর প্রতিদিনের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'সূর্য সবুজ রক্ত'। উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'চামেলীর হাতের রক্ত ঝরে বাংলাদেশে, ভারতে, শ্রীলঙ্কায়'–এমন একটি মাত্র বাক্য জুড়েই রিজিয়া রহমান প্রকাশ করে দেন তাঁর আন্তর্দেশিক চেতনা।

বিষয়-ভাবনায় বিশিষ্ট রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'অলিখিত উপাখ্যান'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণে ক্লিষ্ট অত্যাচারিত বাঙালির আর্তনাদ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৪-১৮৯৪) আলোড়িত করেছে ; কিন্তু প্রতিবাদের কলম উত্তোলন করতে গিয়েও 'মানুষ' বঙ্কিম–'সাহিত্যিক' বঙ্কিম পরাজিত হয়েছেন 'ডেপুটি' বঙ্কিমের কাছে। সেই সত্য-অন্বেষী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর অভিলাষ আর অক্ষমতার মর্মবেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ-উপন্যাস।

উত্তর বাংলার সাঁওতাল-জীবন নিয়ে লেখা রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। এ-উপন্যাস ধারণ করেছে সাঁওতাল জনপদের সুদীর্ঘকাল, এবং এখানে আছে সাঁওতালদের আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, ধর্মবিশ্বাস-কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা এবং ঈর্ষা আর স্বার্থপরতার ছবি। এই আরণ্যক আদি-মানুষের জীবন সভ্যতার স্পর্শে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে :

প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নীলাভ কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ হড়। হড়রাই সেই নীলাভ অন্ধকারের পবিত্রতা দু'হাতের মুঠোয় ভরে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আর অনেক দূর থেকে শংখিনী সাপের আঁকা বাঁকা দেহভঙ্গীর কুটিলতা নিয়ে পথ খোঁজে খোঁজে এগিয়ে আসে সভ্যতা।[৫২]

আদিম জনপদের এই বিপর্যয়েরই শিল্পরূপ 'একাল চিরকাল'। ভাষার ক্লাসিক সংহতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজ-সচেতনতা এবং শৈল্পিক সতর্কতা–সবকিছুর অন্তর্মিলনে রিজিয়া রহমানের এ-উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ।

সেলিনা হোসেনেরও অগ্রযাত্রা-শুরু স্বাধীনতা-উত্তরকালে এবং ইতোমধ্যে তিনি লিখেছেন এ-সব উপন্যাস : 'জলোচ্ছাস' (১৯৭২), 'জ্যোৎস্নায় সূর্য-জ্বালা' (১৯৭৩) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), 'পদশব্দ' (১৯৮৩) এবং 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪)। বিষয়-গৌরবে সেলিনা হোসেনের প্রতিটি উপন্যাসই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী। দক্ষিণবাংলার চর-জীবনভিত্তিক 'জলোচ্ছাস' উপন্যাসে লোকমানসের সঙ্গে স্রষ্টার সুগভীর সংযোগ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। 'জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা' উপন্যাস নাগরিক-ক্লেদ আর অবক্ষয়ী জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষী গ্রামীণ স্নিগ্ধতায় বেড়ে-ওঠা বস্তিবাসী এক নারীর আপন উৎসে প্রত্যাবর্তনের শব্দচিত্র। তাঁর 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' নৈঃসঙ্গ্য-পীড়িত এবং স্মৃতিভারাক্রান্ত আধুনিক মানুষের অন্তর্ময় ভাবনার শব্দরূপ ; তা রোম্যান্টিক মধ্যবিত্তের গীতল প্রেম-উপাখ্যান। একজন মিতুলকে না-পাবার বেদনায় উপন্যাসের নায়ক জামেরী এখানে হারিয়ে যায় । অসীম নৈঃসঙ্গ্য আর অতলান্ত শূন্যতায়।

বিষয়-গৌরবে বিশিষ্ট সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন'। ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসে ঘটনার দ্বৈত স্রোতধারায় বিন্যস্ত হয়েছে সমাজসত্য এবং ব্যক্তি-সংবেদনা। এই উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে ভাষা-আন্দোলনের প্রাক্-পটভূমি ও বাঙালি জাতির আত্ম-জাগরণ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রেম আর সংগ্রামের দ্বৈরথে নায়ক জাফর রক্তাক্ত হয়েছে এবং অবশেষে নতুন ভোরের প্রত্যাশায় সে সংগ্রামের স্রোতে মিলে গেছে। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে ধরা পড়েছে সেলিনা হোসেনের ঐতিহ্য-প্রীতি। এ-উপন্যাসে তিনি বিচরণ করেছেন হাজার বছর পূর্বের চর্যাগীতির উঠানে। ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজ-সচেতনতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অঙ্গীকারে রচিত এ-উপন্যাস হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির এক শিল্পিত দলিল।

'মনসামঙ্গলে'র সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং সমকালের জীবন-অভিজ্ঞতা, এ'দুয়ের পরস্পর অন্তর্বয়নে রচিত হয়েছে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক চাঁদবেনে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সাহসী-মানুষ চাঁদ সদাগরের নবীন সংস্করণ। কাহিনীর মৌল-উৎসে আছে 'মনসামঙ্গলে'র অনুষঙ্গ ; তবে কেবল 'মনসামঙ্গলে'র আবহেই 'চাঁদবেনে' সীমাবদ্ধ নয়–বরং মঙ্গলকাব্যের ধূসর পাতা ছিঁড়ে, চাঁদ সদাগরের প্রেরণায়, এখানে ফুটে উঠেছে এক ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত-মজুরের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনসংগ্রামের কাহিনী। এ-উপন্যাসে পূজা-প্রার্থী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষুসী মনসা নেই–তবে আছে মনসারূপী এক ভূস্বামী শোষক আজু মৃধা। মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতাপ্রত্যয়ী সমাজে সবার অলক্ষেই যেমন জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদ সদাগর, যার কণ্ঠে উঠে-আসে দেবতার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় প্রতিবাদ–'আমি তেত্রিশ কোটি দেবতা মানি না, কোনো অপদেবতার পূজা আমি দেব না' ; তেমনি চম্পাইগঞ্জের অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশে ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত-মজুরের ঘরে জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদবেনে–যার কণ্ঠে চাঁদ সদাগরের মতোই প্রতিবাদ-ধ্বনি "আমি আজু মৃধার শোষণ থেকে মুক্তি চাই, আমি তাকে ঘৃণা করি, আমি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি।" উপন্যাসের পরিণতিতে 'লাউয়ের ডগার মতো' এক সকিনার আকাঙ্ক্ষায় চাঁদবেনের সংগ্রামীসত্তা আর সমাজভাবনা প্রেমের সঙ্গে আত্মলগ্ন হয়ে অর্জন করে সম্পূর্ণতা :

আজু মৃধা আমার ভিটা দখল করে নিলে আমি লড়াই করব, পরাজিত হলে বিন্দুমাত্র গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন করবে না। সেই শোক লালন করে আমি আবার প্রস্তুতি নেব। কিন্তু একজন প্রিয়তম নারীর অভাব কাটিয়ে উঠতে পারব না। যে নারী উর্বরা ভূমি হয়ে উত্তর-পুরুষ সৃষ্টি করে। যার ক্ষমতায় জীবনের ফসল উপচে ওঠে। যার ভালোবাসায় চম্পাইগঞ্জের মাটিতে সুদিন আসে।[৫৩]

এ-উপন্যাসে লেখকের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা যেমন বহির্জীবনসন্ধানী ; তেমনি মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য-উন্মোচন যেন অতল হৃদয়স্পর্শী। পরিচর্যা-সচেতনা,

উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ইঙ্গিতময়তা এবং কবিতাস্পর্শী ভাষারীতি সেলিনা হোসেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, কখনো কখনো প্রতিভার স্পর্শে, নবতর জীবন-চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠে। সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগে এবং যুগ-সংক্ষোভ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পীমানস ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আধারে সঞ্চার করে নবীন সংবেদনা। লেখকের চেতনার গভীরে প্রোথিত ইতিহাসজ্ঞান এবং সমাজবোধের স্পর্শে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যিক উপাদানের পুনর্জন্ম ঘটে ; কল্লোলিত বর্তমানের অভিজ্ঞতার উত্তাপে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তর্বয়নে মিলে যায় একালের সাথে চিরকাল। শৈল্পিক সিদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু একথা অনস্বীকার্য যে শওকত আলী, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন, প্রমুখ ঔপন্যাসিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সঞ্চার করেছেন একটি নতুন মাত্রা। তবে তুলনাসূত্রে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যিক উপাদানের উপন্যাস-অবয়ব সৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে সেলিনা হোসেনের সাফল্য একক, বিস্ময়কর, অনতিক্রান্ত এবং শীর্ষবিন্দুস্পর্শী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের আরেকজন প্রতিশ্রুতিশীল ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-)। তার উপন্যাসগুলো হচ্ছে–'নন্দিত নরকে' (১৯৭২), 'শঙ্খনীল কারাগার' (১৯৭৩), 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' (১৯৮৩), 'অচিনপুর' (১৯৭৪), 'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৩), 'অন্যদিন' (১৯৮৪), 'সৌরভ' (১৯৮৪), 'তোমাকে' (১৯৮৪), এবং 'ফেরা' (১৯৮৪)। একদা 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' লিখে তিনি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে, তিনি আত্মসমর্পণ করলেন সহজ ফুলেল জনপ্রিতার কাছে এবং লিখে ফেললেন উপন্যাসের অভিধায় একগুচ্ছ বড়গল্প। সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পের অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেন 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগারের'–এমন স্বীকারোক্তি 'শঙ্খনীল কারাগা'র ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে।[৫৪] কিন্তু সোমেন চন্দের গল্পে সুগভীর এবং মীমাসিংত সমাজবাদী চেতনা[৫৫] হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়নি। যুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত মূল্যবোধে আচ্ছন্ন 'নরক' আর 'কারাগার' থেকে হুমায়ুন আহমেদ মুক্তির অভিলাসী ; কিন্তু ঐ 'নরক' আর 'কারাগার' থেকে এল না তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি–বরং 'নন্দিত' আর 'শঙ্খনীল' বিশেষণের আবরণে মেনে নেন তিনি স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। আমরা জানি, উপন্যাসের অন্বিষ্ট পূর্ণায়ত জীবন, কিন্ত হুমায়ুন আহমেদের পরবর্তী উপন্যাসসমূহে সেই পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবন-উপলব্ধি নেই। যেমন হুমায়ুন আহমেদ, জনপ্রিয়তার কাছে সমর্পিত হয়ে, লিখেছেন একগুচ্ছ বড়গল্প ; তেমনি আরেকজন ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনও (১৯৫৫–) উপন্যাসের অভিধায় লিখেছেন বেশ কিছু বড়গল্প[৫৬] এবং এখানেও জীবনজিজ্ঞাসা খণ্ডিত ও বয়োসন্ধি-স্নিগ্ধ। স্বাধীনতা-উত্তর কালে, এ-ছাড়াও আরো কয়েকজন নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, যাঁরা বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিক-

নির্মিতির প্রশ্নে পরীক্ষা-প্রবণ এবং স্বাতন্ত্র্য অর্জন-প্রয়াসী ; তবু তাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ভাবে কিছু বলার এখনো সময় হয়নি ।

পাঁচ

উপর্যুক্ত আলেচনায় আমরা তুলে ধরেছি পূর্ববাংলার উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি, দেখাতে চেয়েছি আমাদের উপন্যাসিকদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা । প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামমুখীন জীবনযাত্রার রূপায়ণে আমাদের প্রবীণ ঔপন্যাসিকরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা নির্মাণ করেছে পূর্ববাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত্তি । পঞ্চাশের দশকে আমাদের উপন্যাসে এল নগরজীবন–এল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শব্দস্রোত । ষাটের দশকে এসে উপন্যাস-সাহিত্যে প্রাধান্য পেল অবক্ষয়ী মূল্যবোধ, এল আঙ্গিক-সচেতনা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য-অনুসরণে উপন্যাস রচনার একটি নতুন ধারা । মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসে এল বিষয়বৈচিত্র্য, কিন্তু ক্রমঅপসৃত হল মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষেরা–উপন্যাসের শব্দস্রোতে কল্লোলিত হল না বাঙালি জাতিসত্তার রক্তাক্ত উজ্জীবন ।

যুগের হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, কর্মহীন রোম্যান্টিকতার অকারণ যন্ত্রণা আর মৈথুন-উৎসবের চিত্র নয়–আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস যেখানে আছে দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা । অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জনের কাব্যিক বর্ণনা নয়, আমরা চাই উত্তরণের কথামালা । ভীরুতা, কাপুরুষতা আর রমণপ্রিয়তার চিত্র নয় । আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস যেখানে আছে নাম জানা না-জানা হাজার-লক্ষ বীর শহীদের রক্তদান-মহোৎসবের কথা । আমরা বিশ্বাস করি, সমাজচৈতন্য ও ব্যক্তিসংবেদনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত, প্রার্থিত সেই উপন্যাসটি আমাদের উজ্জীবিত করবে উজ্জ্বল উত্তরণের লক্ষ্যে; নতুন চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠবে নষ্ট জীবনের আরাধনারত তরুণ সমাজ– হয়ে-উঠবে তারা রক্তমুখী, সূর্যমুখী, স্বপ্নমুখী, আমরা আশা করব, একাত্তরের রক্তাক্ত উজ্জীবনের আলোয় পথ দেখে আমাদের ঔপন্যাসিকরা এগিয়ে আসবেন উত্তরণ আর শৃঙ্খলমুক্তির কথামালা সৃষ্টিতে– হয়ে উঠবেন তাঁরা এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা ।

তথ্যনির্দেশ

১. Ralph Fox : The Novel and the People,
1937, London, p. 27
২. সৈয়দ আকরাম হোসেন : 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্প-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম), সপ্তদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত ১৩৮০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৬
৩. মোহাম্মদ নজিবর রহমান : আনোয়ারা, ১৯১৪, ত্রয়োদশ মুদ্রণ–১৩৮১, ঢাকা, পৃ. ২৪২
৪. কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ্, ১৯৩৩ ৪র্থ সংস্করণ–১৯৬২, ঢাকা, পৃ. ২৫২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের প্রথমে মুদ্রিত ।

৬. আনোয়ার পাশা : সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, ১৯৬৭, চট্টগ্রাম, পৃ. ৬৬
৭. উদ্ধৃত–আবুল ফজল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৩৮২ ; চট্টগ্রাম, পৃ. ৯৬৩-৬৪
৮. সৈয়দ আকরাম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৯. আবুল ফজল : প্রদীপ ও পতঙ্গ. আবুল ফজল রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
১০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'পূর্ব পাকিস্তানী কথা-সাহিত্য,' আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৩৬
১১. 'জননী' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হলেও, এ-উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, দ্রষ্টব্য-'মুখবন্ধ' ।
১২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : লালসালু, ১৯৪৮, ষষ্ঠ স. ১৯৬৭, ঢাকা, পৃ. ৩০
১৩. লেখক পরবর্তীকালে উপন্যাসটির নাম রাখেন 'দুই মহল' ।
১৪. হাসান আজিজুল হক : 'পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যে চিন্তার সংকট', "পরিক্রম" (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম), তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, ঢাকা, পৃ. ৪৯৯
১৫. শওকত ওসমান : সমাগম, ১৩৭৪, ঢাকা, পৃ. ১৪৫-৪৬
১৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : কাঁদো নদী কাঁদো' ১৯৬৮, ঢাকা প.২৪৪- ৪৫.
১৭. সৈয়দ আকরাম হোসেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাস','শব্দরূপ" (সম্পাদক সৈয়দা হাফসা :
আলমগীর), তারিখবিহীন ঢাকা, পৃ. ১৭
১৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯
১৯. সরদার জয়েন উদ্দীন : অনেক সূর্যের আশা, ১৯৬৭, চট্টগ্রাম পৃ. ৩৪৭
২০. এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' এবং 'কর্ণফুলী' ।
২১. হাসান হাফিজুর রহমান : 'আমাদের সাহিত্য : বিভ্রান্তি উৎক্রান্তি, "সমকাল" (সম্পাদক : সিকান্দার
আবু জাফর), ষষ্ঠ বর্ষ : দশম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, পৃ. ৬৬৯
আরো দ্রষ্টব্য–যতীন্দ্রচন্দ্র সরকার : "পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা", বাঙলা
একাডেমী পত্রিকা (সম্পাদক–কাজী দীন মুহম্মদ), একাদশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪,
পৃ. ৬২
২২. আলাউদ্দীন আল-আজাদ : শিল্পীর সাধনা, ১৯৫৮, চতুর্থ সংস্করণ– ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ৬৮
২৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ,
জানুয়ারি ১৯৭৬, কলকাতা, পৃ. ৩৯২-৯৩

২৪. সৈয়দ শামসুল হক : সীমানা ছাড়িয়ে, ১৯৬৪, ঢাকা, পৃ. ৪১

২৫. দ্রষ্টব্য : 'সারেং বৌ'-এর প্রথম সংস্করণের পিছনের মলাটে মুদ্রিত পরিচিতি। তবে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ

করা প্রয়োজন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০১-১৯৭৬) সারেং জীবনভিত্তিক ছোটগল্প, 'সারেঙ'

প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৩৬১, কলকাতা) গ্রন্থে গল্পটি

সংকলিত হয়েছে।

২৬. শহীদুল্লা কায়সার : সারেং বৌ, ১৯৬২, তৃতীয় সংস্করণ–১৯৬৮, ঢাকা, পৃ. ১৪৭

২৭. শহীদুল্লা কায়সার : সংশপ্তক, ১৯৬৫, ঢাকা, পৃ. ৫৩৬

২৮. মনসুর মুসা : পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ১৯৪৭, ঢাকা, পৃ. ২৯

২৯. সত্যেন সেন : পুরুষমেধ, ১৯৬৯, ঢাকা, দ্রষ্টব্য–'অবতরণিকা'।

৩০. এ-প্রসঙ্গে 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের ভাষ্য : 'পাপের সন্তান'কে আমার 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা চলে। এই দুটি উপন্যাসের ঘটনা-কালের ব্যবধান অর্ধ-শতাব্দীর কিছু উপর।

৩১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫

৩২. জহীর রায়হান : আর কতদিন, ১৯৭০, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৪৮

৩৩. জহীর রায়হান : আরেক ফাল্গুন, ১৯৬৯, ঢাকা, পৃ. ৬৮

৩৪. এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ওয়াকিল আহমদ : 'আনোয়ার পাশার জীবনকথা', মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল

হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা (সম্পাদক : আকরাম হোসেন) ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১১১-১৪

৩৫. সৈয়দ আলী আহসান : দ্রষ্টব্য–'নোঙর' উপন্যাসের ভূমিকা।

৩৬. হাসান হাফিজুর রহমান : 'দুটো পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস,' সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ১৯৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ

১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ৭৪

৩৭. আনিসুজ্জামান : 'ইতিহাস ও উপন্যাস', "পরিক্রম" (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল

ইসলাম), তৃতীয় বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ২৬৮

৩৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আমাদের উপন্যাস প্রসঙ্গে', "উত্তরাধিকার" (সম্পাদক : ডক্টর মযহারুল

ইসলাম)' শহীদ দিবস সংখ্যা-১৯৭৪ ; দ্বিতীয় বর্ষ : প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৯. আনোয়ার পাশা : রাইফেল রোটি আওরাত, ১৯৭৩, ঢাকা, পৃ. ২২৯

৪০. শওকত আলী : যাত্রা, ১৯৭৬, চট্টগ্রাম, পৃ. ৯১

৪১. উপন্যাসটি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশ–"উত্তরাধিকার" (সম্পাদক : মনজুরে

মওলা), ১২শ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-১০৪:

৪২. সৈয়দ শামসুল হক : দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৪৩. সৈয়দ শামসুল হক : দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৪৪. সেলিনা হোসেন : হাঙর নদী গ্রেনেড, ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ–১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ১৫৯

৪৫. রশীদ হায়দার : নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ২৫

৪৬. দ্রষ্টব্য : মাহমুদুল হক : জীবন আমার বোন, ১৯৭৬, ঢাকা পৃ. ৯৪-৯৫

৪৭. হারুন হাবীব : প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ৫৭

৪৮. শওকত আলী : প্রদোষে প্রাকৃতজন, ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ২৪১

৪৯. See; Aristotle: on the Art of Poetry,` Classical Literary Criticism', Translated by T.S. Dorsch, London, pp. 42-45

৫০. দ্রষ্টব্য–আনিসুজ্জামান : 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের ফোল্ডারে মুদ্রিত পরিচিতি।

৫১. রিজিয়া রহমান : বং থেকে বাংলা, ১৯৭৮, ঢাকা, ভূমিকা, দ্রষ্টব্য–পৃ. (২২)

৫২. রিজিয়া রহমান : একাল চিরকাল, ১৯৮৪, দ্রষ্টব্য–পৃ. ৯

৫৩. সেলিনা হেসেন : চাঁদবেনে, ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ৮১

৫৪. এ-প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য ;

সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোটগল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিম্ন-মধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার

একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মন সুবিজন' নামে তিনটি আলাদা

গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি।

দ্রষ্টব্য : হুমায়ূন আহমেদ : শঙ্খনীল কারাগার , ১৩৮০, চতুর্থ মুদ্রণ–১৩৮৯, ঢাকা।

৫৫. এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ইঁদুর' গল্প সম্পর্কে কমরেড মুজফফর আহ্মদের মন্তব্য : সোমেন চন্দের নাম

জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তাঁর কোনো লেখা পড়িওনি। পার্টি যখন আইন-সম্মত

হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে

উঠল। হায় হায়, এমন ছেলেকে রাজনীতিক মনকষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেলল।

সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন। . . . এই

গল্প (ইঁদুর) পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তা পড়েছেন। 'ইঁদুর' জগতের

একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

দ্রষ্টব্য মুজফফর আহ্‌মেদ : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ (সম্পাদক : দিলীপ মজুমদার, ১৯৭৩,

দ্বি. স. ১৯৭৮, কলকাতা) গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'।

৫৬. ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাসোপম রচনাসমূহ : 'দুঃখকষ্ট' (১৯৮২), 'ও রাধা ও কৃষ্ণ' (১৯৮২),

'মহাযুদ্ধ' (১৯৮২), 'একদেশে...' (১৯৮২), 'ভালেবাসার পাশেই' (১৯৮৩), 'কালোঘোড়া' (১৯৮৩),

'যাবজ্জীবন' (১৯৮৪), উপনায়ক' (১৯৮৪), এবং 'ভূমিপুত্র' (১৯৮৪)।

রচনাকাল-১৯৮৪

বাসনার নারীভাব: আহমদ ছফার ‘গাভী বিত্তান্ত’

স লি মু ল্লা হ খা ন

এ কি আজব কাণ্ড, ওলো
রাঙা গাইয়ের দুধু কেমনে ধলা হলো?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ‘মহেশ’ গল্পটি এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় উঠেছিল। এক সময় কী এক অজ্ঞাত কারণে গল্পটিকে তালিকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের ৩১ জুলাই ঢাকার বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দেওয়ার সময় ঘটনাটির উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেন: “বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোনো যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়তো নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো হত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্তামশায় এ অনাচার সইবেন কী করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন হয়েছে তাঁর স্বরচিত গল্প ‘প্রেমের ঠাকুরে’র। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬: ১৪৬)”

আহমদ ছফার ভাগ্য শরৎচন্দ্রের সমান মন্দ হয় নাই। তাঁর উপন্যাস গাভী বিত্তান্ততে গো হত্যা আছে। কিন্তু যাঁদের বুকে শূল বিদ্ধ হয়েছে তাঁরা ‘হিন্দু বালক’ নয়। এঁদের একজনের নাম সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত এক ইংরেজি নিবন্ধে তিনি জাহির করতে রাজি হয়েছেন– গাভী বিত্তান্ত বইটি তাঁর বুকেও শূল বিদ্ধ করেছে। মনজুর লিখেছেন: “আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত একটা ভাঁড়ামোমাত্র। বইটা পড়ে আমি সত্যি সত্যি প্রাণে ব্যথা পেয়েছি। এই রকম একটা লেখা লিখতে তিনি কী আশ্চর্য কারণে আপন সময় ও শক্তি খরচ করলেন সে শুধু তিনিই বলবার পারেন। (ইসলাম ২০০৩: ২৯৬)”

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যদি বিশদ যুক্তিবিস্তার করতেন আমরা নিশ্চয়ই উপকৃত হতাম। কিন্তু তা তিনি করেন নাই। গাভী বিত্তান্ত আহমদ ছফার দাবি অনুসারে–'এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে লেখা একমাত্র উপন্যাস।' ছফা আরো দাবি করেছেন এই রচনাটি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্পণে দেশ সমাজ এবং জাতিকে নিরীক্ষণের মহামূল্য প্রমাণ'ও বটে। আহমদ ছফার এই দাবির সঙ্গে সকলেই একমত হবেন এমন আশা করা হয়তো সঙ্গত নয়। আমার দাবিও সেটা নয়। আমি অন্য একটা কথা তুলতে চাই এখানে।

আমার দাবি, সমসাময়িক দেশ সমাজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনার মধ্যেই এই উপন্যাসের আবেদন সীমিত নাই। মানুষের বাসনার শেষ নাই বা বাসনা মাত্রই অপরণীয়– এই সত্যের সচিত্র সংস্করণ আহমদ ছফা গাভী বিত্তান্ত নামে প্রচার করেছেন। বাসনার অপূরণ-সম্ভবতা থেকে যেই হৃদয়বিদারক নাট্যের উদ্ভব হয় এখানে তার কিছু প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন। ছফার বয়ানে বাসনা হাজির হয়েছে 'নারী' আকারে। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নূরুন্নাহার বানু। পারস্য ভাষায় বানু শব্দের অর্থ নারী, নির্বিশেষ নারী এই কথা খেয়াল করলে আমার ইশারা বুঝতে সহায় হয়। আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত তাই যুগপৎ নারীর ও বাসনার ট্রাজেডি আকারে হাজির হয়েছে। কিভাবে, তা আমি সংক্ষেপে নিবেদন করব। নারীবিদ্বেষ এর হাসির ছটা মাত্র, ভিতরে তার বাসনার বলি আর শূন্যতার গ্রহণ।

তার আগে মনে পড়ছে কয়েকটি আপত্তির কথা। আমাদের এই মহান লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে: তাঁর লেখা নারীবিদ্বেষপূর্ণ। যেমন 'আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' নামে আমরা যখন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করি তখন উপস্থিত সভ্যদের চার জন একটি প্রতিবাদমূলক পত্রে জানান, 'তাঁর শত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি নারীবিদ্বেষী হিসেবে প্রতিভাত, তাঁর সাহিত্যে নারীর উপস্থাপন সমস্যাজনক।' (খালেদা গয়রহ ২০০৩: ৬৪) আমাদের এই চার জন শ্রদ্ধাভাজন পত্রকার গাভী বিত্তান্ত বইটির কথা তোলেন নাই। তবে তোলা অসম্ভব ছিল না। আমার বক্তব্য বলার সময় আমি আমার এই বন্ধুদের আপত্তির কথাও মনে রাখব।

উল্লেখ্য, হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়, সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যবিশারদ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকও মুখরোচক আলোচনায় আমাকে কয়েক বছর আগে নিউইয়র্ক শহরে বলেন: আহমদ ছফার এই লেখাটি ভারি নারীবিদ্বেষী বা মিসোজিনিস্ট (সরংড়মুহরংঃ)। সবিনয়ে বলতে চাই: গায়ত্রীদেবীর এই দাবি যতটুকু সত্য, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প হিন্দুবিদ্বেষী দাবিটাও ততটাই সত্যমাত্র। তার বেশি নয়।

আগে শরৎচন্দ্রের কথায় আসি। ১৯৩৬ সালের বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র নিজ গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান পেশ করেন। আগে আমরা সেটি শুনি:

একটি হিন্দুপ্রধান, হিন্দু-জমিদারশাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরিব চাষী গফুরের বাড়ি। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর। বছর দশেকের মেয়ে

আমিনা আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান খড় আটক করলে তখন সে কেঁদে বললে, 'হুজুর! আমার ধান তুমি নাও। বাপ-বেটিতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় কটি দাও–,নইলে এ দুর্দ্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কী করে?' কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হল, কেউ দয়া করলে না। তারপরে শুরু হলো তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সে জীর্ণ কুটিরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো 'মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে। আমার ভাত কটি তুই মহেশকে দে।' সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই ১০ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো, 'গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিস নে গফুর, ওকে বেচে দে।' গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, 'মহেশ তুই আমার ব্যাটা, আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস, তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি বাবা!' এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নিচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয়জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে। ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়েচিন্তে অনেক দুঃখে, বিলম্বে তার কলসীটি পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে, কলসী ভেঙে ফেলে এক নিশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কিন্তু এ দৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে-একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার দুই হাত পা ছুড়ে প্রাণ ত্যাগ করলে।
প্রতিবেশীরা এসে বললে 'হিঁদুর গাঁয়ে গো-হত্যা!...
(চট্টোপাধ্যায় ২০০২ [১৯৩৬])

সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু আরেকটু বয়ান করে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করলেন: 'এই হলো গো হত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে সেল বিঁধবে!' জমিদারবাবু প্রায়শ্চিত্তের দাবি তুলেছেন। গফুর সেই রাতেই গাঁ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শরৎচন্দ্রের বয়ানে আছে: আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটি সঙ্গে নিতেছিল কিন্তু বাবা বারণ করে বললে ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

আহমদ ছফার বয়ান শুরু হয় যাদের আমরা সাক্ষীগোপাল বলি সেই রকম এক গোবেচারা অধ্যাপকের উপাচার্য পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ঘটনা দিয়ে। ভদ্রলোকের নাম ছফা রেখেছেন মিয়া মুহাম্মদ আবু জুনায়েদ। তাঁর মধ্যে ভয় কিংবা করুণাগুণের এমন বিশেষ জটলা নাই যে তাকে ট্রাজেডির নায়ক বলা যায়। কিন্তু বাসনা আছে। উপাচার্য

পদে নিযুক্ত হবেন এমন আশা তাঁর ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্র যখন সেই মহান পদে তাঁকে বসিয়ে দিল তখন তাঁর পরম বাসনা দেখা দিল। তিনি একটি গরু পুষবেন। এক বিদেশি রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য মহোদয় একদিন ইংরেজিতে যাহা বলেছিলেন তাহার বাংলা তর্জমা অনেকটা এ রকম:

হিন্দুরা গরু পূজা করে, আমরা গরুর গোশত খাই– দুটোই সাচ্চা বাত। তবে আমরা গরু ভালবাসি– এ কথাও সত্য।

'Your Excellency is perfectly right. Hindus do worship cow and we people eat beaf. But it is also true we love cow very much–. (ছফা ২০০৩: ৩১৯)

এই গরু পোষার বাসনা উপাচার্য আবু জুনায়েদ সাহেবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার শেখ তবারক আলীর তবারক– ওরফে প্রসাদ– গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তবারক আলী সাহেবের টাকায় গরু কেনা হয়, গোশালাটাও তিনিই বানিয়ে দেন। উপাচার্যের কন্যা এবং স্ত্রীকেও বিবিধ রতন উপহার দেওয়া হয় তার তরফে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে শেখ তবারকের উপহার অথবা উপচার্যের গাভী।

এই গাভী সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের মন্তব্য:

"শোন বৎস আমাদের শাস্ত্রে গাভীকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যে পাষণ্ড গাভীর মধ্যে মাতৃমূর্তি দর্শন করিতে না পারে, তাহাকে জন্ম জন্মান্তর তীর্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই হইল গিয়া তোমার শাস্ত্রের বিধান। তথাপি তোমার এই চতুষ্পদের কন্যাটিকে দেখিয়া আমার মনে ভিন্ন ধরনের জল্পনা শুরু হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে এক ধরনের সুন্দরী রমণীকে হস্তিনী রমণী বলিয়া মহাকবিগণ শনাক্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমার গাভী দর্শন করিয়া আমার কী কারণে হস্তিনী নায়িকার কথা মনে হইতেছে বলিতে পারি না। মহাকাব্যের যুগে যেই ধরনের গাভীকে কামধেনু বলা হইত তোমার গাভীটি সেই জাতের। ইহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে।" (ছফা ২০০৩: ২৯১–৯২)

মহাকাব্যের যুগ থেকে তুলে আনা কামধেনুকে আহমদ ছফা উপন্যাসের যুগের কামনার ধন বানিয়ে ছেড়েছেন। বাংলাদেশের শাসক জাতির বৈদেশিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার চিহ্ন হিসাবে হাজির করেছেন তিনি এই গাভীটিকে। গরুটির নাম তরণী রাখা হয়েছে। তবে গরুটির জাত নির্ণয় সহজ নয়।

...এই প্রজাতির গরু বাংলাদেশে এই একটিই আছে এবং গরুটির মা-বাবা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাবা অস্ট্রেলিয়ান, মা সুইডিশ। ...গরুটি যে একবার দেখবে প্রথম দর্শনেই বুঝে যাবে এটা ভিন্ন জাতের গরু। বাংলাদেশের গরুসম্প্রদায়ের আত্মীয়স্বজন কেউ নয় এই চতুস্পদের বেটি। তারপরেও জাতীয়তার বিচারে তরণীকে বাংলাদেশী বলতে হবে, কারণ তার জন্মস্থান বাংলাদেশ। (২০০৩: ২৭২)

তরণীকে যদি উপন্যাসের নায়িকা বলায় কারো আপত্তি থাকে, তবে উপাচার্যের স্ত্রী নূরুন্নাহার বানু সেই পদটিতে সহজেই নিযুক্তি পেতে পারেন। এই গাভীকে কেন্দ্র করে উপাচার্যের সঙ্গে তার স্ত্রীর মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই মনোমালিন্যেরই এক

পর্যায়ে নূরুন্নাহার বানু বিষ প্রয়োগ করে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গাভীটিকে হত্যা করেন। এই হচ্ছে গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসের গো-হত্যা!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবের ঘরে এই হত্যা শূল আকারে বিদ্ধ হয়েছে।

দুই

নূরুন্নাহার বানু একটি ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা গাভীকে বিষ দিয়ে কেন মারলেন? কী তার বাসনা? এর ব্যাখ্যা এক নয়, অনেক। বিষ প্রয়োগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাঁর একে একে মনে পড়তে লাগল অনেক কাহিনী। স্বামী পর হয়ে গেছে এই গাভিন গরুর জন্য। নূরুন্নাহারের অচেতন গুজব আকারে ভাসে। অচেতন কোনো গোপন সত্য নয়, যা প্রকাশ্যে গোপন তাহাকেই অচেতন বলে। উপাচার্য সাহেব একটা নতুন জাতের গরু সংগ্রহ করেছেন। ছাত্রীনিবাসে সংবাদটা 'আজগুবি গুজব' আকারে হাজির হল (সূত্রধর বলছেন) এভাবে:

"এটাকে ঠিক গরু বলা যাবে কি না সে ব্যাপারেও বিতর্ক আছে। গরুটির গর্ভধারিণী হলো সুন্দরবনের একটা শিঙাল মাদি হরিণ এবং বাবা অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়। মাদি হরিণের গর্ভে এবং অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়ের ঔরসে উপাচার্য সাহেবের গরুটি পয়দা হয়েছে। গরুটির আকার প্রকার গরুর মতো। গায়ের রঙ, চোখের দৃষ্টি, স্বভাবের চঞ্চলতা সবটা হরিণের মতো। গরুটি এই অল্প সময়ের মধ্যে উপাচার্য সাহেবের কলিজার টুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (ছফা ২০০৩: ২৯৭)

গুজবের আর একটি রূপ চালু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং মহিলা মহলে: "একটা জিন কিংবা পরীর সঙ্গে উপাচার্য আবু জুনায়েদের গভীর ভালোবাসা হয়েছে। এই পরীটাই দিনের বেলা সুন্দর একটা গরুর বেশ ধরে গোয়ালঘরে শুয়ে থাকে। রাত গভীর হলে অনিন্দ্যসুন্দর একটা মেয়েমানুষ হয়ে আবু জুনায়েদের সঙ্গে রঙ-ঢঙ মতো কিছু করে। আবু জুনায়েদ রাতে ঘরে থাকেন না। পরীকন্যার সঙ্গেই গোটা রাত আশনাই করে কাটিয়ে দেন। এখন আবু জুনায়েদের সঙ্গে তার বড় পত্নী নুরুন্নাহার বানুর কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামী স্ত্রীতে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ।" (ছফা ২০০৩: ২৯৭–৯৮)

বিষয়টি কি সম্পূর্ণ নূরুন্নাহারের মনগড়া? সূত্রধর বলছেন, না। স্ত্রীর সঙ্গে তুচ্ছ বিষয় থেকে মহৎ বিষয় সব নিয়েই এখন উপাচার্যের কলহ। লোকে যাকে দাম্পত্যকলহ বলে এই বস্তু হয়তো তা-ই। উপাচার্য পদ পাওয়ার পর কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে, দিনে দিনে আবু জুনায়েদের পারিবারিক জীবনটা একটা নরককুণ্ড হয়ে উঠল। যেন এর বিপরীতে একটা বেহেশতের সন্ধান তিনি পেলেন গরুর আকারে। সূত্রধর এই বেহেশতের নাম দিয়েছেন 'আরেকটা গোপন জীবন'।

মনে মনে আবু জুনায়েদ গরুটার কাছে ঋণী অনুভব করেন। গরুটা সময়মতো তাঁর গোয়ালে এসেছিল বলেই আবু জুনায়েদের কাছে জীবন অনেকখানি সহনীয় হয়ে উঠেছে। তিনি রাতের বেলা ঘুমোতে যাবার আগে চিন্তা করেন সকালে ঘুম থেকে উঠে

গরুটার মুখ দেখবেন। অফিসে যাওয়ার সময় ভাবেন, ফিরে এসে গরুটাকে দেখতে পাবেন। এমনি করে গরুকে কেন্দ্র করে তার গোটা জীবনের মধ্যে একটা চোরা আবর্ত সৃষ্টি হলো। (ছফা ২০০৩: ২৭৫)

একদিন রাতে উপাচার্য গাভী দর্শনে গেছেন। হঠাৎ তার চোখ গাভীর ওলানের দিকে যায়। হঠাৎ করে ওলানটা ধরে দেখবার ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল! এ ইচ্ছা তার আগেও জেগেছিল দিনে। রাতের স্বাধীনতায় সেই ইচ্ছার জয় হল।

ওলানটা রক্তিম বর্ণের। এই তুলতুলে মাংসপিণ্ড স্পর্শ করামাত্রই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল, আজ থেকে অনেকদিন আগে, যখন তার সবে গোঁফ গজিয়েছে, শিশ্নের মধ্যে বীর্যসঞ্চার হয়েছে, এক দূর সম্পর্কীয়া মামী আবু জুনায়েদকে দিয়ে তাঁর বিশাল বিশাল স্তন মর্দন করিয়েছিলেন। আবু জুনায়েদের মনে সেই পুলক, সেই অনুভূতি জেগে উঠল। আবু জুনায়েদের মনে হলো তরণীর এই রক্তিম ওলান, এই স্ফীত বাঁটগুলোর মধ্য দিয়ে চরাচরের নারীসত্তা প্রাণ পেয়ে উঠেছে। (ছফা ২০০৩: ২৭৮)

অচেতনের এই চেতন চেহারা দেখার পর নূরুন্নাহার বানুর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। সেই রাতেই তিনি ঠিক করে ফেলেছেন আবু জুনায়েদের শখের গরুটাকে সময় এবং সুযোগ এলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবেন। নূরুন্নাহার হতে চেয়েছিলেন আবু জুনায়েদের বাসনা। তার সেই স্থান দখল করেছে নিরীহ গাভী। যখন লোকজন থাকে না নূরুন্নাহার তখন লুকিয়ে চুরিয়ে গরুটাকে দেখে আসেন।

গরুটাকে অনেকটা সতীনের মতো ধরে নিয়ে গোয়ালঘর থেকে ঝাড়ু কুড়িয়ে নিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দেন। (ছফা ২০০৩: ২৭৯)

নূরুন্নাহারের বাসনা নানা জায়গায় গিয়ে ফিরে আসে। তবারক আলীর স্ত্রী বানুর মেয়ে দীলুকে যেই বেনারসিটা উপহার দিয়েছেন, সেই কাপড়টার প্রতি নূরুন্নাহার বানুর ভীষণ লোভ। যখন-তখন সেই শাড়িটাই পরে বসেন। তবারক আলীর সুদর্শন জামাই আবেদ হোসেনকে নূরুন্নাহার বানু পছন্দ করেন। 'কারণ শুধু তাঁর চেহারা নয়, স্বভাব চরিত্র কথাবার্তা সব সুন্দর। মাঝে মাঝে আবেদকে নূরুন্নাহার বানুর ছোটো ভাইটির মতো আদর করতে ইচ্ছে হয়।' (ছফা ২০০৩: ২৭৯)

একদিন বানু দেখতে পেলেন গোয়ালঘরের ভিতর আবেদ হোসেন দীলুর স্তন টিপে টিপে আদর করছেন। আর দীলু তার গলা জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হাসছে। তবারক আলীর স্পর্শে পাপ ছাড়া আর কিছুই জন্মাতে পারে না– তার এই উপলব্ধি হল। নূরুন্নাহার বানুর ইচ্ছে হলো এক্ষুনি যদি তিনি তবারক আলীর দেয়া সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তাহলে বাঁচার একটা উপায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শাড়ি গয়না ওসব তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কোথায়? কাজের লোকজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। কাজের বেটির গায়ে জড়োয়া গয়না কি মানায়! তার চেয়ে নূরুন্নাহার বানুর কাছেই থাকুক। নারী হৃদয় বড় বেশি সোনার বশীভূত। (ছফা ২০০৩: ২৮১)

তিন

আমাদের ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানে যেই কাজ হয় তাকে সচরাচর 'গবেষণা' বলা হয়। আমরা খেয়ালই করি না, গবেষণা কথাটি একটি রূপক। আমাদের ইতিহাসের এক পাতায় লেখা আছে, একদা রাখাল হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজে বেড়াত। গরু কথাটির উৎপত্তিতেই আছে যে ঘুর ঘুর করে, গমিত হয়, সে-ই গরু। গরু খোঁজার আবেগকে এই কালে জ্ঞান খোঁজার বাসনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলেই আমরা গবেষণা শব্দটি পেলাম।

শব্দটি বেশ। গো এষণার রূপান্তর গবেষণা, কিন্তু এর একটা নামান্তরও আছে। তার নাম গো বাসনা। একলা ভারতবর্ষের নয়, দুনিয়ার আর দশ জাতির ইতিহাস-পুরাণেও সেই কথা লেখা আছে। আমাদের গবেষণা কী করে গো বাসনা হল তার কাহিনী এই নামান্তরে পাওয়া যাবে। এষণা ও বাসনার উচ্চারণভেদ সামান্য, কিন্তু তার অর্থভেদ অসামান্য। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় আকাশে গবেষণার জায়গায় গো বাসনা চলছে– তো গাভী বিত্তান্ত কাহিনীর এটাই কহতব্য। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বা তাঁর মতন মহান বিচারকরা সম্ভবত এখানেই প্রাণের আঘাতটি গ্রহণ করেছেন।

উপাচার্যের গাভীটি যেই দিন নিহত হলেন, সেই দিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন।

শেখ তবারক আলী তাকে হাত ধরে গরুর মৃতদেহটার কাছে নিয়ে গেলেন। গরুটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, কী জামাই মিয়া আপনাকে কি আমি সঠিক পথ দেখাইনি। (ছফা ২০০৩: ৩২০)

এই স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার হল খানিক পর। তার ভাগ্য খুলে গেল এক টেলিফোনে। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তিনি জানতে পারলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতাপিছু তাঁকে ৪ হাজার ডলার সম্মানী দেওয়া হবে। হিসাব কষে তিনি দেখলেন বিরাশি লক্ষ বাংলা টাকা। স্বপ্নের তাৎপর্য তাঁর কাছে জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলে পাঁচশ একর, এক হাজার একর মনের মতন জমি পছন্দ করে কিনতে পারবেন।

আবু জুনায়েদের বাসনা আল্লাহ সৎ পথেই পূরণ করেছেন। কিন্তু আবু জুনায়েদ এখনো জানেন না কে তার বাসনার গাভীটি হত্যা করেছে। খবরটা নূরুন্নাহারকেই দিতে হল: খুনটা তিনিই করেছেন। তবে টাকাটা আবু জুনায়েদকেই খরচ করতে হবে। প্রেমিকা-গাভীর কবরের উপর তাজমহল বানাতে ৮২ লাখ টাকা লাগবে।

উপাচার্যের বাসনাকে খুন করেছেন তাঁর না-বাসনা। নর ও নারীর মধ্যে ভালোবাসার যেই কাহিনী আমরা প্রতিদিন শুনে থাকি– আহমদ ছফা এখানে তার অসম্ভব ভাব হাজির করেছেন। নর ও নারীর ভিতর কোনো সম্পর্ক হওয়ার আগে একটা শর্ত পূরণ করতে হয়। সেই শর্ত অতীব সরল। নরকে নর আর নারীকে নারী হতে হয়। কিন্তু নর ও নারী বলে দুটি আলাদা ভাব, স্বতন্ত্র আকার নাই। যা নর নয়,

তা-ই নারী– সংজ্ঞাটা এভাবেই দেওয়া হয়। নারী কী বস্তু তা কখনোই বলা হয় না। নরের পাঁজর জ্বালিয়ে নারী বানানোর পুরাণকাহিনী সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। নর ও নারীর মধ্যে ভেদ করার চিহ্ন একটা। এক অঙ্গুলি হেলনে যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ড, দায়ের এক কোপে যেমন শসা দ্বিখণ্ড, তেমনি এক চিহ্নে নারী ও নর দ্বিখণ্ডিত। যেই কোপে নর ও নারীকে দুই টুকরা করা হয় সেই কোপের নাম 'পুরুষ'। ইংরেজিতে কহে ফ্যালাস (phallus)।

নর হাতে চায় 'পুরুষ' বা ক্ষমতার দণ্ড । নারী চায় খোদ সেই পুরুষ হয়ে উঠতে। নর ও নারীর মধ্যে এই কারণেই কোনোদিন মিত্রভাব সম্ভব নয়। প্রভু যেই দেশে পুরুষ, সেই দেশে নর ও নারী দুই খণ্ডই পুরুষের বান্দা। নর মনে করে সে পুরুষের মালিক। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষই তার মালিক। অন্যদিকে নারী মনে করে সে পুরুষ হবে। এখানে পুরুষ মানে খোদ বাসনার চিহ্ন। কপাল এই যে পুরুষ এখানে নারী হয়ে ওঠে। আমার লেখার এটুকু যাঁদের হেঁয়ালি মনে হবে তাঁদের একটা পরামর্শ দিই: নর অর্থে 'ম্যান (man), নারী অর্থে ওম্যান (woman) এবং পুরুষ অর্থে 'ফ্যালাস' পড়বেন। একটু সহজ লাগবে। নারী ও নর উভয়কে আমি বান্দা বা সাবজেক্ট (subject) বলছি। আর বন্দেগি বলতে আমি সাবজেকটিভিটি (subjectivity) বা সেক্সুয়ালিটি (sexuality) দুইটাকেই বুঝব। বাসনা ও বন্দেগি বিষয়ে আমি আর এক জায়গায় 'আগাপাস্ড়লা' লিখেছি। (খান ২০০৩)

আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত-তে বান্দা আবু জুনায়েদ ক্ষমতা বা পুরুষের 'মালিক' হন। কিন্তু পরক্ষণেই বান্দা টের পান ক্ষমতাই তার মালিক। বান্দার পুরুষপদ (phallus/ signifier of desire) বাসনা একটা গাভী বা নারী আকারে হাজির হয়।

ঐদিকে বান্দা নূরুন্নাহার বানু যখন নিজ বন্দেগি (ংঁনলবপঃরারঃু) জাহির করতে যান– নিজেই হতে চান পুরুষ বা বাসনার চিহ্ন– তখন দেখেন সেই চিহ্ন আর তিনি নন, অন্য কেউ, তিনি সরে গেছেন সেই পদ থেকে। নরের বন্দেগি যেখানে পুরুষপদ আকারে প্রকাশ পায়, সেইখানে নারীর বন্দেগিও পুরুষপদ আকারে হাজির হয়। যেই দেশে পুরুষ প্রভু সেই দেশে নারীর বন্দেগি মানে দাঁড়ায় পরচর্চা– পুরুষ হওয়ার বাসনা।

আহমদ ছফার গাভী বিত্তান্ত উপন্যাসে নারীর বন্দেগি এই বিরোধ আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বাসনার চিহ্নকে পুরুষ বলা হয়, কিন্তু পুরুষ খোদ বাসনা নয়। চিহ্ন বা পদের সঙ্গে খোদ বা পদার্থের এই বিরোধ নিবারণের কোনো উপায় নাই। পুরুষ যেখানে চিহ্ন, বাসনা সেখানে খোদ। বাসনার এই ভাবকেই আমরা বলি নারীভাব। পুরুষ না হলে বাসনা হয় না। সেই অর্থে পুরুষই বাসনার স্রষ্টা। কিন্তু পুরুষ একই সঙ্গে নিজেও নিজের স্রষ্টা। বাসনার স্রষ্টা হয়েও পুরুষ বাসনার নাগাল পায় না। বাসনা অধর, নিরাকার, পরাধীন। পুরুষেরই অপর নাম তাই হয় 'পর' বা অতিশয়ে 'পরম'।

গাভী বিত্তান্তকে যাঁরা নারীবিদ্বেষী বলেছেন তাঁদের বলি, বিষয়টা নিয়ে আরো ভেবে দেখুন। শেক্সপিয়র যতটা নারীবিদ্বেষী আহমদ ছফা ততটা নন এই উপন্যাসে। এই তুলনা সোফোক্লেসের 'আন্তিগোনে' পর্যন্ত টানা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে সেই টানাপোড়েনে যাব না। সেই কথাও আমি আমার কোনো কোনো প্রবন্ধে লিখেছি। (খান ২০০৩)

বাসনার অপর নাম যদি মানুষ হয় তো ইচ্ছা হয় আহমদ ছফাকে আমরা মানববিদ্বেষীও বলতে পারি। বাসনার ট্রাজেডি মানুষেরই ট্রাজেডি, ট্রাজেডি লেখককে যারা মানববিদ্বেষী বলেন তাঁরা হয়তো সত্য কথাই বলেন।

দোহাই

১.খালেদা খাতুন গয়রহ, ''আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা' এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ক নিয়ে অধিপতির ভাবনাজাল ॥ চিঠি', রাষ্ট্রসভা পত্রমালা, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০০২)।

২.সলিমুল্লাহ খান, 'বাসনার নীতিভাব: ফ্রয়েড ও লাকাঁ', গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন কেন্দ্র, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০০৩); অলিখিত বক্তৃতা।

৩.শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ' (১৯৩৬), হাবিব
রহমান সম্পাদিত, মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন: সভাপতিদের অভিভাষণ
(ঢাকা, ২০০২)।

৪. আহমদ ছফা, রচনাবলী–৪ (ঢাকা, ২০০৩)।

৫. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা, ১ম খ (কলকাতা, ১৯৮৫)।

৬. Syed Manzoorul Islam, 'Death in the Afternoon: The Passing Away of Ahmed Sofa', মোরশেদ শফিউল হাসান ও সোহরাব হাসান সম্পাদিত, আহমদ ছফা স্মারকগ্রন্থ
(ঢাকা, ২০০৩)।

৭. M. Stutley and J. Stutley, A Dictionary of Hinduism: Its Mythology,
Folklore and Development, 1500 B.C.–A.D. 1500 (London, 1977).

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুই উপন্যাস

মা ম্‌ন হু সা ই ন

সেপাই সংক্রান্ত সুসমাচার

`The one important thing is to find TIME within TIME.... It is enormously difficult, but It has to be done!'

Andrey Tarkovsky

Stavrogin : ... in the Apocalypse the angel swears that there'll be no more time.
Kirillov : I know. It's quite true, it's said very clearly and exactly. When the whole of man has achieved happiness, there won't be any time, because it won't be needed. It's perfectly true.
Stavrogin : Where will they put it then?
Kirillov : They won't put it anywhere. Time isn't a thing it's an idea. It'll die out in the mind.

F. Dostoievsky, The Possessed

এতকাল বাদে চিলেকোঠায় আটক জনৈক ' সেপাই' দেখতে-দেখতে , কিম্বা ব্যক্তিগত পুরনো নোট বই উল্টাতে উল্টাতে– সময়ের রকমফের নিয়ে এই দুটো কথা আলাদা করে পড়তে থাকি আবার। ইলিয়াস ওঁর মহানুভবতায় 'চিলেকোঠার'... একখণ্ড 'সেপাই', আমার সকল অর্বাচীনতা সত্ত্বেও, ওঁর উপন্যাস লেখার সম্মানিত কলমে নিজের সই-তারিখ সহ দান করেন, ওঁর 'মনোরম মনোটোনাস' শহরে চা পানের নেমন্তন্ন জানিয়ে। ১৯৮৬-এর ঢাকা শহরে তখন শীতকাল। ফলে বৃষ্টির সৌন্দর্য পান করার সুযোগ সেদিন হারিয়ে ফেলি;... মনোরম মনোটোনাস শহরে অনেকদিন পর আজ সুন্দর বৃষ্টি ছিল,... এই বাক্যবন্ধনের আন্দাজ আমি তখনি খুঁজে পাই না। অথবা রিকশা জলের ভেতর ছল ছল এগুতে-এগুতে গোটিয়ার বিলে নৌকা হয়ে গেল– এই চিত্রটি বুঝতেও আমাদের ঊনবুদ্ধিতে সামান্য বিভ্রম হয়। ফলে বৃষ্টির মাতাল মিউজিক, পাতাবাহারের ভিজে গন্ধ এবং বিষাদবর্ণ দেওয়াল শুরুতেই আমাদের অধরা থেকে যায়।

উপন্যাসের পৃষ্ঠা এ-যাত্রা খুবলে দেখার মতো, কোনো প্রকার সমন্বয় ছাড়া-ই উল্টে উল্টে দেখি; আর পুরনো সময়ের আঁশগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করি। একটি

ঘোষণা হয়েছিল পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কালে– ইলিয়াসের প্রকাশিতব্য উপন্যাস, 'অন্ধকারকে কেঁদে'। বলাবাহুল্য এই নামে কোনো উপন্যাস ইলিয়াস প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ খবর হয়, গণঅভ্যুত্থানের বছর 'চিলেকোঠায়' নামে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্প একদিন নিশ্চিহ্ন হয় অথবা চোলাই হতে-হতে 'চিলেকোঠায়' উপন্যাসে রূপান্তরিত হয়। ইতঃমধ্যে বঙ্গবন্ধু নিহত হন এবং সে-বছর-ই প্রথম এই উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে দৈনিক সংবাদের সাহিত্য-পাতায়। কিন্তু অচিরেই কর্তৃপক্ষ ভীত হয় অথবা উপন্যাসের দ্রোহে সন্ত্রস্ত হয়ে ছাপা বন্ধ করে দেয়– "...তখন সংবাদের অদ্ভুত ধারণা হল যে সেই Govt. highly pro-Pakistani, সুতরাং পাকিস্তান নিয়ে কোনো ঠাট্টা করা যাবে না। আমার উপন্যাসে তো পাকিস্তান নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা ছিল। একটা Charactar আছে না? basic democrat রহমতুল্লাহ, যে ডাঁট মারতে মাঝে মাঝে জিন্নাহ টুপি পড়ে। ওরা ছাপালো basic democrat, পাকিস্তান, জিন্নাহ শব্দগুলো বাদ দিয়ে। ... আমি ভীষণভাবে Protest করলাম। ... বললাম আপনারা যে ছাপতে পারছেন না সেটা লিখে দিন।..." ইলিয়াসের মতামত ওরা মেনে নেয়।

এবার দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। ১৯৮১-তে সাপ্তাহিক 'রোববার'-এ ধারাবাহিক ছাপা হতে-হতে ১৯৮৩-তে সমাপ্ত হয়, এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ পায় ১৯৮৬-এর অক্টোবরে। ইলিয়াস আনন্দিত হয়েছিলেন, উৎসর্গকৃত পুস্তকটি বাবার হাতে দিতে পেরে। বাবা পুস্তক প্রকাশের দশ মাসের মাথায় যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন মনোরম মনোটোনাস শহরে তীব্র বৃষ্টিপাত আর সারা শহর জলমগ্ন। জলস্রোতে ভাসতে-ভাসতে, ইলিয়াস পিতৃবিয়োগ উদযাপন করেন এবং ঘরের মধ্যে জমে ওঠা জলরাশি থেকে গ্রন্থ বাঁচানোর জন্য মরিয়া হন।

মোটা দাগে, ওঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকাঠার ...' আঁতুড়ঘর এই ভাবেই, একদা রচিত হয়। জিজ্ঞাসু হলে ইলিয়াস উপন্যাস লেখার স্টুডিওতে একদিন আমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। উপন্যাসের শুরুতে তালেবকে আত্মহত্যার প্রণোদনা দেয়া গেলেও, পরে সে মারা যাবে গুলিতে। আবার উপন্যাসের অনেক চরিত্র, অনেক নাম আমি গল্পেও ব্যবহার করেছি– 'এক জায়গায় যে চরিত্রটাকে সম্পূর্ণ দেখাতে পারিনি অন্য জায়গায় তাকে আবার আনি। প্রলেতারিয়েত চরিত্র বলতে যা বোঝায় আমার মনে হয় খিজির তাই। বাকি দুজন, আনোয়ার এবং ওসমান middle class. আমি আলীবক্সকে আরও devolop করতে পারতাম। এটা আমার খুব ভুল হয়েছে। ওসমান নিঃসন্দেহে এদেশেরই একজন ছেলে হতে পারে। তবে ওসমানের ভেতর প্রথম থেকেই একটা rootlessness আমি তৈরি করতে চেয়েছি। তার একটা ভিত্তি তৈরি করা দরকার ছিলো। তার Physical ভিত্তিটা তৈরি করলাম India তে তার Origin-টা দেখিয়ে। এতে তার প্রাথমিক কিছু Helplessness দেখানো যায়। এটাকে অবশ্য লেখকের সুবিধা করে নেয়া বলতে পার। ওসমানকে আমি আনতে চেয়েছি এমন একজন মধ্যবিত্তের প্রতীক হিসেবে যে আসলে মানুষের অগ্রযাত্রায় যোগ দিতে চায়। ওসমানের মধ্যে সম্ভাবনা সেইটুকু যে ওসমান মধ্যবিত্তের কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। আনোয়ার তো ওসমানের চিলেকোঠায় নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে। ওখানে আমি দেখিয়েছি আনোয়ার কেমন অঘোরে ঘুমাচ্ছে, তার মাথার উপর চারকোণা মশারী, তার চারপাশে দেয়াল অর্থাৎ সে

আবদ্ধ। কিন্তু ওসমান দরজাটা ভাঙল এবং খিজিরের ডাকে বাইরে বেরিয়ে আসল। ... কিন্তু সে বেরিয়ে আসতে গিয়ে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় যা যা করছে সেগুলো Suggest করছে সে তার মধ্যবিত্ত কোটরকে অস্বীকার করছে। যেমন সে বেরিয়ে আসবার আগে তার চিলেকোঠার ঘরটায় চারিদিকে আচ্ছামতো পেচ্ছাব করল, তারপর ধর সেই রঞ্জু ছেলেটাকে সে চুমু খেল এবং তাকে মেরে ফেলার Attempt নিল। এখানে কিন্তু হোমো-সেক্সচুয়ালিটির কোনো ব্যাপার নেই। ওসমান শুরু থেকেই রঞ্জুর মধ্যে তার ছেলেবেলাটা দেখতে পায়, তার প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা অনুভব করে। এটাকে নার্সিসিজম বলতে পারো। মধ্যবিত্ত মানুষেরা কিন্তু basically নার্সিসিস্ট, লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই ওসমান পড়ার মধ্যে শুধু পথের পাঁচালী পড়ে। কারণ পথের পাঁচালী পড়ে যতটুকু আরাম পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর পড়ে ততটুকু আরাম পাওয়া যায় না। তো ওসমানের রঞ্জুকে হত্যা করতে চাওয়ার যে চেষ্টা এর মধ্যে সে আসলে তার অতীতকেই হত্যা করতে চাইছে, তো এসব যখন করছে তখন কিন্তু ওসমান no more a middle class man. মধ্যবিত্তের এই পরিণতি আমি চাই। সেটা কিভাবে হবে আমি জানি না। আমার কাছে কোনো Answer নেই। তবে আমি মনে করি ওসমানের ঐ পরিণতিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। হাঁ চেংটুকে দিয়ে আমি ব্যাপারটা ঘটাতে পারতাম। কৃষকদের leading-এ আনতে পারতাম। তবে একটা ব্যাপার কি' ৬৯-এর movement -টা যদিও গ্রামে ব্যাপকভাবেই ছড়িয়েছিল কিন্তু নেতৃত্বটা essentialy ছিল শহরেরই হাতে। আওয়ামী-লীগ শ্রেণীর ব্যাপারটাকে চাপা দিল বাঙালিত্বের ধুয়ো তুলে। মুজিব জেল থেকে এসে প্রথমেই বললেন আপনারা শান্ত হোন। বললেন, আমরা সবাই বাঙালি। আমার মনে আছে রেক্স-এ একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম, আমাদের পাশের টেবিলে এসে বসলেন খন্দকার মোস্তাক, বাইরে তখন প্রচ ঁ মিছিল, মিটিং্ । মোস্তাক খুব ক্ষেপে গিয়ে বলছিলেন, এত Wild হওয়ার কোনো মানে হয়? এই Wildhorse এখন কে সামলাবে? এটাই হল typical বুর্জোয়া Politics-এর কথা। তারপর ধর, শেখ মুজিব যেদিন ৭ই মার্চের বক্তৃতা দিয়ে ফিরছেন। আমি ঐ শাহবাগের মোড়ে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে কিভাবে যেন মুজিবের গাড়ির একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, একেবারে মুজিবের গাড়ির জানালার পাশে, মুজিব জানালা দিয়ে People -কে দেখছেন। সেদিন তাঁর চোখে আমি দেখেছিলাম ভয়, Nothing but fear। ভাবছেন বোধ হয় এই লোকগুলোকে তিনি কোথায় নিয়ে যাবেন? .. আর মানুষ তো তখন শুধু পাকিস্তান থেকেই মুক্ত হতে চায়নি আরও অনেক কিছু চেয়েছিল।"

অন্য ঘর অন্য স্বর খুঁজতে-খুঁজতে ইলিয়াস তখন এইভাবে মানুষের নানান আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নবৃত্তান্তের খবর জমা করতে শুরু করেছেন। ওঁর নিজের এই ব্যাখ্যারাশি আর বইয়ের ব্লার্ব মিলিয়ে উপন্যাসের একটা কেজো-সারমর্ম আমরা খুব সহজেই আবিষ্কার করে ফেলি। আমাদের মেধাবী-বন্ধুরা নানান প্রশ্নবাণে ইলিয়াসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান– কেন আলীবক্স আরো জীবন্ত হল না? গ্রাম-শহরের জোড় আর কীভাবে রাখা সম্ভব ছিল? চেংটুর মৃত্যুর সঙ্গে গ্রামীণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ কী? কেন শিল্প-শ্রমিকের ভূমিকা নেই উপন্যাসে? কেন অজস্র শ্ল্যাং, কেন আনোয়ারের

পলায়ন আর শেষমেষ ওসমানের গৃহত্যাগ? কাটা পা নিয়ে, ক্র্যাচে ভর দিয়ে, ইলিয়াস বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এই সব প্রশ্নের জবাবে আর এক দফা টীকা-ভাষ্য রচনা করতে পারতেন। কিন্তু এক্ষনি সেই সুযোগ না থাকায় বেঁচে থাকা পাঠকেরা বিবিধ গল্প-গাছায় আনায়াসে জড়িয়ে যায়। চারশ বত্রিশ পৃষ্ঠার উপন্যাস আমরা এবার আঙুলের মাথায় উল্টাতে উল্টাতে নিজেদের পছন্দমাফিক গল্প বানাতে শুরু করি– এখন খাকি বল কালো বল, সবুজ বল সাদা বল– কারো সাধ্য নেই যে তাকে সেই ওসমান গণি বলে সনাক্ত করে। আইয়ুব খানকে প্রথমবার ইট লাগাতে পারেনি বলে তার যে গ্লানি হয়েছিল পরবর্তী সাফল্যে তা একেবারে মুছে গেছে। এই সাফল্য তার চেহারা ও গলায় পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষের ভার অর্পণ করে। দিছি, খানকির বাচ্চারে এক্কেরে নামাইয়া দিছি। রাস্তার ধুলামাটি ও কফ থুথু মাখা গায়ে চিৎপটাং রাষ্ট্রপতির কপালে ও মাথায় সে কয়েকটা লাথি মারে। ...হাঁ বাঙালি আর্মির পেছনে পিপলের টাকা খরচ হবে, তাতে মানুষের লাভ কী? বাঙালি আর্মি তখন চেপে বসবে বাঙালির ওপরেই, বাঙালি ছাড়া আর কার ওপর দাপট দেখাবার ক্ষমতা হবে তার? বাঙালি কর্নেল সাহেব বাংলা ভাষায় শুয়রের বাচ্চা বললে কি তার পা জড়িয়ে ধরে বলব আ মরি বাংলা ভাষা! .... তোমাদের অটোনমিতে বাঙালি সিএসপি প্রমোশন পাবে, বাঙালি ক্যাপ্টেন সায়েব মেজর জেনারেল হবে, বাঙালি আদমজি ইস্পাহানি হবে। তাতে বাঙালি চাষার লাভ কী? ... বাপদাদার রক্ত তুমি শরীর থ্যাকা বার কর‍্যা দিবার পার? দ্বিধাগ্রস্ত আনোয়ারকে বারবার রক্তের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয় জালাল মাস্টার। ... হারামজাদা অর মায়ের কাছে খালি তোমার গপ্পো করছে বাবা। তুমি আজ ঢাকাত যাবা শুন্যা ফজরের আগে আত থাকতে উঠছে, পিঠা বানায় আর কান্দে! মেয়ে মানুষ তো! খালি কান্দে। এই কান্নাস্রোতে ডুবতে-ডুবতে ইলিয়াসের সঙ্গে আমাদের পরিভ্রমণ আরো দীর্ঘতর হয়। সময়ের ভেতর ক্রমাগত অন্য এক সময় কী ভাবে আসে, কিভাবে ছোট সময়-বড়সময় এবং ব্যক্তিগত সময়ে আমরা লীন হতে থাকি– তার তীব্র আয়োজন আমাদেরকে নাছোড় করে। ওঁর ক্রোধ-দ্রোহ-আনন্দ-ঘৃণা আর স্বপ্নময় বাক্যরাশি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, ওঁর ভাষা বাক্য নিয়ে তুমুল তর্ক হয়। ওঁর লেখার ভেতর কালচারাল থিয়োরির মানুষেরা তত্ত্ব খোঁজে। ওঁর লেখার ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ ভ্রূ-কুটি করে। আর আমরা কমবুদ্ধির মানুষ ওঁর বাক্যের মধ্যস্থিত শূন্য স্থানে আমাদের অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন আর স্মৃতির নুড়িপাথর ফেলে বিপুল জনারণ্যে নিখোঁজ হই– যেন সময়ের এই পাথর চিনে-চিনে ফের ঘরে ফিরতে পারি। দেখি হাত উচুঁ করে জুম্মন শ্লোগান দিচ্ছে, তার পাশে আরো কয়েকটা পিচ্চি। গলি উপগলি শাখাগলি থেকে এই যে ছলকে ছলকে মানুষ আসছে এর ফলে সামনে পেছনে মিছিল কেবল বেড়েই চলে। ...হাজার হাজার মানুষ কারফ্যু ভেঙে ছুটে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে।...চুতমারানি মিলিটারিকে আজ ভাগিয়ে দেবে পেচ্ছাবের ফেনার মতো।...

কিন্তু মিলিটারি আমাদের শহরে কদাচিৎ মূত্রজলে স্নাত হয়। রাষ্ট্রপতির স্নেহধন্য– সৈন্যবাহিনী সারা রাত অস্ত্র তাক করে রাখে খিজির, ওসমান, জুম্মনের মা,

রানু, চেংটু, আনোয়ার এবং নাদুপরামানিকের দিকে। মৃত্যুভয় এড়াতে আমরা চিলেকোঠায় আশ্রয় নিই অথবা প্রাচীন তালপাতার সেপাইয়ের মতো চিলেকোঠা ত্যাগ করি রাতের অন্ধকারে। আমরা অতঃপর নগরের শোভা দেখতে-দেখতে নির্বিষ হই। আমরা সেলফোনে উন্নয়নের গান শুনি, আমরা দারিদ্র্য বিমোচনের 'নাইট' হই, শান্তি পুরস্কার পাই, তেলগ্যাসের ইজারা দিই আর ব্যাসিক ডেমোক্রাটদের পরবর্তী আত্মীয়কুলকে নেমন্তন্ন দিই দেশের সর্বত্র শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য– প্রিয় আত্মীয়কুল গভীর পেশাদারিত্ব দিয়ে বোমা বানায়, বোমা ছোঁড়ে এবং মানুষ হত্যার সুনিপুণ ক্রীড়া-নৈপুণ্য ধ্যান-মগ্ন হয়।

উপায়ন্তর হয়ে সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে এবেলা আমরা ফের ইলিয়াসের চিলেকোঠায় যাই। শহরের সকল চিলেকোঠায় একবার ইলিয়াস সাহসের বীজ রোপণ করেছিলেন। সকল বন্ধ-খোলা চিলেকোঠা নিয়ে ইলিয়াস একবার একটি বই লিখেছিলেন। বইয়ের পৃষ্ঠার ভেতর ইলিয়াসের মুখ দেখি, ইলিয়াসের দুমড়ানো ক্রাচ দেখি, ইলিয়াসের রক্তপাত দেখি, আর দেখি আমাদের জনপদের প্রথম আখ্যানপর্ব।

ইলিয়াস ওঁর ভারি চশমা দিয়ে আমাদেরকে দেখেন, আমাদের চারপাশকে দেখেন, আর আমাদের নতুন এক চশমা দান করেন আমাদের ক্ষীণদৃষ্টির শুশ্রূষার জন্য। ওঁর পুস্তক অনুবাদ করার জন্য এবার নানান পুস্তক জড়ো করি, নানান পুস্তকের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে ওঁর বাক্য স্পর্শ করি, নিজে-নিজে কথা বলি, নিজে তৃতীয় একজন হয়ে বাক্যের সরঞ্জাম খুঁজে পেতে আবিষ্কার করি, অথবা হয়তো অপরকেই বুদ্ধি যোগাতে শুরু করি, বাখতিনের মূর্খ-অনুকরণে– `to speak about himself means to address his own self with his own discourse....But while speaking with himself, with another, with the world, he simutaneously addresses a third party as well : he squints his eyes to the side, toward the listener, the witness, the judge. দেখি, ইলিয়াস কে এক ওসমানকে খুঁজতে নামেন। বাপের ওপর ওসমানের রাগ হয় (কারামাজভ কি একবার কোর্টে'র বারান্দা থেকে চিৎকার করেছিলেন– হু ডাজ নট ডেজায়র হিজ ফাদার্স ডেথ?)। একবার বাস করবে বলে পাকিস্তানে এল তো বাবা আবার ফিরে গেল কেন? এখানে বাড়িঘর কিছুই করল না। ইলিয়াস এই জায়গা থেকে বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের ধ্বংস ও নির্মাণকাল বর্ণনা করতে পারতেন। কেন কতিপয় বঙ্গীয় মুসলমান ভারতভূমি শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেনি, তার বিবরণ লেখা যেতে পারে; আবার এই উদ্বাস্তু-মুসলিম যুবকের খানিকটা অংশ এই বঙ্গে, খানিকটা ওই বঙ্গে– ইলিয়াস যাকে বলেছেন rootlessness, সে-ই কথাটিও আরো সবিস্তারে ভাবা যেতে পারে। কল্পনা করি– শিয়ালদা স্টেশনে ভলান্টিয়ার হাতে চিঁড়ে গুড়ের ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বলল, কোন ক্যাম্পে যাবেন? ক্যাম্প? সেই ইছামতী তীরের ঝুরিনামা বটের ছায়া থেকে কলকাতার ক্যাম্প! ওসমান ক্যাম্পে আটক না হয়ে আবদ্ধ হয় গওসল আজম স্যু ফ্যাক্টরির চিলেকোঠায়। ওসমানের পরামর্শে আমরা সময় ও স্থান বাঁচাতে অফিস, সিনেমা হল ও মসজিদে পায়খানা করি। রহমতউল্লা জিন্না ক্যাপ পরে মুকুটের মতো অথবা মসজিদে পায়খানা সেরে নানরুটি পায়া খায়।

লোকজন চাঁদা দেয় আগরতলা মামলা নিষ্পত্তির আশায়। স্টেডিয়াম গুলিস্তান ভিক্টোরিয়া পার্ক আর্মানিটোলা ঠাটারি বাজার বলাকা সিনেমা এবং নবাবপুরে হরতাল হয়, গুলি হয় এবং মানুষ মৃত্যুবরণ করে। লোকে হরতালের ভেতর কাপড় কিনতে যায় বাজিতপুর, বল্লা, কালিহাতি ও পোড়াবাড়ির হাটে। লোকে অবাক হয়– কুনো দ্যাশের ডাক্তারে ইস্ট্রাইক করছে শুনছেন? নিহত যুবকের মায়ের বিলাপে খাটিয়া ভারি হয়ে উঠছে। একজন বুড়ো মানুষ বারান্দায় একা একা রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে চলেছে। আমরা রঞ্জুর কালো বোনকে লুকিয়ে দেখি। পামগাছের বাচ্চারা মানুষের স্লোগানে ভালোভাবে ঘুমাতে পারেনি বলে খুব আস্তে আস্তে হাই তোলে। দেখতে পাই– রোজার মাস, লোকজন বড়্ডো থুথু ফেলে। লোকজন মেয়েকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ায় ও ছায়ানটে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখায়।

আর লোকজন ইংরেজি বলে– উই নিড প্রপার প্লেস ইন দ্য পলিসি মেকিং। তবে এ্যানার্কি সুড নেভার বি এ্যালাউড টু কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিওড্। কেউ কেউ ইলিয়াসকে এ্যানার্কি ব্যাখ্যা করার দায়ভার অর্পণ করেন– হু এভার ডিনাইজ অথোরিটি এ্যান্ড ফাইট্স এগেইন্সট ইট ইজ এ্যান এ্যানারকিস্ট। আমরা ইংরেজিতে ঝগড়াটা আর একটু উস্কে দিই– What is to be the form of Government in the future? .... why, how can you ask such a question? You are a republican. A republican! yes, but that word specifies nothing. Res publica; that is, the public thing. Now, whoever is interested in public affairs- no matter under what form of government, may call himself a republican. Even kings are republicans. Well, you are a democrat, No... Then what are you? I am an anarchist! ইলিয়াস প্রশ্ন তোলেন– ভোট দিলেই কি সব মানুষের জন্য গণতন্ত্র আসে? আর্মি ছাড়া গোটা পাকিস্তানে এরকম সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন আর কি আছে? ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো গ্যারান্টি তো তোমরা দিচ্ছো না। ... বাঙালি আর্মি তখন চেপে বসবে বাঙালির ওপরেই। বাঙালি আর্মির উপদ্রবের পাশাপাশি দূর গাঁ-গ্রাম থেকে গরু চোরের উপদ্রব নিয়ে চিঠি আসে। আমরা সমবেতস্বরে চিঠি পাঠ করি এবং হারমোনিয়াম পার্টির সমাজতন্ত্র-চর্চা নিয়ে মজা করি। আমরা হয়তো আমাদের লিবিডো এবং অবদমন নিয়েও দুঃখে মুষড়ে পড়ি– আমাদের সময়ে ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা কইলেই ফাইন হইত, ... আমাদের সময় ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বললে তার রেপ্ড হওয়ার ফিলিং হত, ... ছেলেদের কথা শুনে আবার কনসিভ না করে– এই ভয়ে মেয়েরা তখন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করত। মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলতে-বলতে সবাই ভারি রগুড়ে হয়ে পড়ে। দূরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ছবি ভেঙে ফেলার জন্য মন চঞ্চল হয়। শাহীন রেস্টুরেন্টের টুটাফাটা নোংরা পর্দা ভেদ করে আশা ভোঁসলে আমাদেরকে আরও খানিকটা চনমনে করে ফেলে। খবর হয়, হেভি টিয়ার গ্যাস মেরেছে। কানা আবুলের হোটেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রিকশা গ্যারেজের বদ জিন ক্রিং ক্রিং বেল বাজায়। খিজির মায়ের রক্তে ভাসা শরীর দেখে।

দেখে মহাজনের প্রথম বউকে– ৩ বার ৪ বার গোসল করে, ২৫ বার অজু করে আর হাত ধোয় ৫০ বার। গ্যারেজ থেকে তারপর বেরিয়ে মানুষ ওয়াহেদ মুরাদ-জেবা আর সুচন্দা-রাজ্জাকের ছবি দেখে। মানুষ সিনেমার টিকেট ব্লাক করে। এক ফাঁকে বৌয়ের ফুলে ওঠা সিনা দেখে অথবা গোপনে পরস্ত্রীকে ব্রেসিয়ারের প্যাকেট উপহার দেয়। তখন কেউ বক্তৃতা ঝাড়ে– মানষে বোঝে না। এইগুলি ইন্ডিয়ার মতলব। ওয়ারে ডিফিট খাইয়া ইন্ডিয়া অহন এই ট্যাকটিস ধরছে। বক্তৃতা শেষ হলে মানুষ রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে এবং এনএসএফ-এর গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়। হয়তো কারোর ধূমতেষ্টা পায় তখন। নরসিংদি ডিপোতে ওয়ার্কাররা হয়তো তখন স্ট্রাইক শুরু করেছে। হয়তো তখন মিটিং শুরু হয় কোথাও। পাবলিকে শহীদের ভাইয়েরে দ্যাখবার চায়। কেউ বলে, আইয়ুব খানের লোক্যাল এজেন্টদের এক্সপোজ করা দরকার। মিটিংয়ের ভেতর কেউ প্রেমিকা এবং ডিউওডীনাল আলসার নিয়ে কথা শুরু করেন। কেউ দীপচাঁদ মুচির আত্মহনন প্রকল্প বর্ণনা করতে-করতে আউশের কালচে-হলুদ গন্ধ পায়। মানুষের ঈমান নাই। ভোটের আগের রাতে মটর সাইকেল নিয়া দুইজন মানুষ আসলো, ভটভটি ওয়ালারা টাকার বস্তা নিয়া আসছিল, সব ভোট পড়ল ফুল মার্কাত। আমার ভোটটা নষ্ট হল। নষ্ট ভোটের বেদনা ভুলতে কেউ সিরাজউদ্দৌলা ছবির সংলাপ মুখস্ত বলে। আবার কেউ চন্দনদহ কলেজের ফান্ড তৈরির যাত্রা-অনুষ্ঠানে হাজির হয় কেরুর সিংহ মার্কা গোপন বোতল হাতে। ঐ রাতেই ৩ ঘর চাষার দুটো গাই, ৩ টেবলদ ও ১টা এঁড়ে চুরি হয়ে যায়। ধারাবর্ষার চরে গরুগুলো লুকিয়ে থাকে আর মানুষ কিংস্টর্ক জ্বালিয়ে ধূমতেষ্টা দূর করে, অথবা মোষের দুধ দিয়ে সের দেড়েক চালের ভাত খায়। নদীর ভেতর ঘোড়ার ডাক শুনে সেদিন সবার ঘুম ভেঙে যায় অতি ভোর-ভোর। বাথানে আগুন ধরানো হয় এবং ডাকাতমারা চরে সিন্দুরিয়ার মেম্বারকে পোড়ালে সহসা চেনা যায় না। আমাদের শহরের রাস্তায় তখন 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স' পুড়ে যাচ্ছিল। ভয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী পদ থেকে রিজাইন দেয় পোস্তাগোলার পিয়ারু সর্দার। আলিবক্স রায় পাঠ করে– সর্বসম্মতি ক্রমে এই গণআন্দোলন মোহাম্মদ খয়বার হোসেন গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর আগেই গাবগাছের পাশে ধানকাটা জমিতে ভোরবেলা চেংটুর লাশ পাওয়া গেল। মৃত্যুকাল স্মরণীয় করার জন্য চেংটুর মা ভাপাপিঠে তৈরি করে। মানুষ ভাপা পিঠের সুগন্ধ আস্বাদ করে আর ওসমানের আবৃত্তি দেখতে দেখতে, ওসমানের গায়ে ইঞ্জেকশন প্রবিষ্ট করার আয়োজন নেয় তড়িঘড়ি। আমরা রিজনিং অফ ম্যাডনেস নিয়ে প্রবন্ধ বানাই এবং মানুষের স্যানিটি নিয়ে রাত ভর ঝগড়া করি। আমরা ইয়ুং-এর কথা তুলে প্রবন্ধ শক্ত-পোক্ত করার আয়োজন নিই– মানুষ আসলে অশান্তির মধ্যেই শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়, ... the yearning for rest that arises in a period of unrest.

ওসমানের গৃহত্যাগের সঙ্গে পুরাকালের এক ছবি এসে তখন ভিড় করে– ১৯৭৫এর জ্যাক নিকলসনকে দেখতে পাই স্টেট মেন্টাল হসপিটালের করিডোরে, ... আর অনুভব হয়, কেউ যেন দূরে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, ওসমানের জামা কাপড় গায়ে

নিকলসনের মত পা ফেলে ফেলে আমরা এই দৃশ্যের ইংরেজি শিরোনাম দিই– ওয়ান ফ্লু ওভার দ্যা কাক্কুস নেস্ট!

ইলিয়াসের সঙ্গে এরপর সহসা আর দেখা হয় না। ওঁর উপন্যাস ভাবনা নিয়ে, যে-সব প্রশ্নমালা তৈরি করেছে আমাদের বন্ধুরা, তা আর পৌঁছানো যায় না। চিলেকোঠা আজ আশ্চর্য শান্ত, নীরব এবং জনশূন্য।

ইলিয়াসের অন্যতম বন্ধু মোহাম্মদ রফিক বললেন, বাঙালি মুসলমান ছেলেরা কেমন হয় এটা আমি ইলিয়াসের সঙ্গে মিলে শিখেছি। আমরা বলি– বাঙালি মুসলমান কীভাবে আধুনিক মানুষ হয়, কিভাবে উপন্যাস লেখে, কিভাবে মার্গসঙ্গীত শোনে, কিভাবে শুভলক্ষী শুনতে শুনতে বাবার মৃত্যু দিন উদযাপন করে, কিভাবে ফিল্ম-সেন্স তৈরি করে, কিভাবে সংস্কৃতির ভাঙাসেতু মেরামত করে, কিভাবে মহাশ্বেতা দেবীর মাস্টার সাব হয়,– তার প্রমাণ খুঁজতে আমরা যাই ইলিয়াসের আশ্চর্য-কর্মময় জীবন-যাপনের গভীর ভেতরে।

ধরা যাক, এই তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কালে চিলেকোঠার ওম বিসর্জন দিয়ে ইলিয়াসের কাঙ্ক্ষিত সেপাইবৃন্দ বগুড়া শহরের ঠনঠনিয়া গোরস্থান দেখতে গেছে ৪ঠা জানুয়ারি; আর কী আশ্চর্য, ফেরার কালে সবার হাতে সেপাই বিপ্লবের এক-একটি গোপন খোয়াবনামা। আমরা পৃষ্ঠা উল্টাই, তরুণ বন্ধুরা ভ্রূকুটি করে– ইলিয়াসের লেখায় তীব্র বিপ্লবের ঝাঁঝ কোথায়? ইলিয়াসের হয়ে জবাব দেয় বাকুনিন– Revolutions are not made, either by individuals or by secret societies. They come automatically in a measure; the power of things, the current of events and facts, produces them. They are long preparing in the depth of the obscure consciousness of the masses- then they break out suddenly, not seldom on apparently slight occasion. ফলে বিপ্লবের অপেক্ষায় পুস্তক হাতে আমরা অপেক্ষা করি আরো বহুদিন। আর কী আশ্চর্য, ইলিয়াসের আশঙ্কানুযায়ী আমাদের চার পাশ ঘিরে থাকে ক্যান্টনমেন্টের সম্মানিত বাঙালি সৈন্যদল এবং তাদের অপরূপ-পবিত্র বশংবদ বৃন্দ।

দুই

খাবনামায় আমাদের ভাবের ব্যায়াম

একদা তীব্র যুদ্ধের কালে ঈষৎ শুকনো গড়াই পেরিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম মায়ের অকাল-বিধবা এক ফুপুর বাড়ি। ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে তিনি শুকনো বরই চূর্ণ করছিলেন। বাড়িতে শহর-পলাতক মানুষ গিজগিজ করছে। বড় একটি টেবিলের ওপরেও মানুষ শুয়ে আছে। নাকি কেবল শিশুরা ঘুমুচ্ছিল? আনমনে পেতলের হাতলওয়ালা ড্রয়ার খুলে আমি সেই প্রথম স্বপ্ন বিষয়ক পুস্তকের সন্ধান পাই– যদি ও আসল নূরানী মোহাম্মদী খাবনামা, ফালনামা ও তাবীর। বইয়ের সব কথা ঠিকঠিক এখন মনে নেই। আবছা স্মরণে আসে– শুরুতে ছিল বারো রাশির স্বভাব বর্ণনা। অক্ষর ধরে ধরে 'যুদ্ধ' খুঁজি, কিন্তু স্বপ্নের বইয়ে যুদ্ধ দেখার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

অগত্যা ডিকশনারির অক্ষরের মতো পাতা উল্টে উল্টে– কবর, আবাদি জমিতে নামাজ, আগুন জ্বালানো, লাল চাদর, উট, কুরআন শরীফ চুরি করা, কুয়ার মধ্যে আযান, জিহাদ, মৃত ব্যক্তির গায়ে সবুজ কাপড়, মৃত ব্যক্তিকে ক্লান্ত ইত্যাদি দেখার বর্ণনা পড়ি। সারা-যুদ্ধ রেডিও'র ভেতর যুদ্ধের উত্তেজনা শোনা এবং ড্রয়ার খুলে স্বপ্ন দেখা– শৈশবের বিরাট এক অলস-কাল এইভাবে পাড়ি দেয়ার পর মধ্য ডিসেম্বর, শীত-কুয়াশা ভেদ করে পতাকার মতো সূর্য নামে আমাদের ঘর-বাড়িতে। এবার স্বপ্ন-পড়ার বদলে আমাদের দুর্বল-অপুষ্ট চোখ দেখতে শুরু করে কেবল স্বপ্ন এবং স্বপ্ন। উচ্চ নম্বরের সিঁড়ি বেয়ে মই-এর মাথায় পৌঁছানো, নাকি ইকারুসের আকাশ দেখা– সেও স্বপ্নের এক ঘোর বটে। কোন্ কোন্ তারিখে স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন সত্য হয়, তার একটি তালিকা পাই। মায়ের আয়ুষ্মান দাদিমার মুখে– কাক ডাকা, হাঁচি দেয়া, টিকটিকির শব্দশোনা এবং গলাবুকে তিল থাকার ফলাফল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার অবকাশ হয় কখনও। পরে চাকুরির স্বপ্নে 'আদি খাবনামা' বিস্মৃত হয়ে, পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে জন্মগ্রহণের পর, আবার জটিল এক মেটামরফোসিসে যখন চাকুরির পাঁকেই ডুবে যাচ্ছি, তখন দেখতে পাই– অমল ধবল চাকুরির সুটকেস কাঁধে নিয়েই কে একজন ইলিয়াস এই ঢাকা শহর– এই পুণ্ড্রশহর করতে করতে পুস্তকের স্বপ্নে দলছুট হয়ে গেলেন, নাকি স্বপ্নে 'আসল খাবনামা' প্রাপ্তির আশায় নতুন তদবির শুরু করেছেন মহাস্থানগড়ের মাজার শরিফে! সুটকেসের ভেতর টাইপ রাইটার রাখতে গিয়ে, চামড়া অনেকখানি ঢিলে ঢালা হয়ে গেছে– ইলিয়াস বুঝতে পারেননি। মাজারের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নামে যেয়ে, অথবা মায়ের কর্কটাক্রান্ত প্যাংক্রিয়াস মেরামতের শেষ চেষ্টা হিসেবে ধন্বন্তরীর ভিটে থেকে হরলিক্সের এক শিশি ধুলো নিয়ে নামার সময় সুটকেস গলে কতিপয় কলিন ইউলসন, কাজানজাকিস এবং জয়েস পড়ে যায়, একদা জেনারেলের ছেঁড়া সুটকেস থেকে ঝুলে পড়া অধুনা-রাজপুত্রের কনভয়ের সামনে। কাজানজাকিস, মিলিটারি-চাকার সঙ্গে কান্তাজিউ'র মন্দিরে পৌঁছে, একটি বাঙাল মন্দির ও ডেলফি'র মন্দির নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় মগ্ন হলেন গোপনে। অন্যদিকে মোটা বই বিক্রির সময় ভালো মুদ্রা পাওয়া যায়– এই ভেবে মাদ্রাসার অল্পবয়সী হাফেজ রেহেলের পাশে জাগ্রত ফিনেগানকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আর কলিন উইলসনের দুর্বল সেলাই বিবাগি বাতাসে তছনছ হয়ে আমাদের পাঠশালা, সরাইখানা, মসজিদের বারান্দা এবং চলন্ত বাসের আসনে লুকিয়ে গেল। ফলে তীব্র জনবিক্ষোভের মধ্যেও খানিকটা আউটসাউডার হওয়ার সুযোগ আসে; অসংলগ্ন পৃষ্ঠা হাতে নিয়ে কেউ পড়ে, অথবা বুক পকেটে জনসভার কাগজের মতো ভাঁজ করে রাখে। (... ম্যান ইজ আ ইউজলেস প্যাশান। জগতটা মোটের পক্ষে বসবাসের জন্য মন্দ নয়। তুমি কি সন্তুষ্ট? নয় কেন? তাহলে কি বলব, পৃথিবীতে তুমি খুবই সহনীয় এবং আনন্দময় সময় কাটাতে সক্ষম? নিশ্চয়ই। কেন, তুমি কি অন্য কিছু ভাব? না, সত্যিই আমি দুঃখিত, এখন পর্যন্ত তোমার মতো ভাবতে শিখিনি। কখনও মনে হয় আমি মরণোত্তর সময় কাটাচ্ছি। শুনুন জনাব, আপনি দেখছেন এবং খুব বেশি ভেতরে দেখছেন, আমরা বাঁচি

পুরনো দিনের ভেতর। কিয়ের্কেগার্ডের আত্মার ভেতর লুকানো আছে এক ধরনের ধর্মীয় বোধ। কেউ কি নিজেকে অস্বীকার করে বাঁচে? মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিনে লোকটি ঠিক কী করেছিল, আপনার মনে পড়ছে? - সব শোক বিস্মৃত হয়ে সাঁতার কাটল সুইমিংপুলে, একটি মেয়ের সঙ্গে লিয়াজো করল, আর সবশেষে টিকেট কেটে কমিক ফিল্ম দেখল। এই লোকটিকে ফাঁসিতে ঝুলান যায়, কারণ সে মায়ের মৃত্যুতে বিশেষ কান্না করেনি। মুক্ত জীবন কি খুব আতঙ্কের? হয়তো এতে সমস্যা আছে, অথবা নেই। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে– এরকটি কখনও দেখেছেন? একটি হলুদ পাতা, সামান্য সবুজ, কোণাগুলো দুমড়ানো, বাতাসে উড়ে গেল। প্রতি শীতে, যখন খুব ছোট, আমি চোখ বন্ধ করে একটি সবুজ পাতাকে ভাবতাম, পাতার শিরা এবং পাতার ওপর ভোরের সূর্য। এটি কি কোনো এ্যালিগোরি? না, নেহায়েৎ-ই একটি পাতার কথা। আসলে সবকিছু-ই বড় চমৎকার। সবকিছুকেই বলবেন? অবশ্যই। মানুষ অসুখী কেন জানেন, আসলে সে জানে না যে সে সুখী। ক্ষুধায় মারা গেলেন, ছোট্ট একটি মেয়েকে রেপ করলেন– এটিও কি ভালো? আমি তো তাই ভাবছি। জগতের সবকিছুই অদ্ভুত, বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর সুন্দর!) চিলেকোঠার সিঁড়ি ভেঙে ততদিনে ইলিয়াস স্বপ্নের জালে আক্রান্ত হয়ে মহল্লার কেউ কেউ আদি ও আসল নূরানী মোহাম্মদী খাবনামা খোঁজে। কিন্তু তখনি পায় না। আবার ভেতরে ভেতরে খুঁজে বার করার ইচ্ছাটাও মরে না সহসা। অনেকদিন পর, বরেন্দ্র শহরের একমাত্র জাদুঘরের সামনে একজন ভেন্ডার বই বিক্রির সাহসে পুরো ফুটপাত দখল করে নিলে, কী ভেবে এখানে দাঁড়াই। খুঁজতে খুঁজতে মোহাম্মদী খাবনামা পাই না বটে, কিন্তু দেখতে পাই অন্য বই– ছোলেমানী খাবনামা ও ফালনামা। বইটি আমার দখলে এলে, নতুন এক স্বপ্নবৃত্তান্ত এসে পথ আটকে দেয়। হাতের তালুতে 'দোয়াত' থাকলে মানুষ 'লেখক' হয়– স্বপ্নের ঘোরে তালুতে আমি দোয়াত খুঁজি কিন্তু দেখতে পাই 'ইঁদুর' আঁকা– এর অর্থ চৌর্যবৃত্তি। একজন পাবলিক সার্ভেন্ট চৌর্যবৃত্তি করছে, এই অপবাদ এড়ানোর জন্য অথবা হাত থেকে ইন্দুরের লোগো মুছে ফেলার জন্য দ্রুত অন্যত্র মনোযোগী হই। যেমন, আনন্দ ও সৌভাগ্যের জন্য কেউ আমাকে পরামর্শ দেয়- তালুতে চেয়ার, তসবিহ অথবা ত্রিভুজ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। জালস্বপ্নের ঘোরে আমি অতঃপর সারাদিন নদীর স্রোতরেখার মতো দুস্পাঠ্য কররেখার দিকে চেয়ে থাকি, অথবা, তালুতে গাভী, চেয়ার ও ত্রিভুজের ট্যাটু তৈরির জন্য সুইপারকলোনির বাবুলালকে ব্রাইব করি। মনোটনি এড়াতে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে এবার নক্ষত্র গিলে ফেলা দেখি। কুকুরের দুধ খাওয়া দেখি। আর দেখি কাফন চোরের খবর। ছোলেমানী খাবনামার প্রচ্ছদও এক ফাঁকে পড়ে ফেলি– গোলাপি বাঙলা হরফে নাম, নিচে দুটি বৃত্ত। প্রথম বৃত্তের ভেতর রাশির চিহ্ন। দ্বিতীয়টিতে ছুটে যাওয়া রকেট, শনিগ্রহ এবং কতিপয় নক্ষত্রের ছায়া।

সে-হিসেবে ইলিয়াসের খাবনামার রঙ এবং ছবি দুটিই আলাদা। স্বপ্নে পাওয়া এই পুস্তক প্রকাশের সংবাদ প্রথম দেন সদ্যবিবাহিত এক জ্ঞানমগ্ন যুবক। বিয়েতে তিনি দুটি খাবনামা পান। বিয়েতে প্রীতি উপহার- এই কথাটি মুছে তিনি তৎক্ষণাৎ এই

গ্রন্থের স্বত্ব দান করেন আমাকে। দেখতে পাই- ইলিয়াসী খাবনামার প্রচ্ছদে আমাদে এক অগ্রজ বন্ধুর নাম লেখা। কবে ইলিয়াসের কে এম দাস লেনে প্রচ্ছদ তৈরির বায়না নিয়ে ঢালি আল মামুনকে কব্জা করেছিলাম, এখন মনে পড়ে না। নাকি ওর ঘরে 'রেড বিয়ার্ড' দেখার পর এই যোগাযোগটা পোক্ত হয়েছিল, তা-ও স্মরণে নেই। গাঢ় বেগুনি জমিন জুড়ে লাল-সবুজের ছায়া, এর ভেতর লুকিয়ে আছে গুটিকয় মানুষ ও মাছের মুখ। চিত্রভাষা বলতে এই কয়েকটি রঙ এবং বস্তুখণ্ড ছাড়া অন্য কোনো গোপন রহস্য আমার কাছে আসে না। এক ফাঁকে প্রচ্ছদের পেছনে ঝুলে থাকা ইলিয়াসের পোর্ট্রেট দেখি আর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই ব্লার্বে : মেলাদিন আগের কথা। কাৎলাহার বিলের ধারে ঘন জঙ্গল সাফ করে সোভান ধুমা আবাদ শুরু করে বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে। ওইসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের আগুণতি ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান গড়ের দিকে যাবার সময় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সেপাই সর্দার টেলারের গুলিতে মারা পড়ে মুনসি বয়তুল্লা শাহ। কাৎলাহার বিলের দুই ধারের মানুষ সবাই জানে। বিলের উত্তরে পাকুড় গাছে আসন নিয়ে রাতভর বিল শাসন করে মুনসি। দূরে কোথাও ভূমিকম্প হলে যমুনা বদলে যায়। বন্যায় ভেঙে পড়ে কাৎলাহারের তীর। মুনসির নিষ্কটক অসিয়তে চাষিরা হয় কাৎলাহার বিলের মাঝি। খোয়াবনামা শুরু। বিলের মালিকানা চলে যায় জমিদারের হাতে। মুনসির শোলোকে শোলোকে মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় চেরাগ আলি ফকির। তমিজের বাপ শোলোক শোনে আর ঘুমের মধ্যে বিলে গিয়ে কাদায় পা ডুবিয়ে দেখতে চায় পাকুড়গাছের মুনসিকে। ভবানী পাঠকের সঙ্গে পূর্বপুরুষের জের টেনে বৈকুণ্ঠনাথ গিরি প্রতীক্ষা করে ভবানীর শুভ আর্বিভাবকে। তমিজ দেখে জমির স্বপ্ন। আর চেরাগ আলির নাতনি কুলসুম খোয়াবে কার কায়া যে দেখতে পায়, তার দিশা পায় না। তেভাগার কবি কেরামত শেষ পর্যন্ত আটকে পড়ে, শুধুই নিজের কোটরে; সে নাম চায় বৌ চায় ঘর চায়। কোম্পানির ওয়ারিশ ব্রিটিশের ডাণ্ডা উঠে আসে দেশি সায়েবদের হাতে। দেশ আর দেশ থাকে না। হয়ে যায় দুটো রাষ্ট্র। দেশি সায়েবরা নতুন রাষ্ট্রের আইন বানায়, কেউ হয় টাউনগামী, কেউ হয় কন্ট্রাক্টর! আবার নিজদেশে পরবাসী হয় কোটি কোটি মানুষ। হিন্দু জমিদার নায়েব বলে যাওয়ার পরও আজাদ পাকিস্তানে জমি আর বিলের মানুষ নিজেদের মাটি আর পানির পত্তন ফিরে পায় না। পাকুড়গাছ নাই। মুনসির খোঁজ করতে করতে চোরাবালিতে ডুবে মরে তমিজের বাপ। ভবানী পাঠক আর আসে না। বৈকুণ্ঠ নিহত। ক্ষমতাবান ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকর হয়ে বিল-ডাকাতির আসামি তমিজ পুলিশকে এড়ায়। কিন্তু তার কানে আসে কোথায় চলছে তেভাগার লড়াই। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তমিজ বেরিয়ে পড়ে তেভাগার খোঁজে। ফুলজানের গর্ভে তমিজের ঔরসজাত মেয়ে সখিনাকে নিয়ে ফুলজান ঠাঁই নেয় কোথায়! খোয়াবনামা সারা। কিন্তু মোষের দিঘির পাড়ে শুকনা খটখটে মাঠের মাটিতে দাঁড়িয়ে কাৎলাহার বিলের উত্তরে সখিনা দেখতে পায়, জ্বলন্ত হেঁসেলে বলকানো ভাত। খোয়াবনামার জিম্মাদার তমিজের বাপের হাত থেকে খোয়াবনামা একদিন বেহাত হয়ে গিয়েছে। এখন সখিনার খোয়াবি।

খোয়াবনামা স্বপ্নের ব্যাখ্যাতা। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যা বিবেচ্য তা স্বপ্ন নয়, স্বপ্নদেখা মানুষ।

ইলিয়াসের 'পা' তখনি হত্যা হয়ে যাওয়ার আয়োজন শুরু হয়নি। বই প্রকাশের আগে ওঁর ঘরে এই ব্লার্ব পড়বার নেমন্তন্ন দিয়েছিলেন– আমি ছিলাম আর ছিলেন জিনু ভাই (মাহবুবুল আলম), ইলিয়াসের খাবনামা উৎসর্গীকৃত হয়েছে এঁর নামে। ইলিয়াস ভালোবেসে ব্লার্বের টেক্সট কাঁটা-ছেঁড়ার দয়ার্দ্র নির্দেশ দিলে ভয়ে ও খানিকটা নির্বুদ্ধিতার জোরে গুটিকতক বিরামচিহ্ন ও শব্দ বদলানোর সুযোগ গ্রহণ করি। আর বইটি যখন প্রস্তুত হচ্ছে, এর 'কালাজ্বর' অংশ নিয়ে গুটিকয় কেতাবি কথা বলেছিলাম– অতি গায়ের জোরে বললে, এই পুস্তকে আমার এতটুকু অংশগ্রহণ! বাকি সমস্ত অধ্যায়, পৃষ্ঠা এবং বাক্য জুড়ে রয়ে গেছে জিনু ভাইয়ের অদৃশ্য টিকা-ভাষ্য। শহিদ কাদরী, কায়েস আহমেদ, মান্নান সৈয়দের মতো সুবিখ্যাত কেউ না হয়েও এদেশে ষাটের মূল ধাত খুব সহজ ভঙ্গিতে একবার তিনি বর্ণনা করেছিলেন– ষাট-এর প্রধান প্রফেট ছিলেন তিনজন : কলিন উইলসন, জয়েস এবং দিপ্তী ত্রিপাঠী! এইসব চকিত উজ্জ্বল মন্তব্যের পরেও জিনুভাই চিরকাল আড়ালে রয়ে গেলেন। ওঁর মৃত্যু-সংবাদ পেতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়; নেহায়েৎ ঔৎসুক্যে একটি চিঠি পাঠাই ওঁর ঠিকানায় দিন কয়েক আগে – চিঠির বদলে ওঁর পুত্র বলে, বাবা নেই! গত ০৮ ই আগস্ট ২০০৬ জিনু ভাই তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, ইলিয়াসের লোবানে ডুবু-ডুবু হয়ে দূর সাভারে ঘুমিয়ে গেছেন। ধীরে-ধীরে অনুভব করি, একটি চিরকালীন বন্ধুসভা আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেল– সেই যে বন্ধুকে নিয়ে লেখা, বন্ধুকে উৎসর্গীকৃত লেখা; অথবা যে বন্ধু কখনও লিখিয়ে নেয়, লেখার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখে, লেখার সরঞ্জাম যুগিয়ে যায়– সেরকম এক বিন্দু, কমরেড ও ভ্রাতৃযুগল এখন মেঘের ভেতর থেকে আমাদেরকে কেবল স্বপ্নভুক করে চলেছে।

স্বপ্নরাজ্য চাক্ষুস করার আশায়, হাতের নাগালে পাওয়া খ্যাতিমান কেতাবসমূহ এলোমেলো উল্টাই; সব বই পড়া হয় না, দু'একটি বাক্য কেবল মনে রাখার চেষ্টা করি। আরিস্ততল বললেন, স্বপ্ন হল জাগ্রত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। ফ্রয়েড ভাবলেন– ঘুমের সময় আমাদের ইন্দ্রিয় ঝিমিয়ে যাওয়ায় স্বপ্নেরা খুব সহজেই ডালপালা ছড়িয়ে দেয়। যিশুর জন্মের বহু আগ থেকেই মিশরে স্বপ্ন-লিপিবদ্ধ করার নথি নাকি পাওয়া গেছে ইদানিং। ইলিয়ডে আগামেমনন স্বপ্নে সংবাদ পেতেন। প্রাচীন গ্রীসে মানুষ মন্দিরে যেত স্বপ্নের মাধ্যমে রোগমুক্তির আশায়। গ্রীকদের এরকম একটি পুস্তিকার নাম শিখি– ওনিয়োক্রিটিকা। ইয়ুং-এর কাছে স্বপ্ন ছিল, বিবিধ আর্কিটাইপ এবং যৌথ অবচেতনার মিথষ্ক্রিয়া। ভারতবর্ষের অথর্ববেদ-এ দেখি স্বপ্নের বিস্তৃত বর্ণনা। ইসলাম যখন বিস্তার লাভ করছে, তখন ইবনে সিরিন স্বপ্নকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিক স্বপ্ন, শয়তান দ্বারা প্ররোচিত স্বপ্ন এবং নিছক শরীরীসত্তা দ্বারা তৈরি স্বপ্ন! এদের ভাষ্যে– স্বপ্নের অর্থ বদলে যায় শরীরের অবস্থান এবং স্বপ্ন দেখার সময়-ক্ষণের ওপর। যেমন, আপনি তখন কী ভঙ্গীতে ঘুমিয়েছিলেন। আপনি কি ক্ষুধার্ত ছিলেন নাকি ভরা পেটে ছিলেন; স্বপ্ন দেখার সময় কি অতি ভোর না মধ্যরাত,

ইত্যাদি। অপর স্বপ্নবেত্তা শেখ আল নাবুলসির মতে স্বপ্ন হল আত্মা, হৃদয় এবং নফস্-এর এক জটিল রসায়ন : বুকের কয়েক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ঘুমন্ত আত্মা ঈশ্বরের আলো নিয়ে নফসে ফেরত যায়; যেমন সূর্য লুকায় মেঘের আড়ালে। তারপর আমরা জেগে উঠলে আত্মা সবকিছু মনে করতে পারে। কেউ বলেন, স্বপ্ন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে তখনই যখন স্বপ্নের ভেতর কথা বলে মৃতব্যক্তি, শিশু এবং মানুষ আওয়াজ পায় না এমন জন্তু; যেমন পিপীলিকা!

পিপীলিকা আমার সঙ্গে কথা বলল স্বপ্নে– এরকম পুণ্য কখনো হয় না। হেঁটে হেঁটে একদিন বাবার কবরস্থানে দাঁড়াই বাবার মৃত কণ্ঠস্বর শোনার জন্য। প্রায় চল্লিশ বছর আগের মাংস-অস্থি কবে মাটি হয়ে, বৃক্ষ লতা পাতাতে লীন হয়ে, হয়তো আবার কোনো দৈবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আকাশে! বাবার বই পুস্তক স্পর্শ করে বাবার দিবাস্বপ্ন গড়ি, যেন রাতে ঘুমের ভেতর সত্যি বাবা এসে কথা বলতে পারেন। কিন্তু এবারও মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। আগত্যা আমি অন্য আর এক মৃতব্যক্তির সন্ধানে নামি : আমাদের অবিসংবাদিত রাজপুত্র মিলিটারি পিতার ছেঁড়া সুটকেস থেকে বেরিয়ে, তীব্র ভঙ্গিতে এখন যে নির্বাচনী শহর গড়ছেন, ইলিয়াস সেই শহরের ঠনঠনিয়া গোরস্থানে সমাহিত। বগুড়া হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে, একদা ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০০৬ ঠনঠনিয়া গোরস্থানে দাঁড়াই– পকেট থেকে ১২.১২.১৯৮০-তে লেখা ওর জন্মদিন উদ্‌যাপনের ব্যক্তিগত অভিভাষণ বের করে পড়ি : গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তো ... – হে পৃথিবী। তোমার গিরিসমূহ, তোমার হিমালয় পর্বতশ্রেণী, তোমার অরণ্যসূহ– সমস্তই মঙ্গলময় হোক। এই পৃথিবী, যিনি বভ্রু বা পাংশুবর্ণা, যিনি রক্তবর্ণা, সমস্ত রূপে রূপময় যিনি, এই বিশাল ভূমি যিনি স্থির ও ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত– আমি সেই পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি– আমি হত হইনি, আহত হইনি। আমাকে কেউ জয় করেনি, মন্ত্র উচ্চারণের মতো এই নিশ্চুপ ব্যক্তিগত পাঠচক্র শেষ করে ঠনঠনিয়া গোরস্থানের লেবুপাতা ছিঁড়ি, ইউক্যালিপটাসের বাকল খুলে দেখি, সার সার গাঁদা দেখি আর এমনভাবে হাঁটি যেন পায়ের নিচে মাংসখোলা কালো ডেয়ো-পিঁপড়াগুলো খোলামকুচির মতো গুড়িয়ে না যায়। ফটোগ্রাফার বন্ধু ইলিয়াসের নাম-ফলকের ছবি তুলে পাঠায়। অনেকবার সেই নামফলক পড়ি, অথর্ববেদ থেকে ইলিয়াসের জন্মদিনের অভিভাষণ পড়ি- কিন্তু রাতে ঘুমের ভেতর কিম্বা ঘুমের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে অথবা স্বপ্নে ইলিয়াসের সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ করা যায় না। অতঃপর সাব্যস্ত হয়, ইলিয়াসের সঙ্গে কথা বলার একমাত্র উপায় ওঁর স্ব-উদ্ভাবিত খাবনামার পৃষ্ঠা ক্রমাগত উল্টে যাওয়া। ঠনঠনিয়া গোরস্থান থেকে দেয়ালে নবীজির কালোজিরা মাহাত্ম্য পড়ি– মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগ নিশ্চিহ্ন করে কালোজিরা! করতোয়া পাড়ে নারুলি গ্রাম দেখতে একঝলক দাঁড়াই। এখানে ইলিয়াসের পিতামহ গৃহপত্তন করেন। নারুলি থেকে বেরিয়ে আসার মুকে চোখ পড়ে কাঁখে প্রধানমন্ত্রীর প্রিয় কালো ছাগল এবং কানে নোকিয়া-সেলফোন চেপে কুলসুম অথবা সখিনা বেওয়া অনর্গল কথা বলে চলছে। এই পে-ফোন থেকে মাকে কালোজিরার টেক্সট পাঠাই, যদি-বা মৃত্যু নামক ব্যাধি থেকে

আর কয়েকটি দিন পরিত্রাণ পান কর্কটাক্রান্ত মা। ইলিয়াস জীবদ্দশায় মজারু ভঙ্গিতে বলতেন, অনেক ক'জনকে আমি চিনতাম, যারা হেঁটে হেঁটে ঘুমায় এবং স্বপ্ন দেখত। আমি ভাবি– স্বপ্ন দেখা শেষ হলে কি মানুষ তবে হাঁটা ভুলে যায়? আমার অনেক প্রাণশক্তি, এরকম ভঙ্গি করে পদ্য বানাই– ডেড ম্যান ওয়াকিং...! মৃত মানুষ হেঁটে বেড়াবে, এই অনুসঙ্গ খানিকটা ইলিয়াসের সঙ্গেও মিলিয়ে নিই : ইলিয়াস দেশ ভাগ চাইতেন না, এর প্রতিবাদে ওঁর দক্ষিণপন্থী পা ক্যান্সারে ডুবিয়ে গ্রেট ক্যালকাটা শহরে রেখে এসেছেন ১৯৯৬-এর ২০ মার্চ। ইলিয়াসের এই নিখোঁজ পা উদ্ধারের জন্য, মহাশ্বেতা দেবীকে দিয়ে কি একটি দরখাস্ত লেখানো যায় মাননীয় বুদ্ধিদীপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বরাবর? নাকি ম্যাগসেসে-দেবী খুব ক্রোধ ছড়িয়ে, আমাদেরকে ভস্মীভূত করবেন? দিদি ওর 'মাস্টার সাব' পুস্তকের উৎসর্গ লিখে ইনসুলিনের সিরিঞ্জ হাতে বারান্দায় দাঁড়ান। নিশ্চয় তিনি স্বপ্ন দেখছেন না!– ইলিয়াসের নিখোঁজ পা হেঁটে হেঁটে কোলকাতা শহর দেখছে, আনন্দবাজারের বন্ধ তালা ছুঁয়ে দেখছে, বিদ্যাসাগর ব্রিজ দেখছে আর অনেক রাতে ক্লান্ত পা নিয়ে মহাশ্বেতা দিদিকে ডাকেন– দিদি দরজা খুলুন! পুলিশের মতো কেউ ফলো করছে, পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছি...! দিদির গলায় গুনগুন গান। কে, আক্তার, নাকি মাস্টার সাব? দুজন হাসেন। দিদি ওর উৎসর্গপত্র পড়ে শোনান। ইলিয়াসের চোখে সামান্য জল। চোখ মুছে ভাইবোন পূর্ববাঙলার গল্প বলেন, দেশভাগের কথা বলেন আর বাকি রাত জেগে পরিকল্পনা করেন নতুন আর এক নিরুদ্দেশ যাত্রার।

ইলিয়াস খাবনামা বুকপকেটে রাখলে এরকম অনর্গল সব স্বপ্ন কেবল বিচ্ছুরিত হতে থাকে। স্বপ্নভুক মানুষেরা কেউ কেউ আবার হোঁচট খায়; অন্য খাবনামা ফালনামার মতো অক্ষর ধরে ধরে তক্ষণি স্বপ্নের অর্থ জানা গেল না তো! টানা বাক্যে তৈরি এই খাবনামা খানিকটা দুস্পাঠ্য মনে হয়েছিল রুশ ভাষায় পারঙ্গম আমার এক আত্মীয় অধ্যাপকের– তিনি তারাশঙ্করের নাগিনীকন্যার নিরিখে ইলিয়াসী খাবনামার কথা তুলেছিলেন একবার। এই আপাত দুস্পাঠ্য ফালনামা (?) সহজবোধ্য করার এক বালখিল্য মতলব এবার মাথায় দৌড়ে বেড়ায়। আয়ুষ্মান-বুদ্ধিপ্রবণ কাউকে এই প্রকল্পের কথা জানাতে ভয় হয়। খুঁজে খুঁজে পাড়ার জ্ঞানী ক্ষৌরকারের সঙ্গে কথা বলি, তিনি সামান্য অভয় দেন। কম পয়সায় অল্প নরম-বেলে মাছের আশায় কাঁঠালপাতা বিক্রি করে যে অশীতিপর বৃদ্ধা, সেখানে মাঝে মাঝে চায়ের আসর হয়– ভুষি বিক্রেতা, সব্জিওয়ালা, হেরোইনের কারবারি, পুলিশ, দরিদ্র ঠিকাদার এবং মোষ জবাইকারী এক কসাই নিয়মিত চা খায়। এরা ভালোবেসে ওদের বেঞ্চে বসার সুযোগ দেয়। চা খেতে খেতে খাবনামা মেরামতের একটি উপায় একদিন হঠাৎ করে শিখে ফেলি: ভেন্ডর তারস্বরে বই কেনাবিক্রি করছে মাইক্রোফোনে। বইয়ের ভিতর কী সম্পদ লুকানো আছে, তিনি চিৎকার করে বলে চলেছেন; এই পুস্তক পড়লে জনাব জানতে পারবেন, গাভীর খুরা রোগ কী, চিনতে পারবেন গাভীর পেটে বাচ্চা কত বয়সের, গাভীর মুখে লালা ঝরলে তার উপায় জানতে পারবেন, ইরাকে সাদ্দামের বিচারে কী চলছে,

সাদ্দামের কয় সন্তান, এরা কী করে, সাদ্দামকে কেন আমেরিকা মরতে চায়, আমেরিকার কাছে লাদেন ভালো না সাদ্দাম ভালো, ক্লিন্টন কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে লীলা করছেন, সাদ্দামের ভয়ে আমেরিকার কী অবস্থা ...; জানতে পারবেন এই পুস্তক থেকে আত্তাহিয়াতু, দোয়া মাছুরা, দোয়া কুনুত, জানতে পারবেন জানাজার নিয়ম, স্ত্রী সহবাসের নিয়ম, কীভাবে সঙ্গম করলে পুত্র সন্তান লাভ হয়, পায়খানায় কোন পা দিয়ে ঢুকবেন, মসজিদ দেখলে তার দোয়া কী। কী করিলে দুই হজ্বের নেকী পাবেন, ... জানতে পারবেন মোবইলে রিংটোন ডাউনলোডের নিয়মকানুন, জানতে পারবেন মোবাইল থেকে কীভাবে ফটো তোলা যায়, কীভাবে ভোরের নিউজ পড়া যায় ... ইত্যাদি।

এই বই বিক্রেতার কাছে থেকে আমি বুদ্ধি চুরি করি। ইলিয়াসের বাক্য, শব্দ এবং স্বপ্নরাজ্যের বিপুল অংশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর জেদ, সাহস, শক্তি, সৃজনশীলতা, মায়া এবং ক্রোধ নিয়ে দুই বাংলাতে এত বিস্তর লেখা হয়েছে যে খুব সামান্য বিশেষণই এখন অবশিষ্ট। হেলাফেলায় বলা চলে, ইলিয়াস ভালো বাংলা লেখেন– তাঁর বাক্যবন্ধন আমাদেরকে আক্রান্ত করে। উদ্বেলিত করে, এবং আমূল বিদ্ধ করে। এদিকে বুদ্ধির যে অংশটুকু চুরি করেছি, সেখানে পলেস্তারা লাগাই। ইনভেন্ট্রি করার মতো সাজাই– ইলিয়াস যারা পড়বেন, তারা পছন্দের স্বপ্নবৃত্তান্ত যেন তৎক্ষণাৎ খুঁজে পান এবং নিদ্রাদেবী যেন অপেক্ষাকৃত কম রুষ্ট হন তাদের ওপর। সেজন্য বড় বড় অক্ষরের লিখি, এই বই পড়িলে আপনি যাহা জানিতে পারিবেন তাহা নিম্নরূপ :

তমিজের বাপের গৃহপত্তন, ৯/ তমিজের বাপের শক্তির উৎস, ২৫/ তমিজের বাপের ক্ষুধা নিবারণ, ১১০/ তমিজের বাপের জ্বর চিকিৎসা, ১৮৮/ তমিজের বাপের মৃত্যু, ২৮৬/ তমিজের বাপের ভিটেমাটি লিখে দেয়া, ২৫৭/ কুলসুমকে তমিজের বাপের মরণোত্তর পাহারাদান, ৩৪৯/ বিলের বর্ণনা, ১০-১১/ বিল দখল, ২৩, ৪৪, ২৯৭, ২৯৮/ বিলে মাছের বর্ণনা, ৫৪/ ঘুমের ঘোরে হাঁটা, ১২-১২/ ঘুমে শাপলা ফুল প্রশাস্তি, ১৩/ মাছধরা, ১৫, ১৮৪, ২১৭, ২০০, ২০১/ বিবিধ জাল বর্ণনা, ২১১/ মৎস্য চুরির সালিস, ২০৮/ দুর্ভিক্ষ ১৪/ কুলসুমের বইপ্রীতি, ১৮-১৯/ চেরাগ আলির বই ধানকাটা, ২১/ ধানমাড়াই, ১২৮-১২৯/ যুদ্ধের ফলাফল, ২২-২৩/ স্বপ্নের মাজেজা, ২৯/ ধান উঠলে স্বপ্ন দেখার ধুম, ২৯/ সর্ষের তেলের আলোয় স্বপ্নের বিত্তান্ত শোনা, ২৭/ স্বপ্নের বয়ান, ৬৮/ মাটি ও নারীর তুলনা, ৩০, ৫৯/ নদী ভাঙন, ৩১-৩২/ নদীর গতি পরিবর্তন, ৪৮-৪৯, ১৮৩, ২৩৬-২৩৭/ জমি কেনা বেচা, ৪১/ জমি বৃদ্ধির উপায়, ৫১-৫২/ মাটিকে স্পর্শ করার অনুভূতি, ৫৬/ জমি চাষের সময় চুরি করে পানি নেয়া, ৭০/ মেয়েকে নিয়ে বাবার চাষবাস, ৫৭/ খেজুর ডালের গুনাগুন, ৩৯/ মাঙন খাটা, ৪০/ কুয়ার পাট বদল, ৪০/জিরাতে ভেজাল দেয়ার উপায়, ৪৪/ সংগীতের উপকারিতা, ৪৫-৪৬/ মহাজনী সুদ, ৫৩/ তেভাগার খবর, ৪৭-৪৮, ৭১-৭২/ মাঝির বেটাকে পানি খেতে দেয়ার লজ্জা, ৭০/ চেরাগ আলি বৃত্তান্ত, ৬৫/ চেরাগ আলির মৃত্যুস্থান, ১৬৫/ কুলসুমের শৈশব, ২৮-২৯/ দাদাকে নিয়ে কুলসুমের স্মৃতিকাতরতা

১৬৪/ কুলসুমের জিলাপি খাওয়া, ১৯৩/ কুলসুমের ওপর চেরাগ আলির ভর, ১৬৭/ কুলসুমের ওপর তমিজের বাপের ভর, ৩০৭/ মৃতস্বামীর সঙ্গে কুলসুমের মনোলোগ, ৩৬১/ কুলসুমের প্রতি যৌন-নিপীড়ন, ৩৬৪/ কুলসুমের মৃত্যু, ৩৬৬/ মরিচ ক্ষেতের বর্ণনা, ৭২/ চাঁদনী রাতে চাষবাস, ৯৭-৯৯/ চাঁদের আলোর ধানক্ষেত, ৩৭৭/ কাঁথায় চাঁদ-তারা আঁকা, ৩৩০/ চাঁদতারা আঁকা কাঁথায় কুলসুমের লাশ জড়ানো, ২৬৩/ জখম চাঁদের কথা, ৩৮৪/ চাঁদের ওপর সিদ্ধ আউশের রং দেখা, ৩৮১-৩৮২/ শিমুল গাছের বক বৃত্তান্ত, ১২০/ কোলকাতায় বোমা, ৬৮/ পাট কাটা, ৫৭/ মতিনের ঝগড়া, ৮৪/ চল্লিশের আয়োজন, ১০২-১০৪/ জাত-পাতের ছোঁয়া, ৬৭-৬৮/ কবরে মোমবাতি, ১২১-১২৩/ তমিজের চুল নিয়ে কুলসুমের মুগ্ধতা, ৩৯/ তমিজের ধানক্ষেত দেখার আনন্দ, ১২৫/ তমিজের চাষি হওয়ার প্রচেষ্টা, ১৪৮-১৪৯/ জমি থেকে তমিজের বিতাড়ন, ১৫৭/ তমিজের গ্রেপ্তার হওয়া, ২২৩/ জেল থেকে তমিজের মুক্তি, ২৭৭/ তমিজের জমি ও তেভাগার স্বপ্ন, ২৮১, ২৮৩/ তমিজের ভিটেবাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা, ২৯৪/ তমিজের পলায়ন, ৩২২/ তমিজের বিয়ে, ৩১১-৩১৪/ তমিজের গৃহভৃত্য হওয়া, ৩৩৪/ জমির জন্য তমিজদের আকুলতা, ৩৩৫/ তমিজের স্বপ্নভঙ্গ, ৩৩৬/ তেভাগার স্বপ্নে তমিজের ট্রেনে চড়া, ৩৫১-৩৫২, ৩৬৯/ মুসলিম লীগের পোস্টার, ৭৬/ জিন্নাটুপি, ৭৭/ টাউনের লোকদের রাজনীতি-আলোচনা, ১০৫/ ইসলাম বনাম কম্যুনিজম, ১০৮/ বর্গাচাষ, মুসলিম লীগ ও ইসলাম মাহাত্ম্য, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯/ জমিদার ও খাজনা প্রথা, ১৩৭/ হক সাহেব জটিলতা, ১৫০/ মোহাম্মদী-হানিফ বাহাস, ১৪৩, ২৮৮/ ভোট, হাজি দানেশ, ২২৫/ মাওলানা আজাদ, ২২৭/ সুন্নি-শিয়া-কাদিয়ানি, ২২৯/ রফাজানিদের মোনাজাত কৌশল, ৫৫/ মীনা পেশোয়ারী ও সুরাবাদী সমাচার, ২৬৭/ মহাত্মাগান্ধী, ২৩৮/ মুসলিম লীগ বনাম কংগ্রেস, ২৪০/ দাঙ্গা, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৭১-২৭৩/ হাশেম সাহেব, ১৩৪-১৩৫/ রেডক্রস, ৯৪/ কালাজ্বর ও চিকিৎসা তৎপরতা, ৮১, ৮৭/ জ্বর আক্রান্ত পুত্রের জন্য মায়ের আহাজারী, ১১৪/ হাট বাজার, ১৫০/ মেলা, ১৫৯, ১৮৭, ২০০, ২০১, ২০৪, ৩২১/ বৈকুণ্ঠ, ১৬৮, ১৮৫, ২৪১, ৩০৭/ বৈকুণ্ঠের হত্যা, ৩৪২-৩৪৩/ কবি কেরামত, ১৭৮-১৭৯, ২১৬-২১৭, ২৪২-২৫৩, ৩২৯, ৩৩২/ কবি কেরামতের তালাক দেয়া, ২৮২/ কবি কেরামতের গ্রেপ্তার হওয়া, ৩৬৭/ পোড়াদহ মেলা, ৭৮, ১৫৯, ১৮৭/ নিশানের মেলা, ১৪৭/ অন্য মেলার খবর, ২০৪/ ভবানী পাঠক ও মজনু শাহের যোগসূত্র, ১৬৯/ মুন্সি এবং সন্ন্যাসীর সম্মিলন, ৭৮, ২৬৮-২৬৯, ৩৪০-৩৪১/ পাকুড়গাছ সমাচার, ২৬০-২৬১, ২৬৯/ পাকিস্তান প্রাপ্তির আনন্দ ২৭৭-২৭৮/ পাকিস্তান প্রাপ্তিতে হিন্দুদের দুর্যোগ, ২৯৪, ২৯৭-২৯৮, ২৯৯-৩০০, ৩০৩-৩০৫/ বিহারের মুসলিম উদ্বাস্তু, ৩২৫/ হিন্দুদের দেশ ত্যাগ, ৩৭১/ ভাতের গন্ধ ও স্বপ্ন বর্ণনা, ৩৮১-৩৮৪ --

স্বপ্নপুস্তকের রহস্যময় নির্ঘণ্ট এই ভঙ্গীতে লিখে জানালে কৃতিবন্ধুরা, অতিদ্রুত আমার তরলমতি আচরণ স্তব্ধ কর দেন। বন্ধুদের সদয় প্রশ্রয় পাওয়ার আশায়, গম্ভীর মুখে মাথার ভেতর বড় ভাবনা এনে এবার বসাই। ঘুম-ঘুম স্বপ্নের ভেতর ইলিয়াস

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন : দ্রুত খাবনামার পৃষ্ঠা উল্টে চলেছি। চোখবন্ধ করি, স্পর্শ করি অক্ষরের শরীর, চোখ খুলি- আর দেখি ইলিয়াসীয় খাবনামার ভেতর থেকে উজ্জ্বল-সবুজ গন্ধ ছড়িয়ে জাদুর ভাপের মতো শত শত পুস্তকের শেকড় নেমে আসছে। অপুষ্ট বইগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে নামপড়ি : বাঙালী মুসলমানের মন (পুনর্লিখন অথবা ২য় পর্ব); বাঙলার কৃষি সমাজ ও কৃষকের ইউটোপিয়া; বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়– আত্ম পরিচয়ের উপায় ও বাধা; ইতিহাস ও সাহিত্য; স্বপ্নবৃত্তান্ত ও স্বপ্নচর্চার রকমফের; ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম– প্রেক্ষাপট হিন্দু মুসলিম; হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বনাম মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা; দেশভাগ– স্বপ্ন ও ফলাফল; তেভাগা : কৃষকের জয়-পরাজয়; পীরতন্ত্র ও মাজার পরিক্রমা; ধর্মের গ্রহণ ও মুক্তিতন্ত্র; কৃষকের নান্দনিকতা ও সংগীত প্রতিভা; নদীভাঙন; গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ও নেতৃত্ব; কৃষকের পেশাবদল ও ভূমিহীনদের বাঁচামরা; রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উত্থান ও পাপপুণ্য সমাচার; ক্ষুধার রাজনীতি; ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ; কৃষক বিদ্রোহের স্বরূপ; বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন; মিথপুরাণের ভাঙাগড়া; খাবনাম পুস্তকের মাহাত্ম্য; নিছক মাছধরা; হানাফি মোহাম্মদী বাহাস; বাংলার হাটবাজার; বাংলার লোকমেলা ও বাংলার বিল-নদী!

মাটি খুবলে দেখার মতো ইলিয়াসী খাবনামার ভেতরে লুকিয়ে থাকা এইসব পুস্তক আমি এলোমেলো উল্টাই। পুস্তকের গা জুড়ে বট-অশথের শেকড়– শেকড়ের গায়ে পুণ্ড্রভূমির ধূপছায়া, মাটি, যমুনার জল এবং জলজ লতাপাতা আমার ব্যক্তিগত বাক্যরাশি উধাও করে দেয়। বুঝে, না বুঝে হোঁচট খেতে খেতে কাৎলাহার বিলের অন্ধকার কাদামাটিতে ডুবে যেতে থাকি। তখন শুরু হয় নিছক এক জাগ্রত ঘুম, স্বপ্নের ঘুম অথবা শুরু হয় গুহার ভিতর ঘুমিয়ে পড়া সাতজন মানুষের শতবর্ষের নির্জনতা! পুস্তকের পাতা দৌড়ে বেড়ানোর শব্দ আসে। আমরা সজাগ হই অথবা তক্ষণি ঘুমিয়ে পড়ি। চিন্তার জট শেকড় হয়ে মাটিতে হারিয়ে যাচ্ছে– এইমাত্র টুপ করে চোরাবালিতে পুরো শরীর মন ডুবে গেল। অনুভব হয়, পুণ্ড্রনগরের মানুষ যমুনার বদলে যাওয়া ঢেউয়ের সঙ্গে মিলে মিশে কথা বলে চলেছে। এইসব মানুষদের কাউকে চেনা যায়; কাউকে চেনা যায় না, দূর মেঘ-ছায়া থেকে কথা বলে। পাড়ার যে টি-স্টলে বসে আমরা চা খাই– যেখানে কাঁঠাল পাতা বিক্রির ফাঁকে একজন লোক এসে বসে, যেখানে মোষ জবাইয়ের কসাই আসে, হাজাম আসে, ভাইস চ্যান্সেলরের ঠিকাদার বন্ধু আসে– এদের বৈকালিক অথবা সান্ধ্য আসরে গুটিকয় উদ্বাস্তু মানুষ হঠাৎ পার্টিশানের গল্প বলতে শুরু করে : পার্টিশান আমি তো কই তিনবার। প্রথমবার মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান চাইল। দ্বিতীয়বার পাঞ্জাব ও বাংলা যখন ভাগ হল। আর শেষ হল, আমরা যেদিন মালদা বর্ধমান ছেড়ে এলাম চিরকালের মতো। ১৬ই আগস্ট ছিল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দিবস। অক্টোবরে দুর্যোগ ছড়িয়ে গেল বিহার এবং নোয়াখালি। তারপর সেই অবিস্মরণীয় ম্যাসকিলিং– শিখ, হিন্দু এবং মুসলিমের রক্ত অনেকখানি ছড়িয়ে গেল ভারতবর্ষের মানচিত্রে। কে এক পল্লীকবি ইউনুস আলী সম্প্রীতির কথা তুলে 'পাকিস্তানের কবিতা' শোনালেন। আর নোয়াখালির কবি শোনালেন দুই

সম্প্রদায়ের বিদ্বেষের কথা– চিলুমচি আর দস্তরখানা সকল জাতে চিনে না। কলাপাতার দুই পিঠেতে দুই জাতির খানা। এদিকে বিপিনবাবু হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষে ব্রিটিশকে দেখেছেন আশীর্বাদ হিসেবে; কাজেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি চিহ্নিত করলেন তিনটি মতলব : প্রথম, এদেশে বরাবরই বিদেশি শাসক ছিল, কাজেই ব্রিটিশ এনেছে মানবিক ও সুসভ্য শাসন। দ্বিতীয়, হিন্দুরা মুসলিম কর্তৃক শাসিত হয়েছে; ব্রিটিশ তাদের মুক্ত করেছে। তৃতীয়, হিন্দু-মুসলমান চিরকাল বিভক্ত ছিল; তাই তৃতীয় পক্ষ (ব্রিটিশ) না থাকলে এখানে শান্তি হবে না। বিপিনবাবুর সেই কাঙ্ক্ষিত 'শান্তি' হারিয়ে গেলে, প্রকারন্তরে বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্যোগ আসে আর কল্যাণ-বার্তা এল গুটিকয় উচ্ছিষ্টভোগীর– আগে ছিল উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন, তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন। ...গত বছর আমি একজন জোলা ছিলাম, এ বছর আমি একজন শেখ, আগামী বছর ভালো দর পেলে আমি একজন সৈয়দ হব। সৈয়দ হওয়ার লোভ আমদেরকেও নাছোড় করে। এই প্রতিযোগিতা এবং ওপরচালাকি যত শাঁসালো হয়, এদেশের চাষা তত গভীর সঙ্কটে জড়িয়ে যায়। ঐ দূর গাঁয়ে খড়ের চালার ভেতর লুকানো কেবল গভীর শূন্যতা। কৃষক মাঠের ভেতর একা-একা হাঁটে আর শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ে বুকের অন্তর্গত ক্ষতে। মহাত্মার প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার চাষি, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিলো নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব আস্থার সুযোগেও বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনো চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের চিন্তা তাদের, বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষির অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল ১৯২৮ সালের আইন সংশোধনীর ব্যাপারে। কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ হল বাংলার আইনসভার কংগ্রেসীয় সভ্যদের কাছে চাষির স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়। শহরের লোকগুলোকে গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিনতে শিখছে। স্বদেশ-স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোমার নয়। এই যমুনা-গঙ্গা নদী তোমারই-বা হোত যদি, পরের পণ্যে, গোরা সৈন্য জাহাজ কেন বয়! ঐ যে ক্ষেত শস্যভরা, তোমার নয় গো একটি ছড়া, তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রামের মালিক নয়। স্বদেশ-স্বদেশ করিস কারে! এদেশ তোমার নয়। হয় কি, স্বপ্নদেখা মানুষ এরপরেও ভোট দেয়, হয়তো খানিকটা ক্ষোভ এবং বেদনাতেই– চল চল, চলরে কিষক ভাই, জমিদারি উঠিবার তানে ভোট দিবার যাই। শেষ করিবার তানে জমিদারি, জমিদারের নামে করিম সমন জারী। হা খোরানিয়া দেশটাক করিম ঠিক, ভিন দেশত না মাগিম খাবার ভিক্। আপন জমিত ঠালিয়া ধরিম হাল, বাংলাদেশের হামেরা খেদাম আকাল। ...কত দেখিম ভাই ভোটের ভেকধারী, বাঙালের বন্ধু আজি বেড়াছে বাড়ি-বাড়ি। ন্যাতালা ভোটের বাদে হৈসে বাহির, নিজর বাহার করেসেন জাহির। ...জিবিহাতে নিকিলিয়া দ্যাসে পানবিড়ি, হবার চাহে হামার, মেম্বার মনতিরি। ভোট পালেরে ভাই, দেখাই হোয়া ধাই, এলা তো বন্ধুর লেখা জোখায় নাই।

নির্বাচনী ডামডোল মিলিয়ে যাওয়ার পর আবার সকল নিম্নবর্গের মানুষ জীবন-যাপনের পদ্ধতিতে একাকার হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিমের এই সহজাত-অবস্থান খোদ সাহেবের (হেনরি বেভারিজ ও কার্সটেয়ার্স) চোখেও এড়ায়নি– হিন্দু মুসলিম পরিচয়ের সর্বাগ্রে এরা বাঙালি। বাংলায় একজন মুসলিম যখন অদেখা ঈশ্বরের উপাসনা করছে, তখন হিন্দু উপাসনা করছে ঘরে রাখা দেবতার। কিন্তু বসবাস করছে একই গাঁয়ে। এক পুকুরের জল নিচ্ছে। গাঁয়ের এক রাস্তায় শিশুরা খেলছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঠে চাষ করছে, রাতে দাঁড়িয়ে একত্রে পাকা শস্য দেখছে, বাজারে চলেছে একসাথে? একই জমিদারের খাজনা গুনছে, এক পঞ্চায়েত-এর বিচার সালিস মানছে– তবে কী, বিয়ে এবং খাওয়াটা সারছে আলাদা। সাহেব-বৃত্তান্ত সেরে ইলিয়াসী খাবনামা থেকে ঝরে পড়া অন্যসব পুস্তক উল্টাতে শুরু করে প্রতিবেশীরা : ঊনিশ শতকে মুসলিমদের নামের একটি তালিকা যেন– বাবুমণ্ডল, অনন্ত মোল্লা, ধানাই প্রমাণিক, পালান মোল্লা, ইনায়েত নসৎ, পবন খান, বাঘা, হারাধন মঙ্গল, পচা, নেপাল গাজী, গোবরু মৃধা, নারায়ণ তরফদার, শিয়ালী মাতব্বর ইত্যাদি। মেয়েদের নামগুলোও খানিকটা তাই– রূপাবিবি, চাঁন্দি, ডোমনি, জহুরি, কেতকী, মান্ডি, শাবানী, সোনাবিবি, লক্ষ্মী, জিরা, কালী ইত্যাদি। এই নামগুলোতে তখনও তীব্র আরবি-ফারসি ছায়া এসে পড়েনি। তবে দরিদ্র মুসলিমরা যখন পেশা বদল করছে, তখন-শহরতলীতে পেশাভিত্তিক কিছু জাত-পাত তৈরি হয়ে যায় অলক্ষে– যেমন বলদিয়া (বলদ দিয়ে ইট বালি বহন করে), চামড়া ফরাস (চামড়া ব্যবসায়ী, চণ্ডুওয়ালা (আফিম বিক্রেতা), হাওয়াইগার (জ্বালানি কাঠ তৈরি করে), জিল্‌দখার (বই বাঁধাইকারী), নানবাই (রুটি বিক্রেতা) রাজ (ইট-সিমেন্টের মিস্ত্রি), সাবুনওয়ালা (সাবান বিক্রেতা), নিকারী (মাছ বিক্রেতা) ইত্যাদি। ইলিয়াসী খাবনামা থেকে বেরিয়ে এসে এই নাম-তালিকা কেবল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

জাতপাতের জটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খাবনামার অপরাপর পুস্তক উল্টে চলি এবার। এইসব নামহীন পুস্তক আগে কখনও দেখিনি। এত বিচিত্র অধ্যায়, পরিচ্ছেদ এবং বিষয়বস্তু যে– জিভের জল ঘষে-ঘষে সেই যে পৃষ্ঠা উল্টাই, এরপরেও লঘুপাচ্য কোনো প্রসঙ্গ তক্ষণি এসে দাঁড়ায় না– খানিকটা ধরা যায়, খানিকটা অধরা। তবে ক্ষীণ একটা রেশ থেকে যায়, বাক্যের সূক্ষ্ম আঁশে। এইসব বাক্যে অস্পষ্ট স্বপ্নের গন্ধ লেগে থাকে; স্বপ্ন জমে থাকা পুস্তকের পৃষ্ঠা দিয়ে খোলামকুচি বানায় কেউ, কেউ আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, জলের ভেতর অলৌকিক স্টিমার বানায়, বেনামীতে পুস্তক লেখে, খ্যাতিমান হয়, অথবা কেউ থেকে যায় চিরকালের অচেনা। কোনোদিন খুব খ্যাতিমান পুস্তক তৈরি হবে, এই স্বপ্নে পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলো, তীব্র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুড়ে রাখি– কোথাও দেশভাগের গোপন নথিপত্র, মেকলে সাহেবের ড্রাফট, শিবাজি উৎসব, কৃষকের কথা খানিকটা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুষঙ্গ, মজনুশাহের পাগরি উড়ানো বিদ্রোহের ঝাঁঝ আর দেখা যায়, দূরে কে একজন মিহিরবাবু একটি বিষাদ বৃক্ষ তৈরি করেছেন কাৎলাহার বিলে যেখানে খানিক আগেও ছিল মুনসির সেই নিখোঁজ পাকুড় গাছ!

...পুস্তকের এই অংশে শিবাজি-মেলার উত্তাপ লেগে আছে : তিলক প্রবর্তিত শিবাজি উৎসব শুধু মহারাষ্ট্র নয়, তা সমগ্র ভারতকে অনুপ্রাণিত করল। মুসলিমদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো দুই ধরনের। উপরের স্তরের সাম্প্রদায়িকতায় প্রতিষ্ঠা পেল মুসলিম লীগ এবং নীচতলার সাম্প্রদায়িকতা, কী হল হিন্দু জমিদার, নায়েব ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। ইংরেজরা এতে প্রচ্ছন্ন মদত দিয়েছিল। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের সমন্বয় চাইছিলেন বঙ্কিম। বিবেকানন্দ বললেন, বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে; অরবিন্দ তখন গড়েছেন একটি ভবানীমন্দির।

মেকলে তার প্রতিজ্ঞায় অনড়– মতে ও রুচিতে, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ , এমন এক মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণীর সৃষ্টি করা হবে, যারা শাসক ও লক্ষ লক্ষ শাসিত মানুষের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনের ভূমিকা নেবে। লিটন প্রশ্ন তুললেন, এইসব বাবুদের ভবিষ্যৎ কী? এরা শুধু পরকে অন্ধের মতো অনুকরণ করতে শিখেছে, শেখেনি অনুসরণ করতে, স্বাবলম্বী হতে। নিজেদের সামাজিক বৈষম্য প্রতিফলিত করা ছাড়া তারা আর কিছুই করে উঠতে পারেনি। অপর আমলারা ভাবছিলেন– মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে নতুন একটা প্রদেশ গঠন করতে পারলে চরমপন্থী এবং সাধারণভাবে (বাঙালি হিন্দুরা যারা চরমপন্থী এবং মডারেট কংগ্রেসের সবচেয়ে তেজী অংশ) নির্বিষ হয়ে যাবে। রিজলে পেপারের কপি বাতাসে উড়ে যায় হঠাৎ। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সাল। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হল। বাংলা হারাল পনেরটি জেলা, তার জনসংখ্যা হল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ।

বাংলায় সন্ত্রাসমূলক কর্মতৎপরতা, নোটস অন আউটরেজেস পড়ি– বোমা, ট্রেনধ্বংস, অস্ত্র লুট, ছুরিকাঘাত, দাঙ্গা, হত্যা ও ডাকাতির চেষ্টা। পাশাপাশি 'ভদ্রলোক'কৃত অপরাধের তালিকা ও বার্ষিক আয়ের হিসাব পাওয়া গেল। ওইসব ভদ্রলোকের বেশিরভাগ ছিল জমিদার, জোতদার, উকিল, ডাক্তার, তহশিলদার, দোকানদার, কোর্টের কেরানি, মুহুরি, মোক্তার, টালি কেরানি, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর, ছোট তালুকদার ও যাত্রাদলের অধিকারী। সরকারি নথিপত্রে ফকির সন্ন্যাসীদের কার্যাবলিকে ডাকাতের কার্যাবলি বললেও, ফকিরেরা ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের মাদারীয়া শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। একদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ ব্যবহার করতেন ত্রিদণ্ডী বা ত্রিশূল। ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অগ্রসর হলেন নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল। এই বিদ্রোহ সম্প্রসারিত হয়েছিল ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালা ও পুর্ণিয়া জেলায়। ১৭৭১ সালে লে. ফেলথানের নেতৃত্বে একদল কোম্পানির সৈন্য ঘোড়াঘাট ও গোবিন্দগঞ্জের পথে ফকির সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করেন। এ সময় অশ্বপৃষ্ঠে মজনু শাহ শতাধিক অনুসারী নিয়ে মহাস্থানের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৮৭-তে মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করলে উত্তরাধিকারী হন মুসা শাহ, চেরাগআলী শাহ, পরাগ শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরিশাহ, করিম শাহ প্রমুখ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই

তুষখালিতে মোরেলের বিরুদ্ধে অসন্তোষের খবর আসে। আবার টংক আন্দোলন, পাবনা বিদ্রোহ এবং নাচোলের বিদ্রোহ নিয়েও ছোট ছোট বই উঠে আসে হাতে।

বাঙালি কৃষকের হয়ে একজন গুরু প্রামাণিক বহুকাল আগে পূর্ববাংলার লে. গভর্নর বরাবর পত্র লেখেন– হে আমার চালক শাসক, কতদিন তুমি একজনের দোষ আর একজনের কাঁধে চাপিয়ে শাসন চালিয়ে যাবে? জমিদারদের তুমি নির্যাতনের জন্য দোষী করেছ– যখন নির্যাতন প্রতিরোধ না করার জন্য শাসক হিসেবে তুমিই অপরাধী। যে ব্যক্তি নম্র এবং যে তোমাকে সর্ব বিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ মনে করে... তুমি তাকে পাত্তাই দাও না। এ ধরনের মানুষের অনুযোগ তুমি বুঝতেই পার না! তার মামলায় তোমার আদালত ন্যায়বিচার করবে না! তোমার যদি দেখার মতো চোখ থাকে তাহলে দেখ, এই অভাবের দিনেও জমিদারের লোকেরা প্রতি টাকায় ৮ আনা খাজনা দাবি করছে। এবং তারা লাঠিশোটা নিয়ে আসে এবং কৃষকদের উচ্চস্বরে গালিগালাজ করে।

...কতদিন দিন পর্যন্ত তুমি শিক্ষার জন্য কৃষকদের তৃষ্ণাকে অনিবারিত রাখবে? ...কৃষক এক হাতে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে এবং অন্যহাতে সংবাদপত্র পড়ছে; এ দৃশ্য দেখে নিজের চোখকে সার্থক করার জন্য আর কত সময় অতিবাহিত করতে হবে?

১৯৩০ সালের একটি হিসাব পড়ি– একরপ্রতি মজুরের হিসাব। জমি প্রস্তুত করা, নিড়ানি দেওয়া, ফসলকাটা, ফসল তোলা, বহন করা, যাচাই করা ও রোপণ করা; পাট চাষে মানুষের ৮২ রোজ এবং বলদের ২৯ রোজ। আউশ ধানে মানুষের ৩৯ রোজ এবং বলদের ৩১ রোজ। মানুষের মজুরি রোজ প্রতি প্রায় ১২ আনা। কিন্তু কৃষকের ক্ষুধা যায় না। ভুখে ভগত না কিজে, ইয়ে মালা আপনি লিয়ে.. ..; ক্ষুধিত মানুষ তোমার খেদমত করতে পারে না, প্রভু হে- এই নাও তোমার তসবি আমি ফিরিয়ে দিলাম : .. .. আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও দুইসের আটা, এক পোয়া ঘি, কিছু নুন আর আধাসের ডাল, তাহলেই আমার দুবেলার খোরাক হয়ে যাবে।

কৃষকের অনন্তকালীন এই ক্ষুধার জগত বিস্মৃত করার জন্য ভদ্রবাবুরা নতুন অপরাধ শুরু করে– সাম্প্রদায়িকতা, এটি হ্যাবিটফর্মিং ড্রাগের মতো, ওষুধের ডোজ বাড়ানোর মতো, সাম্প্রদায়িকতা চর্চার ঝোঁক কেবল বাড়তেই থাকে! অসাম্প্রদায়িক নাম নিয়ে কংগ্রেস যেমন হিন্দু সংগঠন, মুসলিমরা তেমনি সংগঠন গড়বে প্রজা-পার্টির আড়ালে। এই যুদ্ধ এবং শীতলতা বাড়তেই থাকে– মুসলমান যদি কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কী হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুদেরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে, এদেশে বিত্ত তাহার নাই। ....কুকুর সোহরাওয়ার্দীর মুণ্ডু চাই, সাদা চামড়ার রক্ত চাই। কোলকাতার মতো শহরে কার্ফু দিয়ে আইন শৃঙ্খলার নামে আজকাল কী হচ্ছে তাকি তোমরা জানো? তারা কোলকাতায় গোপন কসাইখানা বানিয়েছে। অতঃপর গ্রেফতারকৃত ঐ লোকদের অধিকাংশের কী যে হয় তা তো তোমরা জানো; তাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের দেহ কেটে টুকরো টুকরো করা হয় এবং কাঠের বাক্সে পুরে

শহরের বাইরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সুতরাং তোমাদের সব শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ কর। সম্ভব হলে পাঞ্জাবি পুলিশকে হত্যা কর, বন্দুক ছিনিয়ে নাও বা তাকে কামড়িয়ে দাও। এর ফলে বাঙলার গুণ্ডা মুসলমান মন্ত্রীর সহায়তায় মুসলিম লীগের সুপরিকল্পিত এ ধরনের রহস্যময় অন্তর্ধান থেকে মুক্তির কোনো সুযোগ দিতে পারে। পাকিস্তান এবং তার অর্জনের পন্থা ধ্বংস হোক।

নওগাঁয় কেডি এইচ ই স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা এ বছর সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছে। অথচ গত ষাট বছর ধরে স্কুল প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল। স্কুল কমিটি অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে আর কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া হবে না– বিষয়টি এখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই বিদ্বেষের সৃষ্টি করছে।

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যাকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বৃদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিনীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্ট দেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মদেবতা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনাল থিয়েটার, তিনিই বাবু। যিনি নিজ গৃহে জলখান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহিবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথোন মাতৃভাষায় ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।

অতএব, মফস্বল এলাকায় বর্তমানে প্রজাপার্টি ও কংগ্রেসের এইসব বাবুদের মধ্যে পুনর্মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রজাপার্টির নেতারা জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য খুবই আগ্রহী; কংগ্রেস কর্মীরা, যারা কিনা হিন্দু, এই ভূমিকা পালন করতে চায় না। কারণ জমিদার ও মহাজনদের মধ্যে, বিশেষ করে শেষোক্তরা মূলত হিন্দু।

১৮৮৮ সালে মুসলমানেরা সে-যুগের উলেমাগণের কাছে জানতে চান, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা যথার্থ কিনা.. .., এর জবাবে সেই ১৮৮৮ সালে শত শত উলেমা যেমন, এনামুল উলেমা কুতুবুল আহতাব, হযরত শাহ রশিদ আহম্মদ গাঙ্গোলি, মাওলানা মুহাম্মাদুল হাসান একে যথার্থ বলে দাবি করেন। শিক্ষিত মুসলমানের স্বরূপ নিয়ে কথা হয়:

শিক্ষিত মুসলমানেরা বসবাস করে ঠিক কৃষকদের মতো। কৃষক পরিবার থেকেই উঠে আসছে। মুসলমান ব্যবসায়ী সামান্য জমির মালিক মুসলমান ও মুসলমান কেরানিদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। এরা সাধারণত অবস্থাপন্ন চাষি পরিবারের সন্তান। তাদের আচার-আচরণ ও জীবনযাপনের মান তাদের পিতাদের মতোই।

আমাদের তাবৎ ইতিহাস চর্চা এবং মিথ ভাবনা, লক্ষ করি, এইসব বিপুল বিস্ময়কর ঘটনার পরম্পরাতেই ঘটে গেছে। ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসকে রনজিত গুহ মনে করেন, ইন্ডিয়ান এলিটদের 'স্পিরিচুয়াল বায়োগ্রাফি'। মার্কব্লকের ভূমিকায় একটি প্রশ্ন ছিল কিশোর বালকের– বাবা, বলো না ইতিহাস আমাদের কী কাজে লাগে। বাবা জবাব দিতে যেয়ে একটি পুস্তক লিখে ফেললেন। ইতিহাসের এই নানান তল ইলিয়াস ওঁর খাবনামার সাদা অংশে অদৃশ্য করে রাখেন। তথ্য সূত্রের ঘরে মিথের সংজ্ঞা লেখা- মিথ একটি যোগাযোগের উপায় এবং এক ধরনের ভাষাভঙ্গিও বটে। ইতিহাসকে মানুষের বিজ্ঞান বলব, না মানুষের এটি একটি সময়ের বিজ্ঞান! ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক সমালোচনা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নিয়ে ইতিহাসবেত্তারা যে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করেন, তা সহসা ধরতে পারি না, পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে ইতিহাসের গলিখুঁজি দেখি– ইতিহাস ও মানবসম্পর্ক, মার্কসিস্ট ইতিহাস, ইতিহাসে ন্যায়বিচার, অফিসিয়াল ইতিহাস, ইতিহাসের বিপদ এবং সাহিত্যের শাখা হিসেবে ইতিহাস!

খাবনামার শেষ পৃষ্ঠায় ইতিহাস ও সাহিত্যের যে মানচিত্র আঁকেন ইলিয়াস, সেখানে তাকাই। ওঁর ছোট ছোট নোটস পড়ি, মানুষ সামাজিক হলে পরেই ইতিহাস হয়। নিঃসঙ্গ মানুষ ও সামাজিক মানুষ আবহমানকাল পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তুমি সন্ন্যাসীর জীবনের সবকিছু জানতে চাইছ, কিন্তু সন্ন্যাসী কিসের সন্ধান করছে সেকথা জানতে চাইছ না। কখনও কি বলতে পারব? ধর্মের ইতিহাস আছে, কিন্তু ঈশ্বরের কোনো ইতিহাস নেই। ঐতিহাসিককে কেউ বলছেন, তিনি অতীতকালের সাংবাদিক। এডওয়ার্ড কার বলতেন, ইতিহাস হল অতীত ও বর্তমানের চিরায়ত কথোপকথন, ইতিহাস ও সাহিত্যের অন্তর্গত যোগাযোগ নিয়ে বইয়ের নাম শিখি– লাদুরিয়, 'মঁ তাইউ' পড়তে পড়তে গপ্পো-উপন্যাসের গন্ধ আসে, ওয়েনিং অফ মিডল এজের তরতাজা কাব্যময় গদ্য; কিন্তু ডেথ ইন প্যারিস সহসা পাঠের সুযোগ আসে না।

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ এবং সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ– বদল করে করে ইতিহাস ও সাহিত্য শীর্ষক পুস্তকের বীজ রোপণ করি মগজে। ইলিয়াসী খাবনামার গা থেকে ঝরে পড়া এতসব পুস্তকের পৃষ্ঠা যথাযথ গোছানোর আগেই ধূলিঝড় উঠেছে কখন, বুঝতে পারিনি! ইলিয়াস স্বপ্নের ভেতর যে ইতিহাস দেখতেন– কখনও ভাবি অফিসিয়াল ঐতিহাসিকদের হাতে পড়লে কেমন দাঁড়াত; পরিচ্ছেদ ভাগ করা যায় অথবা বিষয়ভিত্তিক খণ্ড তৈরির দায়িত্ব দেয়া যায়– ধরা যাক একজন আনাল সম্প্রদায়ের, একজন সাব অলটার্ন গ্রুপের আর একজন কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক গভীর অনুসন্ধানে নেমেছেন! হোঁচট খেতে খেতে কৃষক, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, হত্যা, ক্ষুধা এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের নতুন অনুবাদ পড়ি। গল্প ভেসে আসে আরো নতুন, টাটকা এবং আধুনিক বিষয়াদি নিয়ে– দেশভাগের যৌক্তিকতা নিয়ে এক গুচ্ছ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আসে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে গালমন্দ করে কেউ মুসলিমদের নিজস্ব আবাসনের লক্ষ্যে নতুন প্রবন্ধ লিখতে বসেছেন। ধর্মতত্ত্বের নতুন বই হয়েছে।

নাস্তিকতা, ধর্ম, রাষ্ট্র, সিভিল সোসাইটি, আধুনিকতা এবং ধর্মের মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে কৃতি বন্ধুদের আলোচনা শুনি। ১১ই সেপ্টেম্বরের টিকাভাষ্য ছাপা হয় কাগজে– ইসলাম, ফতোয়া, জেহাদ এবং দি রুটস অফ মুসলিম রেজ নিয়ে। ইজ ইসলাম অ্যান এনিমি অব ইউনাইটেড স্টেটস? ইসলামি চিন্তার এই পুনর্গঠন নিয়ে ইলিয়াসের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করার এখন খুব সামান্যই অবকাশ। ওঁর পুরনো নথিপত্রে দেখা যায়, ইলিয়াস এত বিবাদের পরেও দেশভাগের পক্ষে মত দেননি; দেশভাগ আসলে আমাদেরকে উদ্বাস্তু করেছে, আমাদের স্বতন্ত্রকে হত্যা করেছে আর অগুনতি ভূমিজ মানুষকে দিয়েছে বিপুল এক ক্ষুধার রাজ্য– ইলিয়াসের প্রত্যয় অনেকটা তা-ই। এক ফাঁকে ইলিয়াস ওঁর স্বপ্নতত্ত্বের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন– তুমি জান, অর্ধশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের ঘরে এক ধরনের বই থাকে, খোয়াবনামা, চলতি কথায় বলে খাবনামা। খাবনামা মানে যেখানে স্বপ্নের ব্যাখ্যা থাকে। ধর, লেখা থাকে হাতের স্বপ্ন দেখিলে এই হবে। সে বইগুলো অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত মুসলমানদের ঘরে খুব থাকে। সেইখান থেকে আমি আমার বইয়ের নামটা নিয়েছিলাম।.. বগুড়ার গ্রামগুলোতে আমি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেরও একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি, নিম্নবর্গের হিন্দু, নিম্নবিত্তেরও বটে– নিম্নবর্ণ নিম্নবিত্ত কিন্তু অনেক জায়গায় সমার্থক। তাদের সঙ্গে নিম্নবিত্তের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক কম। ... বগুড়ার পোড়াদহে একটা মেলা হয়। সেই মেলার নাম সন্ন্যাসীর মেলা। মেলা উপলক্ষে বাড়ির লোকদের, আত্মীয়-স্বজনদের আনতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে-জামাইকে আনতে হবে। তা না হলে সেই মেয়েদের পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে থাকা মুশকিল হবে। এই মেয়ে নিয়ে আসছে– এটা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সবাই। ... শেরপুরের কাছে একটা জায়গা আছে কেল্লাতোষ। সেখানেও এই সন্ন্যাসীর মেলা হয়। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরেও একই জিনিস হচ্ছে। এগুলো আমার মনে হয়, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল না আঠার শতকের শেষের দিকে, মজনু শাহ যে ফকির বিদ্রোহ করেছিল আমার মনে হয় এই সময় থেকে এই ব্যাপারগুলোর সূচনা হয়েছিল। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী মধ্যে ভবানী পাঠকও আছেন। হয়তো ভবানী সন্ন্যাসীও হতে পারে।

সন্ন্যাসী ও ফকির রহস্য তখনি সমাধান হয় না। টেলরের বন্দুক আর মাছের নকশা আঁকা পান্টি ভাসে কাৎলাহার বিলে; অথবা নিখোঁজ পাকুড় গাছের নায়া এসে বিলের জলে টলমল করে। মুনসির লাশ থেকে আগুনের শিখা আসছে। গাইখুরা গাছের কাঁটা লাগে পায়ের নিচে। মুনসির পোষা গজার তমিজের বাপের মাংস খুবলে নেয়। হাঁড়ির অবশিষ্ট চাল থেকে গন্ধ নিতে নিতে কুলসুম ক্ষুধা দমন করে, অথবা চালের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে। ঝমঝম বৃষ্টি। এলাকায় ধান কাটা উৎসব। এলোকেশী বেগুনের সঙ্গে খুব ঝাল দিয়ে রাঁধা চচ্চড়ি। কে জিজ্ঞেস করে বানের পানির দাঁত জালায় নাকি? লালচিনি মিশিয়ে চা খায় মানুষ। ক্ষিধে হয়, বমি হয়, মাটি গভভো ধারণ করে। ফকিরের বেটি। ফকিরের নাতনি কথা বলে অথবা গান শোনায়। জমিতে দল বেঁধে মাগুন খাটে মানুষ। পাতকুয়ার পাট বদলায়। খৈয়ের সঙ্গে আখের গুড় খায়।

আউসের ভাত, গরুর গোশতো ও হাতিবান্দার দৈ নামে। জিরায় শটি মিশিয়ে ভেজাল দেয়ার নৈপুণ্য দেখে। জমি ভাগ হয়। বর্গাদার বদলায়। বর্গাদার নিশ্চিহ্ন হয়। পোড়াদহ মেলা নিয়ে মানুষের উৎসাহ বাড়ে। হিন্দুমহাজন, দেশভাগ আর লীগ নিয়ে ঝড় ওঠে চায়ের কাপে। চায়ের সুরুত-সুরুত আওয়াজে যে আবেশ আসে, তাতে কেউ আবছায়া চেরাগআলির গলা শুনতে পায়। কেউ খৈ খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। মশারির স্বপ্ন দেখে আর হঠাৎই শুনতে হয় কোলকাতায় বোমা পড়ছে। মানুষ দলবেঁধে মাটি আঁকড়ে দাঁড়ায়। সাঁওতাল পাড়া থেকে তীর ছুটে গেল। নায়েব বাবু ভয় পায়। জিন্নাটুপি মাথায় শরাফত মণ্ডল আনন্দচিত্তে পায়চারি করে। সন্ন্যাসীর থানে বলি দেয়ার খাঁড়া ধুয়ে নেয়া হল মোষের দিঘিতে। ন্যালাভোলা-হতদরিদ্র মানুষ ডাক্তারের পিয়ার্স সাবান, লিপটন চা এবং ক্রিম ক্রেকার দেখার জন্য ভিড় করে। ব্রহ্মচারী ইনজেকশনের নাম শেখে। এক ফাঁকে কামার বাড়ির খুলিতে নেমকহারাম বকের ঝাঁক উড়ে যায়। রেডক্রসের পাউডার-দুধ স্বপ্ন আরো ঘোলাটে করে। জোছনা রাতে চাষ করতে নামে বাপ-বেটি; জোছনার আঁচ লাগে তমিজের সারা বুকে। গালে ধানের শীষ খোঁচা-খোঁচা চুমু দেয়। পাড়াগাঁয়ের হাটে পাকিস্তান, আবুল হাশেম, নাজিমুদ্দিন, কংগ্রেস, লীগ, জিন্নাসাহেব ও কৃষক প্রজা জোছনার আলোয় ভিজতে থাকে। ইসলামে কোনো কাস্ট সিস্টেম নাই। ...ব্রাদার নেভার ফরগেট দ্যাট ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অফ লাইফ। ইট গিভস আস এভরিথিং উই নিড। ইট অফারস আস দি উইপন টু ফাইট ফর পাকিস্তান হুইচ রিমেইনস আওয়ার গোল টিল উই এ্যাচিভ ইট। পাকিস্তানের স্বপ্ন যত গভীর হয়, চেরাগ আলীর কেরামতিতে শিমুল গাছে সাদা বক তত সংখ্যায় বাড়ে। মোহাম্মদি-হানাফি বাহাসে মিষ্টি মজা হয়। তেভাগার খবর আসছে বকের সাদা পালক ভেদ করে। নিশানের মেলার কর্মকারেরা চিৎকার করছে। তেভাগার গান গাইতে গাইতে সুর বদলে পাকিস্তানের গান বাঁধে এক পথকবি। চিবানো মুড়ির কুয়াশা ভেদ করে সেই গান মানুষের গলা বুকে লেগে যায় আর ভিড় বাড়তে থাকে পাঁচবিবি স্টেশনের প্লাটফর্মে– ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে। এই সেনাপতি কও তো কেটা? পাকুড় গাছের মুনসি হল এই সেনাপতি। মজনু শাহের লিজের মানুষ আছিলো তাই। এখনো কালীপূজার আত্রে ভবানী পাঠকের আদেশে মুনশি কাৎরা ভাসায়া দেয় বিলের মধ্যে, এই কাৎরার মধ্যে কালা পাঠা বলি দিবার পারে তো তোমার সর্ব পাপ মোচন হবি। কী? তোমার আছে আলি, হামার আছে কালি; তোমার তাকত আলির হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে! ঠিক কি-না? আলি আর কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া হয়া থাকবার পারে?

কিন্তু এই সম্মিলনের আবেদন-নিবেদন খবু সামান্যই মানুষ কর্ণপাত করে। কাৎলাহার বিল দখল নিয়ে স্বধর্মের মধ্যেই নতুন আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিলের জলে রক্তের ছলক। পুলিশের ওয়ারেন্ট আসে। নায়েব তার কৌলিন্য জাহির করার জন্য সন্ন্যাসীকে উৎখাত করে, দুর্গার পূজা করতে চাইছে। সন্ন্যাসীভক্ত বৈকুণ্ঠ তাতে মন খারাপ করে। ওদিকে কোলকাতায় মুসলমানদের মেরে সাফ করে ফেলল হিন্দুরা! এই

ক্রোধ এবং উত্তাপ কামার পাড়ায় আগুন ছড়িয়ে দেয়। কামারপাড়া পুড়তে থাকে, কেউ হত্যা হয়। বাসাবাড়ি লুট হয়। লক্ষ মানুষ দেশত্যাগী হয়, উদ্বাস্তু হয় এবং বাকি সব নিজদেশে পরবাসী! চিরকালের মতো গৃহত্যাগের আগে নীরেন দেখে, এটা পিসিমার ঠাকুরঘর। খুব ছোটোবেলায় চুপ করে এই ঘরে ঢুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পিসিমার পিঠে। পূজা ছেড়ে পিসিমা তাকে কোলে নিয়ে বারান্দায় তার মায়ের কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল, দুষ্টু ছেলে, তোমার জন্য আমাকে এখন ফের ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে হবে। পিসিমার পুড়ে যাওয়া শরীরের আঁচ এসে লাগে চোখে। চোখ জ্বালা করে। বুকের ভেতর বাঙালি নদীর জল এসে টলমল করে। মানুষ হেঁটে হেঁটে 'ইন্ডিয়া' খোঁজে, বমি করে, পথের ভেতর সন্তান প্রসব করে, অথবা নিছক পরবাসী হয়ে যাওয়া। কতিপয় পরবাসী, আর ধান, জমি এবং তেভাগার স্বপ্নসৌধ নিয়ে যে ক'জন বাঁচে, এদের মাথায় তখনও বিজবিজ কথা হয়। কথার কুশি বেরোয়। কথা থেকে চেরাগ আলি ও তমিজের বাপের মতো শোলোক নামে। ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে স্বপ্ন তখন একটিই– জখম চাঁদের নিচে হেঁসেল জলিচ্ছে। চাঁদের নীচে জোনাই পোকার জ্বালে জ্বালে চাঁদের ওপর সেদ্ধ হচ্ছে আউশের রাঙা চাল। লাল মাড় উপচে গড়িয়ে গড়িয়ে কাৎলাহার বিলের দিকে এগুলে– পুরনো খাবনামার দু'একটি পৃষ্ঠা দেখা যায়, বকের পাখায় ভর করে নিখোঁজ পাকুড় গাছে মিলিয়ে যাচ্ছে। বকের ধূপছায়া-পালক থেকে স্বপ্ন ঝরে পড়লে খাবনামার খোঁজ পড়ে; অস্পষ্ট দুর্ভাবনা ও ক্ষোভ এসে কাউকে জাপ্টে ধরে– তুমি হামার দাদার বই বেচ্যা খাচ্ছো? তোমার ভালো হবি না। বইটা বার করে সে জান ভরে গন্ধ নেয়। আসলে তার বল হল ঐ ফকিরের বই। বইয়ের জোরে সে মানুষকে এভাবে ধরে রাখতে পারত। ব্যবহারে-ব্যবহারে ছেঁড়া খাবনামার বাকি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় লেখক নিজেও উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে পড়ে– এই ছেঁড়া-খোঁড়া বইটাই যত অনিষ্টের মূল। এখন বইটা হাতছাড়া হতেই কলম শুকিয়ে যাচ্ছে বার বার।

আমাদের ছোট শহর থেকে কবে কালি তৈরির কারখানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বোবা-কলম দিয়ে স্বপ্ন-লিখতে ভয় হয়, স্বপ্ন দেখতেও ভয় হয়– প্রজাতন্ত্রের দণ্ডমূর্তি ক্রমাগত নির্দেশ পাঠিয়ে স্বপ্ন-হত্যা করে চলেছে এবেলা। এর পরেও ভূমিজ-মানুষ লুকিয়ে-লুকিয়ে স্বপ্ন দেখে অথবা স্বপ্ন নিজেই কাৎলাহার বিল থেকে হেঁটে হেঁটে উঠে আসে। ভাতের স্বপ্ন, জমির স্বপ্ন, তেভাগার স্বপ্ন মিলিয়ে গেলে মানুষ সার-বীজের নিগড়ে পড়েও স্বপ্ন দেখার জন্য বিদ্রোহ করে আবার। পাঁচমিশালি বুনো শাক কুড়ানোর মতো, পাতা কুড়ানোর মতো সারারাত স্বপ্ন চাষ করে, স্বপ্ন কুড়ায়, স্বপ্ন ফিরি করে, স্বপ্ন সমবণ্টন করে আর বারোমেসে ফলের মতো একটি স্বপ্নবৃক্ষ বপন করে।

উদ্বাস্তু মানুষ দূর থেকে স্বপ্নবৃক্ষকে বিষাদ বৃক্ষ বলে বিভ্রমে পড়ে। নাড়িপোঁতা দেশ-গাঁ ছেড়ে যখন খাল বেয়ে নৌকা চলে যাচ্ছে 'ইন্ডিয়া'র দিকে, তখন ঘুমের গভীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বিশালকায় দেবোপম বৃক্ষ। সময়ের খালের জলে তাঁরই বিষণ্ন প্রচ্ছায়া। ঝুরঝুর করে বৃক্ষ তাঁর পাতা ঝরিয়ে যাচ্ছেন, যেন অঝোরে কাঁদছেন। যেন অসহায় এক প্রাচীন কুলপতি তাঁর অবাধ্য দুঃশাসনীয় গোষ্ঠীর আত্মঘাতী

মাৎস্যন্যায়ী আচরণে মুহ্যমান। খালের দিকে বাড়ানো তার শিকড়ের সাথে সার সার নৌকা বাঁধা, নাকি বৃক্ষই তাদের আঁকড়ে ধরে আছেন এখনও। এই নদীখাল আর তার কিনারের হোগল, কাশ, ছৈলা অথবা কেয়ার বনজ, এইসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুকুর, দিঘি পরম্পরাগত তাবৎ এই আত্মীয় আয়োজনের কিছুই আর নাকি তাদের নয়।

স্বপ্নচ্যুত এই মানুষকে তখন নতুন স্বপ্ন দেখায় এক ভাস্কর কবি– দেখুন আমি তো মাটিতে পড়ে যাওয়া মানুষ, আমি উঠে দাঁড়ানোর কথা ভাবি। চলার স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নটা ছাড়া কীভাবে বাঁচব? আমরা সকলেই তো আসলে স্বপ্ন দেখতে চাই, কিন্তু এই দেখার জায়গাতেই সকলে এসে পৌঁছতে পারি না। সে জন্যেও একটা মহড়ার দরকার হয়। আমি তো বাস্তবের মাঝেই দমবন্ধ অবস্থায় লেপ্টে রয়েছি। এর মধ্যেই স্বপ্ন এসে হাজির হয়। এই স্বপ্ন একটা খোলা জায়গায় নিয়ে যায় আমাকে। ... মনে মনে ঠিক করতে হবে যে, আমি দুঃস্বপ্ন দেখব না, ভালো স্বপ্ন দেখব। এই মনোবলটাই পরিবর্তন আনবে। আর সত্যিই আমার মধ্যেও পরিবর্তন আনল। আমি তারপর আর ভয়ের স্বপ্ন দেখি না।

ভয় কেটে যাওয়ার আনন্দে নতুন ছবি দেখি : টেবিলের উপর রাখা একটি বাটি অসুস্থ মেয়েটির ইচ্ছাশক্তিতে নড়ে উঠছে– তারকোভস্কির স্টকার নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে বাটি নড়ে উঠাটি স্বপ্ন, না নেহায়েৎ ইমেজ? খাবনামার কয়েকটি পৃষ্ঠায় ইঁদুর আদর করে দাঁত ছুইয়ে দিলে তারকোভস্কির এই স্বপ্ন তখন-ই খুঁজে পাই না। স্বপ্নে দেখি, শতবর্ষের নির্জন তপস্যা ছেড়ে কে একজন মার্কেজের মতো আমাদের এই অদ্ভুত পিলগ্রিমিজে যুক্ত হয়েছেন, আমি ফিদেলের বন্ধু, আই সেল মাই ড্রিমস্... আমি এসেছি তোমাদের পাড়ায় স্বপ্ন বিক্রি করতে! স্বপ্ন ভুলে যাব বলে বুদ্ধি বার করি দ্রুত। কতিপয় শিশু ইলিয়াসী-খাবনামার উড়ে-বেড়ানো-পৃষ্ঠা আঠা দিয়ে জুড়ে ঘুড়ির মতো লেজ বানিয়েছে– স্বপ্নব্যাখ্যার এই ফাঁকা পৃষ্ঠায় আমরা স্বপ্ন সাজাই, খানিকটা নিজের স্বপ্ন, আর খানিকটা কিনে নিই স্বপ্নবিক্রেতার কাছ থেকে। সেই রাতে আবার স্বপ্ন নামে– ইলিয়াস স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন-পুস্তকের নাম বদলাতে চাইছেন; খাবনামা বদল করে ভাবের ব্যারাম করা যায়? বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার আগেই ইলিয়াসের ছায়া দ্রুত কাৎলাহার বিলের নিখোঁজ পাকুড় গাছের কোটরে ঢুকে পড়ল। আমরা সামান্য আতান্তরে পড়ি; বইয়ের নাম তবে কি ভাবের ব্যারাম, নাকি খাবনামা-ই বলবৎ থাকবে? নামবিভ্রাট নিষ্পত্তি ছাড়াই এবার আমরা ব্যক্তিগত স্বপ্নপুস্তক লিখে ফেলি সারা মগজ জুড়ে। এই পুস্তক চুইয়ে কল্যাণবার্তা আসে, মুমূর্ষু হতে হতে বেঁচে থাকার কোলাহল আসে, স্বপ্নে পাওয়া ধন্বন্তরী ওষুধের নাম আসে, আর আসে অপরূপ এক আনন্দ-বেদনার গান। হয়তো খানিকটা ত্রিফলার গন্ধও আসে। খাবনামা থেকে ত্রিফলার গন্ধ হারাতে চাই না বলে, শেষমেষ বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখি। মনে হল, আমার ভাবের ব্যারাম হারিয়ে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা জলের একটি ঝাপ্টা আসে- বালিশের নিচে টলমল জল। জলের স্রোত যমুনা হয়ে, পুণ্ড্রশহর হয়ে, বাঙালি নদী হয়ে, ব্রহ্মপুত্র হয়ে– আমাদের পাপ, আমাদের সাম্প্রদায়িকতা, আমাদের বিষবৃক্ষ, আমাদের বিষাদবৃক্ষ,

আমাদের অশুচি, আমাদের বিবমিষা, আমাদের ঘেন্নাসহ তাবৎ দঙ্গল বুকে নিয়ে চলেছে আদি গঙ্গার দিকে। স্বপ্নভুক কে একজন নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া বিষাদবৃক্ষের দিকে চোখ ফেরায়। ভেতর থেকে মগ্ন-প্রার্থনার সাহস এসে জলে মিশে যাচ্ছে– হয়তো একদিন আমাদের এই জনপদের কারুর কোনো উত্তরপুরষ, কোনোদিন এই মাহবৃক্ষের যে শিকড়ে নৌকার কাছিগুলো বাঁধা ছিল, তার সন্ধান পাবার জন্য আকুল হয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছাবে, যেমন সাগর রাজার উত্তরপুরুষেরা যুগ যুগ প্রচেষ্টার পর পৌঁছোতে পেরে পাপমুক্তি করেছিল তাদের পূর্বপুরুষদের, তেমনি। আর সেদিনই হয়তো এই অভিশাপের কাল শেষ হয়ে বুড়ি পিসিমায়েদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, বাস্তুঠাকুর আবার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন এক জ্যোতির্ময় বিকালে।

শওকত আলীর উপন্যাস: শোষিত শ্রেণীর অসহায়ত্ব ও সংগ্রামের প্রকৃতি অন্বেষণ

ফ রী দু ল আ ল ম

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ শুরু হলে উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে এবং সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মতো প্রভাবশালী ঔপন্যাসিকেরা বাংলা উপন্যাস রচনায় অপরিসীম কৃতিত্ব দেখান। পরবর্তী পর্যায়েও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রভাবশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য থেকেই বাংলাদেশের উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে। এখানকার ঔপন্যাসিকেরা নিজেদের প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় তুলে ধরেছেন। এদেশের গ্রামীণ জীবন, নাগরিক জীবন, অঞ্চলভেদে জীবনধারার রূপভেদ, মনস্তত্ত্বের বিকাশ, ঐতিহাসিক চেতনা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আমাদের উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। এ বিষয়গুলো আমাদের জীবনসম্পৃক্ত বলেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমাদের মননকে আন্দোলিত করে।

মানুষের সব ধরনের স্বভাব-প্রবৃত্তি, অসহায়ত্ব, পতন, আত্মার সংকট– এগুলো উপন্যাসের বুকে স্থান করে নেয়। মানুষের সাথে মিলনের ব্যাকুলতা, উত্থান-পতন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা– এ সমস্তই উপন্যাসের অংশ। সমাজের ভাঙা-গড়া, প্রতিটি তরঙ্গ, প্রতিটি স্পন্দন উপন্যাসে অনুভব করা যায়। ইতিহাসের প্রণেতা হিসেবে সমষ্টিগত মানুষ, আর এই ইতিহাসের অন্তর্গত বড়-বড় ঘটনা, সংগ্রাম-আন্দোলন-যুদ্ধ হচ্ছে উপন্যাসের আখ্যান। লেখক যে সমাজে বাস করেন তার পরিবর্তনে বদলায় উপন্যাস। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে মার্জিত হতে থাকে, পরিণত হতে থাকে উপন্যাসের আঙ্গিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশীয় উপন্যাসের নির্মাণ ও বিকাশের সূচনা ঘটে। সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় সামন্তবাদকে পরাজিত করে স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের ক্রমজাগ্রত পরিণতি এগিয়ে দেয় উপন্যাসের উন্মেষপর্বকে। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পরে উত্থান ঘটে নগরকেন্দ্রিক সমাজের। এই সমাজের নতুন নতুন শর্ত ও বাস্তবতা সাহিত্যে উপযুক্ত স্থান দাবি করলে উপন্যাস নামের নতুন সাহিত্যমাধ্যমের সূত্রপাত হয়। চরিত্র-পটভূমি-পরিবেশ মিলিয়ে উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটে সাধারণ মানুষের কথকতার। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় আজকের বাংলাদেশের উপন্যাস। এদেশে সে-সময়ে প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের বিরোধিতা করে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন রীতির উপন্যাস। উপন্যাসিকদের মধ্যে অনেকেই প্রথাগত সাহিত্যের বিপরীতে উপন্যাসে নতুন চেতনা ও নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। গ্রামবাংলা, পল্লীজীবন-নির্ভর বিভিন্ন স্তর, আঞ্চলিক প্রতিবেশ, মানুষের অচরিতার্থ কামনা-বাসনা, ঘোর-বিকার-স্খলন, অহিংস ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা, নগর ও শহরতলীসহ বহুমুখী বিভিন্ন বিষয় হয়ে ওঠে উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়ে ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে জীবনের ব্যাখ্যা। মানুষের সাবেকী বিশ্বাস এখন আর স্থায়ী নয়। কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শে মানুষ আর আস্থা রাখছে না। পুরনো আদর্শ মরে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতির নতুন নতুন ব্যবস্থা, চূর্ণ-বিচূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের বহির্জগত ও অন্তররাজ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন সূচিত করছে। গ্লোবালাইজেশনের পরিণতিতে সারা বিশ্ব একাকার হয়ে এক প্রান্তের ঢেউ গড়িয়ে আসছে আরেক প্রান্তে। এরই সুবাদে বাংলাদেশের উপন্যাসে এসে পড়েছে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কথাসাহিত্যের প্রভাব।

কেবল আন্তর্জাতিক সাহিত্যই বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেনি। সাহিত্যিকদের মনোজগতে ক্রিয়া করছে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞানসহ বিবিধ বিষয়। দ্রুত বদলে যাচ্ছে সবকিছুই। বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা জ্বালানি যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে চলেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা আশা দেখাচ্ছেন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উন্নততর মানবজাতি

পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার। গোটা মানবজাতির কাছে বিষয়টি নতুন চিন্তার যোগান দিচ্ছে। কম্পিউটার-ইন্টারনেটের চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনাচার। এ সবের প্রেক্ষিতে উপন্যাস রচনার সনাতন প্রথাগত তত্ত্ব ও কলাকৌশল আজ পুরনো ও অকেজো হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের ঔপন্যাসিকগণ পরিবর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি, অগ্রসরমান প্রযুক্তি, নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের সঙ্গে নিজস্ব বাস্তবতায় নজর দিচ্ছেন।

দুই

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অথবা দেশবিভাগের জন্য এই উপমহাদেশে সবচেয়ে চড়া দাম দিতে হয়েছে অখণ্ড বঙ্গদেশকে। বঙ্গদেশের এই অখণ্ডতা চিরকালই ছিল না– এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। দেশ বিভাগের আগে যার নাম ছিল "বেঙ্গল", বাংলা বা বঙ্গদেশ, পাঠান-মোগলের এদেশ অধিকারের আগে তা ছিল অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। এগুলোর ভিতরে একটি ছোট এবং অস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট টুকরোর নামই আদি যুগে ছিল "বঙ্গ"। এই ভৌগোলিক অঞ্চলে আদি যুগে বিভক্ত বিভিন্ন জনপদের নাম ছিল গৌড়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, পুণ্ড্র-বরেন্দ্র, দক্ষিণ রাঢ়-উত্তর রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ ইত্যাদি। শশাঙ্ক, পাল অথবা সেন রাজারা এই খণ্ড খণ্ড অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্র অথবা দেশে পরিণত করতে পারেননি। এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি প্রথমে ঘটে পাঠান শাসনামলে এবং তারপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মোগল শাসনাধীনে। সুলতানী আমলে সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ [শাসনকাল ১৩৪২-১৩৫৮] উপাধি গ্রহণ করেন "শাহ্-ই-বাঙালি"; বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হয় তাঁর রাজ্যসীমা।

দেশ এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য এবং ঐক্যের উদ্ভবে রাষ্ট্রের যতটা ভূমিকা ছিল তার চাইতে বড় ভূমিকা ছিল ভাষা এবং সংস্কৃতির। যাকে আজ আমরা বাংলাভাষা বলি তা সুস্পষ্ট রূপ পায় পাঠান আমলে। চর্যাগীতি যে কালে রচিত হয় তখনও বাংলাভাষা তার নিজস্ব চেহারা খুঁজে পায়নি। আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলো তখনকার মতো রয়ে গেল বটে কিন্তু পঞ্চদশ শতকে প্রায় সমস্ত "বঙ্গদেশে" বোধ্য এবং ব্যবহৃত একটি ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটল যা সাহিত্যের ভাষা এবং যার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এই ভাষাই বাঙালিকে তার সামূহিক বিশিষ্ট অস্তিত্ব দিয়েছে যদিও "বঙ্গাল" বা "বেঙ্গল" শব্দটির প্রয়োগ এই অখণ্ড বঙ্গ সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম করা হয় বিদেশি পর্যটকদের রচনাসমূহে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা এবং দ্বিখণ্ডীকরণে এ দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে বিকল্প বাছাইয়ের কোনো সুযোগই পায়নি। যত বেদনাদায়কই হোক না কেন বিষয়টা আদৌ বিস্ময় উৎপাদনকারী কোনো ব্যাপার নয়– কারণ, প্রায় আড়াই-তিন হাজার বছর ধরে এ দেশের শূদ্র, অচ্ছুৎ এবং অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষদের নানাভাবে মগজ ধোলাই করে মেনে নেওয়ানো হয়েছে যে তাদের ধর্ম এবং কর্ম

উপরতলার মানুষদের সেবা এবং মান্য করে যাওয়া– সমাজের এবং রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্তে তাদের কোনো স্বাধীন ভূমিকা নেই– থাকতে পারে না। এহেন সুস্পষ্ট অন্যায় এবং অসাম্যের অস্বীকৃতিতে মাঝে মধ্যে কিছু আন্দোলন হয়েছে বটে– কিন্তু তা মুখ্যত ইহবিমুখ ধর্মীয় আন্দোলন। রাষ্ট্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে গণসংগঠন করে সংগ্রামের কোনো মানস বা প্রচেষ্টা আমাদের খুব-একটা চোখে পড়ে না। শ্বেতকায় শাসকদের হাত থেকে ১৯৪৭ সালে যখন ক্ষমতা এদেশি উচ্চবর্গের কাছে হস্তান্তরিত হল তখনও এ দেশের নিম্নবর্গের মানুষদের তাতে কোনো অংশগ্রহণের নিদর্শন নেই।

সমকালীন সাহিত্যাঙ্গনের অন্যতম আলোচিত শিল্পকর্ম শওকত আলীর "প্রদোষে প্রাকৃতজন" উপন্যাস। উপন্যাসটি নিয়ে কিছু বলার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় বর্ণনার দাবি রাখে। বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ বিকাশের কোনো স্বতন্ত্র, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংবদ্ধ ধারার অস্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সমকালে এবং অনতি-উত্তরসময়ে আমাদের গোচরে আসে না। এ জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এক শত বছরেরও বেশি সময়। বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের বিকাশ মূলত শুরু হয় বৃটিশ উপনিবেশোত্তর কালেই এবং একে জাতীয়তাবাদ না বলে উগ্র স্বাদেশিকতা নামে অভিহিত করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। বঙ্কিমের সময়ে বাংলা উপন্যাস ছিল ধারা হিসেবে নতুন, এতে সাংস্কৃতিক চেতনার পরিবর্তে গদ্য-ফর্মের আঙ্গিক বিন্যাসই ছিল মুখ্য বিষয়– তাই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাতে ধর্ম এবং রাজনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থান করে নেয়।

জাতীয়তাবাদ থেকে স্বাদেশিকতাকে পৃথক করে অবলোকন করা প্রয়োজন এ কারণে যে উভয়ই কোনো-না-কোনো ভাবে সংস্কৃতিজাত বিষয়; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে আমাদের উপন্যাসসাহিত্য সংস্কৃতিকে এভাবে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। "আলালের ঘরের দুলাল" কিংবা "হুতোম প্যাঁচার নকশা"-য় তৎকালীন সমাজকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল এবং এর প্রকাশকে বলা যায় স্থূল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় ধর্ম এবং রাজনীতিকে উপস্থাপন করে বিতর্কিত হলেও তিনি স্বাদেশিকতার (উগ্রতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও) গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ জাতীয়তা যে অর্থে সামগ্রিকতাকে ধারণ করে এই উপন্যাসগুলো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়নি। এই ধারাই মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং বৃটিশ উপনিবেশকালে রচিত পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে ধর্মের পরিবর্তে রাজনীতিকে তুলে ধরা হয়। ৪৭-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে আরও স্পষ্ট এবং সূক্ষ্মভাবে আত্ম-অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তৎকালীন প্রেক্ষিতে সে প্রচেষ্টার আদৌ প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয়নি। স্বাধিকার প্রতিফলনে যা প্রয়োজন ছিল উপন্যাসিকগণ ততটুকুই তাঁদের লেখায় তুলে ধরেছেন।

তিন

ইতিহাস থেকে পথ খুঁজতে খুঁজতে জীবনের গভীর মন্থনে ক্রমশ ঢুকে যাওয়া– এইভাবেই দীর্ঘদিন পথ চলেছেন শওকত আলী (জন্ম ১৯৩৬)। রাঢ় বাংলার সেইসব ক্ষুধার্ত, ভূমিহীন, বঞ্চিত দাসানুদাসের দল– তারাই একমাত্র তাঁর লেখার পাত্রপাত্রী নয়। এই লেখকের মাধ্যমে জীবন থেকে সাহিত্যের শব্দসমুদ্রে বুকজলে নেমে কিছু মানুষ তৈরি করে নিয়েছে এক জঙ্গম, গতিশীল জীবন। শওকত আলী মানুষের কথা লেখেন, দারিদ্র্য আর শোষণের ব্যাধ-রজ্জুতে বাঁধা-পড়া মানুষদের কথা। দিনাজপুরের রায়গঞ্জে জন্ম শওকত আলীর। পরিবারে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে উঠতে সাহিত্য তাঁর মজ্জাগত হয়ে যায়। ১৯৫৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, দিনাজপুর থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৮ সালে। শওকত আলী দীর্ঘদিন সরকারি জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখান থেকেই পেশাদারি কর্মজীবনের অবসর।

কিন্তু অবসর কি নিতে পারেন তাঁর মতো সৃষ্টিশীল মানুষ? অবসর তো আসলে কাজের ভুবনে আরও বেশি জড়িয়ে যাওয়া, আরও বেশি অঙ্গীকার। বঙ্গীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের বঞ্চনার শিকড় তিনি বুঝতে চেয়েছেন নিজের অনুভূতি দিয়ে, আর তারপর তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই আখ্যান– মানুষ যেভাবে ইতিহাসকে চলমান রেখেছে তার আখ্যান। এই সৃষ্টিরই অনুরণন ছড়িয়েছে বাংলা উপন্যাসে শওকত আলীর সৃষ্টিসমূহে। ১৯৬৮ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৯০ সালে একুশে পদক লাভ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩), যাত্রা (১৯৭৬), প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫), কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬), পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬), উত্তরের খেপ (১৯৯১), টুংকু নামের হাতি (১৯৭৯), উন্মুল বাসনা (১৯৬৮), শুন হে লখিন্দর (১৯৮৬) ইত্যাদি। নিজের লেখার অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে ২০০৭ সালে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে শওকত আলী আমাদের জানিয়েছেন: "..... তেভাগা আন্দোলনে প্রতিবেশী বীরদের রক্তমাখা একগ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এক তেভাগা সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়। তার এক পায়ে গুলি লেগেছিল। সেই পা তার কেটে ফেলতে হয়েছে। লোকটি জমির আলে শুয়ে মাটিতে কান দিয়ে ছিল। তাকে আমি কমরেড সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করি, সে কী শুনছে। উত্তরে সে আমাকেই প্রশ্ন করে, "গান শুনতে পাচ্ছেন?" আমি অবাক হয়ে বলি, "কই, কিছু শুনছি না তো?" পরে সে যা বলল, তাতে আমি বিস্মিতই হলাম। জমিতে ধানের বীজ পোঁতা হয়েছে। সেই বীজ ভেদ করে নবজন্মের হর্ষে সিক্ত উদ্ভিদ যে গান গাইছে তাই শুনছিল সে।

কোনো বড় কবি কী তাঁর মাটিকে এভাবে এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন? এরাই আমার সকল শ্রদ্ধা আর সম্মানের পাত্র, এরাই আমার লেখার অনুপ্রেরণা।"

[গল্প, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪১৪, পৃষ্ঠা-১০]

চার

জাতীয়তাবাদ নয় বরং সংস্কৃতির সূত্রানুসন্ধানে নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুর্লক্ষ। এই ধারার একাধিক উপন্যাসের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে "প্রদোষে প্রাকৃতজন"। আঙ্গিক এবং বৈশিষ্ট্যগত নতুনত্ব,– যা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না, উপন্যাসটিতে আমাদের বিস্মিত করে।

"প্রদোষে প্রাকৃতজন"-এ দুটো অংশ– ১. প্রদোষে প্রাকৃতজন, ২. দুষ্কালের দিবানিশি। উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে সর্বনাশা একাত্তরের পরিমণ্ডলে। অনিবার্য ও অমোঘ প্রতিকূলতায় আবশ্যিক অভিবাসনে ছিন্নমূল মানুষ সবসময় শেকড়ের সন্ধান করে। ফিরে তাকায় পেছন পানে, যেখান থেকে তার যাত্রার শুরু হয়েছিল। শ্যামাঙ্গ, লীলাবতী, বসন্তদাস, ছায়াবতী, মিত্রানন্দ, নিরঞ্জন– এই চরিত্রগুলোর স্থানান্তর, অভিযোজন কিংবা বিনাশ, একটি বিশেষ সময়ের সুগভীর ও স্থায়ী পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে। একাত্তর আমাদের মশালবর্তিকা– পালিয়ে বেড়ানো দিনগুলোর অবসরে তার উপলব্ধি এবং পেছন ফিরে যাত্রা। "প্রদোষে প্রাকৃতজন" উপন্যাসটির রচনা প্রসঙ্গে উপন্যাসিকের নিজের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"..... "প্রদোষে প্রাকৃতজন"-এ একটা কালের ঐতিহাসিক ঘটনা আছে বটে। কিন্তু "প্রদোষে প্রাকৃতজন"-এ যেটা দেখা গেছে সেটা হল এই, মানুষগুলো আক্রান্ত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। ....,৭১ সালে যখন আমরা এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছি, সেখান থেকে আর-এক গ্রামে যাচ্ছি। তখনই দেখেছি হাজার হাজার লোক ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরে দেখেছি এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রামে বাক্স-বিছানা-বালিশ এই সব নিয়ে পালাচ্ছে ঐ গ্রাম আক্রান্ত হবার পর। তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এইগুলো কবে থেকে আমাদের মধ্যে শুরু হয়েছে? মোঘল যখন আক্রমণ করেছে তখন কি এভাবে পালিয়েছে মানুষ? কিংবা বৃটিশরা যখন আক্রমণ করতে আসছিল, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিল সৈন্যবাহিনী নিয়ে, তখন কি এসব ঘটনা ঘটেছে? কিংবা যখন একেবারে প্রথম দিকে আর্যরা আসতে শুরু করল, তখন কি পশ্চিম দিক থেকে লোকগুলো এখানে এসেছে? বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত কিছু হিন্দুদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তাদের আদি বাড়ি কোথায় ছিল? তাদের কেউ বলেছে আদি বাড়ি ছিল বর্ধমান, কেউ বলেছে অমুক জায়গায়– এই ধরনের কথাবার্তা শুনেছি। তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাহলে কতদিন ধরে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি? কতদিন ধরে আমরা পলায়ন করছি

বা স্থান ত্যাগ করছি? এই যে মাইগ্রেশন, একদিকের মানুষ আর-এক দিকে চলে যাওয়া, জীবন ভেঙে যাওয়া, জীবন বিপর্যস্ত হওয়া, আবার নতুন করে জীবন গড়া– এই ব্যাপারটা, এই প্রসেসটা কতদিন ধরে চলে আসছে?..... তা থেকেই উপন্যাসটা বেরিয়ে এসেছে।"

[শওকত আলী– বাংলা উপন্যাস বাস্তবতা প্রসঙ্গ: উনিশ শতক, নিসর্গ, শওকত আলী সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা-১]

শওকত আলীর মহত্তম উপন্যাস "প্রদোষে প্রাকৃতজন"-এ ব্যক্তিক সত্তা অন্তর্লীন হয়ে যায় বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আর তাই ব্যক্তির অবস্থান কিংবা অবস্থানচ্যুতি সামগ্রিকতাকেই নির্দেশ করে। জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে এ উপন্যাসকে আমরা উপলব্ধি করি জাতীয়তাবোধের উৎসে নিবদ্ধ থাকতে।

খ্রিস্টীয় ৮ম শতকের মাঝামাঝি গোপাল দেব পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দ পালের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের বিলয় ঘটে। পাল রাজাদের সময়েই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় এবং এই সময়েই একাদশ শতাব্দীতে "ধর্মযুদ্ধ"-র মোড়কে শ্রেণীসংগ্রাম সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাঙালিদের পতিত ও অন্ত্যজ ঘোষণা করে এবং সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অথর্ব করে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড রূপে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়। সামন্ত শ্রেণীর নেতৃত্বপ্রদানকারী গোষ্ঠী সংগঠিত না হওয়ার কারণে তাদের এই সংগ্রাম ব্যর্থতার পর্যবসিত হয় এবং অবশেষে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্যবাদী শক্তিগুলো কট্টর পুরোহিততন্ত্রের কাছে পরাস্ত হয়। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার এই সংগ্রামকে পৌরোহিত্যবাদী ক্ষমতালোভীরা ধর্মসংগ্রামের নামে চালিয়ে দেয়। বাংলাদেশের সোমপুর তথা পাহাড়পুর মহাবিহারের গায়ে সজ্জিত অজস্র পোড়ামাটির ফলকে লোকায়ত জনমানসের যে কাহিনী বিধৃত হয়ে আছে, তার পরোক্ষে ফলকের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে শ্রেণীসংগ্রামের নির্যাস।

পাল শাসনামলে বিহারগুলোকে কেন্দ্র করে বিশাল বাংলায় বর্ণভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় এক নবজাগরণের সূচনা হয়। বর্ণাশ্রমের বিরোধী জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া বর্ণবাদের বোঝাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক নতুন বর্ণহীন গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। আর এই চেষ্টার বিকাশকেই আমরা সোমপুর বিহারের গায়ে সজ্জিত লোকায়ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দেখতে পাই। মৃৎশিল্পীদের সচেতন প্রয়াসের মধ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আত্যন্তিক প্রকাশকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। বাংলার জনসমাজের অধিকাংশ তখনও বর্ণাশ্রমের বাইরে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিল এবং তাদের প্রতি বৌদ্ধ শ্রমণদের সহযোগিতাও প্রবল ছিল। "প্রদোষে প্রাকৃতজন" উপন্যাসের শ্যামাঙ্গ, লীলাবতী, বসন্তদাস প্রমুখ এই জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি।

পাঁচ

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় শওকত আলী রচিত উপন্যাস "যাত্রা"। অত্যন্ত সীমিত পরিসরের এ উপন্যাসে একদল মানুষের অনিশ্চিত যাত্রা তথা পলায়ন শুধুই কি নিশ্চিত নিরাপদ গন্তব্যের দিকে, নাকি সুনির্দিষ্ট ও মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্যাপক তৎপরতার অংশবাহী– এ দুটি প্রশ্ন মূর্ত করা হয়েছে। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গটি অনেক বেশি সুস্পষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত ও বাঙ্ময়; সেইসঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুখদ সম্ভাবনা অনেক বেশি সজীব এবং প্রেরণাদীপ্ত। অনিশ্চয়তা নয় বরং প্রতিটি চরিত্রের দীপ্ত ভূমিকা রূপায়ণের মাধ্যমে উপন্যাসে নিশ্চিত সম্ভাবনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। "যাত্রা"– এই প্রতীকধর্মী নামকরণে আপাতভাবে "চলা"-কে নির্দেশ করা হলেও মূল ধারণার ব্যত্যয় ঘটে না।

মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত আবেদন তথা দৃঢ়তা, সংকল্প কাল এবং ব্যাপ্তিগত সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে "যাত্রা" উপন্যাসে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা যথার্থ। একদল মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু-যুবক, গণহত্যা থেকে পালিয়ে বাঁচতে কারফিউর ফাঁকে ঢাকা নগরীর অনতিদূরের এক অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের পালিয়ে যাওয়া, পথচলতি বিস্রস্ত সংলাপ, অনুভূতির পরম্পরা ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হলেও সামষ্টিক চেতনা, চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। প্রাণের ভয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে বেড়ানো একদল মানুষ– এদের একটি বড় অংশের পিছুটান লক্ষণীয়। মধ্যবিত্তের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রতীকী কল্পনায় আমরা বলতে পারি, হাসানের মতো দৃঢ় চরিত্রের কেউ কেউ সাময়িক অসামর্থ্য ও অপূর্ণতা নিয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের সহযোগিতায় লীলার মতো কিছু নিবেদিতপ্রাণ আর অধ্যাপক রায়হানের মতো দায়িত্ববান কিছু স্বদেশপ্রেমীর একান্ত সাহচর্যে, সাহায্যে, ত্যাগে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। যাত্রা,– এই পারস্পরিক মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে অনিঃশেষ অভিযাত্রা– যদিও এর শেষ তখন পর্যন্ত অজানা ও অনিশ্চিত। যে কোনো জাতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা একটি নিশ্চিত অবস্থা এবং অবস্থানকে নিশ্চিত করলেও বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে দ্বান্দ্বিক ও বিকৃত ব্যাখ্যার ও ভাবনার অস্তিত্ব অস্বাভাবিক নয়,– যার জন্য বিরুদ্ধ মত ও পথের আবির্ভাব। "যাত্রা" উপন্যাসে সহজাত এই সুরটিকে আমরা অনুভব করি। "যাত্রা" শুধু কোনো-একটি লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করাই নয়, বরং সামগ্রিক স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করা ও সঙ্গে নিয়ে চলা। হাসান, রায়হান, ফার্নান্দেজ, বিনু, শাকের, সিরাজ, নীলা, সিকান্দার,– এসব চরিত্রের চারিত্রিক ভিন্নতা মানুষের সামাজিক ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যিকতাকে চিহ্নিত করেছে এবং ভিন্ন মানসিকতার দ্বান্দ্বিক মিলন ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে। এ উপন্যাসে অবস্থান নিরপেক্ষতা মুখ্য বিষয় নয় বরং বিরুদ্ধতা ও বৈপরীত্যের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ও সহজাত বোধকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। "একের ভেতর বহুত্বের" প্রচলিত আধিবিদ্যক দর্শনের পরিবর্তে বহুত্বের অবস্থানকে অক্ষুণ্ন রেখে দৃষ্টিভঙ্গিজাত এক অনন্যতা খোঁজার প্রয়াস আমরা উপলব্ধি করি শওকত আলীর অন্যতম উপন্যাস "যাত্রা"-য়। সম্ভবত এ কারণেই, অর্থাৎ সমষ্টিগত "একক"-

কে "যাত্রা"-র সমার্থক হিসেবে তুলে ধরে উপন্যাসের এ হেন নামকরণ। আঙ্গিকগত বিমূর্ততার কারণে এই বৈশিষ্ট্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে, অসহায়, আশ্রিত মানুষকে আবার নতুন করে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। হানাদার বাহিনীর নির্মমতায় একদল সচেতন মানুষ রুখে দাঁড়ায়। হাসান, এদেরই একজন, তার শারীরিক অসামর্থ্যতাকে উপেক্ষা করে একটি রাইফেল হাতে অপেক্ষা করে, প্রতীক্ষা করে একটি বুলেট ছেঁড়োর। এই ঘটনাটিকে "যাত্রা"-র অন্তর্নিহিত প্রয়াসের বিপরীতে নিজের শেকড়কে খুঁজে নেয়ার প্রয়াস হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি।

ছয়

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটে শওকত আলীর ত্রয়ী উপন্যাস "দক্ষিণায়নের দিন" (১৯৮৫), "কুলায় কালস্রোত" (১৯৮৬) ও "পূর্বরাত্রি পূর্বদিন" (১৯৮৬)– ঊনসত্তরের সমকালকে ঘিরে রচিত ও প্রলম্বিত। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কিছু সময় আগে থেকে এই ত্রয়ী উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের শুরু এবং সে সময়ের কিছু পাত্র-পাত্রী, প্রেম-ভালোবাসায় জারিত, সামাজিক সংস্কার, রুচি দ্বারা প্রভাবিত। এই চরিত্রগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন ও সক্রিয়। ত্রয়ী উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ঊনসত্তরকেন্দ্রিক নয় বরং উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জীবনে, মননে ঊনসত্তর, তার পূর্ববর্তী এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী কিভাবে প্রভাব ফেলেছে, ছায়াপাত করেছে– সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি জাতির অবস্থানের পরিচয়বাহী। এমন একটি আপাত-অখণ্ড বিশাল বিষয়কে ধারণ করা যে-কোনো রচনার পক্ষেই বেশ দুরূহ। বরঞ্চ সাধারণভাবে বলতে গেলে এ ধরনের একটি ঘটনার পেছনে সময়, সক্রিয়তা ও সক্ষমতার বেদনাবাহী যে অতীত বিদ্যমান থাকে এবং তাতে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে খণ্ডিতভাবে উপকরণ হিসেবে যা পাওয়া যায়– ব্যাখ্যাভেদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যে পৃথক রূপ-রস-গন্ধের পরিচয় যাওয়া যায় তার অংশবিশেষের সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপায়ণ ও উপস্থাপন অনেক বেশি স্বাভাবিক ও অনারোপিত বলে উপলব্ধি করা যায়। অন্তত বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন কালজয়ী উপন্যাসে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ঘটনাপ্রবাহকে এভাবেই তুলে ধরতে দেখি। শওকত আলীর এয়ী উপন্যাস "দক্ষিণায়নের দিন", "কুলায় কালস্রোত", এবং "পূর্বরাত্রি পূর্বদিন"-এ সময়ের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ট্রিটমেন্টের সাক্ষাৎ পাই। এই উপন্যাস এয়ের অন্যতম চরিত্র রাখী-র ব্যতিক্রমী, আত্মবিশ্লেষিত এবং অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণ মানসপটে সেজান নামের এক রাজনৈতিক কর্মীর খণ্ডকালীন আবির্ভাবে যে ঘটনা-পরম্পরা বিস্তৃত হয়,– "কুলায় কালস্রোত"-এর অন্তিমে এসে তা মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী উপন্যাস "পূর্বরাত্রি পূর্বদিন"–এর নির্দেশকবাহী হয়ে দাঁড়ায়। সীমিত পরিসরে হলেও এতে করে উপন্যাসএয়ের রাজনৈতিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে সামাজিক

জটিলতায় সম্পর্কগত উপকরণ তথা প্রেম মুখ্য হয়ে উঠলেও যে সময়ের প্রেক্ষিতে এর বুনন তা অস্বীকার করা যায় না এবং সে কারণেই উপন্যাসিক শওকত আলী এখানে অনন্যসাধারণ। ঈপ্সিত স্বাধীনতাকে বক্তব্যের ভেতর মূর্ত করে তুলতে ষাটের দশকের শেষ বছরগুলোর রাজনৈতিক আবহ বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে এ উপন্যাসএয়ে বিধৃত করা হয়েছে। উপন্যাসের গতির সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মধ্যবিত্তের বিত্তগত মাঝামাঝি অবস্থান যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পলায়নপর, দোদুল্যমান চিত্তের অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে যদি এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পৃথক করে ফেলা যায়, তাহলে সমষ্টিগতভাবে এবং সমষ্টির ওপরে এদের প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবস্থানগত দৃঢ়তা, পরিমাণগত বিশালতা– সর্বত্রই এদের উপস্থিতিকে সংহত করেছে। যার জন্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশের মুহূর্তগুলো এদের অংশগ্রহণে ও নেতৃত্বে সমৃদ্ধ হয়েছে। অথচ উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা, উপরে উঠে যাওয়ার এবং হঠাৎ পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকা, পরিচিত জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে অবস্থান করা– এই দ্বান্দ্বিক চরিত্রকে শওকত আলী তাঁর এয়ী উপন্যাসে অত্যন্ত সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। রাজনৈতিক আদর্শের অবস্থানগত দৃঢ়তা থেকে উত্থিত ষাটের দশকের এদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এদেশের তারুণ্যের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও যন্ত্রণা এ উপন্যাসএয়ের মূল লক্ষ্য হলেও অনিবার্য হিসেবে স্বাধিকার তথা পরবর্তীকালে অর্জিত স্বাধীনতার গন্তব্যে অস্পষ্ট যাত্রাপথের ইশারা আমরা এই এয়ী উপন্যাসে পেয়ে যাই। "পূর্বদিন পূর্বরাত্রি" উপন্যাসের এই উদ্ধৃতাংশে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে:

"...দূরে কোথায় যেন কারা শ্লোগান দিচ্ছে– রাখী কান পাতে– কিছু শোনা যায় না স্পষ্ট করে। তখন হাওয়ার দিকে কান পাতে। ভারী মৃদু হাওয়া বইছে। হাওয়ার ঐ শব্দের সঙ্গে যেন সে নিজের রক্তধারার সাড়া পায়। তার রক্তস্রোত, তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা যেন হাওয়ার সঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠছে। সেই সাড়া সে হাত দিয়ে ছুঁতে চায়। নিজেকে তখন সে শোয়ায়– জ্যোৎস্নায়, শিশিরে, মৃদু হাওয়ায়, সে নিজেকে নিরাবরণ করে। নিজের স্ফীত উদরের ওপর ভারী ধীরে হাত বোলায় সে। জ্যোৎস্না ঝরুক এইখানে– মনে মনে জ্যোৎস্নাকে সে ডাকে। তার মনে হয়, তার উদর আলোকিত হচ্ছে জ্যোৎস্নাধারায়– চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ত্বকের ভেতর দিয়ে, পেশীর ভেতরে দিয়ে একেবারে জরায়ুতে– সেখানে তার ছেলের মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে জ্যোৎস্নার আলো। সে একবার বুকের ওপর হাত রাখে, স্তন স্পর্শ করে, শিশিরকে ডাকে– শিশির ঝরুক এইখানে– শিশির পান করে স্তন আরো পরিপূর্ণ হোক, কারণ তার ছেলে এই স্তন চুষবে। সে দু'বাহুর দিকে তাকায়– এই বাহুতে হাওয়া লাগুক– হাওয়ার সজীবতা বাহুতে শক্তি দিক– কারণ বাহু দু'টি তার ছেলেকে ধারণ করবে।"

গ্রাম ও নগরবাসী শ্রমজীবী মানুষের যেমন, তেমনি মধ্যবিত্তেরও জীবন শওকত আলীর প্রধান অভিনিবেশের বিষয়। একদিকে যেমন তিনি ইতিহাসের সত্যকে ধারণ করেন, অন্যদিকে তেমনি বর্তমানের বাস্তবতাকেও ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তি এবং ইতিহাস তাঁর কাছে সমান্তরাল বিষয়। স্খলন-পতন-সংগ্রাম-ভালোবাসা সমন্বিত বহুস্তর জীবনের পূর্ণরূপটি প্রতিফলিত হতে দেখা যায় তাঁর লেখায়। প্রায় একরোখা হয়ে লেগে থাকেন স্বদেশের মাটি ও সেইসব মানুষের সঙ্গে যারা বেঁচে থাকার জন্য আজীবন লড়াই করে। তাঁর চরিত্রগুলো যত-না ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে তার চাইতে অনেক বেশি প্রতিরোধের শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। মানুষের প্রতিরোধ আর ভালোবাসার গাথা রচনা করেছেন শওকত আলী তাঁর রচনাকর্মে।

সত্যেন সেনের উপন্যাস ও অন্যান্য

নূর মোহাম্মদ

আমরা যারা ষাটের দশকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগ্রাম তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো না কোনো ফ্রন্টে কাজ করি– তাদের অধিকাংশই সত্যেন সেন প্রভাবিত। ফলে, যখন কেউা সাহিত্য সমালোচনার প্রাধান্যবিস্তারী ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বলতে ভালোবাসেন, অমুক উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস, অমুক গদ্যকার রাজনৈতিক গদ্য রচনা করেন– তখন আমরা সত্যেন সেনকে অন্তত তাঁর রচনার জন্যে হলেও মাথায় তুলে নাচি– আর এই বার্তা সগৌরবে ঘোষণা করি: সত্যেন সেন ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, 'কৃষক সংগ্রামের নেতা' রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার এক অনন্যসাধারণ সংগঠক, সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত এবং সেই সাথে আরো একটি প্রয়োজনীয় কাজ– একে কাজই বলতে হবে, নিয়মিত জেলখাটা– এ - সবই ছিল তাঁর 'সমগ্রতা'র প্রকাশ। অবশ্য সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন কমিউনিস্ট।

এই বাংলায় সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হিসেবে 'উপন্যাস' তার জায়গা করে নিতে পেরেছিল ষাটের দশকেই। পঞ্চাশের দশকে যদিও ছোটগল্প, কবিতা, গান যতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছিল, 'উপন্যাস'– যে তুলনায় পিছিয়ে ছিল। যারা

উপন্যাস রচনাকে ক্রমাগত গুরুত্ব দিতে পেরেছিলেন এবং প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের অন্য –শাখাতেও কষ্টসাধ্য চেষ্টা করতে চেয়েছেন পেরেছেনও অনেকেই। কিন্তু সত্যেন সেন একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট হিসেবেই শুধু নন, সৃষ্টিশীলতার বড় এক ক্যানভাসের তিনি অদম্য সাহসী, দক্ষ ও অতিক্রমী এক নিপুণ কারিকর হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

উপন্যাস রচনা করবেন– এই বিষয়ের খোঁজ মেলে ১৯৩৪ সালে। একজন গদ্য-শিল্পী হিসেবে 'ভোরের বিহঙ্গী' জেলখানাতে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি 'উপন্যাস' রচনার তাগিদ অনুভব করেছিলেন সম্ভবত এমনটাও হতে পারে, তিনি যা বলতে চান একজন রাজনৈতিক কর্মী ও গদ্য শিল্পী হিসেবে তার প্রধান মাধ্যম উপন্যাস হওয়ার শ্রেয় বিবেচনায়। তাঁর উপলব্ধির সময়কাল আমলে নিলে বিস্মিত হতে হয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক দশকেরও বেশি ব্যবধানে রচিত 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৭) ও 'গ্রাম বাংলার পথে পথে (১৯৭০)' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত অথচ সংগ্রহে এই বইদুটি নেই– ৭০'এর দশকে এটা বেশ অগৌরবের বিষয়ই ছিল বলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সত্যেন সেনের রচনা অনুপ্রেরণার অন্য এক উৎসে পরিণত হয়। কিন্তু সত্যেন সেন প্রধানত একজন ঔপন্যাসিক তবে রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসেবে তার প্রধান পরিচয় কিনা সে আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয় হতে পারছে না। তবে যিনি সমাজ বদলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও তার জন্য কমিউনিজমের মতাদর্শে বিশ্বাসী তার রচনাতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের প্রশ্রয় থাকবে এটা নিশ্চয় কেউ প্রত্যাশা করতে পারে না। রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও গদ্যশিল্পীর শিল্পমানের ক্রমাগত উৎকর্ষ-বিধান এটা তো সাংঘর্ষিক নয়। এ বিষয়ে তিনি অবশ্যই সচেতন ছিলেন।

তার 'ভোরের বিহঙ্গী'র রচনাকাল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ও ১৯৬৯ সালে একই সাথে প্রকাশিত হল ছয়টি গ্রন্থ। এর মধ্যে আলবেরুনীর জীবনের বিস্তৃত যে সংগ্রাম তাকে কেন্দ্র যেমন 'আলবেরুনী', তেমনি যেরুশালেম/ যেরুযালেম/, জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তার। আবার ধরা যাক 'মসলার যুদ্ধ'। মসলার বাণিজ্য করে কালিকট রাজ্য এককালে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সেই সমৃদ্ধি আকর্ষণ করেছিল পোর্তুগালের কালিকটে অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে। কিন্তু শুধু কালিকট নয়। মসলার উৎপাদন বিস্তৃত হয়েছিল পূর্বভারতীয় দীপপুঞ্জে। এসব উপন্যাসে শুধু ইতিহাসের তথ্য নয়, বরং ইতিহাসের অন্তরালবর্তী সত্যই লেখককে আকর্ষণ করেছে বেশি। একদিকে উপনিবেশ-স্থাপন ও সাম্রাজ্যবিস্তার, কুৎসিত লোভ ও বর্বর অন্যায়, মানুষের জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রণের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা; অন্যদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম,... (আনিসুজ্জামান, ১৭/০৭/৭১, মুখবন্ধ)

সত্যেন সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র অতুলনীয়। অন্তত পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ পর্বে বিরাট ইতিহাসজ্ঞান ও একই সময়ের বৃত্তে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানকে নাছোড় বান্দার মতো আঁকড়ে ধরে বিশাল পরিধিতে অবলীলাক্রমে পদচারণা আর কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায়নি।

'অভিশপ্ত নগরী'র 'ভূমিকা'তে সন্তোষ গুপ্ত বলেন; বাইবেলের চরিত্রগুলো উপন্যাসের মানুষের রক্তমাংসের রূপ দেয়া, শোকহীন, হৃদিহীন স্বর্গকে ধরার সুখ-দুঃখের রসে মথিত করার প্রতিভাই নয়– তার মূল তাৎপর্যকে উদ্‌ঘাটন করে এ কালের পারানির নৌকায় তুলে দিয়েছেন লেখক। এর পটভূমিতে রয়েছে আকাশের মতো বিশাল মানবেতিহাসের আধারে সমাজের ক্রমবিকাশের বহতা নদীর গতিধারা ও তার বৈশিষ্ট্য উদঘাটন।

এই কারণেই এই ধরনের উপন্যাসের ভূমিকা-লেখা দুরূহ। এর জন্য দরকার প্রখর ইতিহাস-চেতনা ও মানবসমাজের বিবর্তনে বিভিন্ন শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা অর্থাৎ তারা কোন পরিবেশে কিভাবে উদ্‌ভূত হয়েছে ও বিলয়প্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলছে তার সম্যক জ্ঞান। এছাড়া এযাবৎ লেখকের প্রকাশিত উপন্যাস কিংবা উপন্যাসের অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে বইখানি রচনার প্রসাদগুণে চমৎকার অথচ প্রাচীন কাহিনীর বর্ণনায় ভাষায় গথিক রীতিকে সর্বত্র সমভাবে নির্বাধ করে দেয়ার সার্থকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। লেখকের বই ভাষাশৈলীর সাথে হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাসের ভাষারীতি তুলনীয়।

সত্যেন সেনের সামাজিক উপন্যাসসমূহ হলঃ রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৩৭৪), পদচিহ্ন (১৩৭৫), সেয়ানা (১৩৭৫) এবং একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে (১৯৭১)। কারাগার থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবনসমগ্রতা, এমনকি নীতি-আইনের মানদণ্ডে অবজ্ঞাত ঘৃণিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পর্যন্ত যে সমাজব্যবস্থার অনিবার্য সত্য, উল্লিখিত উপন্যাসসমূহে সেই সমাজকেই সত্যেন সেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করেছেন। সামাজিক উত্থান-পতনের মধ্যে ব্যক্তিক ও সামুষ্টিক অস্তিত্বের যে সঙ্কট, সে-সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের মানবীয় সাধনা ও এ-সব উপন্যাসে সুস্পষ্ট। আত্মজৈবনিক ঘটনার প্রতিফলনজাত হলেও একটা বিশেষ কালের সমাজব্যবস্থার অঙ্গীকারে 'পদচিহ্ন' সত্যেন সেনের এ-ধারার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। (রফিকউল্লাহ খান)।

আগেই বলেছি দু/তিন বছরে তিনি যে সংখ্যক উপন্যাস ও উপন্যাসধর্মী রচনা প্রকাশ করেছেন, সেটা এককথায় অবিশ্বাস্য।

'৫৮ সাল থেকে' ৬৩ পর্যন্ত জেলে বসে লিখে ফেলেছেন, 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ', যাকে উপন্যাসের উপক্রমনিকা বলেছি। এর পরেই তিনি কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেন বাইবেলের গোড়ার দিকের কাহিনীগুলির নরনারীদের দিয়ে। এরপর লিখলেন অপরাধ জগতের উপন্যাস 'সেয়ানা'। জেলের বাইরে যে তিনি ঝড়ের বেগে লিখে চললেন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। '৬৫ সালে আবার জেলখানায় ঢুকে '৬৮ সাল পর্যন্ত চলল তাঁর উপন্যাস লেখার পালা। (রণেশ দাসগুপ্ত ১৯৮৬)

সত্যেন-সাহিত্যকর্ম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি মহৎ নিদর্শন। সত্যেন সেন এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য পথিকৃৎ। বিপুলসংখ্যক রচনার স্রষ্টা, তথাপি ব্যক্তিগত জীবনে একান্তভাবে সৎ লোক, আত্মপ্রকাশ ও প্রচারের সঙ্কোচে সঙ্কুচিত সত্যেন সেনের জীবনাচরণ সেই সত্যকে অনস্বীকার্য করে তোলে যে, সমাজতান্ত্রিক সার্থক সাহিত্য কেবল ভাষা ও প্রকাশের দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে না; মানুষের জীবন ও ইতিহাসকে যে রচনাকার সামগ্রিক অবলোকন করতে সক্ষম না হয়, যে সাহিত্য মানবসমাজকে সমস্ত বিভেদ দূর করে সঙ্গতিপূর্ণ একমানব সমাজ-সৃষ্টিতে নিজেকে উৎসর্গ না করে এবং দূরগামী সেই লক্ষ্যকে কর্ম এবং আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত না করতে পারে, সেই সাহিত্যের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। (সরদার ফজলুল করিম/১৯৮৭)

সত্যেন সেনের ‘পদচিহ্ন’

মফিদুল হক

ঔপন্যাসিক হিসেবে সত্যেন সেনের তুলনীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি রাজনীতির বৃত্তের মানুষ, সেই যৌবনে দীক্ষা নিয়েছিলেন সাম্যবাদী ভাবাদর্শের, বৃটিশ ভারতে মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ যখন ছিল দুর্ভাগ্য ও কারাবন্দিত্বকে আলিঙ্গন করা। স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহ্যে লালিত সত্যেন সেনের জন্য এসব কোনো বাধা ছিল না, বরং দুঃখজয়ের সাধনা তাঁর কাছে ছিল অধিকতর কাম্য। তাই কারাজীবন হয়ে উঠেছিল তাঁর ললাটলিপি, এবং কারাগারকে তিনি পরিণত করেছিলেন জীবন গড়বার পাঠশালায়। আক্ষরিক অর্থেই কথাটা সত্যি, কেননা পঁচিশ বছর বয়সে যে দীর্ঘ-কারাজীবন শুরু করেন সেটা তাঁর জন্য হয়ে উঠেছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করবার সুযোগ। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি, তবে জেল থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত বাংলায় এম. এ ডিগ্রি নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

মুক্ত জীবনে সত্যেন সেন সচেষ্ট ছিলেন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে ঢাকায় যে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গড়ে ওঠে সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সত্যেন সেনের যোগ ছিল। প্রগতি লেখক সংঘ থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'গণসঙ্গীত' শীর্ষক একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে বহরমপুর জেলে বন্দি থাকাকালে তিনি 'ভোরের বিহঙ্গী' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যা প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ষাটের দশকের গোড়ায়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সময়ে, পাকিস্তান আমলে, সত্যেন সেন তেরো বছর কাটিয়েছেন কারান্তরালে। আর ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে তাঁর কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হতে থাকে পত্রিকায়, লেখকের বয়স যখন পঞ্চাশ।

এই যে পঞ্চাশ বছর বয়সে লেখক হিসেবে সত্যেন সেন পরিচয় দাখিল করতে শুরু করলেন, তাঁর পেছনেও ছিল কেজো তাগিদ। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হল ১৯৫৮ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষে রচিত 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী', কারাগারে বসেই প্রস্তুত করেছিলেন এই পাণ্ডুলিপি সহবন্দিদের অনুরোধে। তাঁর এই রচনা কিংবা 'সংবাদ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'গ্রামবাংলার পথে পথে' শীর্ষক রিপোর্টাজ পাঠক-সমাদৃত হয়েছিল। ফলে এরপর থেকে কারাগারে সত্যেন সেন লেখালেখিতে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৭ সালের শেষ অথবা ১৯৬৮ সালের গোড়ায় সত্যেন সেন কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং আমরা দেখা পাই লেখক সত্যেন সেনের। এই সময় প্রকাশিত হয় প্রায় দশ বছর আগে রাজশাহী কারাগারে বন্দি-থাকাকালে রচিত উপন্যাস 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ', যাকে কারা-উপন্যাসই বলা যায়, যেমন লিখেছিলেন এর আগে শহীদ সাবের 'আরেক দুনিয়া থেকে'। একই বছর প্রকাশিত হয় সত্যেন সেনের আরো চারটি গ্রন্থ। 'অভিশপ্ত নগরী', 'মসলার যুদ্ধ' এবং কিশোরদের জন্য রচিত 'পাতাবাহার' ও 'আমাদের এই পৃথিবী'। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় সত্যেন সেনের পাঁচটি উপন্যাস, 'পুরুষমেধ', 'আলবেরুণী', 'পাপের সন্তান', 'সেয়ানা' ও 'পদচিহ্ন'। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয় সত্যেন সেনের প্রয়াসে এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় সত্যেন সেনের এগারোটি গ্রন্থ, 'উত্তরণ', 'মা', 'সাত নম্বর ওয়ার্ড', 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', 'কুমারজীব' ইত্যাদি উপন্যাস ছাড়াও ছিল ইতিহাস, গণ-আন্দোলন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে দুর্বল স্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি সত্ত্বেও সত্যেন সেন সেই উত্তাল সময়ের ভাষ্য হিসেবে প্রকাশ করেন 'প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ' আলেখ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে সাহিত্যচিত্তের স্ফূর্তি তিনি আর খুঁজে পাননি দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাবার ফলে। ১৯৭২ সালে অন্ধত্ব বরণ সত্ত্বেও তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখেন আত্মীয়-বন্ধু-অনুগামীদের সহায়তায়। মুখে মুখে বলে রচনা করেছেন বই, যার অধিকাংশ ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক।

সত্যেন সেনের সাহিত্য প্রয়াস স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও তাঁর রচনার পরিমাণ নেহায়েৎ কম নয়। তবে এটা ভাবতে অবাক লাগে প্রচলিত সাহিত্য-আলোচনা কিংবা ভাবনার বৃত্তে তিনি একান্ত অবহেলিত থেকে গেছেন। তিনি যে আমাদের এক প্রধান লেখক ছিলেন, সেটা স্বীকারেও যেন অনেকের কুণ্ঠা। সত্যেন সেনকে রাজনীতিক বৃত্তের মানুষ হিসেবে গণ্য করে তাঁর সাহিত্যিক স্বীকৃতি অনেকটা আবৃত করে রাখা হয়েছে। সাহিত্যিক হিসেব তাঁর সিদ্ধির অনেক পরিচয় রয়েছে, বর্তমান আলোচনায় আমরা কেবল একটি উপন্যাস 'পদচিহ্ন' বিবেচনায় নিয়ে এর বহুমাত্রিকতা বুঝে নিতে চাইব।

উপন্যাসিক হিসেবে সত্যেন সেন মূলত কাহিনী বর্ণনার রীতি বা ন্যারেটিভ ফর্মকে বেছে নিয়েছেন। তবে কাহিনীর উপযোগী ভাষা নির্মাণেও তিনি মনোযোগী, যেটা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহে বিশেষভাবে লক্ষগোচর হয়। 'সেয়ানা' উপন্যাসের ভাষায় নিম্নবর্গীয় ছাপ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি 'পদচিহ্ন' উপন্যাসের ভাষায় রয়েছে মধ্যবিত্তের পরিশীলিত ভাষারীতির ছাপ। 'পদচিহ্ন'-এর কাহিনীকাল পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র যে নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করতে চাইছে সেই পটভূমিকায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীর ওপর ভেদচিন্তার অভিঘাত এবং সমাজের অভ্যন্তরে নতুন জাগরণের পরিচয় ফুটে উঠেছে কাহিনী-সূত্রে, আর যথার্থভাবে উপন্যাসের নামকরণ ঘটেছে 'পদচিহ্ন'। এই 'পদচিহ্ন' মোটেই ফেলে আসা পথে কারো পদচ্ছাপের পরিচয় নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনময়তার এ-এক 'পথচিহ্ন', যা আগামীর সুপ্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের সূচনাংশ থেকে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি যেরেমিয়ার সংলাপ, সত্যেন সেনের ভাষাগুণের সামান্য পরিচয় গ্রহণের জন্য। যেরেমিয়া বলছেন, "আঃ, ওই যে রক্তবর্ণ ঘোড়াগুলি ছুটে আসছে বিদ্যুৎবেগে। আরোহীদের উজ্জ্বল বর্মগুলো সূর্যের আলোয় ঝকমক করে উঠছে। তোমাদের পরমায়ুর মতো তোমাদের চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি যেরেমিয়া দেখছি। ঐ, ঐ যে আসছে দুর্ধর্ষ ক্যালদীয়েরা, স্বয়ং প্রভু অগ্রবর্তী হয়ে তাদের চালনা করে নিয়ে আসছেন। আপন সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন বাহু প্রসারিত। ঐ আসছে, ওরা আসছে। ওদের হাতের বর্শাগুলি রক্তের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ওদের ঘোড়াগুলো তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে ছুটে আসছে, ওদের খুরের টগবগ শব্দ যিরূশালেমের প্রাচীরের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে।"

অন্যদিকে 'পদচিহ্ন' উপন্যাস শুরু হয়েছে একেবারে সাদামাঠাভাবে। ভাষার এক আটপৌরে রূপ কাহিনীর আপাতসরল কাঠামোর সঙ্গে একান্ত সামঞ্জস্য রচনা করেছে। উপন্যাস শুরু হয়েছে এভাবে, "কুকুরটা হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যামিনী মিত্র আর স্ত্রী প্রমীলা তখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি, শুয়ে শুয়ে সংসারের সুখদুঃখের কথা বলাবলি করছিলেন। এত রাত্রিতে কুকুরটাকে হঠাৎ এমন করে ডাকতে শুনে ওরা ভয়ে ধচমচ করে উঠে বসলেন। আসলে রাত্রি খুব বেশি হয় নি, কিন্তু গ্রামের রাত্রি তো। তাছাড়া যা দশা হয়েছে গ্রামের, সন্ধ্যা হতে না হতেই যে মাঝরাত্রি হয়ে যায়।"

এই ভাষা অবশ্য সত্যেন সেনের সহজাত, অন্তত 'পদচিহ্ন' উপন্যাসের যে পাণ্ডুলিপি আমার হাতে রয়েছে সেটা উল্টেপাল্টে দেখলে এমনটা মনে হবে। বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতার প্রথম থেকে শেষাবধি টানা হাতে লিখে গেছেন উপন্যাস, কোথাও বিশেষ কাটাকাটি নেই। এমনকি পৃষ্ঠা বাঁচাতে মার্জিনও বিশেষ রাখেননি। খুব ছোট নয় এই উপন্যাস, তাই মনে হয় কাহিনী ও চরিত্রের কোনো ছক তিনি কি কোথাও কাটেননি, নাকি পুরোটা মাথায় নিয়ে পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে এগিয়ে গেছেন রচনাভাষ্য নিয়ে। যে স্ট্রিম অব কনশাসনেস জটিল সাহিত্যধারার জন্ম দিয়েছে, মনে হয় তার বিপরীতে নিবিড় এক চৈতন্যপ্রবাহ তৈরি করে সত্যেন সেন লিখেছেন উপন্যাস। যে জীবনের কথা তিনি লিখেছেন একদিকে যেমন তার গভীরে প্রবেশ করেছেন, অন্যদিকে সমাজবিশ্লেষকের অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে যে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি যুগিয়েছে সেই আলোকেও বিবেচনা করেছেন সমাজবাস্তব। ফলে একদিকে 'পদচিহ্ন' উপন্যাস চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপানুসন্ধান করেছে, অন্যদিকে ধারণ করেছে টালমাটাল সময়ে পরিবর্তনময়তার বিভিন্ন অভিঘাত। এই দুইয়ের সার্থক সংশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন বলেই 'পদচিহ্ন' এমন সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে।

দুই.

'পদচিহ্ন' ঘটনানির্ভর বর্ণনাত্মক উপন্যাস যেখানে কাহিনী আপন গতিতে এগিয়ে চলে। শহরের ছেলে আনিস তার প্রিয়বন্ধু সুবিনয়ের সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে তাদের গ্রামের বাড়িতে। ট্রেন লেট হওয়ায় তাদের বাড়ি পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল। সেই রাতে বাড়ির পোষা কুকুর কাপ্তানের ডাকে জেগে-ওঠা বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছে কাহিনী। উৎকণ্ঠা ছিল আরো অনেক বিষয়ে। পরতে পরতে ঘটতে থাকে এর উন্মোচন এবং সেভাবে এগিয়ে চলে কাহিনী। প্রথম উৎকণ্ঠা ছিল গ্রামের এক পড়তিমুখি সম্ভ্রান্ত আচারনিষ্ঠ পরিবারে আকস্মিক কোনো মুসলিম যুবকের উপস্থিতি কীভাবে গৃহীত হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা কাটিয়ে ব্যক্তিত্বের মহিমা ও ব্যবহারের অন্ত রঙ্গতা দিয়ে আনিস জয় করে নেয় সবার মন। তবু ব্যক্তিসত্তার বাইরেও তো থাকে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা, যার অভিঘাত ব্যক্তির পক্ষে সবসময়ে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই দেখা যায় বাড়ির সবার কাছে আনিসের পরিচয় মেলে ধরা হলেও বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছে সে হয়ে রইল অনিল মিত্র। তিনদিন পর যখন আনিসের চলে যাওয়ার সময় হয় তখন সুবিনয়ের মা প্রমীলার মনে হয়, "কী চমৎকার ছেলেটি! মুসলমানের ঘরে এমন ছেলে হয়? ওকে তো মুসলমান বলে মনেই হয় না।" ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার মিলনে-মিশ্রণে চরিত্রের বাস্তবানুগ হয়ে ওঠার দিকে নির্মোহ দৃষ্টি ছিল সত্যেন সেনের, ফলে তাঁর চরিত্রসমূহ যেমন সজীব হয়ে উঠতে পেরেছে, তেমনি সমাজবাস্তবতার অনেক গভীরে তিনি দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিলেন।

'পদচিহ্ন' উপন্যাস বৃহত্তর পরিসরে তলিয়ে দেখতে চেয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মিলনের নিরিখে সমকালীন সমাজবাস্তবতা আপাতসরল

কাহিনীকাঠামোর ভেতর দিয়ে। ফলে তিন দিনের গ্রাম সফরে আনিসের কাছে উদ্ভাসিত হয় বাস্তবের গভীরতর ও বৃহত্তর রূপ। সুবিনয়ের জন্যও এই দেখাটা হয়ে ওঠে নতুন উপলব্ধির সঞ্চারক। স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল গ্রামসমাজে পরিবর্তন ঘটছিল খুব দ্রুত, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গ্রামসমাজের জটিল সম্পর্ক-কাঠামোকে সরল ধর্মসম্পর্কের নিরিখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। তার স্বাভাবিক প্রতিফল হিসেবে বাড়ছিল সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের পীড়ন। এই পীড়ন যে সবসময়ে রক্তাক্ত সহিংস আঘাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয় তা তো নয়। রায়বাড়ির মানুষজন দেশভাগের পর কলকাতায় দেশান্তরী হলেও বৃদ্ধ নির্মল রায় কিছুতেই ভিটে ছেড়ে যাবেন না। উপন্যাসে আমরা দেখি, গ্রাম সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নির্মল রায় "এই জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছেন কিন্তু এই মর্যাদাটুকু নিয়েই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেজন্যই এই নতুন আমলে সংখ্যালঘুর মনের দুর্বলতা তাঁকে কাবু করে ফেলতে পারেনি। যা বলবার তিনি স্পষ্ট করেই বলতেন। সময় যে বদলে গেছে এবং কোনো কাজ করবার সময় সে-কথাটা যে স্মরণে রাখতে হয় এ-চিন্তাটা তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। ...একদিন গ্রাম্য ব্যাপারে কী একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন তিনি। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে হতে ব্যাপারটা চরমে উঠে গেল। অপর পক্ষ কিঞ্চিৎ ইংরাজি জানা লোক, যে নির্মল রায়কে ইংরেজি ভাষায় নিজের চরকায় তেল দিতে বলল।"

এর পরদিন প্রত্যুষে সপরিবারে দেশত্যাগ করেছিলেন বড় বাবু নির্মল রায়।

গ্রাম পরিক্রমায় মুসলিম পরিবারগুলোর ওপরও দৃষ্টিপাত ঘটেছে এবং কেবল আনিস নয়, সুবিনয়ের জন্যও এ-হয়ে উঠেছে নতুন অভিজ্ঞতা। শ্রীপুর গ্রাম যে কোনো এককালে ছিল শেখপুর, স্কুল মাস্টার আবদুল কুদ্দুস যখন তার অজানা কাহিনী মেলে ধরেন তখন বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন উত্থান-পতনের পরিচয় আমার পাই। গ্রামের ভূমিহীন মুসলিম কৃষক পরিবারের দুর্গতি তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের দূর-সম্পর্ক মেলে ধরে। আবার মদন ঢালীর বাড়িতে উঠে অবাক হয়ে যায় আনিস, মুসলমানদের এমন নাম হয়? আরো অবাক মানে যখন জানতে পারে তাঁর বাবার নাম ছিল কার্তিক ঢালী। বাঙালি মুসলমানের পদবী ও গ্রাম-নাম নিয়ে সত্যেন সেন ছিলেন প্রবলভাবে আগ্রহী। এ-বিষয়ে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করুক এমন অভিপ্রায় ছিল তাঁর। তাঁর নিজের এই উদগ্র বাসনার বিচ্ছুরণ আমরা পাই উপন্যাসের ঘটনাধারায়।

উপলব্ধির এমনি নানা উপাদানে ঠাসা রয়েছে 'পদচিহ্ন', কিন্তু কোনোভাবেই তা কাহিনীর গতি বা ধারাবাহিকতা হারায় না।

সব মিলিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে পঞ্চাশের দাঙ্গার পরপর, পূর্ববঙ্গীয় সমাজে এর অভিঘাত ও নতুন এক উপলব্ধি ও চেতনার জাগরণ প্রতিফলিত হতে দেখি 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে। শেষ বিচারে এই উপন্যাস নিছক পাত্র-পাত্রীর উপাখ্যান নয়, সমান্তরালভাবে এ-হচ্ছে জাতির পথপরিক্রমণের কাহিনী, যথার্থ এক 'পদচিহ্ন'।

আমার এই প্রিয় উপন্যাসের প্রতি সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারাটা হয়েছে আনন্দবহ। এর পুনঃপাঠ সবার জন্য নিশ্চয় হবে এক অনিন্দ্য অভিজ্ঞতা।

মুসলমানমঙ্গল: 'যুক্তি' ও বিভ্রান্তি

শান্তনু কায়সার

২০০৯-এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে জাকির তালুকদারের উপন্যাস 'মুসলমানমঙ্গল'। ৩৫০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি দুটি পর্ব 'আত্মসমালোচনা পর্ব' ও 'মোকাবিলা পর্ব'-এ বিভক্ত। শেষ প্রচ্ছদে 'সংবেদী পাঠক'কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে পাঠক ও লেখক উভয়েই তাদের মুসলমান ও বাঙালি পরিচয় নিয়ে রক্তাক্ত। একদিকে উন্নত বিশ্ব তাদের ঋণচক্রজালের মধ্য দিয়ে যাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করছে তারাই আবার পাহাড়সমান অবজ্ঞার কারণে নিজেদের আত্মপরিচয়হীনতার মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু লেখক মনে করেন, 'আমাদের .... গৌরবের ইতিহাস' সত্ত্বেও এখন আমরা 'অসম্মানের বর্তমান আর অনিশ্চয়তার ভবিষ্যতে'র সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তিনি মনে করেন, 'কষ্ট ভাগ করে নিলে তা নাকি উপশমের সমান।' এই প্রত্যাশা থেকে পাঠককে সঙ্গে নিয়ে এবং তাকে সাক্ষী রেখে তিনি এই উপন্যাস শুরু করেছেন। ব্রেশটের নাট্যে অথবা শেক্সপিয়রের এপিলোগে তাঁরা যেমন দর্শককে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন তেমনি জাকিরও হয়তো পাঠককে লক্ষ্য করে উপন্যাসে তাই করতে চেয়েছেন। বইয়ের ডানদিকের ফ্ল্যাপে বলা হয়েছে, 'সমকালীন বাঙালি

মুসলমান সমাজ ও মননকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে লিখিত হয়েছে 'মুসলমানমঙ্গল'। আমরা বিনীত অহঙ্কারের সঙ্গে বলতে চাই এই ধরনের উপন্যাস বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম।' এ জন্যই হয়তো ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলতে চাওয়া হয়েছে, 'জাকির তালুকদার, কারো কারো মতে, হয়ে উঠতে যাচ্ছেন, বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সবচেয়ে অগ্রগামী চিন্তার কথাসাহিত্যিক।'

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনটি উক্তি স্মরণ করতে চাই। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা।' গত শতকের ষাটের দশকে বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, ধর্মের পরিচয় মানুষ চাইলে পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু নৃতাত্ত্বিক ও জাতিসত্তাগত পরিচয় পরিবর্তনযোগ্য নয়। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ধর্মের পরিচয় পরিবর্তিত হলেও একজন বাঙালি বাঙালিই থেকে যান। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে বলেছিলেন আমাদের জাতিসত্তাগত পরিচয় 'মালা-তিলক-টিকি' বা 'টুপি-লুঙ্গি-দাড়ি'তে ঢাকার যো নেই– তা এ অর্থেই বিবেচ্য। কিন্তু সে সময়ে প্রধানত 'আজাদ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা ষাটের দশকে সুফিয়া কামালের প্রতি যে কটাক্ষ করা হয় তা-ও বলে দেয়, তাঁরা আমাদের প্রকৃত আত্মপরিচয়েরই সন্ধান করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রাণ হয়েও তাঁরা দুজন আমাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সে জন্যেই ডক্টর শহীদুল্লাহ আমাদের পরিচয়কে যে 'আদর্শে'র না বলে 'বাস্তব' বলে গণ্য করেছিলেন; সুফিয়া কামাল প্রকৃতপক্ষে তারই প্রতিধ্বনি করেন। এই দশকের শেষার্ধে বদরুদ্দীন উমর একেই বলেছিলেন বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। দেশ, ভাষা ও পরিপার্শ্বকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে শুধু ধর্মীয় পরিচয়কে অবলম্বন করে আত্মঘাতী অথবা উদ্দেশ্যমূলক যে ভাবনাকে তখন প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করা হচ্ছিল তাকে প্রতিরোধ করে নিজেদের প্রকৃত সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল সেই সময়ের দাবি এবং উল্লিখিত তিনজন সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর (ডক্টর শহীদুল্লাহ আগে মারা গেলেও মর্মগতভাবে) পর্যন্ত তা-ই করেছিলেন বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে যদি আমরা স্মরণ করি উর্দু প্রসঙ্গে 'মর্নিং নিউজ' কী সম্পাদকীয় এবং ঐ ভাষার সমর্থনে সিলেটের কয়েকজন নাগরিক পূর্ব বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে দেওয়া স্মারকলিপিতে কী লিখেছিলেন। প্রথমে 'মর্নিং নিউজে'র মন্তব্য : 'বাঙলাদেশের মুসলমানরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই উর্দু বলতে ও বুঝতে পারে। তারা দিল্লি, আলীগড় অথবা লক্ষ্ণৌর লোকেদের মতো চমৎকারভাবে উর্দুতে কথা বলতে না পারলেও প্রত্যেক মুসলমান শিশুই কোরআনের বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত। কাজেই উর্দু শেখা তার পক্ষে সহজই হবে। করাচির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য এখানেই। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমানদের

মুক্তি ও গৌরবময় ভবিষ্যৎ নিহিত।' এবার সিলেটের কতিপয় নাগরিকের বক্তব্য একটু বিস্তৃতভাবে শুনলেই বোঝা যাবে, এর কী প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক ছিল : 'একদল লোক নিজেদেরকে বিরাট সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাংলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশি ভাষা হিসাবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে চারদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে তারা নিজেরাই বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবি তুলেছে, যে ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা শুধু যে ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ।' (পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি/বদরুদ্দীন উমর, ১ম খণ্ড)। ২০০৯-এর এই সময়ে দাঁড়িয়ে বলারও প্রয়োজন নেই, কারা আসলে পশ্চাদপদ ও নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু অতঃপর জাকির তালুকদার যখন 'মুসলমানমঙ্গল' লেখেন তখন তাঁকেও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মপরিচয়ে অবশ্যই মুসলমান। কিন্তু তাই বলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বা প্ররোচনায় তাকে যে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলা হয়েছে দেশটির প্রকৃত পরিচয় কিন্তু তা নয়। এটি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। ধর্মপরিচয়ে এক হয়েও পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান যে পাকিস্তান থেকে পৃথক হতে চেয়েছে এবং হয়েছে তা-ই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। স্বয়ং ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে বলেছেন, '... শ্রীমহছেন উল্লাহ সরকারের মতো মানুষেরা চেয়েছিলেন, বাঙালি মুসলমান কৃষক মুক্তি পাক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শোষণ থেকে, ব্রিটিশের অন্যায় শাসন থেকে, আবার একইসাথে মুক্তি পাক হিন্দু জমিদারদের অসহিষ্ণু অমানবিক কার্যকলাপ থেকে, হিন্দু বাবুদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য থেকে। এইসব আকাঙ্ক্ষার বিপথগামী পরিণতির নাম পাকিস্তান।' হ্যাঁ, বিপথগামী। কারণ পাকিস্তানের বা তার প্রকৃত নেপথ্য স্রষ্টাদের মূল লক্ষ্য জনকল্যাণ ছিল না, ছিল তাদের নির্বিকার ও নির্বিচার শোষণ ও লুণ্ঠন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে যে গণপ্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাকির তালুকদার সে কাজেই ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি যে যুক্তি ও যুক্তিকাঠামো অনুসরণ করেছেন তা অধিকতর বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। 'মোকাবিলা পর্বে'র সাত পরিচ্ছেদে লিসবেথ বলে এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে উপন্যাসের মূল চরিত্র ইউসুফের দেখা হয়। মার্কিনিরা বা মার্কিন প্রশাসন ইসলামের মধ্যে মৌলবাদ খুঁজে তাকে যেভাবে আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছে তার বিপরীতে যুক্তির সন্ধান করছে ইউসুফ ও লেখক। সেজন্যই হয়তো তাদের লিসবেথের প্রয়োজন হয়েছে। সাদী ওস্তাদের শ্লেষের জবাবে ইউসুফ যে বলে 'ধর্ম আর প্রান্তিক বিষয় নয়। মুসলমানরা এখন যেমন নিজেদের মধ্যে

বোঝাপড়াটা সেরে নিতে চাইছে, তেমনই বোঝাপড়া সেরে নিতে চাইছে আমেরিকা-ইউরোপের নেতৃত্বাধীন ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মের সাথে এবং অন্যান্য সব ধর্ম আর মতবাদের সাথেও।' 'আত্মসমালোচনাপর্বে'র তিন অধ্যায়ে ইউসুফই বলেছিল, 'যুক্তিবাদী হলেই তাকে ধর্মবিরোধী হতে হবে, এই ধারণা ভুল।' উদাহরণ হিসেবে সে মুতাজিলাদের কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে একটি কাকতালীয়-প্রায় সাদৃশ্যের কথা বলা যাক। রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের একটি গল্পের নাম 'লিসপেথ।' লিসপেথ অবশ্য ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। তার প্রকৃত নাম এলিজাবেথ, পাহাড়ী উচ্চারণে হয়েছে 'লিসপেথ।' এই তরুণী ভেবেছিল, খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সে বুঝি ঐ ধর্মের, তার সংস্কৃতির একজন হয়ে তার অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু ঘটনাক্রম থেকে সে বুঝতে পারে, ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের খ্রিস্টান সমাজে সে আসলে বহিরাগত। ফলে তাদের 'মিথ্যুক' বলে সে নিজের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ফিরে যায়। যে লেখক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কখনও মিলবে না বলে ফতোয়া দিয়েছেন (East is east, West is west/The twain shall never meet), যিনি ভারতবাসীকে ভেবেছেন White men's burden তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে নিজের সংস্কৃতির কাছেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত আশ্রয়। জাকিরও হয়তো ঐ রকম প্রণোদনা অথবা প্রেরণা থেকেই 'মুসলমানমঙ্গল' লিখে থাকবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যুক্তির চেয়ে আবেগের পরিচয় বেশি দিয়েছেন। তিনি একবার দেখাচ্ছেন 'মৌলবাদ' 'শব্দটির উদ্ভাবক খ্রিস্টানরা।' এর প্রথম ব্যবহার করেন ইহুদিরা। (আট/মোকাবিলা পর্ব)। আবার ছয় অধ্যায় শেষ করছেন একথা বলে, '... বিনীতভাবে এই দাবিটুকু করতে চাই যে, বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা শুরু করার দায়ভার আমাদের বাঙালি মুসলমানদের নয়।' 'আমাদের' বলে উপন্যাসের মূল চরিত্র অথবা ছদ্মবেশী লেখক একটি পক্ষ নিয়েছেন, কিংবা অন্তত তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়েছে। এতে ঔপন্যাসিকের নির্মোহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ঘটে কি না শিল্পের সেই প্রশ্নকে আপাতত উহ্য রেখেও বলা দরকার বিষবৃক্ষ যেই রোপণ করে যাক, তার সুযোগ গ্রহণ অথবা ব্যবহার কি কোনো অর্থেই গ্রহণযোগ্য? লেখকও তা চান বলে মনে হয় না। কিন্তু 'মুসলমানমঙ্গল' যখন তিনি করতে চান তখন তাঁকে অন্তত মনোমত ব্যাখ্যা দিতে হয়। এই 'মঙ্গল' (কাব্য?) রচনা করতে গিয়ে তাঁকে দেশের ও বিশ্বের মুসলিম ইতিহাস ও নানা ঘটনা পর্যালোচনা করতে হয়েছে। উপমহাদেশে, বিশেষত বঙ্গে ওহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইউসুফের ঘনিষ্ঠ আবদুল খালেক বলে, '... এক সময় ওহাবি মোল্লাদের তৎপরতায় গ্রামে গ্রামে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে মেলামেশা, তাদের পূজা পার্বণের আনন্দে, মেলাখেলায়, ব্রতের উৎসবে মুসলমানদের যোগ দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, মেলা, কুস্তি, বলীখেলা, এমনকি পুঁথিপাঠকেও খারাপ বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। ফলে কী হয়েছিল? গ্রামগুলো হয়ে উঠেছিল আনন্দহীন শ্মশান। যেখানে আনন্দ না থাকে সেখানে মানুষের কাজের উৎসাহ কি থাকতে পারে ভাইজান?' খুবই ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে একজন মাদ্রাসা

শিক্ষিত তরুণ। ফলে সন্দেহ হয় সে কি নিজের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে কথা বলে, না ঔপন্যাসিকের মুখপাত্র হয়ে ওঠে? এবার স্বয়ং লেখক উদ্ধৃত ইসলামের ইতিহাসের দুটি ধ্রুপদী উদাহরণ : 'এরপর হজরত ফাতিমা আর কোনোদিন হজরত আবু বকরের সাথে বাক্যালাপ করেননি। এমনকি তিনি মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন যে তার জানাজায় যেন আবু বকর ও ওমর যোগ দিতে না পারেন। সেই সাথে এটাও বলেছিলেন যে, তাকে যেন রাতের আঁধারে কবর দেয়া হয়, যাতে, কেউ জানতে না পারে তার কবর কোথায় অবস্থিত। হজরত ফাতেমার এই দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করেছিলেন হজরত আলী।' (চৌদ্দ/আত্মসমালোচনা পর্ব)। '...ইকফের ঘটনায় হজরত আয়েশার চরিত্রে যখন কলঙ্ক লেপন করা হল সাফওয়ান নামক তরুণ সাহাবিকে কেন্দ্র করে তখন রাসুল নিজেও তীব্র মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রাজ্ঞ সাহাবির কাছে এই ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে হজরত আলী রাসুলকে বলেছিলেন যে– সে (আয়েশা) আপনার জুতার ফিতার অপেক্ষা অধিক কিছু নয়। তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করুন।' 'এই কথাও আয়েশাকে আলীর প্রতি আরও বিদ্বেষী করে তুলেছিল। ফলে যে ওসমানকে হত্যা করা জায়েজ বলে আয়েশা রায় দিয়েছিলেন, সেই ওসমানের হত্যার বদলা নেয়ার নাম করে তিনি আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অথচ যার বিরুদ্ধে তিনি ওসমান হত্যার বদলা নেবার জন্য যুদ্ধে নামলেন সেই আলী যে ওসমানের হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তা সম্ভবত আয়েশাও ভালো করেই জানতেন।' এই বাস্তবতায় যেখানে তিনজন খলিফাই নিহত হয়েছিলেন সেই বাস্তবতাকে কি মুসলমানরা নির্মোহভাবে দেখতে ও বিশ্লেষণ করতে প্রস্তুত? ঔপন্যাসিক কিংবা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের চিন্তায় যেখানে নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার কিংবা জাহিরের ফলে ভিন্ন ধর্মের মানুষ আহত কিংবা তাকে হীনমন্যতায় ভুগতে সাহায্য করে এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে সে নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করে বলে বলা হয়েছে সেখানে 'মুসলমানমঙ্গল' রচনা স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা আত্মপ্রত্যয়, না ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে? ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যেখানে তুরস্কেই খেলাফতের বিষয়টি তত দৃঢ় ছিল না সেখানে ভারতে সে বিষয়ে একটি আন্দোলন পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে নজরুলই সম্ভবত কামাল পাশার ওপর কবিতা লিখে তুরস্কের প্রজাতন্ত্রকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রায় মৃত একটি বিষয়কে যেখানে শুধুমাত্র আবেগী কারণে ভারতের মুসলমানরা সমর্থন করে সেখানে 'মুসলমানমঙ্গল' লিখে ঔপন্যাসিক তাকে কতটা যৌক্তিক করে তুলতে পারবেন? বিষয়টি কয়েকটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ থেকে বোঝা যেতে পারে। ইউসুফের পরহেজগার দুলাভাইও এক সময়ে তার 'যুক্তি'তে সম্মত হয় কিন্তু বলে, 'মুসলমানরা যদি তোমাকে নিজেদের লোক মনে না করে তাহলে তোমার কথায় কান দিবি না।' তাতে 'মোল্লাগের পক্ষে খুব সুবিধা হয়ে যাবে তোমাগে নাস্তিক, ইহুদি এজেন্ট, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা।' অতএব সে ঠিক করে তাদের আস্থা অর্জনের জন্যে নামাজ পড়বে। শুধু বলা নয়, উপন্যাসে দেখি সে বন্ধুদের নিয়ে ওজু করে

প্রকৃতই নামাজ পড়তে যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই কৌশল ইসলামের মৌল নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণই শুধু নয়, তার পরিভাষা অনুসরণ করে একে 'মোনাফিকি'ও বলা যায়। সুরা মাউন ও কোরআন থেকে এর সাক্ষ্য নেয়া যেতে পারে। এমনকি যে লেখাটি নিয়ে ইউসুফরা উচ্ছ্বসিত মোখতার আহমদ সিদ্দিকীর সেই 'ফিকাহর উদ্ভব ও পরিণতি'তেও বলা হয়েছে: 'যদি আমি আল্লাহর জন্য নামাজ না পড়িয়া বান্দাগণকে দেখানোর উদ্দেশে নামাজ পড়ি, নামাজকে হাজার শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করিলেও আল্লাহর কাছে তাহার পুরস্কার তো পাইব না, বরং তিরস্কার পাওয়ার আশঙ্কা আছে।' কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মুসলমান সমাজের আস্থা অর্জনের জন্যেও ইউসুফের আর নামাজ পড়ার সংবাদ পাই না। বরং মোকাবিলা পর্বের শুরুতেই দেখি, উপমা বলে এক হিন্দু তরুণীর সঙ্গে ইউসুফের প্রেম হয়েছে। 'মুসলমানমঙ্গলে'র জন্যে ঠিক না হলেও উপন্যাসের নায়কের জন্য খুব বেঠিক কাজ হয়নি। উপমহাদেশে এ ধরনের ঘটনার অভাব না থাকলেও উভয় সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনাসমূহকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি অথবা দেখেনি। হিন্দু প্রেমিক থাকায় ইউসুফ যে নিয়মিত বা আদৌ নামাজ পড়েনি তা বলাই বাহুল্য এবং সেক্ষেত্রে তার যুক্তি অনুসরণ করেই বলা যায়, মুসলমান সমাজের আস্থাও সে অর্জন করতে পারেনি। এ অবস্থায় উপমা ভারতে চলে যায়। সরাসরি প্রশ্ন না করলেও ইউসুফ ভাবে উপমা তার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারত, 'তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এখানে থাকতে বলার? তুমি (ব্যক্তি, সমষ্টি কেন নয়? - শা. কা.) কি সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী ঠেকাতে পেরেছ? পেরেছ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানানো ঠেকাতে? অন্য ধর্মের মানুষদের যে অপ্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রাখা হল তা কী ঠেকাতে পেরেছ? উপন্যাসের এ প্রেম খুবই সংক্ষিপ্ত হয়তো উপন্যাসেরই প্রয়োজনে। ইউসুফ ও লেখক উভয়ই দ্রুত এই অপ্রীতিকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে চেয়েছেন। সে জন্য লেখক খুব সহজেই বলেন, 'বিরহে মানুষ এক সময় অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে।' পারে না, ঔপন্যাসিকের ইচ্ছায়, গেছে, কারণ লিসবেথের আবির্ভাবের জন্যে তো জায়গা প্রয়োজন, যাতে ঔপন্যাসিক তাঁর উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন। নামাজ পড়ার প্রসঙ্গে সাদী

ওস্তাদ বলেছিল, 'মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে দ্যাখো, তোমার পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের লোক, পুলিশের লোক, কাস্টমসের লোক, আয়করের লোক, উকিল, আওয়ামী লীগ-বিএনপির নেতা, বড় বড় ব্যবসাদার– সব শালা হারামখোর। ...যার উপার্জন হারাম তার ইবাদত... লোক দেখানো ছাড়া আর কী? এইসব লোকের পাশে দাঁড়াতে গা ঘিন ঘিন করে না?' সে তো আছেই, কিন্তু মসজিদ কমিটিও নিয়ন্ত্রণ করে তারা। সাদা ইবাদতের নিয়ন্ত্রক কালো টাকা। একইসঙ্গে ইউসুফ যখন নিজের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে 'যখন দেশের নেতারা দেশের মানুষের স্বার্থ বিক্রি করে দেয় নিজের লাভের বিনিময়ে, যখন দেশের তেল-গ্যাস-কয়লা তুলে দেয় বহুজাতিক কোম্পানির হাতে, যখন বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের কাছে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, যখন সামরিক-বেসামরিক আমলারা ঘুষ খেয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি করে, কোর্টে

মানুষকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে, যখন ব্যবসায়ীরা যোগসাজশ করে জিনিসের দাম মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যায় তখন সেইসব লোকের মুখে ইসলামের কথা শুনতে আমার ঘৃণা হয়। মনে হয় এই লোকেরা যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে অমুসলিমরা সত্যি সত্যিই ভালো মানুষ।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঔপন্যাসিক তাঁর প্রয়োজন ও স্বার্থে এদের কাউকে কাউকে সাক্ষ্য মেনেছেন। যেমন শাহ আবদুল হান্নান, যেমন মওদুদী। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, অথচ ১৯৭১-এ গৃহযুদ্ধ ছাড়া এখানে আর কোনোকিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। এ রকম আমলারা গাছের খেয়ে তলারও কুড়ান এবং আশ্চর্যভাবে 'সৎ'ও থাকেন। মোকাবিলা পর্বের পনের অধ্যায়ে মওদুদীর প্রতি একধরনের প্রশ্রয় লক্ষ্য করি যখন পড়ি 'জামায়াত এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর স্ট্রাকচার একেবারে হুবহু কমিউনিস্ট পার্টিগুলির স্ট্রাকচারের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি। এমনকি কমিউনিস্টরা যেমন যৌথ ব্যবস্থা বা কমিউনের প্র্যাকটিস করে মওদুদী তার অনুসারীদের একবার সেই রকম ইসলামি কমিউনও প্র্যাকটিস করিয়েছিলেন।' ফলে প্রায়ই উপন্যাসে নানা স্ববিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে উপন্যাসের একটি চরিত্র ভাবে, 'রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথদের শুধু আধুনিক বিদ্যা নিয়ে স্বজাতির সংস্কার করা সম্ভব হত না যদি তারা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র না জানতেন। যদি তাঁদের পেছনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ধর্মীয় নেতাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকত।' অন্যদিকে ঔপন্যাসিক ভাবেন, '...বিবেকানন্দের এই স্বদেশমন্ত্র কোনো অহিন্দুর পক্ষে আক্ষরিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না। এটি কোনো অহিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।' অথচ তিনি ভুলে গেছেন 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার তথাকথিত পৌত্তলিকতার ছদ্মাবরণে নজরুল আসলে স্বদেশবন্দনাই করেছিলেন। এই স্ববিরোধিতার কারণে ইউসুফের মনে হয়, 'আহ ধর্ম! তোমার তো সব মানুষের অবলম্বন হওয়ার কথা।' না, তা হওয়ার কথা নয়। জাকিরের উপন্যাসেই সাক্ষ্য রয়েছে, নিজেদের 'শ্রেষ্ঠত্ব' ও পরস্পরবিরোধিতার মধ্যেই মানুষেরা তাদের আপন আপন ধর্মের 'সার্থকতা' খুঁজে পায়, অন্তত ব্যবহারিক ধর্মের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। যুক্তির এই ভ্রান্তির কারণে ঔপন্যাসিক তথ্যগত ভুলও করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্য, 'বাঙালি মুসলমান যে কতটা অসহিষ্ণু তা রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে কোনো লেখা লেখেননি।' কবির লেখা একটি গল্পের নাম 'মুসলমানী গল্প'। কমলা করিমকে বিয়ে করে হবির খাঁকে বলে, 'তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্মকর্ম ওরই মধ্যে বাধা পড়েছে।' বলাই বাহুল্য, তাঁর সম্প্রদায়ের মতো 'মুসলমানদের দুর্বলতা'র কথা জানলেও তিনি তাদের খুশি করার জন্য লেখেননি। ইউসুফের দলে 'মালাউন' হয়েও ধীমান হিন্দুত্বের ও ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রবণতার নিন্দা করে। সে বলে, '... সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি আমাদের দেশে শিকড় ছড়াতে পারে না। কারণ এদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। কিন্তু

ভারতে এক বাঙালি বাদ দিলে বিশেষ করে হিন্দীভাষী অঞ্চলের মানুষ ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগ দিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক তৎপরতার সমাপ্তি ঘটেনি।' সে আরও বলে, 'একমাত্র তারাই হিন্দুদের সমর্থন লাভের যোগ্য। সেই কারণেই বিজেপি সেখানে কেন্দ্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।'

কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই, এই ধীমানকে আর শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। লিসবেথকে নিয়ে কামাল-বাবু-সাদীদের সঙ্গে ইউসুফ যখন মদনের দোকানে আড্ডা দেয় তখন ধীমান আর সেখানে নেই। তবে কি লেখকের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্যেই ধীমান শুধু ব্যবহৃত হয়েছে? কাজে লাগার সময় যে ছিল 'কাজী', কাজ ফুরোনোর পর সে 'পাজী' হয়েছে? যতীন সরকারের বাস্তব চরিত্রকে নিয়ে ঔপন্যাসিক অথবা তার চরিত্রের মন্তব্য, 'ইসলাম ধর্মের মূল প্রবণতা যে মানবিকতা সেই গুণটিকে যতীন সরকারের মতো আর কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম নিয়ে কোনো মন্তব্য করার অধিকার, তাঁর নেই। অন্তত এ দেশে নেই। কারণ, তিনি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছেন।' কিন্তু সেই একই দোষে স্বয়ং ঔপন্যাসিকই কি দুষ্ট নন? তা না হলে তিনি কেন ধীমান চরিত্রটিকে সরিয়ে নেন?

এই ধীমানই বলেছে, '... এই দেশের হিন্দুদের পিছু হটার একটা জায়গা আছে। তা হচ্ছে ইন্ডিয়া। যদি ইন্ডিয়া না থাকত, তাহলে এ দেশের হিন্দুরা অবশ্যই সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ আমলের মুসলমানরা। কারণ তাদের যাওয়ার জায়গা ছিল না।' এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে বাস্তব হরিপদ দত্ত সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন কী হবে? হরিপদ থাকেন ঢাকায় কিন্তু তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা ইন্ডিয়ায়। তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য, 'মুসলমানমঙ্গল'-এর ভাষায়, 'যে দেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় সেই মাটিতে আমি আর কোনোদিন পা রাখতে চাই না। তুমি থাকলে থেকে যাও। তোমার দেশপ্রেম নিয়ে থাক, তোমার অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটানোর জন্য থাক। আমি সামান্য নারী। আমি শুধু আমার ছেলেমেয়ের কথাই ভাবতে চাই। তাদের দিতে চাই শঙ্কাহীন দিনরাত্রি, নিরাপত্তার জীবন।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে লেখক নিজের স্ত্রীকেই যে বিষয়ে বোঝাতে পারেন না তিনি কি করে দেশের জনগণকে সে বিষয়ে বোঝাতে, আস্থায় নিতে অথবা উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন? অথচ আমরা দেখি এ বিষয়ে ঔপন্যাসিক বাস্তব ঐ চরিত্রের সমর্থক অথবা তার বিষয়ে সংবেদনশীল।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ইউসুফরা মনে করে, তাঁরা ছিলেন উন্নাসিক, তাঁরা ইউরোপের শিক্ষা নিয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথদের অনুসরণ করেছিলেন। 'তারা ঠিক মুসলমান সমাজের একজন হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে বোধহয় রাজি ছিলেন।' তাই কি? এঁদের প্রধান আবুল হুসেন তো বলেছিলেন, প্রথমে পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করায় তার মন খারাপ হলেও পরে তিনি এই ভেবে খুশি হয়ে ওঠেন যে, পশ্চাদপদ এই সমাজে তাঁর বা তাঁদের কাজ করার সুযোগ বেশি। আর বৌদ্ধিক ঐ আন্দোলনকে

সীমাবদ্ধ ও জনবিচ্ছিন্ন ভাবলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কথাসাহিত্য অথবা শামসুর রাহমানের কবিতাকেও ব্যর্থ ভাবতে হবে। স্বয়ং মার্কসের লেখাকেও তা না বলে উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে নজরুলের মন্তব্য ও মূল্যায়নকে উপযুক্ত জবাব হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ১৯২৬-এর ২০ আগস্ট 'আত্মশক্তি' সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে শ্রীযুক্ত তারারা-র কটাক্ষের জবাব দিয়ে নজরুল লিখেছিলেন, 'কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলো লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন।'

মুসলিম সাহিত্য সমাজকে অভিযুক্ত করলেও ইউসুফ লিসবেথের কাছে স্বীকার করেছে তারাও 'খুঁতখুঁতে, সিনিক'। লিসবেথ যখন বলে 'তোমার মধ্যেও পুরুষতন্ত্র কাজ করে' তখন ইউসুফ বলে, 'কিছুটা', তারপর যোগ করে, 'এবং অ্যারিস্টোক্র্যাসিও।' মদনের ভাষায় ইউসুফরা 'সোনার টুকরো মানুষ।' লিসবেথও ইউসুফকে বলে, 'তুমি যেটা চাও সেটা তো ভালো হবেই।' এক ধরনের নার্সিসিজম কি এক্ষেত্রে কাজ করেনি? তবে ইউসুফের বড় বোন তার সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে, ক্যাজুয়ালি যে মন্তব্য করে তা প্রকৃত অর্থেই তাদের পরস্পরের অর্থাৎ ভাই-বোনের অর্থাৎ উন্নাসিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রকৃত পার্থক্যকে নির্দেশ করে, 'বড় বড় চিন্তা নিয়া থাকলে তো কাছের মানুষগের দিগে চোখ পড়ে না।'

উপন্যাসের শেষে যে শামসুল নিজের ওপর তথাকথিত আক্রমণকে ইসলামের ওপর আক্রমণ বলে দেখাতে চেয়েছে ও বলেছে 'আমি ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য আমার উপর হামলা হয়েছে। আমি আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আজ আমার উপর হামলা হয়েছে। আমার ইসলামি লেবাসকে অপমান করা হয়েছে। আমার দাড়ি, আমার নবীজীর সুন্নতকে অপমান করা হয়েছে' তার জন্যে ইউসুফরাও কম দায়ী নয়। তারা যতই 'মুসলমান' হোক, শামসুলরা তাদের নাস্তিকই বলবে। 'দাজ্জালে'র কথা বলে পশ্চিমী যে সভ্যতাকে এই উপন্যাসে চিহ্নিত করা হয়েছে তা সত্ত্বেও বলা দরকার, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহজাগতিকতার কোনো বিকল্প নেই। কারণ আধ্যাত্ম দিয়ে ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠানের বিচার বা মূল্যায়ন কিংবা তার কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কামালও এ কারণে ইউসুফদের বলে, 'ধর্মের সাথে... রাজনীতিকে মেশানো উচিত নয়।' ধর্ম একটি পর্যায়ের বেশি যুক্তিকে অগ্রসর হতে দিতে রাজি নয়। যেটুকু 'বিজ্ঞান' ধর্মকে মানে ধর্ম শুধু সেটুকু পর্যন্তই যেতে বা গ্রহণ করতে রাজি, তার বেশি নয়। যুক্তি ও বিজ্ঞান যখন ধর্মের সংস্কার ও তার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন ধর্ম নানা অজুহাতে তাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে। সে কারণে ইবনে খালদুন ইতিহাসের ভূমিকা তথা আল্-মুকাদ্দিমা পর্যন্তই লিখতে পারেন তার বেশি যেতে পারেননি।

অতএব উপন্যাসের অন্তিমে কেন্দ্রীয় মসজিদের চত্বরে একাত্তরের শত্রুরা যখন তথাকথিত বিচার বসায় তখন ইউসুফের প্রার্থনা, 'আল্লাহ ইসলামকে তুমি বাঁচাও।'

উপন্যাসের মতো ইহজাগতিক রূপকল্পে এই আত্মসমর্পণ শিল্পরূপগত, ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অপচয়ই বটে। ইব্রাহিম খাঁকে লেখা চিঠিতে নজরুল যথার্থই বলেছেন, 'ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে। কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না– ইসলাম কেন, কোনও ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না।'

দুই

গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস 'প্রেম নেই' বিভাগপূর্বকালের প্রধানত মুসলিম জীবন নিয়ে লেখা। এতে একধরনের মুসলিম প্রবণতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ইয়াকুব বলেছে, 'ঢাকার স্পিরিট।' অর্থাৎ মুসলমানকে নিজের হক আদায়ের জন্য আরও বেশি জঙ্গী মুসলমান হতে হবে।" ২০০৯-এ আমরা তার একটি পরিণততর রূপ প্রত্যক্ষ করছি।

অন্যত্র 'মৌলভী সাহেব কন, হিঁদুর মাসের নাম তুমাগের মুখে আগে বেরোয় ক্যান।'

'কাজে কম্মে সব সুমায় এই মাসের কথা শুনি, তাই ওগুলো বেশি মনে থাকে। এতে কি গুণাহ হয়?' 'বাপ আমার জবর সওয়াল তুলি ধরিছ। চাঁদ, সুরুজ হিঁদু না মুসলমান, একদিন হয়ত এই সওয়ালও তুলা হবে। ফকির হা হা করে হেসে উঠল।'

বৈশাখের মেলা-বান্নির বিরুদ্ধে এখনও মৌলানা ও ইমাম সাহেবেরা বিষোদগার করেন, বলেন, এসব অনৈসলামিক রেছালা। তবু আজও মানুষ সেখান ভিড় করে। প্রমাণ হয়, জীবনের দাবি আজ ও সবসময় অনেক বিরাট।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মন 'প্রেম নেই'-এ তাই জানতে চায়, 'আচ্ছা, এই মুর্দাটা এখন কী? হিন্দু না মুসলমান? একটা দেহ কতক্ষণ হিন্দু থাকে, কতক্ষণই-বা মুসলমান? ফকির গোরে যাবে। মিশে যাবে মাটিতে। সেই মাটি কি মুসলমান? হিন্দু মড়া দাহ হবে, ভস্মরাশি মিশে যাবে বাতাসে অথবা ধুয়ে যাবে জলে। সেই বাতাস, সেই জল কি হিন্দু?'

রোকেয়ার লেখা পড়ে 'প্রেম নেই'–এর প্রধান চরিত্র শফিকুল ভাবে, "এই মহিয়সী মহিলা, মিসেস রোকেয়া এস হোসেন, যাঁকে সে কখনো চোখে দেখেনি, তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। 'যদি ঈশ্বর কোনো দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন সে দূত কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু ও কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু তো সকল দেশেই আছে।... দূতগণ সকল দেশময় সর্বব্যাপ্ত হন নাই কেন?' 'নবনূর' নামে একটা মাসিকপত্রের পুরনো সংখ্যায় এই লেখাটা পড়েছিল ফটিক। এবং পড়েই মনে হয়েছিল, কী আশ্চর্য, এ তো তারই মনের কথা। অথচ এতদিন এই মহিলার নামই কখনো

শোনেনি। মুসলমান শিক্ষিত সমাজ এর নাম নেয় না আর হিন্দু সমাজ এই বিপ্লবিনী নারীর নাম শুনেছে কি না সন্দেহ। বস্তুত এই মহিলা আদৌ মুসলমান কি না সে সম্পর্কে তার সন্দেহ জেগেছিল।" 'যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত...। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।' সে ভাবে, 'ম্যাট্রিক, আই,এ বি,এ এ বাংলা পাঠ্য সংকলনে কত মহিলার আলুনি লেখা স্থান পেয়েছে কিন্তু রোকেয়ার তো ঠাঁই মেলেনি সেখানে। কেন?'

কিন্তু শফিকুল প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হয় তখন যখন তাকে অনিচ্ছুকভাবে হলেও মক্কেল অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে নিজের রোজগারের সূচনা করতে হয়। তার মুহুরি হরি মুহুরি বলেন, 'উকিল সাহেব, চল্লিশ বছর ধরে মউরিগিরি কত্তিছি। তাতে এই বুঝডা বুঝিছি যে, সরষে আর মক্কেল এগের ওপর যত চাপ দেবেন তত তেল পাবেন। সব বিটার এই এক প্রিক্রিতি। পেরথমেই কাঁদে ভাসায়ে দেবে, আমার কিছু নেই। সব বিটার ঐ এক রা। ওতে যদি গলে গ্যালেন তো হয়ে গ্যালো। এই লাইনে আপনারে আর করে খাতি হবে না।' 'করে খাতি' হলে মক্কেলকে চাপ দিয়ে তাকে শোষণ করতে হবে। অর্থ না পাওয়ায় শফিকুল তথা ফটিক এবং তার স্ত্রী ছবির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সে জন্যে 'নেব না নেব না' করেও মক্কেলের টাকাটা সে নেয়। এবং নিয়েই 'সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিছুতেই খচখচানিটা তার যাচ্ছিল না।' কিন্তু 'তবু এটা তার প্রথম রোজগার। এবং সে বুঝতে পারল, এর পরেও সে যা রোজগার করবে, তার সবই আসবে মক্কেলদের গলা ঐ রকমভাবে টিপে টিপে।' 'ওকালতি ব্যবসায় টাকা যদি উপায় করতে হয় তবে এ ছাড়া পথ নেই।' শোষণের এই মৌলিক পাঠই 'প্রেম নেই'-এর প্রধান পাঠ।

তিন

মিহির সেনগুপ্ত বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চলের 'পিছাড়ার খাল' নিয়ে, তার তীরবর্তী রেন-ট্রি, বৃক্ষদম্পতি যে ঘটনাবলীর সাক্ষী তাকে নিয়ে একটি 'আলেখ্য' রচনা করেছেন। একে তিনি 'ব্রতকথা'ও বলেছেন। যে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে'র কথা 'মুসলমানমঙ্গল'-এ আছে এখানে তাদের কথাই প্রধান। 'আনাল হক'-এর প্রসঙ্গও উভয় 'উপন্যাসে' এসেছে। মিহির অথবা কথক লিখেছেন, 'ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে আমার মতো একটি সংখ্যালঘু সমাজের কিশোরের কী ধরনের সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে পথ চলতে হয়েছিল তারই আলেখ্য এটি।' এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন, '.... এর সাথে সশস্ত্র দাঙ্গা ও দেশভাগের অন্যান্য কুফল মিশ্রিত হয়ে ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে যায় যে, ব্যাপক মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ কোনও গণতান্ত্রিক প্রতিরোধে না গিয়ে ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণ খোঁজে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় হিন্দু মধ্যবিত্ত এই বিপরীত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখেন তারা কিছুকাল গত হলেই মুসলমান ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে

ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু সে শহরে-নগরে। গ্রামগুলো ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে...। গ্রামকে উপেক্ষা করার এই ভুলের মাশুল উভয় সমাজকে আজও দিয়ে যেতে হচ্ছে।'

এভাবে 'মুসলমানমঙ্গল'-এ যেমন দেখা যায়, গ্রামের প্রাণ, তার আনন্দপ্রবাহকে নষ্ট করা হয়েছে তেমনি 'বিষাদবৃক্ষে'ও দেখি, জারি, কারবালার করুণ আখ্যায়িকা, নমরুদ বাদশাহর জারি বা চাচা-ভাতিজার যুদ্ধের সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে লক্ষ্মীমতীর পালা বা গুণাই বিবির গান। কিন্তু বিভাগপরবর্তীকালে নানাভাবে এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নষ্ট করে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মোল্লা-মৌলভীরা একে ধর্মবিরুদ্ধ বলে তার প্রাণশক্তিকেই হত্যা করে। গম্ভীরা গান যেমন তিন পুরুষ বার্তা বহন করত বলে দারোগা ও শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে তাকে অশ্লীলতার বাহন করে তোলা হয়েছিল তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে মানুষকেও পশ্চাদপদগামী করে তুলতে চাওয়া হয়েছিল। 'বিষাদবৃক্ষে' এই পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে নাগর আলির গানে :

যতসব দীনদরদী
তারা সব পাইছেন গদি
খালি মোরা দেহি,
হাতে কাম নাই
ও মেয়া ভাইরে
কওছেন দেহি
ক্যামনে প্যাট চালাই?
হিন্দুরা যায় হিন্দুস্থানে
আর দরদীরা ট্যাহা গোণে
আর নজর হেরগো ডাহার পানে
মোগো হিসাব নাই

এই 'আলেখ্যে' লেখক একজন দাদীআম্মার কথা বলেন, তার কাছেই তিনি অনেকটা মানুষ এবং তাঁরই প্রেরণায় তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই মহিলা তাঁদের দুজনের পরিচয় নির্ধারণ করেছেন এভাবে, 'না মুই শরিয়তি মোছলমানের বেওয়া, না তুই নিয়মের য়িন্দু।' ফলে উভয়ই পেয়েছেন স্বচ্ছ দৃষ্টি। দাদীর পূর্বপুরুষ ছিল রামচন্দ্র দেব বা রামচন্দ্র বক্ষ। তাঁর পুত্র কীর্তিনারায়ণ ঢাকায় মুসলমান নবাবের যাবনী খাদ্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর জাত গিয়েছিল। এঁর নামেই বরিশালের 'কীর্তিনাশা'। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপ্রজন্মের এক পুরুষেরও জাত গিয়েছিল। ভাগ্যিস গিয়েছিল, না হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথে সংস্কৃতির এত বিচিত্র প্রকাশ দেখা যেত না। কথক অথবা মিহির বলছেন দাদীআম্মা 'কোমর বেঁধে' একদিন তাদের এমন নাস্তা খাইয়েছিলেন যে 'সে স্বাদ মরার আগের দিন পর্যন্ত থাকবে।' তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, 'আমরা পাঁচজনে (হিন্দু-মুসলমান) পাশাপাশি বসে হাপুস-হুপুস করে খেলাম। কিন্তু জাইত যে কোনখান

দিয়ে গেল টের পাইলাম না।' অথচ সমাজে ছেলে মাকে পর্যন্ত দেখতে আসেনি, কারণ অনন্যোপায় হয়ে হলেও মুসলমান বাড়ির অন্নজল গ্রহণ করায় মায়ের জাত গিয়েছিল।

অন্যদিকে লেখক দেখিয়েছেন, 'আমাদের ওখানের মুসলমান এবং নিম্নবর্গীয় মানুষেরা উচ্চবর্ণীয়দের কাছে কোনওদিনই ভালো ব্যবহার পায়নি।' এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সদুপায়' প্রবন্ধে সাক্ষ্য রয়েছে। মিহির লিখেছেন, 'এ সবই শিকড়ের ঘুণের ব্যাপার। ব্রাহ্মণ ভেদাচারের প্রতি বিদ্বেষবশত তারা একদা বৌদ্ধ আশ্রয়ে গিয়েছিল। সেই আশ্রয়কে যখন ব্রাহ্মণতা গ্রাস করে তখন ইসলাম তাদের প্রাণের অঙ্গীকার দিয়েছিল। কিন্তু একসময় দেখা গেল তারাও ব্রাহ্মণতার ভেদাচার রপ্ত করে তাদেরকে অন্ত্যজই করে রাখল।' এর একটি চূড়ান্ত রূপ তিনি দেখেছেন বিভাগোত্তরকালে। 'হিন্দুদের জমি-জিরেত বাগান পেয়েছিল তারাই, যাদের কিছু ছিল। যারা ভূমিহীন (মুসলমান) তারা পায়নি, তারা তাদের শ্রম ব্যয় করেছিল, যেমন বহু আগের কাল থেকে তারা করে এসেছিল এখানকার ভূমি হাসিল করার জন্য। হিন্দুদের পরিত্যক্ত ভূমি আবাদ করার কাজও তাদেরই করতে হয়েছে, তবু মালিক তারা হতে পারেনি, এরা সাময়িকভাবে কিছুটা বখরা পেয়েছিল, কায়েমিস্বত্ব কিছুই পায়নি।' অন্যদিকে 'মুসলমানমঙ্গল'-এ যেমন তেমনি 'বিষাদবৃক্ষে'ও হিন্দুদের ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার প্ররোচনা রয়েছে। তাতে তাদের জায়গা-জমি দখল ও নতুন শ্রেণী উত্তরণের সুযোগ ঘটে। এর উল্টোদিকে 'বিষাদবৃক্ষে' মুসলমানরা অভিযোগ করে, 'তোরা হিন্দুরা সুযোগ পেলেই কি 'মোছলার জাত এ রকমই হয়' বলে গাল দিস না?' কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য, 'মুসলিম লীগের মধ্যে উদারপন্থিদের একটা উপদল ছিল এবং তাঁরা হিন্দুদের দেশ ছাড়ার ব্যাপারটা পছন্দ করেননি।' কিন্তু তারচেয়েও বড় সত্য, 'তাঁরা কোনোদিনও প্রাধান্য পাননি।' বরং 'অন্যের হকের সম্পত্তি' দখল করা না-জায়েজ বা হারাম হলেও এখানে প্রাধান্য পেয়েছে দ্বৈত মান, হিন্দুদের সম্পত্তি হলে দখল করা জায়েজ কিন্তু মুসলমানের হলে না-জায়েজ। এই অন্তঃপ্রেরণাই দাদীআম্মার উত্তরপুরুষ দম্পতিকে 'ধার্মিক' তথা 'ধর্মবাতিকগ্রস্ত' করেছে। ঢাকায় থেকে 'ওরা দুজনেই ভোর রাতে উঠে নামাজ আদায় করে আবার বেলা অবধি ঘুমায়।' স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে বলে, 'ও খুব মৌলা হয়েছে।' মিহির জিজ্ঞেস করেন, 'আর তুই?' সারাদিন ডাক্তারি করি, বাড়ি ফিরে ওর নির্দেশ মতো খোদার দরবারে মোনাজাত করি।' 'দুটো ব্যাপার মেলাতে পারিস?'

'মেলাতে পারার মতো সময় কোথায়?' দাদীআম্মাকে মিহির বুঝতে পেরেছিলেন, 'তোদেরটা বুঝতে পারছি না।'

বুঝতে না পারার কিছু নেই। তাঁর আলেখ্যে 'জমি'কে যেমন তিনি সবকিছুর উৎস বলেছিলেন তেমনি সবকিছু দখল করার, নিজের অধিকারে রাখার এই প্রবণতার নামই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা অথবা মূল লোভকে আড়াল করার এ মুখোশ মাত্র। তাঁর এই রচনায় এর একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। পাকিস্তানের আইয়ুবী আমলে ইউনিয়ন

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন এক পীর। একবার দেলোয়ার নামের এক যুবক গরুর বাছুরের সঙ্গে কুকর্ম করে। হুজুর-চেয়ারম্যানের কাছে বিচার যায়। তিনি অপরাধীকে দশ ঘা কোড়া মারার আদেশের সঙ্গে হারাম পশুকে জবাই করে তার মাংস বিতরণের আদেশ দেন। কিন্তু ভাবেন না, পশুর মালিকের কী হবে। কারণ তার মূল বিবেচ্য শরিয়ত, মানুষ বা তার অর্থনীতি নয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ছোট মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশী বাবুদের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের এই 'ন্যায়' বিচারের তলায় পড়ে কত মানুষের যে সর্বনাশ হয়েছে তা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রই জানেন বা জানতেন। মিহির লিখেছেন, 'বরাবর আমরা একে অন্যকে দুষে আসছি।' তার চেয়েও বড় কথা, 'সম্পদ অর্জিত না হলে তার প্রতি বোধহয় কোনও মমত্ব জন্মায় না।' জমিদাররা ও মধ্যস্বত্বভোগীরা যেমন, মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, তেমনি তাদের কাছ থেকে যারা দখল করেছে অথবা 'পেয়েছে' তাদেরও তা জন্মায়নি। আর তা জন্মায়নি বলে ১৯৪৭-এর পরে তো বটেই, একাত্তরপরবর্তী থেকে সাম্প্রতিকতম কাল পর্যন্ত দখল ও তার রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই জয়জয়কার। ঠোঁট ও মনের কথা বিপরীতই শুধু নয়, সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। কারণ মানুষকে বোকা বানাতে না পারলে যে পুরোপুরি স্বার্থোদ্ধার ও নির্বিচার লুণ্ঠন সম্ভব নয়। 'মুসলমানমঙ্গলে'র 'মোকাবিলা পর্বে' পাচ্ছি, 'পাকিস্তানকে ঘিরে কত স্বপ্নই না দেখেছিল পূর্ববঙ্গের গরিব মুসলমান কৃষক। এমনকি তেভাগা আন্দোলন করতে গেলেও বামপন্থীরা সাড়া পাননি তখন। কৃষকদের সার কথা পাকিস্তান হলে তেভাগার দরকারই পড়বে না। পাকিস্তান হবে পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ। তখন তেভাগা কেন, কৃষক চৌভাগা (চারভাগের তিন ভাগ?) পর্যন্ত পেয়ে যাবে।'

'বিষাদবৃক্ষে'ও ব্যাপারটা এসেছে, একটু অন্যভাবে। মুসলমান কৃষকরা শুধু নয়, প্রচারের গুণে নিম্নবর্গের মানুষের মনেও এই ধারণা হয়েছিল যে, পাকিস্তান আসছে ন্যায় ও সুবিচারের বার্তা নিয়ে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু বাস্তবে কী হল? "উচ্চবর্গীয়দের সাথে তাদের একটাই সমানাধিকার ছিল, তা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের। মিলাদুন্নবীর জমায়েত, জুম্মার নামাজ আদায়, ঈদের দিনের কোলাকুলি, এইসব ব্যাপারেই যা সমতা। নচেৎ শত ঢক্কানিনাদেও কি সারা মুসলিম জাহানে 'আলবেরাদরী'র কোনও নজির দেখা যায়? আবার পিছাড়ার খালের আশেপাশের মুসলিম পরিবারগুলোর পূর্বজরা অ-মুসলিম অবস্থা থেকে যে কারণে শরিক হয়েছিল, অদ্যাবধি তার কোনও সুরাহা হয়নি। তারা বর্গে এবং বর্ণে যে স্থানে অবস্থিত ছিল এখনও সংখ্যাগুরুদের ক্ষেত্রে তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি।" "মুসলিম লীগের তরফ থেকে স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই মানুষদের অর্থাৎ আধিয়ার, তেভাগা আন্দোলনকারী, বেউবেগারী বিরোধী, সামন্ত-নিপীড়িত তাবৎ অপবর্গী সাধারণ বর্ণ হিন্দু এবং মুসলমান চাষিসমাজকে এক প্রগাঢ় 'ওয়াদা' প্রদান করা হয়েছিল। এইসব মানুষ সামগ্রিকভাবেই হিন্দু সামন্তবাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে শোষিত ও নির্যাতিত ছিল।" "তেভাগার অনুসরণ যে পাকিস্তান কায়েম হলে স্বাভাবিকভাবেই হবে– এ বিষয়ে সাধারণ চাষিদের

ব্যাপকভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার পর, এমনকি মধ্যস্বত্ব প্রথা উচ্ছেদ হবার পরও, এই প্রতিজ্ঞা পালনের কোনোই প্রচেষ্টা হয়নি।" মুসলিম লীগের এই বাগাড়ম্বরের জন্যে আবুল মনসুর আহমদ একে সমাজতন্ত্রের চেয়েও উন্নততর রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে বলে ভেবেছিলেন এবং ফর্‌রুখ আহমদ তাতে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানোত্তর কালে কলম কামড়িয়ে লেখার পরিস্থিতিই বলে দেয়, কবি তাতে হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু সৎ ছিলেন সেহেতু অন্যদের মতো ডিগবাজি না খেয়ে এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ফায়দা লোটার সুযোগ না নিয়ে অন্ধের মতো তাতেই বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পর্বে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ না হওয়া থেকে বোঝা যায়, ঐ প্রতিশ্রুতি কত মিথ্যা ছিল।

এখনও এই পরিস্থিতির গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। যখন দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে, সম্পদ ও সম্পত্তির প্রদর্শনবাতিকতা সমস্ত রুচি, কাণ্ডজ্ঞান ও পরিমিতিবোধকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করছে তখন সংবাদপত্রের খবরের সাম্প্রতিকতম শিরোনাম, 'দারিদ্র্যই হত্যাকারী' (Poverty, the murderer)। ২০০৯-এর ৫ এপ্রিল ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার* জানাচ্ছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সুজাপুর গ্রামের পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক গৃহবধূ ও ছয় সন্তানের জননী আজিনূর বেগম সন্তানদের আহার জোগাতে না পেরে বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন। দিনমজুর স্বামীর প্রায়ই কাজ জুটত না বলে তাদের অবস্থা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, আগে সন্তানদের বিষ খাইয়ে পরে নিজেও তা পান করে মৃত্যু তথা সমস্ত সমস্যার একমাত্র 'সমাধানে'র পথ বেছে নিয়েছেন মা। এই বাস্তবতায়ও আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং প্রয়োজনীয়। কিন্তু সরলীকরণ তার পথ নয়। 'বিষাদবৃক্ষে' পূর্ববঙ্গত্যাগকারী ও কলকাতায় বসবাসকারী পুত্র সম্পর্কে পিতা বলছেন, 'কমিউনিস্ট, তয় হেয়া বুঝি হাউসের।' 'মুসলমানমঙ্গলে'র ইউসুফও কি তেমন হাউসের বা শখের কেউ? সে গ্রামে থাকে বটে, কিন্তু তাদের একজন সে নয়। উপন্যাসের একটি উক্তি থেকে তা বেশ বোঝা যায় 'এমন বৈচিত্র্যহীন ঘটনাহীন দিন কীভাবে সে কাটাবে!' উপন্যাসে খুব স্বল্পস্থায়ী উপমাও তার অসম্ভব প্রশংসা করে। বলে, 'তুমি তো শুধু আমার প্রেমিক নও, তুমি আমার আইডল, আমার হিরো। এমন মানুষকে পায় কজন মেয়ে।... তার প্রেমিক যে তার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ কথা বলতে পারে না তারা। কিন্তু আমি পারি।' সে আরও বলে, 'তুমি খুব সাধারণ পোশাকে সাধারণভাবে এখন অজস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে হেঁটে যাও তখনও যে কেউ তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারে যে, তুমি এই ভিড়ের কেউ নও। তুমি সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ।' সে এতটাই আবেগতাড়িত হয় যে, 'মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে' ভাবার ও তাদের 'ভাগ্য বদলানোর পথ' খোঁজার জন্যে ইউসুফকে কোনো চাকরি করতে দিতে চায় না। তাহলে কি এ ধরনের মানুষেরা শুধু প্রেমিকার ওপর নির্ভর করে রোজগারহীন

জীবন যাপন অথবা এনজিও করবে? আত্মমর্যাদাহীন মানুষের পক্ষে কি সমাজবদলের কোনো কর্মে যুক্ত হওয়া সম্ভব? উপমা কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে দ্রুতই অদৃশ্য হয়। তাই পাঠকের মনেও হতে পারে, ইউসুফের প্রশংসা করার জন্যই বুঝি উপমার এই স্বল্পস্থায়ী আবির্ভাব ও উপস্থিতি। তাহলে লেখক কি ইউসুফকে হিরো করে তুলতে চেয়েছেন? সে কি দীনবন্ধু মিত্রের একবিংশ শতাব্দীর নবীনমাধব, যে তার স্রষ্টার পূর্ণ আনুকূল্য পাচ্ছে? নীলবিদ্রোহের যে পটভূমিতে দীনবন্ধু এ নাটক লিখেছেন তাতে নীলবিদ্রোহ ও নাটকে বর্ণিত বাস্তবতায় এর মুখ্য চরিত্র হতে পারত তোরাপ অথবা রাইচরণ, যারা প্রকৃত ও নির্যাতিত নীলচাষী কিন্তু নাট্যকারের সমর্থন পায় মধ্যবিত্ত নবীনমাধব, যে ইংরেজ সাহেবের ধমক খেয়ে প্রজাদের রক্ষা করার পরিবর্তে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসে। ফলে নাট্যকারের সমর্থনও নবীনমাধবকে 'মহিমান্বিত' করতে পারে না, বরং– তা নাটকটিকেই দুর্বল করে। ইউসুফের 'মহিমা'ও পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়। উপন্যাসের একেবারে শেষে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও 'ইসলামের রক্ষক' হিসেবে অন্যতম যাকে চিহ্নিত করা হয় তার পরিচয় দিতে গিয়ে শুরুতেই যে বলা হয় সে 'এই শহরের এক চাপকল মিস্ত্রীর ছেলে' তাতে লেখক অথবা তার উন্নাসিকতা ও শ্রেণীমানসিকতারই প্রকাশ ঘটে।

একটি বাস্তব ঘটনার সাহায্যে পুরো বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বাণিজ্যিক রাজধানী বলে পরিচিত একটি মহানগরের প্রধানত শুল্ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক এলাকার একটি মসজিদের ইমাম সাহেব একবার জুম্মার নামাজের খোতবার সময় মুসল্লিদের দান করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কেউ অসৎ উপায় বা রোজগারের অর্থ দান করবেন না। এর ফলে শূন্য দানবাক্স পাওয়া গেলে মসজিদ কমিটি ইমাম সাহেবকে বলে, এখন আপনার বেতন দেব কোত্থেকে? পরের জুম্মায় ইমাম সাহেব বললেন, রোজগার যেভাবেই করুন, সৎ নিয়তে দান করলে অন্যায় বা গুণাহ হবে না। এবার বাক্স ভরে গেল। দেশেও এখন অসৎ অর্থ 'সৎ' নিয়তে ব্যয় অথবা কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে কোনো 'দোষ' নেই। তবে ধর্ম অথবা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ রকম নীতি অনুসৃত হলে তাকে অধর্মই বলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ও কোনও দোহাই হতে পারে না।

আবুল ফজলের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা

সৈ য় দ আ জি জু ল হ ক

কথাশিল্পী আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) চেয়ে প্রবন্ধকার আবুল ফজলই অধিক খ্যাতিমান। কিন্তু তাঁর কথাশিল্পকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর শিল্পীসত্তার মূল প্রবণতা কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। ছটি উপন্যাস, চল্লিশটি গল্প, এগারোটি নাটিকা নিয়ে সমৃদ্ধ তাঁর কথাশিল্প-বিশ্ব। উপন্যাসগুলোর নাম চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০-৪১), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবনপথের যাত্রী (১৯৪৮), রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭) ও পরাবর্তন (১৯৮০)। যদিও ১৯৩৪ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত তাঁর উপন্যাসমূহ প্রকাশের কালগত সীমা, কিন্তু প্রতিটিরই রচনাকালের সঙ্গে গ্রন্থাকারে মুদ্রণের রয়েছে বিচিত্ররূপ ব্যবধান, রয়েছে নামকরণ নিয়ে নানা সংশয় ও টানাপড়েন, রয়েছে শৈলীগত নিরীক্ষা ও ভাষাবোধের বিস্তার। তবে সবগুলো উপন্যাসেরই উপজীব্য বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনধারা। এই জীবনস্রোতের সংগতি ও অসংগতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, বেদনা ও যন্ত্রণাকে তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের শৈলীগত সার্থকতা বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য তাঁর উপন্যাসে বিধৃত সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন।

অখণ্ড বাংলা ও ভারতবর্ষে আবুল ফজলের জন্ম। সেই ভারতকে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিখণ্ডিত ও ত্রিখণ্ডিত হতে দেখেছেন। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) দুবছর আগে যাঁর জন্ম তিনি দেখেছেন বঙ্গভাগের রক্তিম পরিণতি। আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে তিনি তাঁর একই জন্মভূমিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনটি শাসন-যুগ ও তার বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে : এক. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষ-অন্তর্ভুক্ত গোটা বাংলা, দুই. পাকিস্তানের আধা-ঔপনিবেশিক শাসনাধীন পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান, তিন. স্বাধীন বাংলাদেশ। এই তিন যুগেরই সমাজজীবন তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে, তবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে ব্রিটিশশাসিত বাংলাই। আবুল ফজল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায়ই যুক্ত হয়েছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র(১৯২৬) সঙ্গে। তিনি এই সংগঠনের মুখপত্র 'শিখা'র সঙ্গেও ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যে-পত্রিকার শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ ছিল এই গোষ্ঠীর দর্শনটি : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি

সেখানে অসম্ভব।' এই সংগঠন ও তাদের পত্রিকা বাঙালি মুসলিম সমাজকে রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা ও কূপমণ্ডূকতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। আবুল ফজল উপরের ওই বাণীকে তাঁর জীবন-ধ্যানের অপরিহার্য অংশ করে তুলেছিলেন। তাঁর সারা জীবনের কর্মচাঞ্চল্য, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার দিকে তাকালে আমরা সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ করি যে, তিনি এই গোষ্ঠীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও দর্শন থেকে কখনোই এতটুকু বিচ্যুত হননি।

বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি এই সমাজের শক্তি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহযোগে অবলোকন করেছেন। আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ফলে নিজ সমাজ সম্পর্কে সমালোচনাও তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে। আজীবন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ধর্মপরায়ণ পিতার জীবনাদর্শ একদিকে, অন্যদিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিদারুল আলমের শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন– এই দুইকে আত্মস্থ করেই নির্মিত হয়েছে আবুল ফজলের জীবনবোধ ও সমাজভাবনা। এই দুয়ের প্রভাব থেকে কখনোই মুক্ত হতে পারেননি, ফলে এই দুয়ের কোনোটিকেই তিনি অবহেলা করেননি, বরং এ দুয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনাদর্শ। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বিশ শতকের শুরুর দিকে মানব মনস্তত্ত্বসম্পর্কিত ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনোজগৎ এবং নর-নারীর সম্পর্কবিষয়ক ভাবনায় এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব শোষণমুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বিশ্বব্যাপী সংবেদনশীল মনে এক সম্ভাবনার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। এর ফলে উনিশ শতকে সৃষ্ট বাস্তবতার ধারণায় আসে এক গভীর পরিবর্তন। তাই মনোবাস্তবতা ও সমাজবাস্তবতার সমন্বয়-সাধন একালের সাহিত্যের এক বলিষ্ঠ প্রবণতা। বাংলা সাহিত্যে একালে 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র মাধ্যমে যে নতুন ধারার সূচনা ঘটে তা-ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে শাসকশক্তি-বিরোধী রাজনৈতিক অসন্তোষ যত বৃদ্ধি পায় ততই তারা প্রয়াসী হয় এদেশে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিভেদকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলতে। এই সবকিছুর সম্মিলিত রসায়নে সমাজে যে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি হয় সেটাই আরাধ্য হয়েছে আবুল ফজলের উপন্যাসে। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর সবগুলো উপন্যাসের বিস্তৃত পর্যালোচনায় প্রবেশ থেকে বিরত থাকব। বরং আমরা গুরুত্ব দেব এ-বিষয়ক সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল দুটি উপন্যাসের ওপর। এর একটি চৌচির, যেটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং অপরটি পঞ্চম উপন্যাস রাঙ্গা প্রভাত। চৌচিরে লেখকের চিন্তাচেতনার যে রূপ আমরা পাই তার একটি সফল পরিণতি লক্ষ করি রাঙ্গা প্রভাতে। সুতরাং এ দুই উপন্যাস-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই লেখকের সমাজচেতনার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ উন্মোচিত হবে।

চৌচির উপন্যাসে রওশন ও তসলীমের প্রণয় কাহিনী তার উত্থান-পতন, টানাপড়েন, তার সফলতা-ব্যর্থতা ও বিষাদাত্মক পরিণতিসমেত পরিবেশিত হয়েছে। এ দুজনের প্রণয়ের ক্ষেত্রে যে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে সক্রিয় বাঙালি

মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার বিস্তার। এ প্রসঙ্গে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র শব্দ দুটির তুলনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথ এ দুটি শব্দ দ্বারা ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপকে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়।... ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর, তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"

এ শব্দ দুটি দ্বারা দুই উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার অনেকগুলো দিক সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ধর্ম মানুষকে সৎ থাকতে, বিনয়ী হতে, মহৎ হতে শিক্ষা দেয়; ধর্ম মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে নীতিবোধ, কল্যাণচেতনা ও পরার্থপরতার অনুভূতি; ধর্ম মানুষকে মার্জিত হতে, পরিশীলিত হতে, নমনীয় হতে ও সুন্দর হতে শেখায়, শেখায় উদার হতে; সর্বোপরি ধর্ম মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটায়। অপরদিকে ধর্মতন্ত্র মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরায়ণতা, প্রলোভন ও নীতিহীনতার কঠোর সব অনুভূতি; ধর্মতন্ত্র মানুষকে অমার্জিত করে তোলে ও অসুন্দরের দিকে ঠেলে দেয়; ধর্মতন্ত্র শুভবুদ্ধির বিনাশ ঘটায় এবং জাগিয়ে তোলে পশুপ্রবৃত্তি। রওশন ও তসলীমের প্রণয়ের মধ্যে ধর্মের শুভচেতনা সক্রিয় থাকলেও এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ধর্মতন্ত্র। বাঙালি মুসলিম সমাজে ধর্মতন্ত্রেরই প্রাবল্য আমরা লক্ষ করি। রওশনের জমিদার-নানার মৃত্যুর পর ফকির মোহাম্মদ নামে তাদের স্টেটের ম্যানেজার সম্পদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য ধর্মের নামে যে প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং নারীর অসহায়ত্বকে যেভাবে নিজ স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে তার পেছনে ধর্মতন্ত্রই সক্রিয়। ধর্মতন্ত্রই ওই মুসলিম নারীকে (রওশনের নানি) ইংরেজি শিক্ষাবঞ্চিত ও অন্তঃপুরবাসিনী করে নিরুপায়ত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে পুরুষনির্ভর হতে বাধ্য করেছে। আর এভাবে রওশনের নানি ফকির মোহাম্মদের স্বার্থপুষ্ট ধর্মপরায়ণতার অসহায় শিকারে পরিণত হয়ে তাকে স্বামীত্বে বরণ করার আর কোনো বিকল্প খুঁজে পায়নি। তারপরও ধর্মতন্ত্রের আড়ালে ফকির মোহাম্মদের স্বার্থতাড়নার নিষ্ঠুর বলি হয়েছে রওশনের দুই মামা-খালা। ধর্মতন্ত্রের নামে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না-করে

তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আর এভাবে ফকির মোহাম্মদের পুত্রের সঙ্গে রওশনের মায়ের বিয়ে দিতেও বাধ্য করা হয়েছে। ফকির মোহাম্মদের এসব অন্যায় স্বার্থ চরিতার্থতার পথে ধর্মতন্ত্র হয়েছে তার নিশ্চিত সহায়তাকারী। রওশন-তসলীমের বিয়ের ব্যাপারেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ধর্মতন্ত্রের আচ্ছাদনে সামাজিক পশ্চাৎপদতা। রওশনের মা ও রওশনকে নিয়ে যেসব কলঙ্কপূর্ণ গুজব রটে তার মূলেও সক্রিয় থাকে রওশনের বাবার পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থ এবং তাকে সহায়তা করে সমাজসত্তার গভীরে প্রোথিত ধর্মতন্ত্রের ব্যাপক-বিস্তৃত ও অসহনীয় কূপমণ্ডূকতা। ধর্মতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্র আমাদের সমাজে সর্বদাই হাত ধরাধরি করে চলে। গুজবের শাখা-প্রশাখা বিস্তারে, বিশেষত নারীর কলঙ্ক রটনায়, এই দুয়েরই থাকে অদম্য স্পৃহা ও সম্মিলিত স্বার্থপ্রণোদিত আগ্রহ। এই উপন্যাসে নারীর কলঙ্ক-সম্পর্কিত গ্রাম্য গুজবের প্রবল শক্তি ও তার অন্তঃসারশূন্যতা দুই-ই উন্মোচিত হয়েছে। এই শক্তির কারণে রওশন ও তার মায়ের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল তসলীমের মনও সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। ফলে রওশনের সঙ্গে তার বিবাহবন্ধনের বিষয়টি হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। আর সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে তসলীম যখন মানসিক শক্তি অর্জনসহ এর রহস্যভেদে তৎপর হয়েছে তখন একজনও প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে না-পাওয়ায় প্রকট হয়ে উঠেছে এই গুজবের অন্তঃসারশূন্যতাটি।

চৌচির উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার এই রূপ অঙ্কনের পাশাপাশি আমরা উন্মোচিত হতে দেখি আধুনিক চিকিৎসা, আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষার প্রতি ধর্মতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্রের অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষের দিকটিও। কামালউদ্দিন যখন তার স্ত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আধুনিক চিকিৎসা পেতে পুরুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তখন মোল্লাতন্ত্রের ধারকেরা জীবনের মূল্যের দিকে না-তাকিয়ে পর্দাপ্রথা অমান্য করার অপরাধে তাকে একঘরে করে, মসজিদ থেকে বের করে দেয়। ইংরেজি-শিক্ষিত বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি যুবক যখন একজন মওলানাকে উর্দু ভাষায় অজ্ঞ বাংলাভাষী শ্রোতাদের সামনে উর্দুর পরিবর্তে বাংলায় বক্তৃতা করার অনুরোধ জানায় তখন ওই মওলানার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার ভাবটি। মাতৃভাষা বাংলাকে কাফেরের ভাষা বলে আখ্যাদানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মতান্ত্রিক সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতার প্রকাশ। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার বিষয়টি ধর্মের শিক্ষা নয়, ধর্মতন্ত্রের অজ্ঞানতা ও স্বার্থপুষ্ট প্রচারণার অংশমাত্র। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আমাদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তার প্রতিপক্ষ যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল তা নয়, এদেশের ধর্মতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও বাংলার বিরোধিতা করেছিল। চৌচির উপন্যাসে ১৯৪৭-পূর্ব পটভূমি চিত্রিত হলেও বাঙালি মুসলিমসমাজে যুগ যুগ ধরে চলমান বাস্তবতার এই কূপমণ্ডূক রূপটিই অঙ্কিত হতে দেখি। চৌচির উপন্যাসে ধর্মতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকেরা ইংরেজি বা আধুনিক শিক্ষার যে বিরোধিতা করে তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য এক ঘটনা

যা সমগ্র উপমহাদেশে এই সম্প্রদায়কে বিপুলভাবে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে যে প্রায় শত বছরের ব্যবধান, এই বিরোধিতা তার অন্যতম জনক। এক প্রকার পশ্চাৎপদ, কূপমণ্ডূক মানসিকতা যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা তথা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এরূপ বিরোধিতার জন্ম দিয়েছে তেমনি এই বিরোধিতা এই সম্প্রদায়ের জন্য কালক্রমে আবার বিপুল পশ্চাৎপদতার কারণও হয়েছে। অন্যদিকে তা এদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সুগভীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির 'বিভেদের মাধ্যমে শাসন করার নীতি' এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সক্রিয় থাকলেও শুধু তাকে দায়ী করে নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করা অনুচিত। চৌচির উপন্যাসে শুধু ওই বিরোধিতা ও পশ্চাৎপদতাজনিত বাস্তবতার চিত্রই আছে, কিন্তু রাঙ্গা প্রভাতে অঙ্কিত হয়েছে এই পশ্চাৎপদতা থেকে সৃষ্ট দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার ব্যবধানের চিত্র। দুই উপন্যাসের কালগত পটভূমির ভিন্নতার বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রথমটির পটভূমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় আর দ্বিতীয়টির পটভূমি ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাল। রাঙ্গা প্রভাতে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের রাজনীতি থেকে সৃষ্ট সম্প্রদায়গত বিভেদচিন্তাই মুখ্য। এই বিভেদ পরস্পরের মধ্যে জন্ম দিয়েছে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দাঙ্গা ও হানাহানির। এই প্রক্রিয়ায়ই প্রায় অনিবার্য করে তোলা হয়েছে দেশভাগ ও দেশত্যাগের বাস্তবতাকে। আবুল ফজলের সংবেদনশীল মনের সেকুলার-চিন্তা ও মানবীয় বোধ এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র, যাদের কারো কারো মধ্যে মূর্ত হয়েছে লেখকের আত্মজৈবনিক রূপ, মুখর হয়েছে এই বাস্তবতার সমালোচনায়।

রাঙ্গা প্রভাতে যে-সমাজবাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে তা অনেক বেশি রাজনীতি-প্রভাবিত। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেরণাসৃষ্ট বিভেদমূলক বাস্তবতার বিপরীতে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ। অর্থাৎ লেখক গভীরভাবেই কামনা করেন ওই সম্প্রীতিকে। ফলে বর্তমানের হিংসা-বিদ্বেষজর্জর বাস্তবতার ওপরে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান অতীতের মানবিক বোধসম্পন্ন সম্পর্কের বিন্যাসকে। শুধু তাই নয়, তিনি অতীতের সম্প্রীতির সম্পর্ককে নতুন যুগের মূল্যবোধের আলোকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত করতেও আগ্রহী। হিন্দু কর্তৃক মুসলমানের মসজিদের জন্য জমি-দান এবং হিন্দুগৃহের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে মুসলমানের মাছ-মাংস-চাল পাঠানোর ঘটনায় যে ঔদার্য, মহত্ত্ব ও আত্মীয়তাসুলভ সৌজন্যবোধ ক্রিয়াশীল তার মধ্যে লেখক এক ধরনের আদর্শকেই খোঁজেন। কিন্তু অতীতের ওই আদর্শগত অবস্থান থেকে বর্তমান অনেক দূরবর্তী। পরস্পরের অমঙ্গলসাধনই উপন্যাসের বর্তমানকে আচ্ছন্ন করেছে। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অনাত্মীয়তার বিষাক্ত আবহ। এই বিষময় মনস্তত্ত্ব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। যার শিকার হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে চারু রায়কে।

য়ুনুসের উগ্র ধর্মপরায়ণতা সর্বধর্মের আদর্শভিত্তিক ক্লাসের বিরোধিতায় সংকীর্ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু ছাত্রকে মাত্রাতিরিক্ত নম্বর দিয়ে প্রথম স্থান পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় খসে পড়েছে সংস্কৃত-শিক্ষকের ধর্মীয় নৈতিকতা। 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না-করলে কে করবে'– এমন বক্তব্য দ্বারা পরিচালিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুসলিম-বিদ্বেষের চিত্রও উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। সমাজবাস্তবতার এই রূপ অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের সততা ও সচেতনতার পাশাপাশি সমাজের গতিধারা পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয়ও পরিস্ফুটিত। বিদ্বেষক্লিষ্ট এই বর্তমানের বিপরীতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে অতীতের রূপ সন্নিবেশিত হয়েছে তার পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই সমাধান নিহিত বলে লেখক মনে করেননি। অতীত-সম্প্রীতির মধ্যেও তিনি লক্ষ করেছেন নানা সীমাবদ্ধতা, ধর্ম ও কুসংস্কারের সুদৃঢ় আবেষ্টনী। যেমন, মির্জা এনামুল হোসেন কিংবা চারু রায় দুজনেরই দেশপ্রেম-ভাবনার মূলে সক্রিয় রয়েছে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। একজন দেশপ্রেমকে ঈমানের অনিবার্য অংশ মনে করেন, আরেকজনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এদেরই উত্তরসূরি একালের প্রগতিশীল তরুণ কামাল ও মুকুল পূর্বসূরিদের সৌহার্দ্যের মধ্যেও লক্ষ করে কুসংস্কারের সুগভীর আবহ। এত হৃদ্যতার মধ্যেও তারা পরস্পরের বাড়িতে কখনও খাদ্য গ্রহণ (পরিপূর্ণ ভোজন অর্থে) করেনি। তবে মির্জা এনামুল হোসেন ও চারু রায় উভয়ে নিজ নিজ ধর্মের বন্ধনের মধ্যে থেকেও পরিচালিত হয়েছেন উদার মনোভঙ্গি দ্বারা। সন্তানদেরও ওইরূপ শৃঙ্খলা ও ঔদার্যের সমন্বয়ে দেশসেবার মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু যখন লক্ষ করেছেন নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শৈথিল্য, তখন কামনা করেছেন তারা যেন মানুষ হয়। নতুন কালের অভিঘাতে পূর্বসূরিদের মধ্যে চিন্তার এই যে রূপান্তর তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ করি বর্তমান প্রজন্মের তরুণ কামাল ও মুকুলের মধ্যে।

মুকুল ও কামাল অগ্রসর চৈতন্যের ধারক। মির্জা এনামুল হোসেন ও চারু রায় ধর্মতন্ত্রকে ঘৃণা করেছেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মের উদারনৈতিকতাকে গ্রহণ করেছেন। আর মুকুল ও কামাল প্রচলিত ধর্মেরও শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে, যত উদারতার কথা বলা হোক না কেন ধর্মের প্রথাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ও কুসংস্কারের জাল। ফলে তারা তাদের আচার-আচরণ ও উচ্চারণের মধ্যে প্রকৃত মানবতার বাণীকেই অঙ্গীকার করেছে। তাদের কাছে মানবতাবোধ ও মানবধর্মই মূল বিষয়। প্রচলিত ধর্মের নামে যেসব বিভক্তি আছে তাকে অতিক্রম করে গিয়ে তারা মনুষ্যধর্মেরই জয় ঘোষণা করেছে। আবুল ফজলের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ যেভাবে ঘটেছে তাতে এটি স্পষ্ট যে, তিনি সমাজে ধর্মের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল প্রবণতার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর ধর্মপরায়ণ পিতার উদার মনোভঙ্গিসূত্রেই তিনি ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালি মুসলিম

সমাজের পশ্চাৎপদতার পেছনে ধর্মতন্ত্রের সংকীর্ণতা যে অনেকাংশে দায়ী সে-বিষয়টিও তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। ফলে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের বিরোধে ধর্মের পক্ষে সংগ্রামশীল হওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি। সমাজকে কল্যাণের পথে মুক্তিদানের লক্ষ্যেই এই সংগ্রাম। কিন্তু ক্রমশ তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছান যে, শুধু মুসলিম সমাজের মধ্যেই নিহিত নেই এই সংকটের মূল। বরং সকল ধর্মের মধ্যেই উদারনৈতিকতা ও রক্ষণশীলতার বিরোধ রয়ে গেছে এবং এই বিরোধে রক্ষণশীলতাই প্রাধান্য বিস্তার করছে। কারণ শোষণক্লিষ্ট বৈষম্যজর্জর সমাজে ধর্মতন্ত্র সবসময় যেমন শোষকদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে তেমনি একই সঙ্গে শোষকরাও তাদের অন্যায় শোষণ অব্যাহত ও বাধাহীন রাখার স্বার্থে ধর্মতন্ত্রকে আশ্রয় করছে। ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই যেহেতু কূপমণ্ডূকতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বসবাস, সেহেতু ধর্মতন্ত্র সহজেই ওইসবের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বাস্ত বতা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই আবুল ফজলের মধ্যে এসব উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। অতঃপর তিনি মনে করেন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মানুষের প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব। রাঙ্গা প্রভাত উপন্যাসে এই উপলব্ধির কথা স্পষ্ট। উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার রূপায়ণসূত্রে আবুল ফজলের জীবনবোধের রূপান্তর ঘটেছে। চৌচিরে নিজ ধর্মের রক্ষণশীলতার চিত্র উন্মোচনের পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ তিনি পৌঁছে যান রাঙ্গা প্রভাতে, যেখানে সর্বধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেই সংগ্রামশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ক্রমশ তিনি উপলব্ধিতে পৌঁছান যে, মনুষ্যত্বের বিকাশই আসল কথা। সকল ধর্মের উপরে মানবধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিল্পীসত্তার এরূপ রূপান্তরশীলতার মধ্য দিয়েই আবুল ফজল তাঁর উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার রূপায়ণে সার্থকতা অর্জন করেছেন।

পদ্মার পলিদ্বীপ: দ্বীপদেশের মহাকাব্য

জাহেদ সরওয়ার

শাস্ত্র মতে উপন্যাস মহাকাব্যের বংশধর। মহাকাব্যকে বলা যায় সাহিত্যের মাতৃক্রোড়। এক সময় মহাকাব্য চারণ কবিগণ মুখে মুখে আওড়াতেন। রাজা ও প্রজা– যাকে নিয়েই রচিত হোক, মহাকাব্যগুলোতে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, সেটা হল মাত্রাঐক্য। সেখানে একই আবহের মধ্য দিয়ে যেন ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে যায়। কোথাও এতটুকু বেতাল হয় না। সন্দেহ নেই সুর কেটে গেলে সেটা মহাকাব্য হিসেবে অসফল বিবেচিত।

ধারাবাহিকতা, কাহিনীর সমন্বিত বিস্তার, সময়োপযোগী ডিটেল ও ভাষার ব্যবহারই মূলত একই লয়ে তাকে ধরে রাখে। শালোকভের বয়ানে– ঔপন্যাসিকদের সঙ্গীত জ্ঞান থাকা জরুরি। সব সফল মহৎ উপন্যাসগুলোতে এই মহাকাব্যের গভীরতা বিদ্যমান। মহাত্মা বালজাক এই কারণে তার উপন্যাসমালার নাম রাখেন 'হিউম্যান কমেদিয়া'। এই উপন্যাসমালার প্রতিটি উপন্যাস মিলে যেন একটা মহাকাব্য। ফরাসি সমাজের সব ধরনের চরিত্র তাতে বিদ্যমান। শালোকভের বৃহৎ উপন্যাস 'প্রশান্ত দনে' শত চরিত্রের ঘনঘটা, বহু ঘটনার বিস্তার। বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রুশীয় গৃহযুদ্ধ থেকে অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত কিন্তু পুরো উপন্যাসের পরতে পরতে যেন একই ধারার সঙ্গীত বেজে চলেছে। কখনোই কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়তে হয় না পাঠককে।

তলস্তয়ের মহাকাব্যিক উপন্যাসসমূহ 'আনা কারেনিনা', 'পুনরুজ্জীবন', দস্তয়েভস্কির 'কারামাজভ ভাইয়েরা', 'অপরাধ ও শাস্তি' অথবা স্তাদালের 'লাল ও কালো'। এক সময় মহাকাব্যের একটা পর্যায় ছিল যখন তা লিখিত হত দেব-দেবীদের নিয়ে। নিদেন পক্ষে রাজা-বাদশা আমির-ওমরাহদের নিয়ে। কেননা রাজা-বাদশাহরাই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু ইতোমধ্যে মানুষ যুদ্ধে ভূমিকম্পে অগ্ন্যুৎপাতে রোগে মহামারীতে নিজের অভিজ্ঞতা তো সমৃদ্ধ করলই তদুপরি নিজের সীমাটাকে সে নির্ধারণ করতে পারল। চিহ্নিত করতে পারল তার অসহায়ত্বকে। এমনকি তলস্তয়ের চরিত্রসমূহ নেখলেয়ুদভ অথবা কনস্তানতিন লেভিন ব্রুনস্কি, কারেনিন অথবা পিটার সুফিয়া– প্রায় সব চরিত্র ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি বই তো নয়! প্রলেতারিয়েত চেতনা থাকা সত্ত্বেও লেভিনও তাই। যাই হোক আধুনিক কালের উপন্যাসই মহাকাব্যের বংশধর হিসাবে

উত্তম। বিশ্বসাহিত্যে সম্ভবত দস্তয়েভস্কিই সেই মহৎ ঔপন্যাসিক যার শুরু মানে *অভাজন* থেকেই চরিত্ররা একেবারে সাধারণ মানুষেরা।

দস্তয়েভস্কি গোগল সম্পর্কে বলেছিলেন গোগলের *ওভারকোট*-এর পকেট থেকে আধুনিক রুশ সাহিত্যের জন্ম। দস্তয়েভস্তি সম্পর্কেও বলা যায় যে আধুনিক উপন্যাসেরও জন্ম তার রাসকলনিকভে। তার চরিত্রসমূহে। কার্যত দস্তয়েভস্কি ও বালজাকের পর উপন্যাস আর আগের মতো থাকেনি। ব্রাত্য অন্তর্মুখী অভাজনেরাই আধুনিক মহাকাব্য তথা উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হয়ে আসতে লাগল। এবং উপন্যাসে সাধারণ মানুষের স্থান বলা যায় চিরস্থায়ী হয়ে গেল। যদিও এই সাধারণত্বের গোত্রভিত্তিক রূপ দিতে গিয়ে প্রকৃতিবাদী এমিল জোলা, কুপ্রিন, মপাসা প্রমুখ উপন্যাসকে প্রায় পর্নোর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মহৎ ঔপন্যাসিক সময় উপত্যকার চারিদিকে আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণরত। সমস্ত বিষয়টিকে, যে বিষয় নিয়ে সে কাজ করে, মানসচক্ষে দেখতে পায় বলে একটা মাত্র কাহিনীতে তাকে ধরে রাখতে পারে।

দুই

আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* বইটির আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমাংশের ভূমিকাটুকুর অবতারণা করতে হল কেন না এই বইটি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। বইটি পড়তে পড়তে শালোকভের 'প্রশান্ত দনের' কথা মনে পড়ে যায় বারবার। একজন মহৎ ও পাক্কা ঔপন্যাসিকের সবগুণে আবু ইসহাক গুণান্বিত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত অধিকাংশ গল্পই অরুচিকর নিম্নমানের হয়। আবু ইসহাকে *জোঁক* গল্পটি মাধ্যমিকে পাঠ্য ছিল একসময় কিন্তু সিলেবাসভুক্ত ছিল না। কৈশোরে এই গল্পটি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম আবু ইসহাকের লেখনীর শক্তি। আবু ইসহাকের সাহিত্যকর্ম মোট পাঁচটি বইয়ে সীমাবদ্ধ। *মহাপতঙ্গ, হারেম, সূর্যদীঘল বাড়ি, পদ্মার পলিদ্বীপ* ও *জাল*।

পদ্মাপারের জেগে ওঠা চরের মতোই দ্বীপাঞ্চলের অনিশ্চিত মানুষের গল্প লেখেন তিনি। পদ্মাপারের মাটির মানুষ আর তাদের ভাষা আর তাদের ভেতর দিয়ে উপনিবেশবাদের অক্টোপুশি চেহারাকেই তিনি উন্মোচিত করেন। এ উপন্যাসের নায়ক ফজলের মতোই যেন তৃতীয় বিশ্ববাসী।

ফজল একদিন মাছ ধরতে গিয়ে দেখতে পায় তাদের পুরনো দখলকৃত খুনের চর আবার জেগে উঠেছে। সে তার বাবা মাতব্বরকে খবর দেয়। কোলশরিকদের নিয়ে মাতব্বর চরটি পুনঃদখল করে।

কিন্তু উপনিবেশবাদী জাঙ্গরুল্লা চরটি দখল করার পাঁয়তারা করে। তার অভিনব কৌশলের কাছে সহজেই পরাস্ত হয় ফজলরা। চরের পাশে একটি ডাকাতি হয়েছে এই মর্মে থানায় এজাহার দেয় জাঙ্গরুল্লা। জাঙ্গরুল্লার পয়সা খাওয়া পুলিশ বাহিনী মিথ্যা মামলার আসামী করে ফজলকে। ফজলরা পালিয়ে গেলে দ্রুত চরটির দখল নেয়

জাঙ্গরুল্লা। অন্যান্য উপনিবেশবাদীদের মতই জাঙ্গরুল্লা এক পীরকে ধরে এনে ধর্মপ্রচারের আস্তানা গড়তে চায় এই চরে।

আবু ইসহাক *পদ্মার পলিদ্বীপ* রচনা করেন ১৯৮৬ সালে। ততদিনে মার্কিন সাম্রাজ্য বিকশিত হয়ে ডালপালা গজিয়েছে। তিনি জানেন সাম্রাজ্যবাদীরা নব নব পন্থায় সাম্রাজ্য বিস্তারের পাঁয়তারা করে। আবার এই জুলুমকে জায়েজ করার জন্য তাদের দরকার হয় ধর্মীয় নৈতিকতার আধার। হিংসার চরমতম রূপ যুদ্ধকে তারা নাম দেয় ক্রুসেড। তারা লুণ্ঠনকে করে তোলে ধর্মপ্রচারের সফর। চিরদিন এই দুটি ব্যাপার একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হিসেবে চলে আসছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা বয়ানের সত্যতা এ উপন্যাসের জাঙ্গরুল্লা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে মেলে। বোঝা যায় উপনিবেশবাদিতা অশেষ। উপনিবেশবাদিতা প্রজাতির রক্তিম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মানুষের ভেতর রয়েছে রাজত্ব করবার স্পৃহা। দখলপ্রবৃত্তি মানুষের অতি পুরনো বাসনা। যা কিছু আনন্দ দেয়, শৌর্য দেয়, বীর্যবান করে সবই তার দখলে চায়। জাঙ্গরুল্লার দখলে অনেক চর। তার অনেক লাঠিয়াল, অনেক শক্তি। বহু মিত্র, কোলশরিক। তবু যেই শুনেছে খুনের চরে ভালো ধান হচ্ছে; খুনের চর থেকে মাছ ধরে সহজে দুই পয়সা কামাই করা যায়; তখনই তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে লোভ, তার ঘুম হারাম হয়ে যায়– কী উপায়ে এই দ্বীপ দখল করা যায়। এটাই তো *সাম্রাজ্যের মন*। যখন মানুষের দখলসত্তা জেগে ওঠে তখন সে একটার পর একটা পরিকল্পনা করে, কিভাবে সে তা দখল করতে পারে। এই জন্য সে মিছা ডাকাতির মামলা সাজায়। ফজল ধরা পড়ে জেলে যায়। সাক্ষী জাঙ্গরুল্লার নিজেরই লোকজন আর তার ক্ষমতা আর তার টাকা।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত সাম্রাজ্যবাদীর উত্থান ঘটেছে; ইতিহাস সাক্ষী দেয় প্রত্যেক দখলদারিত্বের আগে তারা মিথ্যাচারের জন্য নগ্নভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে। এডওয়ার্ড সাঈদের *কাভারিং ইসলাম* ও *আফটার দ্যা লাস্ট স্কাই* বইসমূহ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিবিসি, সি এন এন-এর মতো নিউজ ব্রডকাস্টিংগুলোকে নিজেদের স্বার্থে পশ্চিমারা কী জঘন্যভাবে ব্যবহার করে বইগুলো তার সাক্ষ্য দেয়। এই কিছুদিন আগেও নিউজ এজেন্সিগুলোর বরাতে সাদ্দাম হোসেনকে মনে হত বিশ্বত্রাস। যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়াকে নরকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা যেন তার রয়েছে, ভাবখানা ছিল এমন। কত সহজেই-না মার্কিনিরা ইঁদুরের মতো লেজ ধরে গর্ত থেকে তুলে এনে তাকে লটকে দিল ফাঁসিতে। এই যে ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার নামে কাবুলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রস্তর যুগে; সন্দেহ হয় আসলে ওসামা বিল লাদেন বলে কেউ আছে কি ? যে মার্কিনিদের বোমাবৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পাহাড়ে খানাখন্দে তেলাপোকার মতো বেঁচে আছে। এই সবই কি উপনিবেশ বিস্তারের বা বিস্তৃত উপনিবেশকে পোক্ত করার জন্য অভিনব কৌশল নয়? আসলে ঘটনা-পরম্পরা বিবেচনা করলে দেখা যায় সবকিছুর মূলে চরদখল ফন্দিফিকির।

মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে মরে যায় জরিনার স্বামী অসুস্থ চোর মতলব। এতবড় ইস্যু কি ছাড়তে পারে জাঙ্গরুল্লা। সে রটায় ফজলই খুন করেছে মতলবকে। উপন্যাসের

শেষার্ধে যদিও ঔপন্যাসিক ফজলকে দিয়ে পুনরায় দখল করায় খুনের চর। কিন্তু মানুষ কি আদৌ এত আশাবাদী হতে পেরেছে? জাঙ্গরুল্লার কোলশরিক ফজলের শ্বশুর যখন ফজলের বউ রূপজানকে বিভিন্ন ছুতোয় আটকে রাখে নিজের বাড়িতে, তখন ফজলই বুদ্ধি করে জাঙ্গরুল্লার লোক সেজে রূপজানকে তুলে নিয়ে আসে। এটাই আসলে টিকে থাকার মেটাফর। ফজল-জরিনা-রূপজান-কেন্দ্রিক প্রেমকাহিনীটা এ উপন্যাসকে আরো বেশি চিরন্তন করে তোলে।

প্রসঙ্গত *জাল* উপন্যাসে আবু ইসহাক একটা ভূমিকা লেখেন। তার ভাষায় *আমার প্রথম উপন্যাস সূর্যদীঘল বাড়ি লেখা শেষ হয় ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে। তারপর চার-চারটে বছর প্রকাশকের সন্ধানে কলকাতা ও ঢাকায় ঘোরাঘুরি করেও বইটির প্রকাশক পাইনি।*

এতে আহত হয়ে তিনি ভাবলেন মৌলিক উপন্যাস যখন কেউ ছাপে না তখন তিনি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখবেন। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি *জাল* লেখেন। কিন্তু পাঁচ বছরের মাথায় তিনি সূর্যদীঘল বাড়ির প্রকাশক পান এবং এটার সফলতা দেখে জাল-এর পাণ্ডুলিপি বাক্সবন্দি করেন। প্রায় ৩৪ বছর জাল-এর পাণ্ডুলিপি বাক্সবন্দি অবস্থায় ছিল।

বাংলাদেশের প্রকাশকদের মতো অশিক্ষিত কোনো সম্প্রদায় কোথাও নেই। এদের ব্যবসা চিন্তা আর নোংরা মানসিকতা আর সস্তা রুচির কারণে এ দেশীয় সাহিত্য এখনো আঁতুড়ঘরেই রয়ে গেল। এখনো এ দেশে বই ছাপা হবার যোগ্যতা হচ্ছে আমলা হওয়া, পত্রিকার সম্পাদক হওয়া অথবা প্রকাশকের বউয়ের ভাই হওয়া। এদের হাতেই বন্দি এ দেশীয় সাহিত্য। মেলা আসলেই দেখা যায় এই মূর্খ অশিক্ষিত প্রকাশকদের কুরুচিপূর্ণ নিম্নমানের অপন্যাসে ভরে যায় বটতলার বইয়ের স্টলগুলো। এদের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বলি হয় আবু ইসহাকের মতো মৌলিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকরা।

ক্রীতদাসের হাসি: প্রতীকের আড়ালে সমকাল

সৌ মি ত্র শে খ র

শওকত ওসমানের 'রূপক উপন্যাস' হিসেবে পরিচিত 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) গ্রন্থাকারে প্রকাশ-বর্ষেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অধিক অর্থমূল্য ও সম্মানের 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে' ভূষিত হয়। লেখকের হাতে পুরস্কার তুলে দিন সামরিক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। অথচ উপন্যাসটিতে ভিন্ন আবহে আইয়ুব খানের দুঃশাসনে প্রপীড়িত পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আত্মিক প্রতিবাদ বিঘোষিত। এক সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন:

"আমার ঐ সময়কার উপন্যাসে রূপক অর্থে উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করার অনেকগুলো কারণ ছিলো। যেমন ধর ১৯৬১ সালে রচিত 'ক্রীতদাসের হাসি'র কথাই। এ সময়ে আইয়ূব খানের সামরিক শাসন এত কড়াকড়ি ছিল যে, সরাসরি কাউকে কিছু বলা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও শব্দ করা যেত না। ঐ কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করেও আমি 'ক্রীতদাসের হাসি' লিখেছি। ঐ সময় স্বৈরাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। একজন শিল্পীতো আর বসে থাকতে পারে না। তাই ঐ স্বৈরাচারী সরকারের শঠের সঙ্গে আমিও শঠ করলাম যেহেতু তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মধ্যপ্রাচ্য, আরব দেশ, অষ্টম শতাব্দী। সুতরাং ওরা ভাবল আমি একটা আরব্য উপন্যাস লিখে ফেলেছি, রূপকথা লিখে ফেলেছি। কিন্তু যখন বুঝতে পারল তখন It was too late তাছাড়া ওরা আমাকে সরাসরি কথা বলতে দেবে না। তাই বাধ্য হয়ে ঐসব উপন্যাসে রূপকের আশ্রয় নিয়েছিলাম।"[১]

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে লেখক কথিত পূর্বোল্লিখিত 'রূপক অর্থে' বা 'রূপকের আশ্রয়' বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। কেননা, লেখকের এ ধরনের বক্তব্যকে পুঁজি করেই সম্ভবত আলোচকদের দ্বারা 'ক্রীতদাসের হাসি' 'রূপকধর্মী' উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

ইংরেজি 'Allegory' শব্দের বাংলা অর্থ 'রূপক'। একটি রূপের আধারে কোনো বিশেষ ভাব, ধারণা বা বক্তব্য প্রকাশ এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও রূপক শুদ্ধমাত্র ওই 'বিশেষে'ই সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন 'চর্যাপদে' ব্যবহৃত রূপক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অধ্যাত্ম যে-কোনো দিক থেকেই সত্য। সেজন্যেই বলা যায়, একাধিক বক্তব্যের প্রতিফলক হয়ে

উঠতে পারে এই শিল্পকলা। আসলে 'সহজ করে বাহ্য ও লৌকিক জীবনের রূপ বর্ণনার সাহায্যে লেখকের ভাব বা তত্ত্ব যখন অভিব্যক্ত হয় না, তখনই লেখক রূপকের আশ্রয় নেন।'[২] গ্রিক ক্রিয়াপদ `Synballein' থেকে `Symbol' বা প্রতীক শব্দটি জাত। `Stoic' দার্শনিকেরা বহুমুখিতা নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন এবং এর থেকেই পরে `Hermenentics' নামে একটি বিশেষ ব্যাখ্যানবিদ্যারও উদ্ভব হয়। মূলত প্রতীক একটি বিশেষ ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করে সৃজিত ও বিকশিত। বক্তব্য-আধেয় এক হলেও আধার-সুষমাই ক্ষণিকের জন্যে এতে প্রধান হয়ে ওঠে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্যে রূপক ও প্রতীকের অর্থ অনেকের কাছে এক বলে প্রতিভাত হতে পারে। 'গ্যেটে, কীটস ও বোদলের-এর রচনাতেও– 'সিম্বল' 'অ্যালেগরি'র (রূপক) পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়া প্রায়শ 'সিম্বল' একাকার হয়ে গেছে 'ফিগার' (বাঙ্‌মূর্তি) ও 'ফিগারেটিভ'-এর সঙ্গে।'[৩] এ কারণে শওকত ওসমান যদিও 'ক্রীতদাসের হাসি'তে 'রূপকের আশ্রয়' নিয়েছিলেন বলেছেন, তারপরও আমরা উপন্যাসটিকে 'প্রতীক ধর্মী' বলতে চাই। কেননা উপন্যাসটিতে তৎকালীন পাকিস্তানের একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ূব খানের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বাঙালির প্রতিবাদ ও আত্মিক স্বাধীনতার বাণী শুধুমাত্র এক বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যমেই নয়, প্রতিনিধিত্বশীল সম্পূরক চরিত্র সৃষ্টির দ্বারাও সমানভাবে বিঘোষিত। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই প্রতীকাশ্রয়ে ওই সময়ের এক একটি চেতনার প্রতিনিধিত্ব করছে। এদের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। আইয়ূবী শাসনামলের যেভাবে ও যতটুকু সুচারু উপস্থাপনা আছে উপন্যাসটিতে অন্যকোনো স্থান-কালের সঙ্গে ওর পার্থক্য যোজন-দূর। এই নিকট-সাদৃশ্যই– উপন্যাসটিকে 'প্রতীকধর্মী' হিসেবে আরও বেশি প্রমাণ করে। বাগদাদের স্বেচ্ছাচারী বাদশা হারুনার রশীদ এক গভীর রাতে হাবসী গোলাম তাতারী ও আরমেনী বাঁদী মেহেরজানের দাম্পত্যসুখলাভে উৎসারিত উচ্ছ্বল প্রাণদ হাসি শুনতে পায়। পরে গোলামকে মুক্ত করে ধন-দৌলত ও বাগান দিয়ে স্বাধীন করে দেয়া হয়। বিনিময়ে বাদশাকে হাসি শোনাতে হবে– শর্ত এই। সুন্দরী বাঁদী মেহেরজানকে বেগম করে বাদশা অন্দর মহলে স্থান দেন। কিন্তু এরপর তাতারী আর হাসে না। সেনাপতির তলোয়ারের ভয় কিংবা বাদশা কর্তৃক প্রেরিত সুন্দরী বুসায়নার প্রলোভন কোনো কিছুই তাতারীর হাসির ঝর্ণাধারার বাঁধ খুলে দিতে পারে না। নির্যাতনের ফলে মৃত্যুকালে তার শেষ উচ্চারণ: দিরহাম-দৌলত দিয়ে গোলাম-বাঁদী কেনা গেলেও হাসি কেনা যায় না। 'ক্রীতদাসের হাসি'তে বর্ণিত মূল কাহিনী এটুকুই। অবশ্য এর আগে একটি ছোট শিরোনামহীন প্রস্তাবনা আছে।

গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার কয়েক মাস পরে ঢাকার তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যসাময়িকী সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকালে' এর বিকৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] সমালোচক উপন্যাসটিতে 'রূপকথা' অনুসন্ধান করে একে 'চিত্র-নাট্য' প্রভাবিত বলে মন্তব্য করেছেন। পুরস্কার প্রাপ্তির পর উপন্যাসটির বিরূপ সমালোচনা যেন আরও তীর্যক হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে দুটো মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক:

এক. "['ক্রীতদাসের হাসি'কে আদমজী পুরস্কার দিয়ে] এ দেশের সর্বসাধারণের সাহিত্য রুচির প্রতিই শুধু তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়নি, সাহিত্য পুরস্কারের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি। পীরের আলখেল্লার ভিতর এ ভূত ভাগাবে কে? "[৫] দুই, "[শওকত ওসমান] যদি ছোটগল্পের জন্য পুরস্কার পেতেন তাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন হতো। অথচ তিনি পুরষ্কার পেলেন ক্রীতদাসের হাসি নামক একটি সস্তা জনপ্রিয় উপন্যাসের জন্য।" [৬] এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রকাশের পাঁচ-ছ'বছর পরও উপন্যাসটির প্রতীকাশ্রয়ের স্বরূপ সব ধরনের পাঠক-সমালোচকের কাছে যেমন উদ্ঘাটিত হয়নি তেমনি যথাযথ সাহিত্যিক মূল্য থেকেও উপন্যাসটিকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

শওকত ওসমান অন্বিষ্ট মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে প্রতীকী আড়ালের দ্বারোদ্ঘাটন আবশ্যক। বাদশা হারুনার রশীদ ও তার পারিষদবর্গকে তৎকালীন পাকিস্তানী জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কল্পনা করা যায়। এর থেকেও আরও সূক্ষ্ম-বিভাগ হতে পারে এভাবে– বাদশা হারুন: একনায়ক সামরিক শাসক আইয়ূব খান, বন্ধু সেনাপতি মশরুর: আইয়ূব খানের বাধ্য সেনাবাহিনী, বেগম জুবাইদা : পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, আলেম আবদুল কুদ্দুস, জল্লাদ ও পারিষদবর্গ: ইসলামের ধ্বজাধারী শাসকের স্বার্থরক্ষাকারী ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের অনুচর-সমর্থক, তাতারী: পূর্ব-পাকিস্তানের মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষ, মেহেরজান: বাংলার স্বাধীনতা– যা তুর্কী, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানীদের কাছে বার বার হাত বদল হয়েছে, কবি নওয়াস-ইসহাক: বাংলার কবি, শিল্পী, সংস্কৃতিবান মানুষের প্রতিনিধি। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করার পর যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে এর ফলে শওকত ওসমানকে রূপ-প্রতীকের আশ্রয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী যেহেতু ওই সময়কালের ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিনিধি এবং পরিবেশ প্রতীকাশ্রয়ে ১৯৬২-উত্তর পূর্ব-পাকিস্তানকেই ব্যঞ্জিত করে সেদিক থেকে বিচার করলেও উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের তথ্যচিত্রে পরিণত হয় নি। বরং কালের অনিবার্যতাকে ধারণ করে কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে এটি। প্রতীকের আড়ালে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি যে উপন্যাসটির পরতে পরতে অনুরণিত এ বিষয়টি আমাদের কাছে মোটেও গৌণ নয়। মানুষের আত্মার প্রতিধ্বনি হাসি অত্যাচারীর ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার শাশ্বত বাণী নিশ্চয়ই একটি মহান-বার্তা বহন করে। কিন্তু এটিই উপন্যাসটির সবটুকু নয়। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির 'দশম সংস্করণ' প্রকাশিত হওয়ায় নিশ্চিত বুঝা যায় এর জনপ্রিয়তা মোটেই কম নয়। তাছাড়া এর ইংরেজি অনুবাদ ও নাট্যরূপও প্রকাশিত হয়েছে। – এ জনপ্রিয়তার সূত্র-সন্ধান আবশ্যক।

জুলাই, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্রীতদাসের হাসি'র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'৬২ তে প্রকাশিত 'সমকাল'র 'পুস্তক সমালোচনার' আগে আর কোথাও কোনো আলোচনা

প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়নি। তাই একেই আমরা গ্রন্থটির প্রথম সমালোচনা হিসেবে ধরে নিতে চাই। এতে উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"রূপকথার রূপ যদিও-বা তিনি দিতে পেরেছেন– কথার রস সঞ্চার করতে পারেন নি; কাঠামোটাই শুধু তৈরি হয়েছে– প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এর জন্য লেখকের অক্ষমতা যতখানি দায়ী তার চাইতে অধিকাংশে বেশি দায়ী হল এর গল্প বলার রীতি– আংগিক। কারণ আংগিক গঠনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে ক্রীতদাসের হাসি উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত নয়।"[৭] বলা বাহুল্য রূপকথার প্রধান বৈশিষ্ট্য:, কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও কালের দ্বারা যেমন এগুলো সুচিহ্নিত নয়, তেমনি ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারাও এগুলো রচিত হয়নি। 'তবে কোনো উপন্যাসে রূপকথার উপাদান সচেতনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার রূপকথার কোন বিশেষ কাহিনীতে উপন্যাস-লক্ষণ আভাসিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য রূপকথার ফ্যান্টাসির জগৎ নয়– পক্ষীরাজের পক্ষবিস্তার, কড়ির পাহাড়– হাড়ের পাহাড়– সাত সমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে কোনো ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রে রাজপুত্রের পৌঁছে যাওয়া নয়, তার লক্ষ্য বাস্তব মানবজীবন, নরনারীর হৃদ্‌স্পন্দন।'[৮] এ বিচারে 'ক্রীতদাসের হাসি'কে উপন্যাসই বলতে হয়। তারপরও শওকত ওসমানের সমসাময়িক এক ঔপন্যাসিক বলেন, 'ক্রীতদাসের হাসি– উপন্যাসের চাইতে নাটকেই বেশি।'[৯] আসলে সাহিত্য-শিল্পের 'উপন্যাস' ধারার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, গঠনশৈলী বা সংজ্ঞা নিয়ে সূক্ষ্ম মতভেদ থাকলেও মানুষ ও তার সামাজিক নির্ভরতাকে গ্রহণ ও অভিব্যক্তি দেবার প্রয়াসই যে উন্যাস এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। র‍্যাকল ফক্স তাঁর `Novel and the People' গ্রন্থে মধ্যযুগের সমাজবাস্তবতা এবং উপন্যাসের কাঠামো ও বিষয় সম্পর্কিত ব্যাপক আলোচনা করেন। তাঁর মতের সঙ্গে 'ভারতকোষে' প্রদত্ত উপন্যাসের সংজ্ঞার বড় কোনো পার্থক্য নেই: 'কার্যকারণ শৃঙ্খলিত, চরিত্রদ্যোতক ও জীবন-স্বরূপ নির্দেশক কাহিনীই উপন্যাস'।[১০] আর এই 'শৃঙ্খলিত' অর্থাৎ সেতুবন্ধনের জন্যে (Method of communication) প্রয়োজন একটি বিশিষ্ট ভাষারীতির। রিচার্ডসন, ডিফো, ফিল্ডিং প্রমুখের রচনাতে অগ্রজ নাট্যসাহিত্যের প্রভাব-অধিকার স্পষ্ট। এলিজাবেথীয় নাটকের সংলাপ-নিরীক্ষা, গদ্য-পদ্যের মিশ্ররীতি বা চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুসারে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে সংলাপ বলানোর কৌশল ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ফলে উপন্যাসে সংলাপ ব্যবহার কোনো দোষের নয়। নাটকে দৃশ্যগুণ ও কাব্যগুণ যেখানে সবচেয়ে বড়, উপন্যাসে জীবনবোধ ও তার ক্রিয়া-সংঘন বিস্তৃতিই কাম্য। মৃণাল লিখিত একটি চিঠি যদি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নামের ছোট গল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কতগুলো চিঠির পসরা নিয়ে যদি কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন হারা' বা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ক্রোঞ্চ মিথুন উপন্যাসের মর্যাদা পায়, এমনকি সংলাপ-সমৃদ্ধ বুদ্ধদেব বসুর 'অনেক রকম' (১৯৩০) উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হলে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' কেও 'উপন্যাস' বলে অভিহিত করতে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তবে আলঙ্করিক ও শিল্পরসবেত্তাগণের সমর্থনে

প্রকরণগত বৈচিত্র্য ও করণকুশলতার ভিন্নতার জন্যে একে আমরা উপন্যাসের একাধিক উপ-বিভাগের একটি 'নাট্যোপন্যাস' ধারার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

'ক্রীতদাসের হাসি'র প্রারম্ভেই একটি শিরোনামহীন প্রস্তাবনা আছে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এটি ছিল সাতাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী, সপ্তম সংস্করণ থেকে সোয়া চার পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মূল কাহিনী ফাঁদার জন্যেই মূলত ও প্রস্তাবনা। উপন্যাসটি নাকি নাস্তালিখ অক্ষরে লিখিত 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে' অর্থাৎ 'সহস্র দুই রাত্রি' গ্রন্থের শেষ কাহিনীর অনুবাদ। এতদিন 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা' বলে যে গ্রন্থটির নাম জানতাম তা' আসলে সহস্র এক রাত্রি নয়। আরও একটি অনাবিষ্কৃত কাহিনী ছিল যা' লেখকেরা তিন বন্ধু মিলে শাহ ফরিদ উদ্দীন জৌনপুরী নামক এক মৌলানার কাছ থেকে উদ্ধার করেন। প্রস্তাবনাটি পড়লে একে সত্য না বলে উপায় নেই। কিন্তু কাহিনীটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

এ প্রস্তাবনাতেই লেখকের এক সহপাঠী রউফনের কথা আছে, যার পিতামহ শাহ ফরিদ উদ্দীন জৌনপুরী এবং সে সূত্রেই পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান লাভ। রউফন ছাত্রজীবনে প্রেমিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গ্রামে ফিরে যায় এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করে পড়ানোর কাজে ব্রতী হয় সংসারের একমাত্র অবলম্বন পিতামহর সান্নিধ্যে। প্রেমের মর্যাদা পায়নি বলে জীবন থেকে পালানোর কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না– চুম্বকাকারে প্রস্তাবনায় এই ভাবটি মূর্ত। অনেক সমালোচক প্রচলিত বিচারপদ্ধতিতে মূল কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক– সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন:

"এই দুটি গল্পের মধ্যে স্থানের ঐক্য (Unity of place), কালের ঐক্য (Unity of Time) বা আখ্যানভাগের ঐক্য (Unity of plot) ব্যাহত। নানাভাবে চেষ্টা করেও এ দুটি গল্পের মাঝখানে কোনও সূত্র আবিষ্কার সম্ভব নয়।[১১] পরবর্তী সময় এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিই শোনা গেছে অন্য গবেষকদের আলোচনায়। কিন্তু তাঁরা উভয়ের মধ্যে 'চেতনার ঐক্য' (Unite of consciousness) অনুসন্ধানের চেষ্টা করেননি। প্রকৃত পক্ষে গল্প দুটোর মধ্যে স্থান-কালের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও রউফনের অপরাজিত প্রেমসত্তা প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান সহ্য করেও দেশকে (গ্রামকে) ভালোবেসে সতত জাগরূক হয়ে রইল, মূল কাহিনীর তাতারীর অপরাজিত মনোভাবের সঙ্গে এর সম্পর্ক আবিষ্কার করা সহজ:

"সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয়-না-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তার সজল চোখ আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই সেরা ছাত্রটির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রউফন এমনি চোখেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে কিন্তু সে খোয়ার হতে দেয়নি। বীরের পৌত্রী আপ্ত-মানবী।"[১২] উপন্যাসের মূল কাহিনীটি বাগদাদের, প্রস্তাবনা-গল্পের প্রেক্ষাপট বাংলার; চেতনার ঐক্যই উভয়কে এক সূত্রে বাঁধে। যেমন চেতনা নাম্নী ওই অমিত বোধের সিঁড়ি বেয়ে মূল কাহিনীর প্রতীকাশ্রয়ে প্রতিবিম্বিত পূর্ব-পাকিস্তান ও সেখানকার দুঃশাসনকে আমরা দেখতে পাই।

'ক্রীতদাসের হাসি'র উপস্থাপন কৌশল ও ভাষাবয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার মূলেও এ বিষয়টি মুখ্য কাজ করেছে। এর সহজ-সরল ভঙ্গিতে বাক্যগঠন, অলঙ্কার বিবর্জিত পেলব উপস্থাপনা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কাহিনীর কারণে বেশ কিছু আরবি-ফারসি-উর্দূ শব্দের সমাহার লক্ষ্যযোগ্য হলেও তাতে গদ্য ভারাক্রান্ত হয়নি। আলাপচারিতার ঢংয়ে নাটকীয় ভঙ্গির সংলাপ-সৃজন উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে কাহিনীরস আহরণে পাঠকের যেমন কোনো অসুবিধা হয় না, উপরন্ত নাট্যেপম উপস্থাপনার গুণে পুরো বিষয়টি একই সঙ্গে শ্রাব্য ও দৃশ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। বাইশটি পৃথক পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে উপন্যাস; একাদশ ও অষ্টাদশ ক্ষুদ্রাকারের পরিচ্ছেদ দুটো বাদ দিলে আর প্রতিটিতেই রয়েছে নাটকের মতো সংলাপ। কোথাও বর্ণনা দিয়ে কাহিনী-সূত্রের বিবরণ প্রদান করা হলেও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ব্যতীত আর কোথাও তা' প্রধান হয়ে ওঠেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে সমাসবিবর্জিত পরিচিত বাংলা শব্দের সঙ্গে অল্প পরিচিত বিদেশি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের যে সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে তা' অনন্য ভাষাশিল্পীর চমৎকার কারুকর্মের স্বাক্ষর বহন করে। উপন্যাসের স্বল্প বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে বা সৃষ্টি করেছে অপূর্ব চিত্রকল্পের:

"শুধু কি আকাশ? পৃথিবী নিজের অন্তহীন বিস্তার অস্বীকারের জন্য গণ্ডীর মধ্যে বিচিত্রার আতসবাজি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয়। থামতে চাইলেও থামতে পারে না। তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষের মধ্যেই তাই পৃথিবী ভেঙে ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোঁজার মতো। খুঁজে পাওয়ার পর আবার ছড়ানো। ঝর্ণান উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থান-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে। তাই গরাদের উপরে শুধু আকাশই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না, ধেয়ে আসে চূর্ণিত পৃথিবী, টুক্‌রো-টুক্‌রো রঙিন কাঁচের মতো অন্তহীন বর্ণ-সজ্জায়– পলানুপল, দণ্ড-প্রহর অহর্নিশ।" (পৃ. ৯৫)

বর্ণনার এই চিত্ররূপময়তা এবং পেলব ভাষার দ্যোতনা পাঠকের মনে যে বিশেষ ভাবের সঞ্চার করে তাতে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধার আত্মোৎ সারিত আকুতি: 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' শুধু কাব্যভাষা হিসেবে নয়, মধ্যযুগের কাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হিসেবে এই পঙ্‌ক্তিটি আদৃত। 'ক্রীতদাসের হাসি'তেও ঠিক এ ধরনের পঙ্‌ক্তি সৃষ্টি হয়েছে। কবি ইসহাক মেহেরজানকে দেখে বলছে: 'দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না– দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ।' (পৃ. ৩৯) পঙ্‌ক্তিটি বাচ্যার্থ অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশক হিসেবেই শুধু নয়, আশ্চর্যজনকভাবে অলঙ্কারের ভ্রান্তিমানতা নির্দেশ করছে। তাছাড়া 'ইডিপাসে'র অন্ধ টেরিসিয়াসের মতো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পাঠকের চিন্তাশক্তিকে সচকিত করে। যেমন কবি নওয়াস হারুনকে বলছে:

"[....] আমার ওই হুঁস আছে বলেই আমি বেহুঁস থাক্‌তে চাই। আর যাদের সে হুঁস নেই অর্থাৎ যারা বেহুঁস– তারা হুঁসে থাকে। অর্থাৎ– মোদ্দা কথা, যারা বেহুঁস তারা হুঁসে থাকে, আর যারা হুঁসে তারা বেহুঁস। [....]" (পৃ. ৭২)

এ ধরনের বক্তব্য এবং বক্তব্য-প্রকাশক ভাষাভঙ্গি উপন্যাসটির পরম সম্পদ। 'আলেফ লায়লা'র সর্বশেষ অবিচ্ছেদ্য কাহিনী হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে লেখক উপন্যাসটিতে বাগদাদের পরিবেশ ও পাত্র-পাত্রীই নির্বাচন করেননি, 'আরব্য রজনী'র মতো কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে কোথাও এমন বর্ণনা দিয়েছেন[১৩] যে জন্যে গ্রন্থটির প্রথম সমালোচক থেকে সাম্প্রতিক এক ঔপন্যাসিকের কাছে এতে 'যৌন খুঁজলানির চটক'[১৪]-এর সন্ধান মিলেছে। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পে শ্লীলতা-অশ্লীলতার সঙ্গে রুচিবোধের সম্পর্ক বিদ্যমান।

(১৩) দ্রষ্টব্য: ক্রীতদাসের হাসি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১, ৩০-৩৩, ৬৫, ৭৫

(১৪) আবু রুশ্‌দ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

সংস্কৃত সাহিত্য আদিরসাত্মক হওয়ার পরও সাহিত্যরসবেত্তাদের কাছে তা' পরিত্যাজ্য নয়। কিংবা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোথাও কোথাও আদিরসের প্রাবল্য লক্ষ্যযোগ্য হলেও তার সাহিত্যিক মূল্যে এর প্রভাব পড়ে না। সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'প্রবন্ধ সংগ্রহে' মন্তব্য করেছিলেন যে, সুরুচির দিক থেকেই সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিবেচিত হতে পারে, সুনীতির দিক থেকে নয়। নীতিবাগিশগণ অবশ্য এতে স্বভাবতই হবেন ক্ষিপ্ত; কিন্তু এতে খুব বেশি হেরফের ঘটে না। 'ক্রীতদাসের হাসি'-ও এই 'সুরুচি'র বিচারেই বিবেচ্য, 'সুনীতি'র দিক থেকে নয়। 'ক্রীতদাসের হাসি'র অনেক চরিত্র ইতিহাসের সঙ্গে মিলে গেলেও উপন্যাসটি 'ঐতিহাসিক' নয় এবং তাই সে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি আলোচিত হতে পারে না। কিন্তু তারপরও সমালোচক ঔপন্যাসিক আবু রুশ্‌দ্‌ বাগদাদের বর্ণনায় তুষ্ট হননি। বাদশা হারুনকে প্রজাবৎসল করে চরিত্রায়িত না করায় তিনি চরিত্রটির প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন।[১৫] আবু রুশ্‌দ নিজে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি।[১৬] তিনি হয়তো আশা করেছিলেন 'ক্রীতদাসের হাসি'তে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিচ্ছবি; যেখানে তাঁর অনুসৃতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। সে কারণেই 'লাল সালু' উপন্যাসে ধর্মীয় কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্ঘাটক অপরিহার্য পরিচ্ছেদটি সম্পর্কেও তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গির মন্তব্য: ' [লালসালু'র] প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা কাহিনীতে অবান্তর মনে হয়।[১৭] বাদশা হারুন কতটুকু ধর্ম বা ইতিহাসসম্মত তার চেয়ে বেশি বিবেচ্য, চরিত্রটি উপন্যাসে কতটুকু তার চেয়ে সার্থক এবং কিভাবে। সাহিত্যরসপিপাসু মধুসূধনের মেঘনাদবধ কাব্য'কে অবশ্যই মূল রামায়ণের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন না। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত হারুন অভাবনীয় পরাক্রমসম্পন্ন, দাম্ভিক, নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ এক স্বেচ্ছাচারী বাদশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাতারী ও মেহেরজানের মিলনরাতে মেহেরের রূপঐশ্বর্যে বাদশা হারুন চরমভাবে মোহাবিষ্ট হয়। মশ্‌রুরের কাছে কোরান ও নবীর নামে মিথ্যে শপথ করে সে পরিচয় জেনে নেয় সুন্দরী মেহেরের। তারপরের রাতে একই দৃশ্য দেখে কবি ইসহাকের কাছে জানতে চায় বাদশা হারুন: ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়? (পৃ. ৩৯) আসলে সে মেহেরজানকে দেখামাত্র কামতাড়িত হয়ে পড়ে এবং তাই যখন মশরুর জানায় মেহের বেগম

জুবায়দার প্রিয়পাত্রী তখন হারুনের কড়া নির্দেশ: 'বেগম সাহেবা যেন এইসব রাত্রির খোঁজ না পান।' (পৃ. ৩৭) হাসির শব্দ শুনে প্রলুব্ধ বাদশা হারুন এর সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে যখন সুন্দরী মেহেরকে আবিষ্কার করে তারপর থেকেও অভ্যন্তরীণ চরম কপটতা ও কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিতে দেখা যায় তাকে। এরপর মিলন-মুহূর্তে দাসবস্তিতে সশস্ত্র প্রবেশ করে তাতারীকে চরম দাম্ভিক একনায়কের মতো জিজ্ঞাসা করে: 'তুই শাদী করেছিস, অথচ খবর দিস্‌নি? [....] [....] তোর কি জানা নেই আপন মাওলার (প্রভু) হুকুম ছাড়া কোনো গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটির শাদী দিতে পারে না?' (পৃ. ৪৬) ঠিক এর পরেই নাটকের দক্ষ অভিনেতার মতো চরম মহানুভবতার সংলাপ উচ্চারণ করে বাদশা তাতারীকে ধনদৌলত ও বাগান দান করে স্বাধীন ঘোষণা করে; শর্ত একটি– বাদশার মন ভারাক্রান্ত থাকলে তাকে হাসি শোনাতে হবে। – কাহিনীর এ ধারাক্রম অবধি পাঠকগণ এমনকি বাদশার সঙ্গী কবি ইসহাক পর্যন্ত জানতে পারে না হারুনের মনোভিপ্রায় কী? কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ অষ্টম পরিচ্ছেদই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যখন হারুন কবি ইসহাকের আপত্তির মুখে জানায়, আলেম আবদুল কুদ্দুস বাদশার অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করার জন্যে তাতারী ও মেহেরের বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করে সই দিয়েছে। নবম পরিচ্ছেদে সড়কের কাফিখানায় লোকমুখে আলোচনা চলে যে খলিফা হারুন সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারেন। এরপর মেহের-প্রসঙ্গ দীর্ঘ অনুপস্থিত থাকলেও উপন্যাসের শেষে প্রমাণ হয় সত্যি খলিফা হিসেবে শ্রদ্ধেয় হারুন বাঁদী মেহেরকে বিয়ে করেছে। এই বিয়ে গভীর গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পন্ন এবং মেহেরকে অজ্ঞাতস্থানে কড়া পাহারায় রাখা হয় বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, তাতারী মোহাফেজকে মেহেরের সংবাদ জানতে পাঠালেও সে খবর নিয়ে আর আসেনি। বেগম জুবায়দা বাঁদী তুতীকে মহলের অন্দরে সন্ধান করার জন্যে পাঠালে সে-ও ব্যর্থ হয় খোঁজ পেতে। আসলে বাদশা হারুন চরম বিচক্ষণ বক্তি। সে ইচ্ছে করলে তাতারীকে হত্যা করে মেহেরজানকে পেতে পারত; অন্তত নিজের ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে যে হত্যা করতে পারে তার দ্বারা এটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা' না করে শাস্ত্রীয় বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সে মেহেরকে লাভ করেছে এবং যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে। কেননা, পূর্ব-বিবাহিত স্ত্রী ও বন্ধু-পারিষদবর্গের দ্বারা একটি অন্তরবিরোধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল তার।

তাতারীর মুখের হাসি পরবর্তী সময় হারুনের প্রধান কাম্য হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক বিবেচনায় দেখা যায়, সুচতুর বাদশা বুঝতে চেয়েছিল তাতারী মেহেরকে ভুলে গেছে কি-না। প্রচুর ধন-দৌলত, বাগান, দাস-দাসীর মালিক করে দিয়ে তাকে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। মুক্ত ঘোষণা করা হলেও আসলে কিন্তু সে নজরবন্দি, শহরের বাইরে যেতে পারে না। বাগানরক্ষক মোহাফেজের কাছে হারুন যখন শুনল তাতারী বিত্তে বিমুখ, ঐশ্বর্যে অনীহ, নর্তকীদের সঙ্গে সঙ্গ দেয় না, কোনো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নেই তার আচরণে তখন সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সে বাগদাদের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বুসায়নাকে প্রেরণ করে তাতারীর কাছে। বিবসনা বুসায়নাও তাকে আনন্দিত

করতে ব্যর্থ হয় এবং নিজে আত্মহত্যা করে। এর পরই খলিফা তার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। প্রচণ্ড ক্রোধ ও হিংসার তার তাৎক্ষণিক নির্দেশ: 'কিন্তু তার আগে মশ্‌রুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চাকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বল। একদম 'হারিয়া' কয়েদখানায়। পোকামাকড় বিচ্ছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিনা-কমজাত।' (পৃ. ৯০) বুসায়না হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে চরম নির্যাতন করা হয় তাতারীকে কিন্তু রাজদণ্ডের ভয়েও তাতারী হারুনের কথায় রাজি না হলে আবার দক্ষ অভিনেতার মতো অভিনয় করে সে, ধর্মের নামে শপথ করে 'আজ তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-রূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি। তুমি দেখছ, বাইরের বাতাসের কত দাম। আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত। আমাকে ভুল বুঝো না।' (পৃ. ১০৬) এতেও ব্যর্থ হয়ে তিন দিনের সময় দেয় তাতারীকে। তিন দিন থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত হয়, তাতারী নিজের মতে অনড়। লক্ষ্য করার বিষয়, সময় তিন দিন থেকে তিন বছরে অতিক্রান্ত হলেও 'হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু' হারুন কিন্তু তাতারীকে এ দীর্ঘ সময় কারাগরেই পুরে রাখে। প্রচুর ধন-দৌলত, বাগান, ক্রীতদাস-দাসী, নর্তকী ইত্যাদি দিয়ে তাতারীকে মোহিত করে মেহেরজানকে ভুলানোই প্রথম দিকে বাদশা হারুনের লক্ষ্য ছিল যদিও সে বারবার 'হাসি' শুনতে চেয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টি বাদশার 'ইগো'তে পরিণত হয়। এই 'ইগো' ও 'তেজে'র লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে– এমন মানসিকতা থেকে জাত। সেনাপতি, কবি-বন্ধু, পারিষদের সামনে এক অমিততেজী বাদশার 'সামান্য ইচ্ছা' একটি ক্রীতদাস কর্তৃক উপেক্ষাজনিত ক্রোধে শেষ পর্যন্ত তাতারীর 'হাসিটুকু'ই খলিফার একামাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড অহংবোধসম্পন্ন হারুন অবশেষে তাতারীর প্রেমিকা ও স্ত্রী, বর্তমানে স্বীয় পত্নীরূপী মেহেরজানকে তাতারীর সামনে হাজির করতে বাধ্য হয়। নিজের 'আমিত্ব' ও 'বাদশাহীত্ব' প্রতিষ্ঠায় লড়াইয়ে জয়ী হবার জন্যে। উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে বাদশা হারুন-অর-রশীদের প্রচণ্ড তেজোদ্দীপ্ত উচ্চারণ নিম্নোক্ত সত্য প্রতিষ্ঠা করে:

"মশ্‌রুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু দেখো, দেখো। ওর তেজের সব পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম– [কথায় ছেদ পড়ে । মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমী লেবাস। যৌবন সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থীর মত লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ছাপাইয়া ওঠে। আপ্ত-রমনীর মত চলাফেরা।] (পৃ. ১১৪) মেহেরজানের উপস্থিতিতেও তাতারী হাসে না বরং বাদশাকে তাচ্ছিল্যের সম্বোধনে উচ্চারণ করে যে ধন-দৌলত দিয়ে বাঁদী, গোলাম কেনা গেলেও তার হাসি কেনা যায় না; অবশ্য এর আগে থেকে হারুনের নির্দেশে কড়া আঘাত চলতে থাকে। মৃত্যু হয় তাতারীর। নিজের ইচ্ছার অবজ্ঞা ও তেজের পরাজয়ের শোধ জীবন নিয়ে এভাবে গ্রহণ করে বাদশা হারুন।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বাদশা হারুনর রশীদ চরিত্র বিশেষ মূল্যবান। নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠায় অনড় এই অমিততেজী ব্যক্তিটি যেমন নির্মম, নিষ্ঠুর তেমনি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সেজে ছলনার অভিনয় করতেও পটু। বিচক্ষণ

রাজনীতিক বাদশা হারুন গভীররাতে মাত্র একজন সঙ্গীসহ বের হওয়া নিরাপদ মনে করে না, তার বিচারে: জয় বা পরাজয়ের গ্লানি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেওয়া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। [....} নীতি এখানে বড় কথা নয়। বল– লোক-বল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব নীতির মাপকাঠি।' (পৃ. ১৮)

গগনচুম্বী দম্ভের অধিকারী বাদশা হারুনও ব্যক্তি মনে নিঃসঙ্গতা বোধ করেছিল। 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'–[১৮] এই একাকিত্ব আধুনিকতার একটি বড় লক্ষণ। আধুনিক সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীর মধ্যে এই যুগযন্ত্রণা নতুন মাত্রা নিয়ে সম্ভূত হলেও যে কোন যুগের মানুষের মনে মাত্রা-ভিন্নতায় এর অবস্থান ছিল নিশ্চিত রূপে। হারুন-অর-রশীদ চরিত্রটির মধ্যেও আমরা এই নিঃসঙ্গতার সন্ধান পাই। উপন্যাসে তাঁর প্রথম বাক্য: 'এসো, এসো মশ্‌রুর। আজ আমি বড় একা। হ্যাঁ একা।' (পৃ. ১৩) প্রচণ্ড আত্মাভিমান, অধিপত্যবাদ ও আমিত্বের পথ ধরেই হারুনের মনে এই নিঃসঙ্গতার অনুপ্রবেশ। সহোদরা আব্বাসা ও মন্ত্রী জাফর বা বারমেকীর প্রণয়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পরিণয়ে রাজি হলেও তাদের বাসরশয্যা হবে না এই ছিল বাদশার নির্দেশ। কিন্তু বিয়ের পর বোন নিজেই বাসরশয্যার আয়োজন করলে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে খলিফার হুকুমে জাফরকেও হত্যা করা হয়। এই হত্যা একান্তই হারুনের ব্যক্তি-ইচ্ছাকে অমর্যাদা করার ফলে সংঘটিত। কিন্তু সহোদরা ও তার পতিকে হত্যার পর বাদশার অবস্থা: 'হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির হাবিয়া নরক আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘুম।' (পৃ. ১৬) কোনো ভাবেই এ থেকে মুক্তি পায় না সে। বিরাট রাজ্য, প্রাসাদের ঐশ্বর্য, পত্নী-উপপত্নী, বন্ধু-পরিষদ, ক্রীতদাস, বাঁদী কোনো কিছুতেই তার মনের নিঃসঙ্গতা দূর হয় না। সেনাপতি মশরুর যখন প্রস্তাব দেয় একশ' আর্মেনিয়া সুন্দরী নর্তকী মনোরঞ্জনের জন্যে তার হুকুমের অপেক্ষায়– হারুন সব ফিরিয়ে দেয়। এই বলে:

'কিন্তু স্মৃতি, মশ্‌রুর? স্মৃতি লাশ জেন্দা করে তোলে।' (পৃ. ১৪) লেডি ম্যাকবেথও এ ধরনের স্মৃতি-তাড়িত হয়েছিল। উচ্চাশা ফলবতী করতে গিয়ে একাধিক গুপ্তহত্যার সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। ডানকান খুন হওয়ার পর লেডি ম্যাকবেথের মনের যে অবস্থা, বোন ও তার স্বামীকে হত্যার পর বাদশা হারুনের মনোবস্থাও তদ্রূপ। এহেন মনে সামান্য শান্তির পবনদোলার প্রত্যাশায় রাতে মশ্‌রুরের সঙ্গে প্রাসাদের বাগানে পায়চারী করার সময় সে তাতারী মেহেরজানের মিলনহাসি শুনে প্রলুব্ধ হয়। এই পর্যন্ত বাদশা হারুন চরিত্রের মনোজাগতিক আবেগ-অনুভূতির স্বাভাবিক দ্বন্দ্বজাত যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে চরিত্রটির মধ্যে আরও বড় সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল বলে মনে হয়। 'নির্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাঁজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।' (পৃ. ১৭)– এই অনুভূতি যার অন্তরে, পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে সে কিভাবে একটি 'লক্ষ্য'কে কেন্দ্র করে উত্থিত হয়, মেহেরজানের দেহ ও তাতারীর 'হাসি' শুধুমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে তার– মনে প্রশ্ন জাগে। অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য

প্রতীকাশ্রয়ে সমকালের চিত্র উত্থাপন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক থেকে বাদশা হারুন নিশ্চয়ই সফল প্রতীক চরিত্র হিসেবে আর্বিভূত হতে পেরেছে।

তাতারী হাবসী ক্রীতদাস কিন্তু স্বশিক্ষিত হৃদয়সম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। প্রেমিকা মেহেরজানের সঙ্গে নিভৃত কুঞ্জে নির্দোষ কৌতুকাবহ কথোপকথনে যেমন তার সরলতা প্রকাশ পায়, তেমনি বাদশা হারুন কৃর্তক প্রদত্ত ধন-দৌলত-বাগান সে যে মনে গ্রহণ করে তাতে কোনো সন্দেহপ্রবণতা বা ভাবীকূটকল্পনা কাজ করে না তার মনে। বাদশার ঘোষণায় নিজেকে সত্যি মুক্ত বলে ভাবে তাতারী। কিন্তু যখন বুঝতে পারে মেহেরজানকে বাদশা ছলনা করে 'লুণ্ঠন' করেছে, তাকে কার্যত করা হয়েছে নজরবন্দি তখন তার মধ্যে আত্মসত্তার উন্মেষ ঘটতে থাকে। এই উন্মেষ ঘটে খুবই দ্রুত গতিতে এবং একান্তই তাতারীর মনোজগতে। অন্য কোনো ক্রীতদাস বা বাগানরক্ষককে সে বাদশার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে না। দুই পক্ষের সম্মুখসমরে জয়-পরাজয় নির্ধারণ এই সরল-সমীকরণে ঔপন্যাসিক আস্থা রাখেন নি বলেই একটি বিশেষ চেতনার প্রতীক হওয়ার পরও তাতারীকে শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করাতে নানা সংঘাত-দ্বন্দ্বে এনেছেন চেতনার ধারাবাহিক উত্তরণ।

ধন-দৌলত-বাগানের মালিক হবার পরও বাগানরক্ষক মোহাফেজকে সব মানুষ সমান বলে তাতারী মর্যাদা দিয়েছে। তার কাছে অর্জন করে ভোগ করাই বড় কথা, কারো দান বা অযোগ্যতায় পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। এসব কথায় চরিত্রটির স্বশিক্ষার প্রতিফলন পাওয়া যায়, তাই বাগানরক্ষকেরও মনে হয়েছে, 'আপনি উজির মরহুম জাফর বারমেকীর মতো আক্কেলমন্দ্ কথা বলেন।' (পৃ. ৫৯) প্রেমিকা ও প্রেম তার কাছে কত পবিত্র এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সুন্দরী নর্তকী বুসায়নাকে সে ফিরিয়ে দেয় প্রেম ও মাতৃত্বের শাশ্বতবাণী উচ্চারণ করে (দ্রষ্টব্য: পৃ. ৭৫-৭৬)। বুসায়নার আত্মহত্যায় তাতারী যেভাবে কাতর হয় তাতে চরিত্রটির মধ্যে মনুষ্যত্বের চরম স্ফুরণ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। বাদশা হারুন ও তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাতারীর ব্যক্তিমনে এতই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল যে কোনোভাবেই তার চেতনা পরাভব স্বীকার করেনি। তাতারীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও স্ফুরণ এক নীরব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বাদশা তাতারীর 'হাসি' শুনতে চায়। তাতারী বাদশা কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার পর আর কখনও হাসেনি। তবে এয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সে বিষন্নভাবে কথা বলেছে, তারপর থেকে কথা বলাও বন্ধ করেছে সে। এই ক্রমবাড়ন্ত প্রতিবাদের মুখে হারুনের অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত আত্মজাগরণে বলীয়ান তাতারী শেষ পর্যন্ত বাগদাদের খলিফা হারুনকে প্রথাসিদ্ধভাবে সম্বোধন না করে অবজ্ঞাভরে নাম ধরে বলে ওঠে–

"শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব–! কিন্তু– ক্রীতদাসের হাসি– না-না-না-না- " (পৃ. ১২১) দীর্ঘক্ষণ নির্বাক থাকার পর তাতারীর, এ ধরনের একটিমাত্র অন্তিম সংলাপ উচ্চারণ তার সারা জীবনের ক্ষোভ প্রকাশক ও লালিত চেতনার স্পর্ধিত ঘোষক– যা, 'ন হন্যতে' হন্য

মানে শরীরে'। লালিত চেতনা ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দানে পূর্বাপর একনিষ্ঠ তাতারী একটি প্রতীক চরিত্র হয়েও স্বমহিমায় ভাস্বর। কবি ইসহাক, নওয়াস, আতাহিয়া এমন একটি জীবনসত্যের প্রতীক হিসেবে আর্বিভূত যা' চিরন্তনতার বাণীসব। নওয়াস-আতাহিয়ার আর্বিভাবের পর কবি ইসহাক উপন্যাসে নেই। কবি ইসহাক ও নওয়াস একই চেতনার পূর্বের ও পরের নাম। ফলে চরিত্র দুটোকে একই সঙ্গে আলোচনা করা চলে। উভয়েই বাদশার বন্ধু। রাতে মেহেরজানকে দেখার পর ইসহাক এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, দেহ ও ছন্দের উপমান-উপমিতের বিভ্রম দেখা দেয় তার মনে। 'ঝুটো চিজ' খাওয়া সম্পর্কে বাদশাকে সে যে পরামর্শ দিয়েছে তা' কোনো কৃপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নয়। 'জীবন যৌবন বহতা নদীর মত। কত তৃষ্ণার্ত আকণ্ঠ পান করে যাবে, তবু ঝুটা হবে না।' (পৃ. ৪০)– অফুরন্ত জীবন-যৌবনের জয়গান এর নেপথ্যে। অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে সম্ভোগ করার পক্ষপাতী সে নয়। তাই হারুনকে সে বলেছে: 'তা ত উচিত নয়। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।' (পৃ. ৬৪) কেউ কেউ তাকে পাকিস্তানী শাসকতন্ত্রের অনুগত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি[১৯] হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে বাদশার সঙ্গে ইসহাকের কথোপকথনছলে যে বচসা হয় তাতে উপরোক্ত বক্তব্যের বিপরীত সত্য প্রকাশ পায়। হাসির উৎস সম্পর্কে ইসহাক: 'হেকিমী দাওয়াই তৈরী করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। [....] [....] ধরুন, সব আছে– নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরী হবে না' (পৃ. ৫৪) অথবা আলেক মেহেরজান ও তাতারীর বিয়েকে অসিদ্ধ ঘোষণা করেছে একথা বাদশার মুখে শুনে তার স্পর্ধিত উচ্চারণ: 'আবদুল কুদ্দুস আল্লার কালাম বিক্রী করেছেন।' (পৃ. ৫৫) এরপর কবি নওয়াসও একই কথা বলেছে হারুনকে: 'হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, [.....] [.....] উপাদান লাগে।' (পৃ. ৭১) কবি নওয়াস নিজে ভোগানুরাগী কবি কিন্তু জীবন সম্পর্কে তার বক্তব্য অন্যদের থেকে পৃথক। নারী ও সুরাসক্ত নওয়াসের স্বগত উচ্চারণ: 'জীবনের দিকে দিকে হে অমৃতের পুত্র, অগ্রসর হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে পাড়ি দাও– কিন্তু তোমার দুই পা সব সময় যেন মাটির উপর থাকে। এইভাবে আকাশও তোমার কাছে ধরা দিয়ে যাবে।' (পৃ. ৯২) ভোগানুরক্ততা তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলেও জীবন সম্পর্কে তার এই মৃত্তিকামুখী ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মরুভূমি যত বড়োই হোক না কেন তার ঊষরতা কাম্য নয়, বরং বহতা নদী দজ্‌লাই তার জীবনের প্রতীক: 'নওয়াস ভাবলে, 'দজ্‌লা ত নদী নয়– আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অন্ধকার আছে বলে কি এই নদীর স্রোতদল শহরের আলোস্নাত এক জায়গায় থ্‌মকে দাঁড়ায়? অন্ধকারের রহস্য কি তাদের টানে না? ..... আমি নিজেই এক দজ্‌লা।' (পৃ. ৯৪) জীবন সম্পর্কে ইতিবাদী অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদী এই কবিপ্রাণ নওয়াসকে নিয়ে সরাইখানাগুলোতেও আলোচনা হয়ে যে, ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের কাছে সে আপোসহীন মানুষের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা পাবে। কেননা তার কাছে বাগদাদবাসীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখই প্রধান, অন্য কিছু নয়। দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের মূর্ত প্রতীক কবি

নওয়াসের বক্তব্য: 'মৃত্যুর পর ফেরেশ্‌তা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বাগ্‌দাদে না বেহেশ্‌তে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বাগ্‌দাদে।' (পৃ. ১০৫)

বাদশা হারুনের স্বেচ্ছাচারী প্রতিটি কর্মের প্রতিবাদ করেছে কবি নওয়াস। তাতারীকে অমানবিক নির্যাতনের বিরোধী সে, ইসহাকের মতো তারও একই বক্তব্য হাসির উৎস সম্পর্কে। উপন্যাসের সর্বশেষ সংলাপ তারই কণ্ঠ-নিঃসৃত: 'আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।' (পৃ. ১২১)– যা' ক্রীতদাসের হাসি'র মূল বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিল্পীরা (এখানে কবি) সত্যর পূজারী, সত্যভাষী এমনকি সত্যের প্রতীক। যা' সত্য তা' যদি কোনো গোষ্ঠীস্বার্থকে আঘাতও করে তবুও তাঁরা সত্যপ্রকাশে কুণ্ঠিত হন না। আইয়ূবী সামরিক শাসনামলের যে ত্রাসসৃষ্টিকারী সময়ে উপন্যাসটি রচিত তাতে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কবি নওয়াসের প্রতিবিম্বে লেখক শওকত ওসমানই যেন উচ্চারণ করলেন সেই স্পর্ধিত বক্তব্য। উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজানের চরিত্রই উল্লেখযোগ্য, যদিও উভয় চরিত্রই খুব 'স্কেচি'। বাদশার 'সহধর্মিনী' হিসেবে পরিচয় দেয়া হলেও বিরাট রাজপ্রাসাদে প্রায়শই নিঃসঙ্গ একাকী থাকতে হয় জুবায়দাকে। বাগদাদের অধিশ্বরী হলেও মনের অকথ্য যন্ত্রণায় সে প্রতিনিয়ত একাধিক পত্নী, উপত্নী ও বাঁদীর কক্ষ থেকে কখন বাদশা আসবে তার খাসমহলে এই প্রতীক্ষাতে দিনাতিপাতকারী বেগমের ঈর্ষামিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস বর্ষিত হয় এভাবে : '[মেহেরজানকে] যা। এই সুম্‌শাম রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে সুখ– '। (পৃ. ৯ বাঁদী মেহেরকে সে বিয়ে দিয়েছে সুন্দর সুঠাম দেহ নওয়াজ এক হাবসী ক্রীতদাসের সঙ্গে। শুধু বিয়ে দিয়েই নয়, প্রতিরাতে মিলনের ব্যবস্থা, মিলন পূর্বে মেহেরকে সুর্মা দিয়ে সাজিয়ে পাঠানো ইত্যাদির মধ্যে নিজের বঞ্চিত সুখলাভ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বেগম। বিলম্বে যে 'একজনের বুক খা খা করছে' একথা নিজেকে দিয়েই বুঝে জুবায়দা, তাই মেহেরকে পাঠিয়ে দেয় জলদি। সম্রাজ্ঞী কিন্তু রমণী-সুখ বঞ্চিত এক নারী জুবায়দা তার বাঁদী মেহেরজানের আনন্দে নিজেকে উজ্জীবিত রাখতে চায়। বহু মানুষের বিরাট মহলের অধিশ্বরী নিজেকে সেখানে একা আবিষ্কার করে বলেই মেহের নিরুদ্দেশ হলে বাঁদী তুতীকে দিয়ে খবর দেয়ার চেষ্টা করে। এতে ঔপন্যাসিক আবু রুশ্‌দ্‌ 'লিবিডো' ভাবের ব্যর্থ অনুসন্ধান করেছেন।[২০] উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যে, মেহের বেগমের পাঁজরের হারের মতোই অবিচ্ছেদ্য ছিল। মেহেরের দৈহিক অনুপস্থিতি বেগমকে নিঃসঙ্গ করে দিলেও তাতারী ও মেহের দুটো শুকতারা হয়ে চির জাগরূক তার প্রাণের অসীমতায়। বিত্ত-বৈভব-মর্যাদার খোলসে নিজের রমণীত্বের কামনা-বাসনাকে কিভাবে অবদমিত রাখতে হয়েছে বেগম জুবায়দা তারই প্রতিচ্ছবি।

মেহেরজান তাতারীর প্রেম একসময় উচ্ছ্বল ছিল কিন্তু বাদশা হারুন কর্তৃক 'লুণ্ঠিত' হয়ে বেগম হবার পর দীর্ঘ বিচ্ছেদজনিত কারণে সে তাতারীর প্রেমকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিস্মৃত হয় এবং তাই তার বেশ নির্লিপ্ত উক্তি: 'স্বপ্নভাঙার পর

স্বপ্নে-দেখা ধন-দৌলত হারানোর শোকে কেউ কোনোদিন কাঁদে নাকি– এক নির্বোধ ছাড়া।' (পৃ. ১১৯) তাতারীর প্রেমে অবিচলতা সম্পর্কিত পূর্বোক্তি স্মরণ করে পরে মেহের নিজেও আবেগে বিচলিত হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের শুরুতে মেহেরজানকে দেখা গেলেও তাকে আবার দেখা যায় সর্বশেষ পরিচ্ছেদের অন্তিম মুহূর্তে, অল্প কয়েকটি সংলাপ উচ্চারণকালে। এতে প্রেম রক্ষায় নিজের অসহায়ত্ব যেমন প্রকাশিত, তেমনি তাতারীর প্রতি 'কোড়াঘাতের এত ব্যথা বয়েছ, এস মুছিয়ে দিই, মুছিয়ে নিই–' (পৃ. ১২০) বক্তব্যে মধ্যে প্রণয়ীকে আপন করে নেবার যে প্রেমজ স্বাভাবিক আকুলতা প্রকাশিত তা' মেহেরজানের নারীসত্তাকে মহান করে তুলেছে। প্রেমের জন্যে তাতারী যে ত্যাগ স্বীকার করেছে মেহেরজান তা' করেনি– বলতে হয়, তার পক্ষে সে রকম ত্যাগ স্বীকার অসম্ভব ছিল। আসলে বাদশাহী বিত্ত ও জৌলুসে আরমানী মেহেরজান যে তার পূর্ব প্রণয়ী ও স্বামী এক ক্রীতদাসকে ভুলে যায়নি বরং নিজের পরিণামের কথা না ভেবে তাতারীর করুণ অবস্থায় স্পর্শ করে কাছে যেতে চেয়েছে– এখানেই শাশ্বত নারী হৃদয়ের বিদ্রোহ এবং জয় ঘোষিত হয়েছে।

শুধু বক্তব্য-নির্ভর প্রতীকধর্মিতায় শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র মূল্যায়ন নয়, ভাষা, অলঙ্কার ব্যবহার, উপস্থাপন কৌশল ও চরিত্র-সৃজন প্রণালীতে ঔপন্যাসিক যে বিস্ময়কর সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাতে শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস হিসেবে 'ক্রীতদাসের হাসি' আদৃত হবার যোগ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ শওকত ওসমান যে সাহিত্যিক দায়মুক্তও নন আলোচ্য উপন্যাসটি তার বড় স্বাক্ষর। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী থেকে উপন্যাসটির প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ এ কারণেই পাঠক-নন্দিত হয়েছে।[২১]

তথ্যনির্দেশ ও টীকা:

১. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: সালাম সালেহ উদ্দীন, সাপ্তাহিক 'খবরের কাগজ' ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৩, ঢাকা।

২. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বাংলা সাহিত্যের নানাদিক, ১৩৯১, কলকাতা; পৃ. ১৩৯।

৩. জাহাঙ্গীর তারেক, প্রতীকবাদী সাহিত্য, ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ১-২ ।

৪. ইসমাইল মোহম্মদ লিখিত সমালোচনা, সমকাল, আশ্বিন ১৩৬৯, ঢাকা।

৫. মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ক্রীতদাসের হাসি, প্রসঙ্গ বিচিত্রা, ১৯৬৬, ঢাকা, পৃ. ৭৪।

৬. আমিনুল ইসলাম, সময় ও সাহিত্য, নলেজ হোম, ১৩৭৪, ঢাকা; পৃ. ৫৬-৫৭।

৭. ইসমাইল মোহম্মদ; প্রাগুক্ত।

৮. রবীন্দ্র গুপ্ত, উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা, ঐকতান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, ১৯৯০-৯১,
কলকাতা; পৃ. ৭।

৯. আবু রুশদ, শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস, ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ২৬।

১০. ভারতকোষ, ১৯৫৯, কলকাতা; পৃ. ৬৩১।
১১. আবদুল হাফিজ, গ্রন্থ-প্রসঙ্গে, পূর্বমেঘ, চৈত্র ১৩৬২, রাজশাহী।
১২. শওকত ওসমান, ক্রীতদাসের হাসি, ১৯৯৩, ঢাকা; পৃ. ৪। এরপর এই গন্থ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পাশে
শুধু পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।
১৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ১১, ৩০-৩৩, ৬৫, ৭৫।
১৪. আবু রুশদ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪।
১৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯ ও ৩২।
১৬. মুহম্মদ ইদরিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনা: বিভাগোত্তর কাল, ১৯৮৮, ঢাকা; পৃ. ১১৬।
১৭. আবু রুশদ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬।
১৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্যসংগ্রহ, ১৯৮৪, কলকাতা; পৃ. ৩৩৪।
১৯. পল্লব সেনগুপ্ত, বাংলাদেশের উপন্যাস–, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা, কলকাতা।
২০. আবু রুশদ; পৃ. ৩১।
২১. Shawkat Osman, A Slave Laughs, Trd. by Kabir Choudhury, 1976, Hind Pocket Books (P) Ltd. G. T.Rd. Delhi-110032.

সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস

মো স্ত ফা তা রি কু ল আ হ সা ন

সৈয়দ শামসুল হক নিরীক্ষাপ্রিয় লেখক। সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি নিরীক্ষা করেছেন। সে- নিরীক্ষা তাঁর রচনাকে নতুনত্ব দিয়েছে, নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে রচনাসমূহ। এ প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য যে, নিরীক্ষা হওয়া উচিত শিল্পের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা থেকে; লেখক এমন কোনো স্বাধীনতা নেবেন না যা শিল্পের মৌল প্রবণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা শুরু করেন সচেতন প্রয়াস হিসেবে। প্রকরণ-কৌশলে নিরীক্ষা ছাড়া তিনি বিষয়বস্তুর নতুনত্ব খুঁজেছেন বরাবর। এ ব্যাপারে তিনি বিশ্বসাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আবার আমাদের প্রাচীন-

মধ্যযুগের সাহিত্য, জীবনধারা, সংস্কৃতি-সংস্কার-মিথ এবং আবহমান বাংলা জনপদের ঐতিহ্যধারা দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন। আবার কখনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছেন। প্রকরণগত নিরীক্ষা হিসেবে বর্ণনাভঙ্গির নানা কৌশল গ্রহণ থেকে শুরু করে, প্রক্ষেপণবিন্দু, কাব্যশক্তি ব্যবহার করেছেন। কবিতার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি, কোরাসের সম্মিলিত জীবনপ্রত্যয়, মৈমনসিংহ গীতিকার বর্ণনাকৌশল গ্রহণ করেছেন উপন্যাসে। অর্থাৎ তিনি বাংলা ভাষায় ব্যবহারযোগ্য সম্ভাবনাময় নানা উপকরণ ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। গদ্যভাষাকে আরো শানিত করেছেন, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্যধারা থেকে প্রকরণকৌশল নিলেও তাঁর আখ্যান গড়ে উঠেছে আধুনিক জীবনচেতনা ও মননসমৃদ্ধ হয়ে। এই লেখকের নিরীক্ষাধর্মী কয়েকটি উপন্যাস হল 'রক্তগোলাপ' (১৯৯২), 'আয়না বিবির পালা' (১৯৮৪), 'বুকঝিম এক ভালোবাসা' (১৯৯৬), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪), 'অন্তর্গত' 'আলোর জন্য' (১৯৯৫), 'মেঘ ও মেশিন' (১৯৯১), 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৯৮)।

রক্তগোলাপ উপন্যাস রচিত হয়েছে স্বাভাবিক গঠন-কৌশল অনুসারে, এখানে তিনি ব্যবহার করেছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উপাদান। এই উপন্যাসের নাজিম পাশার ম্যাজিক দলের ফিরদৌসি দর্শকদের হাতে গোলাপ তুলে দেয় সে গোলাপ থেকে গন্ধ বের হয়। সবাই হাতে গোলাপ নিয়ে বাড়িতে ফেরে। নাজিম পাশার কন্যা চম্পাকে ভালোবাসে ফিরদৌসি। নাজিম পাশার দলে হঠাৎ আবির্ভূত ফিরদৌসি গোলাপের খেলা দেখিয়ে দলকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যায়। তবে দলের অন্যতম সদস্য চম্পার প্রতি ফিরদৌসির ভালোবাসা সহ্য করতে পারে না। একদিন চম্পা ও ফিরদৌসিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ফেলে সে, এবং নাজিম পাশাকে দেখায়। তিরস্কার আর অপমানের জ্বালায় দল থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েও যেতে পারে না ফেরদৌসি। শো শুরু হলে গোলাপের খেলা না হলে সবাই স্টেজে জুতা-ইট মারতে শুরু করে। তখন ফিরদৌসি হাজির হয়ে আবার খেলা দেখায়। তখন তার সেদিনের সাতশ ছিয়াশিটা গোলাপ খরচ হয়ে গেছে। আবার মনঃসংযোগ করে অতি কষ্টে দর্শকদের সে গোলাপ উপহার দেয়। সারা হলে পশলার পর পশলা গোলাপ বৃষ্টি হয়। সবাই যখন দর্শকদের করতালি আর উচ্ছ্বাস দেখে মাতোয়ারা, তখন ফিরদৌসি জীবনের শেষ খেলা দেখিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে:

> পর্দার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে ফিরদৌসি আস্তে আস্তে বসে পড়ল তার পায়ের ওপর। যেন সিজদা দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ দ্রুততা এল তার ভঙ্গিতে, যেন এক মুহূর্ত সময় আর নেই। গোড়ালির ওপর বসবার আগেই মাথা নত হয়ে এল তার। সেখানে নিজের রক্তের স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রক্তগোলাপের যাদুকর ফিরদৌসির প্রাণহীন দেহ।[১]

রক্তগোলাপের নায়ক ফিরদৌসি যাদু বা মেসমেরিজম করে অজস্র লাল গোলাপ দর্শকদের জন্য তৈরি করেনি। সে তা করেছে নিজের প্রাণশক্তি, ইচ্ছেশক্তির জোরে, নিজের রক্তের রঙে। আপাতভাবে, এই কাহিনী অবিশ্বাস্য হলেও সৃষ্টিশীল মানুষের

পক্ষে সৃজন এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার উদাহরণ হিসেবে তা বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাস উপন্যাসের বা গল্পের গঠনকৌশলের নিরিখে বাস্তবতা পায়। সাহিত্য যাকে মায়া বা যাদুবাস্তবতা বলা হয়। ল্যাতিন আমেরিকার উপন্যাসে এই জাতীয় যাদুর প্রয়োগ রয়েছে অহরহ। সাধারণ মানুষের সীমাহীন কষ্টকেই সেখানে যাদুবাস্তবতার রূপকে উপস্থাপন করেন লেখক। সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্যে যাদুবাস্তবতার নজির রয়েছে। আমাদের রূপকথায়ও এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকা বা রূপকথায় দেখা যায় স্বামীর জন্য স্ত্রী এক যুগ অপেক্ষা করে আছে। রূপবান পালায় রূপবান বারো দিনের শিশুকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। সৈয়দ শামসুল হক এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন:

> আজকাল লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে যাদু-বাস্তবতা বলে একটি ধারা সনাক্ত করা হয়। পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন রক্তগোলাপ লেখাটি দেখি, তখন আবিষ্কার করে বিস্মিত হই, ঘটনাবিন্যাস ও কল্পনার যাদু আমি সেই ১৯৬৩ সালেই ব্যবহার করেছিলাম, তবে, এই যাদু নির্মাণের সূত্রটি কিন্তু পেয়েছিলাম আমাদেরই রূপকথা ও ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে।[২]

সুতরাং, এই উপন্যাসের নিরীক্ষা তাঁর সচেতন প্রয়াস। সর্বোপরি, উপন্যাসের আখ্যানভাগের প্রয়োজনেই তা ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তা কখনোই আরোপিত মনে হয় না। 'আয়না বিবির পালা' রচিত হয়েছে প্রাচীন গাথা অবলম্বনে। ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন পালাকারদের রচনাপদ্ধতিতে। লেখক মূল পালার নাম গ্রহণ করলেও আখ্যানভাগের পরিবর্তন করেছেন। মূলত বাঙালি পাঠকের মনে প্রাচীন ধারার লোকজ সাহিত্যের রসসিঞ্চনের মাধ্যমে আধুনিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। এতে উপন্যাসের গঠন-প্রণালীর নিরীক্ষা যেমন হয়েছে তেমনি বাংলাদেশের ধারাবাহিক জীবনাচরণকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। মূল উৎস থেকে আখ্যান গ্রহণ বা অনুপ্রেরণা লাভ করলেও লেখকের রচনা স্বাধীন ও মৌলিক। তিনি সবিনয় নিবেদনে বলেছেন:

> পাঠক লক্ষ করবেন যে, আমি ঐ প্রাচীন গাথার শিরোনাম এবং প্রধান দুটি চরিত্রের নাম- মামুদ উজ্জ্যাল ও আয়না বিবি ও ভৌগোলিক নাম ভেরামন নদী, শিবার বাঁক, নারায়ণখলা, চাঁদের ভিটা আমার এই রচনায় ব্যবহার করেছি, এদিকে, ভিন্ন একটি প্রাচীন গাথা থেকে একটি চরিত্রের নাম ধরে নতুন একটি চরিত্র স্বয়ং সৃষ্টি করেছি– মউফল। একইভাবে জামাল চরিত্রটিও আমার উদ্ভাবিত এবং এ চরিত্রের নাম পালাপুঁথি জগতে অতি পরিচিত; যে মানুষ দুজন নিশীথের অন্ধকারে মামুদ উজ্জ্যালের জননীর কাছে দুবার আসে, তারাও আমারই উদ্ভাবিত বটে, যেমন- অন্যান্য ঘটনা ও পরিণতি। প্রাচীন 'আয়না বিবির পালা'র মূল কাঠামো থেকে আমি মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক বাঁক গ্রহণ

করেছি– যেমন, মামুদ উজ্জ্যালের বাল্য কৈশোর ও প্রথম জীবন, আয়না বিবির সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ ও অন্বেষণ, বিদেশ থেকে ফিরে এসে লোকের কথায় আয়নাকে পরিত্যাগ করা। জামালের আয়না অপহরণ, মউফলের কাছে আয়নাকে বিক্রি করে দেয়া, অন্তিমে আয়নার ঘরে মামুদ উজ্জ্যালের গমন ইত্যাদি আমার উদ্ভাবিত উপকরণ।[৩]

আয়না বিবির পালার প্রেম-বিরহের কাহিনীতে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সমন্বয়ে ঔপন্যাসিক মৌলিক উপন্যাস রচনা করেছেন। অগ্রজ লেখকের রচনাকৌশল ও আখ্যানের আংশিক সহায়তায় রচিত এই উপন্যাস, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যধারার ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনের বাস্তবতা সময়ের প্রেক্ষিতে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না, মানবিক মৌলিক প্রবণতা ও স্বতঃসিদ্ধ সেই সত্যকে গ্রহণ করে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছেন আধুনিক জীবনবোধসঞ্জাত এই উপন্যাস। লেখকের অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম আর বাংলা ভাষার প্রকরণশৈলীর নিরীক্ষা এবং আমাদের আবহমান জীবনাচরণকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার এই অভিপ্রায় বাংলা কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সাহিত্যের কোনো প্রকরণ কখনো হারিয়ে যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পালাকারদের সাঙ্গীতিক ও নাটকীয় আবহ সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সেই শাশ্বত জীবনধারা ও রচনা প্রকরণকে আধুনিক মননের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন লেখক। তাঁর বক্তব্য হল: 'বস্তুত পক্ষে আমার এই রচনা সম্পূর্ণ নতুন, স্বাধীন ও নিজস্ব। এ যেন একটি বস্তুর দীপ্তিকে সেই বস্তু থেকে আলাদা করে নিয়েছি এবং দীপ্তিটিকেই অবলম্বন করে তার যোগ্য নতুন একটি বস্তু নির্মাণ করতে চেয়েছি।'[৪] নিঃসন্দেহে লেখকের এই নিরীক্ষা আমাদের প্রচল গতানুগতিক ধারার উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। উপন্যাসে লোকজ জীবনধারার সাথে সঙ্গীত ও নাটকের শক্তি-সুষমা ব্যবহার করে বাংলা উপন্যাসকে কাঠামোগত নতুনত্ব দিয়েছেন লেখক।

'আয়না বিবির পালা'র পর সৈয়দ শামসুল হক আরো এক ধাপ এগিয়ে রচনা করেছেন 'বুকঝিম এক ভালোবাসা' (১৯৯৬)। এ উপন্যাসে তিনি উৎস হিসেবে প্রাচীন গাথাকে আশ্রয় করেছেন এবং নিজে কল্পনা করে নিয়েছেন পালাকার মুনসুর বয়াতির জীবনী। তার সাথে আরেক পালাকার চন্দ্রাবতীকে নিয়ে রচিত হয়েছে 'বুকঝিম এক ভালোবাসা' নামক প্রেমের আখ্যান। এই উপন্যাসে বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা নেই, এটা মৈমনসিংহ গীতিকার রচনা পদ্ধতিতে লিখিত উপন্যাস। ঔপন্যাসিক প্রাচীন পালাকারের মতো গানের সংলাপ, বর্ণনা, কৌশল, এমনকি উপস্থাপনরীতিও গ্রহণ করেছেন। অগ্রজ লেখকের অনুসরণে পালাকারদের ব্যক্তিগত প্রেম-কাহিনী নিয়ে রচিত এই উপন্যাস মূলত আধুনিক বাঙালি পাঠকের মনে আমাদের লোকজ প্রাচীন ধারার সাহিত্যের রস সঞ্চারিত করেছেন। মনে হতে পারে, এই অনুকরণে নতুনত্ব কোথায় এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী? শিল্প সাহিত্যের কোনো কর্ম

কখনো পুরনো হয় না। একটা জাতীয় সাহিত্যে তার ঐতিহ্যধারার ক্রম-আবর্তন হতে থাকে। এ থেকে ঐ জনপদের জীবনাচরণ-সংস্কৃতির নবারোপ হয় এবং শিল্প সাহিত্য মাধ্যমের গতানুগতিকতার অবসান ঘটে। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অথচ প্রায়বিলুপ্ত এই পালাগানকে সৈয়দ শামসুল হক আধুনিক পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে তাঁর সতত অনুসন্ধিৎসু মননের পরিচয় দিয়েছেন। আর এই উপন্যাস দৃশ্যত পালাগান নয়। তিনি পালাগানের নাটকীয়তা, সঙ্গীতময়তা ও বর্ণনাকৌশল গ্রহণ করে আধুনিক উপন্যাসের অবকাঠামোতে তার নিরীক্ষা করেছেন। পালাগানের এই কৌশলগত উপাদান আধুনিক উপন্যাসে ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর সাথে কাব্যময়তা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ, গান ও প্রতিবেদন বর্ণনায় ঔপন্যাসিক সার্থকতা পেয়েছেন। এই উপন্যাস থেকে একটা গানের উদাহরণ:

'বুদ্ধি নাই লো রাজকন্যা, তুমি বুইঝ্যা কথা কও।
দুঃখে ভরা ডাল কন্যা, কেনে মাথায় তুইলা লও।
চিরদুখে আছো কন্যা, দুঃখ নাই সে জানো,
সরল পন্থ ছাইড়া কেন যাও সে কাঁটার বনও।
অমৃত ছাড়িয়া কেনে বিষে কইবা ভালা?
তুমি তো জানো না কত গরল বিষের জ্বালা।
হিয়ারে না কাটো কন্যা আপন হাতের নোখে,
তোমারে না মন্দ করে রাজপুরীর লোকে।'[৫]

'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'র বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ। এই উপন্যাসের নায়ক তাহের ঢাকা থেকে জলেশ্বরী যায় স্কুলে চাকরি নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের পর তার শৈশবের চেনা শহরে স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়ার নতুন স্বপ্ন নিয়ে যায়। সে দেখে যুদ্ধের পরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তির মধ্যে অবিরাম বিরোধ সংঘর্ষ। নিরীহ, ভীতু তাহের এই বিপর্যস্ত সামাজিক পরিবেশের দর্শক। জলেশ্বরী পৌঁছার পর থেকে তার স্কুলে দুদিন অবস্থান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা ও প্রতিক্রিয়ার যে বিরতিহীন, শীতল ও নিখুঁত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তা আমাদের মহান স্বাধীনতার বিপর্যস্ত চিত্রকে সমূলে তুলে আনে। ভাষার শক্তি, বর্ণনা-কৌশল, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, টানটান সাবলীল উপস্থাপনের প্রাখর্যে ঔপন্যাসিক আমাদের এক স্থির গভীর মননঋদ্ধ জগতে নিয়ে যান। উপন্যাসের কোথাও বিরতি নেই, সংলাপ নেই, এমনকি আখ্যানভাগের কোনো অংশ আলাদা করারও উপায় নেই, শুরু থেকে অখণ্ড মনোযোগে পাঠক পৌঁছে যাবেন উপন্যাসের শেষ বাক্যে। বিষয়ের দাবি ও গভীরতার জন্য, চেতনার মর্মমূলে মুক্তিযুদ্ধের বোধ চারিয়ে দেবার জন্য লেখকের এই প্রকরণ-কৌশল অভিনব এবং সার্থক। ভাষার শক্তি সুষমা গভীরতা ও বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ উপস্থাপন থেকে উপন্যাসটি স্বতন্ত্র রচনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই নিরীক্ষা বাংলা ভাষা ও বাংলা উপন্যাসের জন্য নতুন সংযোজন সন্দেহ নেই। বর্ণনার নিখুত ও অনুপুঙ্খ পারম্পর্যের দিকে লক্ষ করলে কারো সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) বা 'কাঁদো নদী কাঁদো'র (১৯৬৮)

উপস্থাপন রীতির কথা মনে পড়তে পারে। তবে, সৈয়দ শামসুল হক বিষয় নির্বাচন ও সার্বিক গঠনকৌশল সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি বিরতিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ঘটনার উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব রীতিতে। এখানে কোনো উপঘটনা নেই। তাছাড়া, সৈয়দ শামসুল হকের ভাষা ব্যবহার, শব্দ নির্বাচন ও বাক্যগঠন রীতি স্বতন্ত্র। সর্বোপরি, এই উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ঔপন্যাসিকের উপস্থাপন রীতির একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> আবার অন্ধকারে ঘরের চৌহদ্দি মুহূর্তে উধাও হয়ে বাইরের বৃহত্তর অন্ধকারের সঙ্গে সাবলীলভাবে এক হয়ে যায়। পথে কিংবা ঘরে, মানুষের অবস্থানের আর কোনো তারতম্য থাকে না। এই অনির্দিষ্টতার ভেতরে কয়েকটি মুহূর্ত পার হয়ে যায়। এক ফোঁটা আলোর জন্য তাহের যখন অস্থিরতা কেবল বোধ করতে থাকে তখন ফস করে আবার টর্চের আলো জ্বলে উঠে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন হঠাৎ আজমীর শরীফ দর্শনপিপাসু ঘুমন্ত লোকটির ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে নেয় এবং বলবান এক ধাক্কায় তাকে উপুড় থেকে চিৎ করে দিয়ে তার মুখের ওপর টর্চের আলো তুলে ধরে। কামানো মাথা কিন্তু সুপ্রচুর দাড়ি-গোঁফ মণ্ডিত শীর্ণ একটি মুখ, চোখ তখনো মুদিত, প্রকাশিত হয়, আর একই সঙ্গে অনুচর দুজন ঘরের দুই প্রবেশ পথে গিয়ে নিঃশব্দে পাহারা বসায়। নাট্যশালার দর্শকের চোখে যা আকস্মিক, অভিনেতার কাছে তা ঘটনার অনন্য স্বচ্ছল বিবর্তন মাত্র। বস্তুত জীবন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সংঘটিত কোনো নাটক দেখছে বলে তাহেরের এখন ধারণা হয়।[৬]

লক্ষণীয় যে, বিষয়ের দাবিতেই ঔপন্যাসিক উপস্থাপন-রীতির এই নিরীক্ষা-করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার তাৎপর্য ও গভীরতাকে সন্ধিগ্ধ চোখে দেখার অভিপ্রায় নিয়ে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তাহের-এর মানসচেতনায় সংঘটিত হয়েছে সমস্ত ঘটনা। কাহিনীর অনুপুঙ্খ বিস্তার, তীক্ষ্ণ অনুভব, বিশ্লেষণ, সতত সঞ্চয়িত শীতল পরিবেশ, একটানা বর্ণনার অখণ্ডতা উপন্যাসটিকে নতুন এক রচনাকাঠামোয় উন্নীত করেছে, যা কাহিনীর প্রয়োজনে রচিত এবং যথোপযুক্ত। বাংলা ভাষার শক্তি, সম্ভাবনা, সৌন্দর্য, প্রাখর্যকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন তাঁর কাহিনীর মৌলচেতনাকে বিকশিত করা লক্ষ্যে।

কবিতার অনুভববেদ্য শক্তি, সুষমা ও ধবনির ঐক্যতানকে ব্যবহার করে সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেছন 'অন্তর্গত' উপন্যাসটি। এর বিষয়বস্তুও মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক আকবর হোসেনকে যুদ্ধের বিরুদ্ধপক্ষ অপদস্ত করে। এক সময় সে মারা যায়। সাধারণ মানুষ এই কিংবদন্তি যোদ্ধাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে, তবে বিরুদ্ধপক্ষ-অপশক্তির ভয়ে তার নাম মুখে আনে না। যুদ্ধের দশ বছর পর কতিপয় সাংবাদিক জলেশ্বরীর মানদারবাড়িতে যায় এই নায়কের ওপর প্রতিবেদন রচনা করতে। ঔপন্যাসিক দশ বছর পরের ঘটনা ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঘটনা একই সাথে

উপস্থাপিত করেছেন কোরাসের কণ্ঠনিসৃত বাণী থেকে। কখনো গ্রামের সাধারণ জনগণ, বালক বর্ণনা করেছে আকবর হোসেন ও সেই সময়কার ঘটনা সম্পর্কে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, ক্ষোভ, প্রতিক্রিয়া, আকুতি প্রকাশ পেয়েছে কবিতার চরণে চরণে। উপন্যাসের কাঠামোয় কবিতা ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক সূক্ষ্ম অনুভববেদ্য সংবেদনশীল আবহ তৈরি করেছেন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। সম্মিলিত জনগণ, বহুমাত্রিক ব্যঞ্জন কোরাসের ভঙ্গিতে বা একক ব্যক্তিকবিতায় উচ্চারিত তীক্ষ্ণ ও আলঙ্কারিক শব্দ প্রয়োগে মহান মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা প্রকাশ করেছেন তা স্বতন্ত্র মূল্য পেয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, পারম্পর্য চমৎকার, কবিতায় রচিত হওয়াতে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি, বরং ঔপন্যাসিকের উদ্দিষ্ট সফল হয়েছে। কবিতার শরীর ব্যবহার করে, কাব্যশক্তির দ্যোতনা ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক সফলতা পেয়েছেন বিভিন্নভাবে। তিনি ধারাবাহিকভাবে কাহিনীর বিস্তার রক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, ফলে এখানে কোনো একক কবিতা নেই এবং কবিতাকে খুব বেশি তরল হতে দেননি। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কবিতাকে ব্যবহার করেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে এই কাহিনী গদ্যে নির্মাণ করা যেত কি না? কিংবা কবিতার সূক্ষ্ম সৌকর্য ও অনুভব ব্যবহার করার কী দরকার ছিল? প্রথমত, বলা চলে, এই কাহিনী গদ্যে নির্মাণ করা যেত। তবে, গদ্য কাব্যাক্রান্ত হলে সেটা উপন্যাসের মৌল বৈশিষ্ট্যের ক্ষতি করত। আর ঔপন্যাসিকের ইচ্ছে ছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সাধারণ মানুষের কোমল অনুভূতিতে সংযুক্ত করার। এ জন্যে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের গল্প বা কাহিনীর আদলে কবিতা ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, কবিতার সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় শক্তি ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনাকে পাঠকের মনে চারিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। আর, সার্বিকভাবে এটা তাঁর নিরীক্ষার অন্যতম উদাহরণ। সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম চেতনা হল, আবহমান জীবন-চেতনা স্বরূপ ও সাহিত্য সংক্রান্ত গঠনগত-পদ্ধতিগুলো নিরীক্ষা করা। অর্থাৎ অতীত ঐতিহ্যের নব প্রয়োগের নিরীক্ষা করা। এই উপন্যাসে তিনি সেটাই করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন:

> আমি মনে করি না, সাহিত্যের কোনো কর্ম মৃত হয়ে যায়, আমি বিশ্বাস করি, একটি বিশেষ কালে একটি বিশেষ ফর্ম তার সমস্ত সম্ভবপরতা নিঃশেষিত করে ফেলে মাত্র; এবং নতুন সময়ে নতুন সম্ভবপরতা আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় সে নেপথ্যে অপেক্ষা করে।[৭]

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘসময়ে কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে। তারপর কবিতা কাহিনী বা গল্পে ব্যবহৃত হয়নি। আধুনিক যুগে কথাসাহিত্যে গদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাও গতানুগতিকার নির্বেদে অনেকটা শক্তিহীন। সৈয়দ শামসুল হক মধ্যযুগের মতো কাহিনীতে কবিতা ব্যবহার করেছেন আধুনিক কালের উপন্যাস রচনা করতে। এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, প্রতিবেশ রচনা এবং সর্বোপরি লেখকের মৌল জীবনদর্শন উপস্থাপনে কবিতার ব্যবহার লেখক সফল বলা যায়। কারণ, তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গভীরভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। সাতটি সর্গে তিনি সবিস্ত

ারে উপস্থাপন করেছেন কাহিনী। তাঁর উপস্থাপন রীতির উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে, তাঁর নিরীক্ষার ধরন।

> এই কাহিনী বিশেষ কোনো মানুষের কণ্ঠের অপেক্ষা করে না,
> এই কাহিনী বিশেষ কোনো স্থানের হয়ে থাকে না,
> এই কাহিনী বার বার রচিত হয়,
> বার বার কথিত হয়, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন সময়ে।
> এই কাহিনী মানুষ ভুলে যায়,
> কারণ মানুষের যেমন স্মৃতি আছে তেমনি বিস্মৃতিও আছে;
> একই দেহে
> স্তন থেকে দুধ যেমন আসে
> যকৃত থেকে পিত্তও নিঃসৃত হয়;
> কারণ সম্ভবত ঘটনা মানুষকে বেষ্টন করে মাত্র, অন্তর্গত হয়ে যায় না,
> না মানুষ ঘটনার;,
> না ঘটনা মানুষের।
> এ কাহিনী বাতাস আত্মসাৎ করে নেয়,
> এ কাহিনী আকাশ অবিরাম ধ্বনিত করে,
> বৃক্ষ তার আপন সংসারে তরুণ বৃক্ষটিকে বলে,
> আগুনের দলার মতো চাঁদের নিচে ফুল তার বীজের ভেতরে- এই কাহিনী রেখে দেয়।[৮]

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি বড় নিরীক্ষার উদাহরণ হল 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও চিরায়ত জীবনাচরণের বিশ্বাস-সংস্কার-কিংবদন্তি-মিথ দ্বারা দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে একটা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্যে ও সার্বিক জীবনপ্রত্যয় দ্বারা সংযুক্ত করেছেন। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও বংশ-পরম্পরায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধকে নবচেতনার দ্বারা যুক্ত করেছেন। সব মিলিয়ে এক মহান চেতনার দীপ্তিমান শিখা জ্বলে ওঠে উপন্যাসের কাঠামোয়। এখানে তাঁর নিরীক্ষা বিষয়বস্তুর নব আরোপ এবং রচনা কাঠামোর অভিনবত্ব নিয়ে। ঘটমান যুদ্ধের কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তাকে ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও প্রামাণিক করে তুলতে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও বিখ্যাত সংবাদপত্র–বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মতামত ব্যবহার করেছেন ধারাবাহিক উপস্থাপনার মাঝে। বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিনের পারিবারিক পীরতন্ত্রের ইতিহাস তথা ধর্মীয় বংশীয় মর্যাদার ইতিহাসও লেখক সংযুক্ত করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ধর্মীয় ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য। অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের জিগির তুলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে যে প্রচারণা চালায়, লেখক তাকে অসার প্রমাণ করেন পীর বংশের কাহিনীর সাহায্য নিয়ে। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা লেখক ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটিকে

প্রামাণিক করতে। তবে, লক্ষণীয় যে, এ ব্যাপারে তিনি বরাবরই সচেতন সৃজনশীলতার তথা শিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তিনি যে, প্রামাণিক উল্লেখ ব্যবহার করেছেন (আলাদা টাইপে) তা মূল কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সাবলীলভাবে। পাঠক উপন্যাসের শিল্পরস ও ইতিহাসের সত্য যুগপৎ গ্রহণ করেছেন কোনো দ্বিধা ছাড়াই। একই সঙ্গে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সময়ের ঘটনা, সম্ভাবনা ব্যবহার করে, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ইতিহাস নিয়ে বাঙালি জাতির এই ঐতিহাসিক বিজয়গাথাকে সমূলে তুলে এনেছেন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের নায়ক মহিউদ্দিন তার সহযোদ্ধা বশীরকে জলেশ্বরী পাঠায় মিলিটারি আক্রমণের খবর নিতে। অবশেষে এপ্রিলের সতেরো তারিখ ঠিক সন্ধ্যাবেলায় বশীর এসে খবর দেয়, রংপুর থেকে মিলিটারি রওনা হয়ে গেছে। রাত সাড়ে দশটা এগারোটার ভেতরেই তাদের স্পেশাল ট্রেন জলেশ্বরীতে পোঁছে যাবে।[৯] এই পটভূমিতে লেখক প্রামাণিক তথ্য সংযুক্ত করেন এরপর। যা কাহিনীর ধারাবাহিকতার সাথে মিলে যায়:

> আম বাগানের প্রান্তে খোলামাঠে, বাংলার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্ষণ করা বোমা আর রাইফেলের বারুদের ঘ্রাণ। সড়কে মাঠে উঠোনে পড়ে থাকা লাশের পর লাশ পচে ফুলে ওঠা লাশ– পৃথিবীময় পচনের দুর্গন্ধ; কিন্তু এখানে এই আমবাগানে মুকুল আর কাঁচা আমের ঘ্রাণে মাঠের একদিকে একা একটি গাছের তলায় গ্রামের মানুষেরা সাধারণ কিছু চেয়ার-টেবিল এনে রাখল; সকাল থেকেই এখানে সমবেত হচ্ছে মানুষেরা। তাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছল।
>
> বেলা এগারোটার দশ মিনিটে এলেন ও আসন গ্রহণ করলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান– মাত্র সাড়ে চার বছরের ব্যবধানেই ইতিহাসের নির্মম-নিরপেক্ষ চক্ষুও ভিজে উঠবে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বেয়োনেট ও রাইফেলে যাঁদের হত্যা প্রত্যক্ষ করে এবং ভবিষ্যতের সেই রক্তাক্ত হাত দুটি পকেটে পুরে খন্দকার মোশতাকও এসে আসন গ্রহণ করলেন তাঁদের পাশে। আসন গ্রহণ করলেন কর্ণেল আতাউল গনি ওসমানি।
>
> শপথ গ্রহণ করবেন স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার। যেহেতু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান– সেই হেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।[১০]

লক্ষণীয় যে, বিশাল পটভূমিতে রচিত মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক এই উপন্যাস একই সাথে উপন্যাস ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণিক দলিল। ইতিহাসের সত্যকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথে। তবে, মূল কাহিনীর মানবিক তাৎপর্য এতে নষ্ট হয়নি। লেখকের এই নিরীক্ষা ও পদ্ধতি-নিপুণতা অভিনব এবং তা ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবকাঠামোগত পদ্ধতিতে নব সংযোজন। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনে ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন মাত্র; উপন্যাসের কাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং তা বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিনের ব্যক্তিগত মানবিক কাহিনীও বটে। সার্বিকভাবে লেখক সফল, সেকথা নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বলা যায়।

ক্ষুদ্র আয়তনে রচিত হয়েছে 'আলোর জন্য' উপন্যাস। স্বল্প পরিসরে জীবনের গভীর এক দিক সম্পর্কে ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাস। কাহিনীর বিস্তার নেই এখানে, উপকাহিনী নেই, এক দিনে কতকগুলো চরিত্রের মানবিক সংকটকে লেখক প্রতীকী রূপ দিয়েছেন। একটা বাসায় কাজী তার স্ত্রী মিষ্টি আর চার অবিবাহিত বন্ধুকে নিয়ে থাকে। বাসাটার কাছেই সবার অফিস, আর আর্থিক সাশ্রয়ের কারণে বাইরের লোকের নিন্দার উপেক্ষা করে তারা থাকে। বাড়িওয়ালা অহেতুক বেশি ভাড়া দাবি করলে তারা দিতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত চতুর বাড়িওয়ালা বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্ধকারে থাকতে থাকতে বাইশ দিন হতে চলে, সেদিন তাদের সবাই বিষয়টা ভাবে গভীর ভাবে। এই অন্ধকার থেকে তারা মুক্তি চায়, যেভাবে হোক আলো তাদের দরকার। কাজীর স্ত্রী মিষ্টি সবার জন্য রান্না করে অন্ধকারে, অন্ধকারে তার ভয় হয়। একবার তার সন্তান মারা গেছে। তার আশঙ্কা হয় এই অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার গর্ভে আসা নতুন সন্তানটি হয়তো মারা যাবে। অন্ধকারে অতিষ্ঠ এই ছয়জন মানুষ তীব্রভাবে উপলব্ধি করে আলোর প্রয়োজন। প্রত্যেকে তাদের জীবনের অতীত-বর্তমান থেকে উপলব্ধি করে কিভাবে অন্ধকার ও আলো জীবনের দুই বিপরীতধর্মী বস্তু। খান কাব্যপ্রেমিক। জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে' আবৃত্তি করে। একে একে আখন্দ, তালুকদার, চৌধুরী কাজী ও খান বাড়িওয়ালার কাছে যায় শীঘ্রই আলো আনার জন্য; কেউ ফিরে আসে না। নিজের গর্ভে হাত দিয়ে মিষ্টি ভীতু হয়ে পড়ে, আর ভাবে তাকে ভয় পেলে চলবে না, তার সন্তানকে বাঁচাতে হবে। বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় মানবিক জীবনের সমস্ত আলো নিভে যাচ্ছে– এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী মানুষের অধিকারে সব আলো, সব সম্পদ। বাকিরা সৎ উপলব্ধি দিয়ে সব বোঝে, কিন্তু তারা দুর্বল, পলায়নপর মানসিকতা তাদের তাড়িয়ে ফেরে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রতীকী উপস্থাপনায়, ছোট একটি ঘটনার সাহায্যে এই জীবনসত্যকে সমূলে তুলে এনেছেন।

ছোট অবয়বে উপন্যাস রচনার নিরীক্ষায় লেখকের বক্তব্য হল, উপন্যাসে জীবনের গভীর তাৎপর্য ধরা পড়বে, অবয়ব সেখানে কোনো অন্তরায় নয়। এক্ষেত্রে

ঔপন্যাসিককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উপন্যাসের গঠন, বক্তব্য, সংলাপ হবে নিখুঁত; তাঁকে সচেতন থাকতে হবে সার্বিক গঠনশৈলী, জীবনদর্শন ও উপন্যাসের মৌল লক্ষ্যের বিষয়ে। এই উপন্যাসে সৈয়দ শামসুল হক মিষ্টি, খান, চৌধুরী ও কাজী চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। খানের কাব্যবোধ প্রকৃতপক্ষে জীবনের গভীর ও তাৎপর্যময় অভিব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের চারপাশের সামূহিক পটপরির্তন, সামাজিক পদস্খলন সুস্থ-মানবিক বোধকে নষ্ট করে দেয়, আমরা অন্ধকারে ডুবে থাকি। লেখক চৌধুরীর বক্তব্যে এই চিত্র তুলে ধরেছেন:

"জানো খান, গ্রামের সেই অন্ধকার থেকে আমি যখন প্রথম শহরে এলাম, বিজলি আলো
আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। চোখের সামনে শুধু আলো দেখতাম তখন। লাল-বেগুনি, নীল
আলো। ছোট-বড় বলের মতো সে আলো লাফায়। চোখে জ্বালা ধরায়। চোখ বুঁজে আসে।
তারপর একদিন সেই বলগুলো হারিয়ে গেল। তারপর একদিন আমি সেই বলগুলোর কথা
ভুলে গেলাম। না, তারা হারায়নি। না, আমি ভুলিনি। আমি তাদের হয়ে গেছি। তারা আমার
হয়ে গেছে। আমি পাগল হয়ে যাব। আমার মাথার ভেতরে কেমন করে উঠছে। আমি পাগল
হয়ে যাব। আমি আলো চাই। যে কোনো মূল্যে, যে কোনো উপায়ে আমার আলো চাই,
আলো।[১১]" সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে, এই ক্ষুদ্রাকৃতির উপন্যাসে লেখক মানবজীবনের
গভীর সত্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। প্রতিটি চরিত্রের আলোর জন্য তীব্র আকুতি,
প্রকৃতপক্ষে জীবনের জন্য আকুতি, অন্ধকার থেকে, অচলায়তন থেকে মুক্তির জন্য আকুতি।
রচনারীতির জন্য না হলেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনের নতুন কৌশলের জন্য উপন্যাসটি আলাদা
মর্যাদা পাবে। সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে তিনি বাংলাদেশের উপন্যাসে যে নতুনত্ব
এনেছেন সে হিসেবে তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে হবে। তাঁর নিরীক্ষা শুধু নিরীক্ষার পর্যায়ে
থাকেনি বরং উপন্যাসের নতুন নন্দনকাঠামো তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

টীকা

১. *রক্তগোলাপ*, ২য় সংখ্যা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ .৪৫ ।
২. উপন্যাস সমগ্র-২, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, ভূমিকা দ্র:
৩. আয়না বিবির পালা, পূর্বোক্ত, ভূমিকা ।
৪. ঐ
৫. *বুকঝিম এক ভালোবাসা*; র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৬১ ।
৬. দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১ ।
৭. অন্তর্গত, পূর্বোক্ত, সবিনয় নিবেদন ।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯ ।
৯. বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭ ।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ ।
১১. *আলোর জন্য*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৬৯-৭০ ।

আবুবকর সিদ্দিকের ‘জলরাক্ষস’ ও ‘খরাদাহ’

ক বী র চৌ ধু রী

কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে আবুবকর সিদ্দিক সুপরিচিত ছিলেন একজন কবি বলে। তাঁর ‘ধবল দুধের স্বরগ্রাম’, বিনিদ্র কালের ভেলা’ এবং ‘হে লোকসভ্যতা’ কাব্যগ্রন্থগুলো বাংলাদেশের সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিদের সারিতে তাঁর জন্য একটি স্থান করে দিয়েছিল। কিন্তু আশির দশকে এসে আমরা তাঁকে আবিষ্কার করলাম কবি ছাড়াও একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক রূপে। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস ‘জলরাক্ষস’ এবং ‘খরাদাহ’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। তবে আবুবকর সিদ্দিকের উপন্যাস যে একজন কবির রচনা সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে, চিত্রকল্পে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, নানা খুঁটিনাটি ডিটেলসহ বাস্তবের জীবন্ত ছবি তুলে ধরার সময়ও তাঁর মধ্যে একটা রহস্যের আমেজ মিশিয়ে দেয়ার সহজ দক্ষতার মধ্যে সে-পরিচয় বিধৃত।

জলরাক্ষস

'জলরাক্ষস' উপন্যাসটি আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রচিত। এর প্রধান পাত্র-পাত্রীরা দুর্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব মানুষ, অধিকাংশই ভূমিহীন, মধ্যযুগীয় সামন্ত জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত। চারপাশে তাদের ঘিরে আছে ক্ষয়, মৃত্যু, পচন ও লয়। তবু অন্ধকার নেমে এলে ক্ষুধার ঘোরে জেগে ওঠে অমানুষিক বিকারগ্রস্ত সম্ভোগকামনা। যার ফলে দুঃসহ জীবন দুঃসহতর হয়ে ওঠে। মানুষের কৃমিতে, উপন্যাসিকের ভাষায়, মাপামাটির ফাঁকা ঠাঁই ভরাট হয়ে যায়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোনজোরালি। অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী, বয়স মাঝবেলা পেরুলেও এখনও প্রচণ্ড শক্তিশালী, চৌধুরিদের লেঠেল বলে যার পরিচয়। চৌধুরিদের হয়ে নানা কীর্তি-কুকীর্তি করার পরেও নিজের ভেতরের এক নেশার টানে সারাটা বর্ষাকাল সে সিঁদচুরির ওপর থাকে। চরিত্রের মধ্যে বীর নায়ক হবার বহু উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার দিন কাটে চরম দুর্দশার ভেতর, অভাব নিগ্রহ নিপীড়ন তাচ্ছিল্য ও অপমান তাকে ঘিরে থাকে সর্বদা, তাকে আর তার স্ত্রী জরিনকে। গভীরভাবে ভালোবাসে সে তার স্ত্রীকে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় টাকার জন্যে একসময় জরিনকে সে ভুলিয়ে হেল্‌থ সেন্টারে নিয়ে এসে তাকে বন্ধ্যা করে দেয়। জরিন ছেলে চায়, কিন্তু তার আর সম্ভাবনা নেই।'

'জলরাক্ষস'-এর কাহিনীর শুরুতেই আমরা শুনি তিন দিনব্যাপী খারাপ মেঘের কথা, পুরনো পুঁজে আর পুরনো রক্তে দলা পাকানো যার চেহারা। এই শুরু থেকেই কাহিনী আমাদের নিয়ে যায় ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ের মধ্যে, যেখানে ঘরবাড়ি ভেসে যায়, চারদিকে দেখা যায় শুধু মৃত্যুর সমারোহ। গোনজোরালি আর জরিন মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে। অন্য অনেকের সঙ্গে তারা উঠে আসে বাঁধের ওপর, ছিন্নমূল মানুষের ভাঙা সংসারের নতুন হাটের প্রহসন গড়ে ওঠে সেখানে। কিন্তু দুর্যোগ তখনও কেটে যায়নি। জানোয়ারের মতো বাতাস গর্জাতে থাকে, নদী বাড়িয়ে চলে তার দখল। পানির তোড়ে আবারও মানুষ ভেসে যায়।

গোনজোরালিও। কিন্তু আবার জিত হয় তার। ভেলা আঁকড়ে ধরে ভাসে গোনজোর, তারই সঙ্গে শাড়ির বাঁধনে বাঁধা জরিন দু'হাতে জাপটে ধরে আছে কলাগাছ। ইতোপূর্বে বাঁধবন্দি জীবনে গোনজোর যখন কোথা থেকে কাঁচাপাকা একছড়া শবরী কলা নিয়ে এসেছিল তখন আগে সে শিশু ও অন্যান্যদের মধ্যে তা বেটে দিয়ে তারপর নিজে খেয়েছিল। এই রকম ছোটোখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গোনজোরালির চরিত্রের মানবতাবোধের দিকটি তুলে ধরেছেন নিম্নকণ্ঠে, হালকা তুলিতে। বন্যার পানিতে একূল-ওকূল সব ভেসে যাবার পর কিছু সময়ের জন্য ছিন্নমূল মানুষেরা বাসা বাঁধে বড়ো সড়কের দু'পাশে। এই পর্যায়ে গোনজোরের স্মৃতিসূত্রে লেখক আমাদের জানিয়ে দেন, কত দিক থেকে জমিদার চৌধুরী তাঁর দুর্ধর্ষ লেঠেল গোনজোরালির কাছে ঋণী, চরম বিপদের মুহূর্তে তিনি কীভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাকে কথা দিয়েছিলেন যে তার বিপদে তিনি গোনজোরদের সব দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে শোষকের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চৌধুরী চিরকালের মতোই চরম স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও লোভী। বন্যার্ত মানুষের জন্য রিলিফের মাল যখন আসে তখনও এই দুঃস্থ মানুষেরা কিছুই পায় না। রাতের আঁধারে চলে হাত-বদল, চোরাকারবার, অসহায় মানুষের জীবনের মূল্যে মুনাফার পাহাড় গড়া। ক্ষুধা ও ক্রোধে গোনজোরালির মগজ জ্বলে যায়। বড়শিতে যখন না বাইন না সাপ কুচকুচে কালো একটা জীব ধরা পড়ে তখন গোনজোর উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জরিনকে বলে ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে মাথাটা বাদ দিয়ে তাকে নুনঝালে সেদ্ধ করতে। জরিন বমির ভান করে। ওয়াক! মুসলমানে কি ওটা খায়? গোনজোরের উত্তর প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ের, 'খিদের আবার মোসলমানডা কি রে?'

গোনজোর-জরিন এবং আরও কেউ কোনো রকমে টিকে থাকলেও বন্যার্তদের আশ্রয়শিবিরে মৃত্যুও এসে হানা দেয়। অনাহারে, দুর্বলতায়, রোগে মানুষ মরতে শুরু করে। এই পর্বে লেখক ছবি এঁকেছেন ত্রাণকর্মের নামে যেসব সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, পুলিশ, এলাকার চেয়ারম্যান প্রমুখ নানান অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে ঘোরাফেরা করে, তাদের। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসেন, হেলিকপ্টারে করে পানি-মন্ত্রী আসেন, মাইকের গাঁ গাঁ শব্দ শোনা যায়, তাঁবু পড়ে, হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বলে ওঠে, আর এর মধ্যে চলে শুধু রিলিফের মাল পাচার নয়, শুধু টিপসই সংগ্রহ নয়, নারীমাংস শিকারও।

'জলরাক্ষস'-এর কাহিনী লেখক এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় চলচ্চিত্রের ভঙ্গিতে, নানা ছোট ছোট আপাতবিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত একটা সংহতি টেনে নির্মাণ ক'রে। যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি চারপাশের মৃত্যুর সমারোহের ভেতর একটি ফরসা টুকটুকে চাষিবউ নৌকোর খোলের মধ্যে রক্তমাখা পানির তোলপাড়কে উপেক্ষা করে তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। মাতৃত্বের জন্য লোলুপ উপোসি জরিন তার সাহায্যে এগিয়ে এলেও সে কিছুই করতে পারে না। তার হাতের তালুতে যা ঝুপ করে পড়ে তা জীবন নয়, মৃত্যু। তখন সে যেমন করে কলাপাতার গোড়া কাটার কথা, তারও চেয়ে মোলায়েম করে নাড়ি কেটে দেয় ছুরি দিয়ে।

ছিন্নমূল মানুষের বাঁচার সংগ্রামে বিরতি দেবার উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টি আর আকাশের অবস্থা যাই হোক জীবনযুদ্ধ চলতেই থাকে। গোনজোর বেরিয়ে পড়ে বড়োগাঙে মাছ ধরার সংকল্প নিয়ে। বড়োনদীতে মোষের লাশ মানুষের লাশ মরে মিশে একাকার। কিন্তু তারই মধ্যে খোলা আকাশের নিচে বিশাল জলরাশির বুকে গোনজোর জীবনের একটা আলাদা স্বাদ পায়। জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় বুকের মধ্যে দুর্জয় সাহস ও শক্তি জেগে ওঠে। মারমুখো বন্যার দাঁতের মুখোমুখি পড়ে তার হাতের শক্ত মুঠোয় মারকুটে বৈঠা মুখিয়ে ওঠে। আবুবকর সিদ্দিক তাঁর উপন্যাসের এই পর্বে প্রকৃতি, মানুষ, পাখি আর গোনজোরালির ভয়ঙ্কর সব কর্মকাণ্ডের চিত্রায়ণে বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নদীর বুকে গোনজোর একা নয়, আকাশেও আছে সহযাত্রী, তারও একই গোঁ। 'উদ্যত ছোঁ নিয়ে পানিতে নেমে আসে বাজকুড়ালি। মরা মাছের দিকে

ঝোঁক। প্রচণ্ড স্রোতে নাগালছুট হয়ে যায় শিকার। ডিঙির পাটাতনে দু'ডানার মস্ত ছায়া পড়ে। গোনজোরালি ঘাড় হেলিয়ে নজর তোলে। মাথার উপর শূন্যে ভাসা মীনে করা মণির মতো কালো ঝকঝকে ছোট্টো চোখ দুটির নজর বিনিময় হয়।

'গোনজোরালির চোখে পালটা শান।' এই শান যে কত প্রখর তা দেখি যখন গোনজোর লাশের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে দেয়, মৃত মানুষের দেহের পচা গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য গামছা দিয়ে নিজের নাক-মুখ-কান-থুতনি সব ঢেকে ফেলে, খোলা থাকে শুধু একজোড়া চোখ, যেন কিমাকার রাক্ষস এক। নৌকা ঠেলে সে এগিয়ে যায়। চৌধুরিরা সব মরে গেছে। ছিপের সুতো খুলে বড়শি গেঁথে সে ছুঁড়ে মারে, টেনে নিয়ে আসে ডিঙির কাছে। ফুলে ঢাউস হয়ে ওঠা মৃতদেহ। দায়ের চাড় দিয়ে তার বাহুর চেন ছিঁড়ে গোনজোর কোঁচড়ে গোঁজে। আংটির পাথরগুলো চৌধুরি বহু টাকার বদলে আরবি ফকিরের কাছ থেকে জোগাড় করেছিল। এখন আঙুল কামড়ে ধরে আছে। বাধ্য হয়ে গোনজোরালিকে চৌধুরির চারটে আঙুল কেটে নিতে হয়।

শুধু চৌধুরি নয়, এমনি করে সেখানে গোনজোরালি যত লাশের গায়ে কানে নাকে হাতে সোনারূপার গহনা দেখেছে, সব সে দা দিয়ে কুপিয়ে খুলে নিয়ে তার ডিঙির খোলের মধ্যে রাখা হাঁড়িতে ভর্তি করে ফেলে। এবং আবারও এই সাংঘাতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা হঠাৎ দেখি আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে যাওয়া একটি মাথা কামানো গোলগাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা বালককে। এবং কী পরিবেশে দূরব্যাপী মৃত্যুর মধ্যে গোনজোর এই প্রথম জীবনচিহ্ন দেখে! ছেলেটির পেছন দিকে খোসা ছাড়াচ্ছে একটা খয়রা রঙা গোক্ষুর। 'কোমর অবধি খসে এসেছে। খই-ওঠা নরম নিশ্চল ঘাড় পাক দিয়ে পড়ে আছে। খোলসে ধবধবে শাদা মেঘের করুণ ছায়া।'

গোনজোরালি ছেলেটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, তাকে তুলে দেয় জরির কোলে। এদিকে রিলিফক্যাম্পে গুঁড়ো দুধ আর অন্যান্য জিনিস আনতে জরি গিয়েছিল। সেখানে ভুঁড়িওয়ালা রিলিফ অফিসার তার দেহের রস নিংড়ে নিয়েছে, তার শরীরের ওপর দিয়ে যেন গর্‌কি চলে গেছে। তবু ছেলেকে সে বুকে তুলে নেয়। আর গোনজোরালির আনা সোনাদানা দেখে প্রথমে কার ধন সে লুট করেছে ভেবে শঙ্কিত হয়। কিন্তু স্বামীর যুক্তি তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই রত্নে গোনজোরের বিবেচনায় তাদের পূর্ণ অধিকার আছে : 'আমরা খাটিছি আর চোঁদরিরা সোনা বানাইছে। এমনি এমনি পারত? নে পর। বানের টানে গাঙডা উলটে গেইছে।' তবে শেষ পর্যন্ত সোনার গয়নাপাতি জরি গায়ে পরে না, দুজনে মিলে হাঁড়িতে পুরে মাটির তলায় পুঁতে রাখে। এই দিয়ে ভবিষ্যতের জীবন গড়তে হবে।

কিন্তু সদ্য কোলে-পাওয়া ছেলেটাকে বুঝি ওরা আর বাঁচাতে পারে না। কলেরায় আক্রান্ত হয় সে। জরির মন হু হু করে ওঠে। আবার রিলিফ অফিসারের কাছেই ধরনা দিতে হবে। নুনের ইনজেকশানের জন্য। জরিনের দেহ এবারও লুটে নেয় লুটেরা। শুধু জরির দেহ নয়, অন্য দিকে পাচার হয়ে যায় রিলিফের যাবতীয় জিনিসপত্র। তাকে

ওষুধ বা ইনজেকশান কিছুই দেয়নি সাহেবরা। ডেরায় ফিরে এসে জরিন দেখে যে ছেলেটি মরে গেছে, ছেলের লাশ সামনে নিয়ে গোনজোরালি কাঁদছে।

এই পর্বে জরিনের ভয়ঙ্কর বীভৎস অভিজ্ঞতার উপস্থাপনায় লেখক স্বপ্ন আর বাস্তবকে সচেতনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন শৈল্পিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির তাগিদে। নারীমাংসলোলুপ রিলিফ অফিসারের ক্লেদাক্ত লালসা, ওষুধ আর ইনজেকশানের জন্য জরির করুণ আকুতি, স্বপ্নের মধ্যে ছেলেটির প্রাণহীন দেহ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠা, রমণরণ-ক্লান্ত ভুঁড়েল পুরুষের ক্লান্ত অবসন্ন দেহের এলিয়ে পড়া : সব যেন একটি বিশেষ মুহূর্তে জরিনকে উন্মাদ বনবিড়ালিতে রূপান্তরিত করে। শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণীর প্রতিভূ এই রিলিফ অফিসার আর চৌধুরি একাত্ম হয়ে যায় তার চেতনায়। নিঃশব্দ চিৎকারে ফেটে পড়ে জরি : 'উরে চদরির বেটা চদরি! আয় তোরে জন্মের তরে পরখাওনের হাউস্ মিটেইয়ে দি!' তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালায়।

এর পর আমরা উপনীত হই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে। ঘর পুড়তে দেখে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাবে ঝুপড়ির বানভাসি পরিবারগুলো বুঝি লুটতরাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পুলিশের বাঁশি বাজে, গুলি চলে, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য দিয়ে জরিন-গোনজোরের অদম্য জীবনতৃষ্ণা তাদের বাঁচিয়ে রাখে। জরিন যখন ঝুপড়ির ঘরের মধ্যে নগ্নিকা ছিন্নমস্তার মতো ফিরে আসে তখন তাকে দেখে গোনজোর যেন ভীমবল পায় হাতে-পায়ে। এদিকে আবার বাতাস উঠেছে, অশুভ মেঘ জমছে, ঝড় শুরু হল বলে। রাইফেলের ফায়ারিং-এ সমস্ত আকাশ তখন গুম গুম শব্দে ডেকে ওঠে। 'আর তার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি বাতাসের দাপে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তখন সরু সরু প্যাঁচে এগিয়ে আসে খ্যাপা কুকুরের টানা বিজাতীয় ডাক। অসহ্য অদৃশ্য অশরীরী কারবার।'

কাহিনী এই পর্যায়ে অ্যাবসার্ড সাহিত্যের আবহ নিয়ে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যায়। ঝড়, রাইফেলের শব্দ, কাদা ও শেকড়ের মধ্যে দিয়ে বুক ঘষে এগিয়ে যাওয়া দুটি মানুষ, তারপর প্রমত্তা নদী, জরির বুকের নিচে মড়ার খুলির গুঁতো, আর সব কিছু তুচ্ছ করে দৈত্যের মতো এগিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা সে কে? 'তার স্বামীই তো? ভয় নেই, ক্লান্তি নেই। ও কি মানুষ না রাক্ষস?'

কোথায় যাচ্ছে গোনজোর? সে জানে না। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। শেষ পর্যন্ত দেহাতি চাষার ডিঙি নৌকোখানায় উঠে পড়ে সে আর জরি। ঝড়ের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে ভেসে চলে আর-এক চর কিংবা নতুন কোনো গঞ্জের সন্ধানে। বন্যায় নিহত লাশের দেহ থেকে ছিনিয়ে আনা স্বর্ণালংকার ভরতি মাটির হাঁড়ি আর মৃত বালকটিকে জড়িয়ে ধরে জরি। তার স্বামী জলরাক্ষস গোনজোরালির সাহস, শক্তি আর দীপ্ত প্রাণাবেগকে মুগ্ধ বিস্মিত দুচোখ মেলে দেখে। ঝড় কিন্তু বাড়তে থাকে। শাদা গরলের মতো ফেনার মাথায় নাচে কালো ডিঙি। ডিঙির ডানায় বসে যুঝছে প্রাণপণে গোনজোরালি। সে হার মানবে না কিছুতেই। একসময় মাটির হাঁড়ি তোপের মতো শূন্যে ছিটকে ওঠে। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়। বৈঠা কামড়ে ঝুলতে

থাকে ধনুকের মতো বাঁকা গোনজোরের শরীর। বাচ্চার লাশ-আঁকড়ানো জরিন শোলার মতো শূন্যে উড়ে যায়। আগ্রাসী তুফান জিভের ডগায় ধরে নেয়। ক্লান্তিহীন লড়াই চলতে থাকে মানুষের আর প্রকৃতির। সময় নির্বিকার দ্রষ্টার মতো তাকিয়ে থাকে। অপরাধের জীবনক্ষুধার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ছবির মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসের প্রকৃত প্রাণ একটি বীরোচিত চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। গোনজোরালির অপরিমেয় প্রাণশক্তি, দুর্জয় সাহস, চারপাশের মৃত্যুর মধ্য থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনার অটুট সংকল্প, জরির জন্য তার গভীর ভালোবাসা, যার মধ্যে ভাবালুতার লেশমাত্র নাই, চৌধুরির সঙ্গে তার সম্পর্কের জটিলতা, তার শ্রেণিসত্তার বিকাশ; সব কিছু মিলে আবুবকর সিদ্দিক এখানে আমাদের একটি অসামান্য চরিত্র উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থের একাধিক স্থানে নীচুতলাকার মানুষের সত্তার তীব্র টানাপোড়েনের মুহূর্তে কীভাবে সর্বগ্রাসী যৌনক্ষুধা জেগে ওঠে, তার অন্তর্ভেদী চিত্রায়ণ আছে। জীবনের নিষ্ঠুর রক্তাক্ত ক্লেদময় পরিবেশের ছবিও লেখক যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে প্রকৃতিবাদী ন্যাচারালিস্টিক প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে। আমি বিস্মিত হব না যদি এই উপন্যাস পড়তে পড়তে কোনো পাঠকের মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক', কিংবা সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বাঘিনী' কিংবা মার্কিন ঔপন্যাসিক জ্যাক লন্ডনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'সি-উলফ'-এর কথা। প্রসঙ্গত, 'সি-উলফ' আর 'জলরাক্ষস' নাম দুটির মধ্যে যে সমধর্মিতা বিদ্যমান তা-ও লক্ষণীয়।

ধ্বংসোন্মত্ত প্রলয়ংকরী প্রকৃতির পটভূমিতে একজন বিত্তহীন সাহসী মানুষের অসাধারণ সংগ্রামের ছবি এঁকেছেন আবুবকর সিদ্দিক এই উপন্যাসে, মূলত প্রকৃতিবাদী ধারায়, যদিও মাঝে মাঝে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন অ্যাবসার্ড সাহিত্যের আঙ্গিকও। আমাদের উপন্যাসভুবনে 'জলরাক্ষস' একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি।

খরাদাহ

'খরাদাহ' উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবাংলার খরাপীড়িত অঞ্চল, যেখানে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়, মাটি ফেটে পাঁচ ছ' ইঞ্চি হা করে থাকে, মানুষের চোখ জ্বালা করে রোদের জেল্লায়, আর তার মাথার ভেতরে যেন শাদা আলো ছাঁৎ করে জ্বলে ওঠে। লেখক সহজ নৈপুণ্যের সাথে নিঃস্ব বুভুক্ষু প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন এবং সেই ছবি আঁকতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন ধ্রুপদী বাক্যগুচ্ছ। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি যে, অন্য জেলার মাত্বর বাহাউদ্দিনকে উত্তরাঞ্চলের এক বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে ঘটক নাটু মিয়া। বাহাউদ্দিন হল বজ্জাত বরকর্তা, লম্পট, নিষ্ঠুর শোষক। শহরে যার চামড়ার কারখানা আছে, যে হিজড়া দলিলউদ্দিনকে পুত্র বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে করায়, এবং পরে সেই মেয়েকে নিজে ভোগ করে সুবিধামতো বারবনিতার কাজে লাগিয়ে দেয়। বরযাত্রীরা যাচ্ছে পায়ে হেঁটে শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, কোথাও মানুষ নেই, গাছ নেই, রোদ ঝাঁ ঝাঁ মাঠের

মধ্যে আল ছাড়া পথ নেই, ফাটল ছাড়া মাটি নেই। লেখক সচেতনভাবে এই অত্যন্ত বাস্তব পরিবেশের মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃতের আভাস আরোপ করেছেন। বরযাত্রীদের সঙ্গে আনা ভাড়াটে বাজনদাররা আর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীরা যখন এগিয়ে চলে তখন মনে হয় বাবা শিবঠাকুরের ভূতপ্রেত চ্যালারা সব চলেছে। মচকানো কোমর, ভাঙা ঘাড়, আধখানা বাহু, ঘষা চোখ; এই সব নষ্ট সম্পদ নিয়ে দলটা জোড়াতালিতাপ্পি দিয়ে চলেছে। এরা কথা বলে আঞ্চলিক ভাষায় এবং এই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লেখক দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। রোদের ঝাঁঝে অস্থির হয়ে বরযাত্রীদের একজন বলে: 'ভিত্‌রিবাগে ঘিলু ভি শুখায়্যা গেলছে উসতাদ। লাকের ফুটো দিয়্যা হাওয়া লিছি তো শালোর মজগের খোল তামাৎ বাঁশি বাজ্যে। অন্য জন বিস্ময় প্রকাশ করে, 'কিনতুক ঘাম নাই কেনে? মনে ল্যায় ইটা ভূতের মুলুক? যততো ভুতুড়ে কারবার দ্যাখলচে!'

বরযাত্রীরা এখন চলেছে বিয়ের আসরে। বরসহ। উপন্যাসের শেষ পর্বে একটা ফিরতি যাত্রাও আছে। সেখানে সাংঘাতিক সংঘর্ষের আবহ। ভিন্নতর। এই প্রথম যাত্রায় খিস্তি খেউড় প্রাধান্য পায়। লেখক এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন খরাপীড়িত দেশে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা অসংখ্য কাতারবন্দি মানুষের এক অদ্ভূত দৃশ্য। আবুবকর সিদ্দিকের ভাষাতে শুনুন :

সারি সারি কাতারবন্দী কয়েক হাজার মানুষ। পরাজিত বন্দী সৈনিকের মতো নতজানু হেঁটমুণ্ডু। প্রায় এক বর্গমাইল ভূমি জুড়ে সমস্বরে গর্জনরত। আসলে দমে দমে ধুঁকছে। চামড়াভাজা আঙড়া রোদ্দুরের আগুন পিঠেমাথায় নিয়ে বিবস্ত্র মাটির ওপর সেই সর্বস্বান্ত সমাজ নিয়মিত লয়তালে দাপাদাপি করছে। ফাটা পায়ের পাতার ওপর ন্যস্ত লুঙ্গি -ঢাকা খিন্ন নিতম্ব। লুঙ্গির ছিন্ন ফাঁকে প্রকট পাঁশুটে কালচে চামড়া। কিছু ব্যবহারজীর্ণ সুতিজামা। আর অধিকাংশের উদোম শরীর। বগলের ফাঁকে লাল কটাশে রোম। ঘাড়ে আকাটা চুল। গিঁটজাগা দাঁড়া।

মত্ত ষাঁড় যেমন পেছন পায়ে চালাচালি করতে করতে হোঁক্কা দিতে থাকে, কয়েক হাজার মানুষের ফুসফুসের ঝিল্লিতে ক্ষুব্ধ হোঁক্কা দিতে দিতে বেরিয়ে আসছে :

ইল্লা : হুক্ হুক্ ! ইল্লা : হুক্ হুক্!

না। এই-ই শুদ্ধ ও সম্পূর্ণটুকু নয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই এত বিশাল তরঙ্গপ্লাবী যে বীজবাক্য, মানবিক ব্যবহারে তার ন্যূনতম স্বরসংগতিটুকু এখন প্রতীকের নাদধ্বনি নিয়ে উপস্থিত লোকবিশ্বে আঘাত হানছে।

নিচেকার শতসহস্র ফাটলের মুখ দিয়ে যেন উঠে আসছে ভূমিকম্পের গুম্ গুম্। তারপর মাটির ওপরে হাজার হাজার বিঘা। পোড়াপ্রান্তরে আর শূন্যে ঝিম ধরা গুমট বায়ুমণ্ডলে ঘা দিতে দিতে ছড়িয়ে পড়ছে তার আঘাতের ঢেউ। জলীয়বাষ্পের কণামাত্র চিহ্ন নেই যে এলাকায়, তারি ফ্যাকাশে স্তরে স্তরে।

এই অসহায় মানবকুলের আবেদনের করুণ চিত্র দেখে বরযাত্রীদের মধ্য থেকে একটা চিৎকারের উচ্চারণ ওঠে : কেন এরা ভেড়ির মতোন ভেউ ভেউ করে কাঁদছে,

কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে না, কেন জমিতে থাপড় মারছে না, আসমানের পানে লাফ দিয়ে উঠছে না?

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আমরা সেই বিদ্রোহ দেখি। অবশ্য এই নামাজী মানবগোষ্ঠী সে বিদ্রোহের নায়ক না, সে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় শ্রমজীবী মানুষ, প্রাচীন তথাকথিত অভিজাত সামন্তযুগের প্রতিনিধি মহাপরাক্রমশীল অত্যাচারী ক্ষয়িষ্ণু জমিদার মসিদ খাঁর লেঠেল সর্দার তরুণ ভল্লা। বরযাত্রীরা এসেছে মসিদ খাঁর এলাকায়। নির্মমভাবে শোষিত বঞ্চিত নিরীহ প্রজা কিসমত মিয়ার মেয়ে চিকনদাসীর সঙ্গে দলিলের বিয়ে দেবার জন্যে। উপন্যাসের নাতিদীর্ঘ পরিসরে অনবদ্য স্বচ্ছতা বেয়ে ফুটে উঠেছে মসিদ খাঁর চরিত্র, তার লাম্পট্য, লোভ, নিষ্ঠুরতা, তার দুই স্ত্রী ও অজস্র বাঁদির আচার-আচরণের খণ্ডচিত্র, এক তরুণী বাঁদির সঙ্গে ছোট বউর সমকামিতার বিষয়, মসিদ খাঁর সঙ্গে চিকনদাসীর মা ও কিসমতের বউ তরুদাসীর সম্পর্কের কথা। আমরা এখানে আরো পাই মসিদ খাঁর তাড়ি খাওয়া ও জুয়াখেলায় মত্ত একমাত্র পুত্রসন্তান আরশাদের সঙ্গে চিকনদাসীর সম্পর্কের বিষয়টি, লেঠেল ভল্লার চিকনদাসীর জন্য গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, চিকনদাসীর চিত্তেও যার অনুরণন জেগেছে। শেষ পর্যন্ত মসিদ খাঁর শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন, চিকনের অন্যের বউ হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া, চিকনের কথার মধ্যে ভল্লার জন্য অকপট মমত্বের প্রকাশে ভল্লার দীর্ঘকালের অবদমিত বিদ্রোহ প্রচণ্ড ভীষণতায় জ্বলে ওঠে। ভল্লার নেতৃত্বে মসিদ খাঁর অর্থ দিয়ে পোষা সোয়াশো কিষান লেঠেল তাদের সোয়াশো হিরণপুরী মোষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মসিদ খাঁর বিরুদ্ধে। ভেঙে পড়ে সামন্তপ্রভুর সকল ক্ষমতা। আরশাদ বরণ করে নিষ্ঠুর মৃত্যু। মাটিতে লুটিতে পড়া চিকন, কুপিতা নাগিনীর মতো ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঙুল ঘুরিয়ে তার একটা চোখের কোয়া আস্ত তুলে আনে সে। মসিদ খাঁ বরণ করে অন্য এক ধরনের চরম নিষ্ঠুর মৃত্যু। যখন সে টের পায় যে আর বাঁচবার উপায় নেই তখন সে মরিয়া হয়ে ছুটে যায় মাটির তলায় সুড়ঙ খুঁড়ে তৈরি করা গোপন কুঠুরিতে, যেখানে নানা সময়ে কত লোককে ধরে এনে গুমখুন করা হয়েছে, পরনারীকে ধরে এনে বলাৎকার করা হয়েছে, ডাকাতির মাল এনে গাপ করা হয়েছে। সেখানে লোহার সিন্দুকে সঞ্চিত আছে অজস্র অপরাধের মাধ্যমে সংগৃহীত সোনাদানা। সেই সিন্দুকের কাছে এসে মাথা কামানো হাজীরা যেমন পবিত্র কাবার কালো পাথর বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, মসিদ খাঁ তেমনি পরম স্নেহে সিন্দুকের ঠাণ্ডা কালো গা দু'হাতে বেড় দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর সে সিন্দুকের ডালা খুলে ফেলে। এবং তখনই ঘটে বিপর্যয়। এবার আর তার পুত্রের নিয়তি চিকনদাসীরূপী নাগিনী নয়, প্রকৃত মৃত্যুরূপী নাগিনী, সত্যিকার বিষধর সাপের ছোবলে তার অভিশপ্ত জীবনাবসান ঘটে। আবুবকর সিদ্দিক এই দৃশ্যটি পরিবেশন করেছেন শক্তিময়তার সঙ্গে, নানা প্রাচীন কিচ্ছা-কাহিনী উপকথার অনুষঙ্গ মিশিয়ে। মসিদ খাঁ সিন্দুকের ডালা খুলে দেখে মোহর নয়, বাজুবন্ধ নয়। হিরে বসানো মুকুট নয়। যে মসৃণ ঠাণ্ডা মিষ্টি ছোঁয়ার গায়ে উদ্যত শুঁড় লোভের থাবা বিছিয়ে এখন সম্মোহিত চুম্বক, তার গায়ে পাতালের আদিমতম কালসিটে

শীতলতা। ভক্তি অবশতা সেবাইতের শুচিতা নিয়ে সেই ধোঁয়ারঙা খরখরে আঁশের উপর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে হাতটা বুলিয়ে আনে মসিদ খাঁ। আঙুলের ডগা বেয়ে হিম অসাড়তা চিনচিন স্রোতে মগজের নিচুকার স্নায়ুজট পর্যন্ত উঠে আসে। সে হাত তুলে নেবার ক্ষমতা সে চিরতরে হারায়...

'সিন্দুকের তলায় লৌহশয্যায় মহান সাধুসন্তদের মতোন যোগশায়িত সেই বিশাল মোটা ছাইরঙা পেট। রাতকালো পথের মতো মেঘরঙা সুদীর্ঘ পিঠ। ল্যাজের ডগা কুণ্ডলীর মতো কোন্ বাঁকে অদৃশ্য, ছায়াটে আলোয় তার দিশে নেই। মুখ তার বয়স্ক গজার মাছের মাথার মতো মেটেরঙা বিরাট গম্ভীর...

মসিদ খাঁর নাকের ডগায় টসটসে ঘাম। ভুরু থেকে ঘাম নেমে চোখের মণি জালজাল। তবু সে আবছা আঁচ করতে পায়, দুটো পুরু ঠোঁট ফাঁক করে কালো রঙের চেরা জিভের ফলা বেরিয়ে এসেছে অই। মসিদ খাঁ এটুকুও আঁচে বুঝতে পারে, হিস হিস মন্দ্র ঘোষণা তাকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হচ্ছে!

আর এই খঞ্জর দেখে চিনতে পারছো তো? আমিই তোমার সীমার... তুমি সেই এয়াজিদ না? চলে এসো আমার কুণ্ডের মধ্যে। আপ্রলয় তোমায় ঝলসে কাবাব করে খাব আমি।

কেমন তুমি বীর হানিফা এস তো দেখি! তোমায় আমি ঘোড়াসুদ্ধ পা-মাথা গিলে নেই।'

এই উপন্যাসের বীর নায়ক চরিত্র হচ্ছে ভল্লা। অশিক্ষিত, সামন্তপ্রভুর পোষা নির্দয় লেঠেল, ভেতরে যার জ্বলছে একদিকে গনগনে আগুন অন্যদিকে ভালোবাসার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ, বিশাল মানুষ, প্রচণ্ড শক্তিধর, অসীম সাহসী, যার কাঁধ আর বাহুর পেশী সর্বদা চকচক করে। এই অশিক্ষিত আনপড় ভল্লাও নির্ভুলভাবে বোঝে যে আজকের দিনে মানুষ বড় অপমানিত হচ্ছে। এবং এই বোধ সঞ্চারিত হয় তার একটি কথায়, চিকনদাসীর মনেও। 'মানুষ বড়ো অপমান হচ্ছে। মানুষ বড়ো কাঁদছে।' ভল্লার এই কথায় চিকন নিমেষে আবহমান বাংলার ফাটা ছেঁড়া জখমি বলাৎকৃত চালচিত্র দেখতে পেল পায়ের তলায় আশেপাশে চতুর্দিকে। 'হেঁটোকাঁটা নতমাথা শতমানুষ গোঙাচ্ছে। মানুষ ফাঁদে পড়ে নিরুপায় কাঁদছে। মানুষ বুলেটবেঁধা ফুসফুস আর বুটেকোটা নাঈ চেপে ধরে লুটোচ্ছে। লাঠিপেটা মানুষের লিভার ফেঁসে রক্ত ঝুঁকে পড়ছে আর মানুষ জিভের ডগা লাগিয়ে রক্তের দই চুষে খাচ্ছে।' ভল্লা আর চিকন এই পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হতে চায়, যেখানে মসিদ খাঁর মতো গ্রামীণ সামন্তপ্রভু আর বাহাউদ্দিনের মতো শহুরে উঠতি ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিক শুধু পয়সা চেনে, বিক্রি করে মানুষের ঘাম ও রক্ত, লোভ আর শোষণ যেখানে সীমাহীন অমানুষিকতায় পূর্ণ। এর বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ ক্ষেপে ওঠে। ভল্লা চিকনকে জানায় যে সে মসিদ খাঁর মাথা ফাটিয়ে দিতে পারে, আরশাদের মাজা ভেঙে দিতে পারে, ওই শহুরে ব্যবসায়ীর ঠ্যাং ধরে ফেড়ে ফেলতে পারে, ওর নাগর ছেলেটার পাগড়ি দিয়ে তার গলায় ফাঁসকল লাগাতে পারে। তারপর,

চিকনের কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সে বলে ওঠে, তারা চলে যাবে এই খরার দেশ থেকে পানির দেশে, ভাতের দেশে, গাছের দেশে, মানুষের দেশে।

উপন্যাসের এক পর্যায়ে এই খরার দেশের নিঃস্ব মানুষের দলে দলে সে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার এক অসামান্য চিত্র আছে। শেষ পর্যন্ত ভল্লাদের বিদ্রোহ শুধু আংশিক জয়যুক্ত হয়। মসিদ খাঁ, আরশাদ, বাহাউদ্দিন মারা পড়েছে। কিন্তু ভল্লা-চিকনদাসীও রক্ষা পায়নি। ভল্লার বাহন ছিল তার পরমপ্রিয় এক দুর্দান্ত মহিষ, যার আদরের নাম ছিল কালবাউশ। আহত কালবাউশ মহাবীর ভল্লার ওপর পড়ে যায় ধসে পড়া দেওয়ালের মতো। ভল্লা তার ভাঙা পা নিয়ে ভাঙা হাঁটু নিয়ে তার নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু কালবাউশ যেন তার ভরাট চাহনি দিয়ে তার প্রভুকে শেষ আশ্বাসটুকু শোনাতে চায় : 'দুঃখ্যুটা কী বা ই মরণট্যাতে! হামরা তো জিতাই গেলচি।'

আবুবকর সিদ্দিক তাঁর খরাদাহ উপন্যাসটি শেষ করেছেন একটি প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে।

ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চলে এক সময় আষাঢ় আসে, বৃষ্টি নামে ছত্রীসেনার মতো। যে খরা অনন্ত জতুদাহে সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করেছিল তা এখন জুড়িয়ে স্থির শান্ত। একটা মরা বুড়ো কাঁঠালগাছ, সে-ও সাধ মিটিয়ে ভিজতে থাকে আর কী আশ্চর্য, তার শুকনো গুঁড়ি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে একটি-দুটি কাঁচা ডাল।

উপন্যাসের শেষ বাক্য ক'টি এই রকম : 'এই যে খরাসাক্ষী কাঁঠালগাছ, এরো একটা গল্পো ছিলো। বানানো ভাষা বাদ দিয়ে তার নিজের জবানেই বলা যাক :

হামার ই হাডডিগুডডিসার শরীলখান। মাজ-মজ্জা নাইখ। উ শালোর জোদদারমার্কা খর‍্যাটা শুষ্যা শুষ্যা শুখায়্যা লিয়্যাছে। চামমাসে জানপ্রাণের রস লিক্যেশ। ই আঙড়া পোড়া দেহ দেখ্যা দিল ধড়ক্যায় তুদের। কেনে? বুলি কেনে এ্যাতো ডরপুক তুরা? খরা আচে তো কী? হামি শুখায়্যা হাজা তো কী? ই শালো মান্ধাতার বেরেক্ষ থ্যাঁতলা পেরমায়ুর মাল। হামার ই হাড়কাঠামো লিয়্যা কালীম্যাঘের আওয়াজ শুনি গুমাগুম। খল খল বরষ্যার ঢল লাম্যে। হামি সোঁদা সোঁদা বাস পাই। হাঁর লাতিলাতিন আচে মাটির তলবাগে। ই বয়ষ্যায় অরা সভে জাগ্যা উঠবে। তু সবাকে ফল দিব্যে, রস দিব্যে। তুরা প্যাট পুর‍্যা খাবি। তুদেব আওলাদ বাচ্চারা ভি খাব্যে। খরাট্যে কদ্‌দিন আর?'

বক্তব্যটা স্পষ্ট। শ্রমজীবী মানুষের শোষণ গঞ্জনা আর বেশি দিন চলবে না। ভল্লাদের আংশিক বিজয় নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'খরাদাহ' উপন্যাসে আবুবকর সিদ্দিক ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সচেতনভাবে বিভিন্ন অংশে যে বৈচিত্র্য এনেছেন, যে রকম সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা অমনোযোগী পাঠককেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আঞ্চলিক ভাষার অনায়াস ব্যবহার সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে উপন্যাসটি প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা

থেকে উঠে এসেছে। সেখানে মাটি আর ঘামের গন্ধ এখনো টাট্‌কা লেগে রয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে কোথাও নির্লিপ্ত, কোথাও অবেগঘন ডিটেল, কোথাও মিথের আভাস।

স্ট্রাকচারের দিক থেকেও 'খরাদাহ' আমাদের আকর্ষণ করে। মসিদ খাঁ, আরশাদ, চিকনদাসী, কিসমত, ভল্লা প্রমুখের সঙ্গে বাহাউদ্দিন, দলিল, নাটুমিয়া, শীতল প্রমুখকে কাহিনীর মধ্যে লেখক নিপুণভাবে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। শুরুতেই দাবদাহ, নির্মমতা, সংঘাতের সম্ভাবনা স্পষ্ট। কিন্তু বৈপরীত্য নির্মাণের জন্য লেখক একেবারে শুরুতে পরিবেশন করেছেন বরযাত্রী পার্টির হাল্কা খেউড়-লুচ্চামির অশ্লীল হাস্যরস। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ নিসর্গের মাঝে হিজড়া মাতাল বর দলিল একসময় পালকি থেকে লাফিয়ে নেমে কোমর বেঁকিয়ে খেউড়ে ধরে:

ঠিক দুক্ষুর বেলা
ভূতে মার‍্যে ঢ্যালা রে ভাই
ভূতে মার‍্যে ঢ্যালা।
ঢ্যালা খায়্যা লাচন লাগায়
শতেক ন্যালাখ্যাপা ভাই
শতেক খ্যাপন্যালা।
ঝাউ গিজার গিজ ঘিনা তা
গিজ ঘিনা তা
লাচ্যে শিবের চ্যালা ভাই
পাগলা শিবের চ্যালা।
অয় ভূতে মার‍্যে ঢ্যালা রে ভাই
ভূতে মার‍্যে ঢ্যালা।

উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে আবহ ভয়ঙ্কর বিপরীতে রূপ নেয়। বাংলার গ্রামের নিঃস্ব মানুষগুলোর মধ্যেও যে বিপুল বিদ্রোহী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে আমরা সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠি। ভল্লার নেতৃত্বে হোঁককা দেওয়া সোয়াশো হিরণপুরী মোষ, সোয়াশো লাঠি, সোয়াশো কিষান ওই বিপুল গণশক্তিরই প্রতীক।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সেলিনা হোসেনের গায়ত্রী সন্ধ্যা

সৈয়দা নাজনীন আখতার

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে সেলিনা হোসেন বহুমাত্রিক লেখক। তার কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে বাঙালি জাতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ভারত বিভাগ, তেভাগা আন্দোলন, সামরিক শাসন, গণআন্দোলন, দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধ, নারীজীবন, আবহমান বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ। তবে এসব বিষয়ের মধ্যে যে-বিষয়টি তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই বিষয়টি তার সৃষ্টিশীলতার মর্মমূলে প্রোথিত। *গায়ত্রী সন্ধ্যা* মূলত এই জাতীয়তাবাদের পটভূমিতে রচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে এই জাতীয়তাবাদকে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে *গায়ত্রী সন্ধ্যার* বিষয় করে তুলেছেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। কিন্তু সেই আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করে নেওয়া জরুরি বলে মনে করছি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, জাতীয়তাবাদ বিষয়টি রাজনৈতিক একটি পরিভাষা বা ধারণা। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব উনিশ শতকে। এর পূর্বে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিশ্বব্যাপী নিজ নিজ জাতির গভীরে সংগুপ্ত ছিল। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস ও আলোকপর্বের প্রভাবে মানুষের ভেতরে জাগ্রত হয় স্বদেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ, মানবিকতা, রোমান্টিকতা; মানুষ হয়ে ওঠে অনুভূতিপ্রবণ। আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ তাকে করে তোলে যুক্তিবাদী, সাহসী, অধিকার সচেতন। জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম ও মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটে প্রায় একই সঙ্গে। এই বোধই মানুষকে পরোক্ষ শত্রুর মোকাবেলা করার শিক্ষা দেয় এবং মাথা উঁচু করে বাঁচবার সাহস জোগায়। এই সাহস ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কোনো জাতি ধর্মকে আঁকড়ে ধরে, কোনো জাতি সংস্কৃতিকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ধর্ম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় মিশে আছে ভাষা-ঐতিহ্য আর জনগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা, আবেগের প্রবহমানতা, আহার-বিহারের স্বচ্ছতা, কৃষিনির্ভর জীবনের সারল্য।

ভারতীয় ইতিহাসে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে ১৮৮৫ সালে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই জাতীয়তাবাদের কল্পিত আবশ্যিক স্তম্ভ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার আচরিত ধর্ম। প্রতিক্রিয়া হিসেবে জন্ম হয় মুসলিম লীগের (১৯০৬)। দীর্ঘ প্রায় বাষট্টি বছরের (১৮৮৫-১৯৪৭) ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চর্চার চূড়ান্ত মুহূর্তে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাকে ভাগ করা হয়; কেবলমাত্র ধর্মের কারণে পূর্ববাংলা অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের নির্মমতার শিকার হয় সাধারণ মানুষ যার ক্ষত শুকায়নি বিগত তেষট্টি বছরেও। এ সম্পর্কে হায়াৎ মামুদ বলেন :

"১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ আগস্টের মধ্যরাতে ভারতের সঙ্গে বঙ্গদেশকেও যখন দু'টুকরো করা হল তখন অনিবার্য ভবিতব্য হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ই তাকে মেনে নিয়েছিল। দ্বিজাতিতত্ত্ব নামে যে ছুরি দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল রোগী বাঁচানো : ভারতে হিন্দুরা বাঁচবে, পাকিস্তানে মুসলমানরা বাঁচবে। পঙ্গু হয়ে ধুঁকে ধুঁকেও যে মরতে পারে, সে সম্ভাবনা তখন কেউই দেখতে পাননি – যদিও সেটাই শেষ পর্যন্ত ঘটে যাচ্ছে।"[১]

বাঙালি জাতীয়তাবাদ দুটি কালখণ্ডে বিভক্ত : ভারতবিভাগ-পূর্ববর্তী এবং ভারতবিভাগ-পরবর্তী। ভারতবিভাগ পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে ছিল ধর্ম। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর ঢাকায় বক্তৃতা দেওয়ার পর যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়, তাতে সম্মিলিত ঐতিহ্যবোধ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখা প্রাধান্য পায়, বাদ পড়ে ধর্ম। কারণ কেবলমাত্র ধর্মীয় সাদৃশ্য জাতীয় সম্প্রীতি ও সংহতি টিকিয়ে রাখতে পারে না। ধর্ম ব্যক্তিমুক্তির পথ প্রস্তুত করে, গোষ্ঠীর নয়। ফলে মানুষ স্বার্থবাদী হয়ে ওঠে আর স্বার্থবাদী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় স্বার্থান্বেষী চক্র। তারা ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে। এতে রাজনীতি হারায় তার নীতি, ধর্ম হারায় তার মূল্যচেতনা আর মানুষ হারায় ঔদার্য্য। এরই প্রতিক্রিয়ায় দেখা দেয় সাম্প্রদায়িকতা যার অবসান ঘটাতে লেগে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী, ঘটে হানাহানি, রক্তপাত, জনজীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশও ঘটে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকাঠামো পাকিস্তানের ভেতরে, কিন্তু ধীরে ধীরে তা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সালাহউদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন :"আমাদের বাংলাদেশ এক প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীনকাল থেকে তাদের পৃথক সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে এবং বাইরের কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করে এসেছে। এর অর্থ এই নয় যে, বহিরাগত কোনো প্রভাব এদেশে পড়েনি। বস্তুত বাংলাদেশ ভূখণ্ড বহুবার বিদেশি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, বিজিত হয়েছে; কিন্তু যারা বাইরে থেকে এসে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে, কালক্রমে তারা যেমন এদেশের আবহাওয়া ও

সংস্কৃতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে, তেমনি আবার বাংলাদেশের দেশজ সংস্কৃতির বহিরাগত উপাদানের সংমিশ্রণে বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এইভাবে বাংলার সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে যুগে যুগে।"[২]

বাঙালি জাতীয়তাবাদের শেকড় তাই বলা যায়, প্রোথিত ছিল এদেশের মর্মমূলে; সম্পূর্ণ অর্থেই দেশজ চারিত্র অর্জন করেছিল এই জাতীয়তাবাদ। কিন্তু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি। এই বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মেনে নিত, তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতে থাকত না। কারণ পূর্ববাংলার জনগণ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যাগরিষ্ঠের জাতীয়তাবাদকে মেনে নিলে তাদের হারাতে হত শাসনক্ষমতা। এজন্যেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি শাসকেরা ভাষাবিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অবশ্য এর পেছনে অর্থনৈতিক শোষণও সক্রিয় ছিল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা ভাষাকে। এর ফলে ধীরে ধীরে বিস্তৃত এবং এ দেশের জনগণের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছে বাঙালি জাতির চেতনা। প্রাথমিকভাবে এই বোধটি সাংস্কৃতিক হলেও পরে তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঘটে এর সংগ্রামী পরিসমাপ্তি।

ঐতিহাসিক সালাহউদ্দীন আহমদ বলেছেন, বাঙালিরা একই সঙ্গে যেমন বাঙালি, তেমনি মুসলমান। এই দুটি বিষয় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অবিভাজ্য বোধে প্রতিষ্ঠিত। তার ভাষায় : "বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলাদেশের মুসলমানরা আজকাল নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব অনুভব করেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যে ভূমিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়, সেটাও প্রধানত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনার ক্রমবিকাশের পরিণতি, একথা অস্বীকার করা যায় না।"[৩]

তিনি আরও লক্ষ করেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে, অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে বাঙালি মুসলমানেরা, বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানেরা তাদের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে উভয় সংকটে পড়ে। তারা বাঙালি না মুসলমান, অথবা কতটা বাঙালি আর কতটা মুসলমান এই ধন্দে পড়ে যায়। নিজেদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এই সময় নিজেদের বাঙালিত্ব, অর্থাৎ দেশজ সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে ইসলাম ধর্মের সর্বব্যাপক আবর্তের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছেন, কেউ কেউ আবার ইসলাম ধর্মের প্রভাব অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের সত্তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।[৪] চেতনাগত এই দ্বৈরথে শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয়ী হয়েছে শেষোক্ত ধারাটি, অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যা ছিল মূলত সাংস্কৃতিক, ভাষাভিত্তিক।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ সংকট, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের ইতিবৃত্ত। বাংলাদেশের অন্য লেখকদের মতো সেলিনা হোসেনও এই চেতনায় স্থিতধী। তার সমগ্র রচনাবলি মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই নির্যাস। তার অন্যান্য লেখায় এই জাতীয়তাবাদের পরোক্ষ প্রতিফলন থাকলেও শেষাবধি তিনি লিখে ফেলেছেন একটি সম্পূর্ণ ত্রয়ী উপন্যাস। বোঝাই যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের দ্বারা কতটা প্রাণিত হলে এরকম একটি সৃজনী প্রকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করা যায়।

গায়ত্রী সন্ধ্যা: বাঙালি জাতির ইতিকথা

গায়ত্রী সন্ধ্যা তিন খণ্ডে বিভক্ত একটি বৃহৎ উপন্যাস। এককভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেভাবে এর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, তাতে একে নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক উপন্যাস বলে অভিহিত করা যায়। এই উপন্যাসের পটভূমিটিও বিশাল : রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জনআন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, যুদ্ধ ইত্যাদি। প্রায় তিরিশ বছরের জাতীয় উত্থান-পতনের নানা কাহিনী এর বিষয়বস্তু। স্বাভাবিকভাবেই যে-কেউ একে গদ্যে রচিত এপিক বলে চিহ্নিত করতে পারেন। বলা নিস্প্রয়োজন, আধুনিক কালে কেউ কবিতায় মহাকাব্য লেখেন না, মহাকাব্যের স্থান এখন চলে গেছে উপন্যাসের দখলে। জাতীয় চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করবার ফলে *গায়ত্রী সন্ধ্যা*ও হয়ে উঠেছে এই ধরনের আধুনিক গদ্য-এপিক। উপন্যাসের কালপরিসরে (১৯৪৭-১৯৭৫) একের পর এসে ভিড় করেছে বহুমাত্রিক ভাবনা, বহুঘটনা, বহুস্বর। মিখাইল বাখতিন উপন্যাসে যে বহুস্বরের সমাবেশ লক্ষ করেছিলেন, সেলিনা হোসেনের *গায়ত্রী সন্ধ্যা* যেন হয়ে উঠেছে ওই ভাবনারই প্রতিচ্ছবি।

কাঠামোগত দিক থেকে বিভক্ত *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র তিনটি খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ের সংখ্যা ৪১ (১৭+১২+১২)। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন প্রসঙ্গ, কিন্তু এসব প্রসঙ্গ আবর্তিত হয়েছে পূর্ববাংলা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঘিরে। পূর্ববাংলা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদই হচ্ছে এর কেন্দ্রীয় বিষয়। এস. ওয়াজেদ আলী পূর্ববাংলা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে সেই মৌল বোধে : "বাঙালির, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক ভবিষ্যৎ আশার কেন্দ্র হচ্ছে পূর্ববঙ্গ। যথাসময়ে প্রকৃত বাঙালি, রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন যে পূর্ববঙ্গের উর্বর ভূমিতেই মূর্ত হয়ে উঠবে তা স্পষ্টতই বোঝা যায়।"

উপন্যাসটিতে অসংখ্য সংগ্রামী মানুষের মিছিল। এই মানুষের নেতৃত্বে রয়েছেন আলী আহমদ। তিনি দেশভাগের নির্মম বর্বরতার শিকার। চব্বিশ বছরের উদ্দীপ্ত যুবক আলী আহমদ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রাম ছেড়ে গর্ভবতী স্ত্রী পুষ্পিতা, ছ'বছরের শিশুপুত্র প্রদীপ্তকে নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে মহানন্দা। উদ্দেশ্য রাজশাহীতে পৌঁছানো। পরিবারের সদস্য ছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে গাঁয়ের দরদী কালো খালা ও তার ছেলে ফজলে গাজী, রাঙামাটি গাঁয়ের হেডমাস্টার নসরুল্লাহর স্ত্রী হাসনা বেগম ও তার দুই ছেলে। বড়ো ছেলে মফিজুল সদ্য যুবক, বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ে। স্বজন

সম্পদ ও স্বদেশ হারানো মানুষগুলো সামান্য আশ্রয়ের আশায় পূর্ববাংলায় আসে। তাদের একটাই চিন্তা কিভাবে কাটবে আগামী দিন। তাদের ভাবনা আগামী প্রজন্মের জীবন চলবে কীভাবে। এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে রেলগাড়িতে জন্ম নেয় আলী আহমদের ছোট ছেলে প্রতীক। দেশত্যাগ আর নতুন ভূখণ্ডে অপরিচিত পরিবেশে আশার পথে নিজেদের মনের মধ্যে চলছে ঝড়, নানা প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে সে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছে, কেন ধর্মের কারণে মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়? ক্ষমতার পালাবদলে কেন ব্যবহৃত হয় ধর্ম? জীবনের ভয়ে একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে আসছে মুসলমানরা আর পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা। পেছনে ফেলে যেতে বাধ্য হচ্ছে জন্মভূমি। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে শৈশব-কৈশোর যৌবনের স্নেহমাখা গ্রাম, উন্মুক্ত আকাশ, মাঠ-প্রান্তর।

আলী আহমদের জীবন ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা। তিনি দেখেছেন বামপন্থী ও ডানপন্থী রাজনীতির উত্থান-পতন। পূর্ববাংলায় এসে অবলোকন করেছেন স্বাধীন রাষ্ট্রের তেভাগা আন্দোলন, ধর্মবিদ্বেষ, ভাষাবিদ্বেষ, রবীন্দ্রবিরোধিতা। বাঙালি সংস্কৃতির অনুরাগী হলেই হজম করতে হচ্ছে 'মালাউন' গাল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের এই আক্রমণ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে সংঘবদ্ধ হচ্ছে মানুষ। ভাষার প্রশ্নে অন্যান্য জায়গার মতো রাজশাহীর ঐতিহাসিক খাপড়া ওয়ার্ডে জেলজীবন যাপন করছে মফিজুল। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা কম্পরাম সিংয়ের, কথা হচ্ছে হাজী দানেশের সঙ্গে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে শিবেন রায়ের তেজোদীপ্ত মুখ। নাচোল তেভাগার দাবিতে ধানকাটার উৎসবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে কৃষকের, পুলিশকে হত্যা করছে কৃষক। সেনারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম, গ্রেফতার হলেন ইলা মিত্র। ফণিমনসার ঝোপে পাওয়া যাচ্ছে কালো খালার একমাত্র সন্তান ফজলে গাজীর লাশ। রাজশাহী কলেজ থেকে বদলি হয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করছেন আলী আহমদ। তার সঙ্গে পরিচয় ঘটছে অহিউল্লাহ, শহীদ সাবের, আমীর হোসেন, কবি হাসান নসিব, হাফিজুদ্দীন, ডোম বুলু দাস, প্রেমলালের মতো আরও অনেকের। সত্তরের জলোচ্ছাসে বিপন্ন সোনাই আশ্রয় পাচ্ছে তার গৃহে। বেড়ে উঠছে তার দুই ছেলে প্রদীপ্ত ও প্রতীক। তাদের জীবনে অঙ্কুরিত হচ্ছে দেশপ্রেমের বীজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হচ্ছেন আলী আহমদ। পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। সুফিয়া কামালের প্রস্তাবে জন্ম নিচ্ছে ছায়ানট। বাঙালি-বিহারির বিভাজনকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হচ্ছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সৈয়দপুরে। নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের পাঁচশো কর্মী নিয়ে সমস্যার সমাধানে তৎপর হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এরই মধ্যে বেধে গেল পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ। শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি পেশ করলেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হচ্ছেন আসাদ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের হাতে নেতৃত্ব দিয়ে পদত্যাগ করছেন। সত্তরের ভয়াবহ জলোচ্ছাসে বিপন্ন হচ্ছে উপকূলের মানুষ। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়েও আওয়ামী লীগ

সরকার গঠন করতে পারছে না। নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। আলী আহমদের ছেলেরা যাচ্ছে যুদ্ধে। স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে নিখোঁজ হচ্ছেন আলী আহমদ। চোখ ও হাত হারিয়ে ফিরে আসছে প্রদীপ্ত। প্রদীপ্তর শ্বশুর পরিবারের সবাই বিহারিদের (সৈয়দপুরে) হাতে নিহত হয়েছে এই খবর নিয়ে ফিরছে প্রতীক। পাকিস্তানের কারাগার হতে ফিরে আসছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি দেশগড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই রন্ধ্র দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সেনাবাহিনী, ক্ষমতা কব্জা করার মিশন নিয়ে। সপরিবারে নিহত হলেন শেখ মুজিব। তাকে দেখার সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল সোনাইয়ের। প্রদীপ্ত হতাশার মাঝে নতুন জাতিগঠনের জন্যে শেখ মুজিবের নামে নিজের সন্তানের নাম রেখে তার চেতনাকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখছে।

এই হচ্ছে 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'র কাহিনী যার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে আলী আহমদ। এই চরিত্রটিকে ঘিরে আরও যারা যুক্ত হয়েছেন, তার সান্নিধ্যে যারা এসেছেন, যে-সব টুকরো টুকরো ঘটনা আবর্তিত হয়েছে, তার সবকিছুই বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিকতার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন প্রকৃত অর্থেই 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'কে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে রচনা করেছেন।

গায়ত্রী সন্ধ্যা, দেশকাল ও রাজনীতি

উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় উপন্যাস হচ্ছে ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক। এর অর্থ ঔপন্যাসিক যে চেতনাকে লালন করেন, তা-ই প্রতিফলিত হয় তার উপন্যাসে। এই উপন্যাসটিও ঔপন্যাসিকের জীবনার্থকে ধারণ করে হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক উপন্যাস, ধারণ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে।

ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম অনুসারে ১৯৪৭-৫২ কালপর্বে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে ভাষার দাবিতে। পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানপ্রীতি কেটে যাচ্ছে। উপলব্ধি করতে শুরু করেছে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বাঙালি জাতিসত্তা। কিন্তু এই জাতিসত্তার কথাই দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন আলী আহমদ : "আমরা জাতিসত্তায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান।" ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার পার্থক্য সাধারণ মানুষ বোঝে না আর প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষিতরা বুঝেও জাতিসত্তার ওপর আঘাত হানে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেই এমনটা ঘটেছে। দেখা দিয়েছে বাদ-প্রতিবাদ। পাকিস্তান সৃষ্টির কালে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি বাঙালি মুসলমানেরা আস্থা জ্ঞাপন করেছিল কিছু শর্ত সাপেক্ষে। এই শর্তের মধ্যে ছিল যে পূর্ববাংলার বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে বর্জন না করেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যখন পাকিস্তানি শাসকেরা অগ্রাহ্য করতে শুরু করল তখনই তারা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকেই প্রাধান্য দিল আর এরই প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সরে এল দ্বিতীয় অবস্থানে। পূর্ববাংলার

মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, ভাষা হারিয়ে গেলে হারিয়ে যাবে তার জাতিত্ব। পরিণত হতে হবে অপজাতিতে, অবগাহন করতে হবে অপসংস্কৃতিতে। মেনে নিতে হবে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, বিভাষীর শাসন, শোষণ, নির্যাতন। তারা উপলব্ধি করতে শুরু করে, ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে মুক্ত হলেও পূর্ববাংলা স্বাধীন হয়নি। পূর্ববাংলা ব্রিটিশের উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ অবস্থা পূর্ববাংলার সচেতন শিক্ষিত শ্রেণী, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ মেনে নিতে পারেনি। ফলে তারা আত্মমুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত হয়েছে। *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র মফিজুল ও তার মতো দেশ হারানো যুবকেরা ধারণ করেছে এই চেতনা, দেশমৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছে নিজেদের জাতিগত অস্তিত্ব। সেলিনা হোসেন উপন্যাসে যা তুলে ধরেছেন, বাস্তবেও ঘটছিল এটাই। বিকাশ ঘটছিল ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, যাদের অন্তরদেশে সংগুপ্ত ছিল বহুকাল ধরে বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ।

ভারতবিভক্তির পূর্বে ও পরে ধর্মের চলছিল অপব্যাখ্যা বা ধর্মের প্রতি নির্ভরতা। সাধারণ মানুষ এর শিকার হলেও তাদের অনুভূতিকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই কারণে রাজনৈতিক জিঘাংসার শিকার হচ্ছিল অনেকেই। এদেরই একজন হচ্ছেন *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র ভাষাসৈনিক অহিউল্লাহর বাবা। অর্থনৈতিক, বিশেষ করে ভূমিকেন্দ্রিক শোষণের বিষয়টি ছিল সাধারণ ঘটনা। এমনকি হিন্দু জমিদার বা মুসলমান জমিদারদের হাত থেকে রেহাই পায়নি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মানুষ – সে হিন্দুই হোক আর মুসলমান। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'র বুলু দাস, প্রেমলাল, রিনি, অহিউল্লাহ, সোনাই এরা একই সঙ্গে সরকার ও মহাজনদের হাতে বন্দি। নতুন আশাবাদের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও পাকিস্তানি শাসকবর্গ যাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে, সেই সামন্তবাদী জমিদারদের অনুসৃত সামন্তবাদী নীতি টিকিয়ে রাখতে চাইছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র এভাবেই হয়ে ওঠে অগণতান্ত্রিক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটলে ওই সামন্তবাদী শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখা যাবে না বলেই এর বিরোধিতা করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এই সময় মিলেমিশে গিয়েছিল। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ছিল উভয়ের সংগ্রাম। শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মীয় বিভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফাঁদ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিভোর রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা। একারণেই এ উপন্যাসে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে গোপনে বৈঠক করেছে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি। সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে বিবৃতি দিচ্ছেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকগোষ্ঠী নতুন করে ভাষা-রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায়। *গায়ত্রী সন্ধ্যায়* এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনেছেন সেলিনা হোসেন। খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুতে ভাষণ দিচ্ছেন, এই ভাষণ বুঝতে পারছে না বাঙালি অহিউল্লাহ। অহিউল্লাহর এই অজ্ঞতা নিয়ে এক বৃদ্ধ তাকে ছোটলোক বলে তিরস্কার ও অবজ্ঞা করছে। বৃদ্ধের ওই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত বাঙালি মুসলমানদের একটা অংশের দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা পরিগণিত হয়েছে ব্রাত্যজনের ভাষা হিসেবে। আধুনিক কালে কংগ্রেসের বিকল্প প্রতিপক্ষ হিসেবে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন মুসলিম লীগের নেতারা উর্দু ভাষাকেই যোগাযোগ ও রাজনীতির ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। ফলে এই ভাষা হয়ে ওঠে এলিট শ্রেণীর ভাষা। বাস্তবতাও ছিল এরকমই, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেছিলেন ভারতীয় মুসলিম এলিট শ্রেণী। তারা উর্দুতে কথা বলত, পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই উর্দু ভাষাকেই তারা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। উর্দু উন্নীত হয়েছে অভিজাত ভাষায় আর বাংলা ব্রাত্যজনদের। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এরই প্রভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল; ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার অবস্থান ছিল এরকমই – দরিদ্রের ভাষা, অস্পৃশ্যের ভাষা। *গায়ত্রী সন্ধ্যা*র দুটি চরিত্র সরাসরি এই ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে; এদের একজন অহিউল্লাহ শহীদ হন, অন্যজন মফিজুল। দ্বিজাতিতত্ত্বের নির্মম পরিণতি হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করা হয় রিফিউজি বলে। ঔপন্যাসিক তার কাহিনীতে উল্লেখ করতে ভোলেননি যে বাংলাভাষার পক্ষে পূর্বপাকিস্তান গণপরিষদে সোচ্চার হচ্ছেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর। সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভাষা আন্দোলনে, শহীদ হচ্ছে। পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তানি শাসক। প্রকাশিত হচ্ছে একুশের সংকলন।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকেও এইসময় ব্যবহার করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে। বিষবৃক্ষের মতো এর বীজ বাঙালি মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, হানাহানি, রক্তপাত ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সর্বত্র। নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক মানুষ। এরা মার খাচ্ছে, শহীদ হচ্ছে, পঙ্গু হচ্ছে। ভারতের দালাল, মালাউন, কমিউনিস্ট বলে তাদের আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেনি তারা। 'দৈনিক সংবাদ' অফিস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, রক্তাক্ত মেঝেতে হুটোপুটি খাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ভুবন। এই ভুবনকে বাঁচাতে গিয়ে অবাঙালিদের হাতে খুন হচ্ছে তেজি সাহসী যুবক আমির হোসেন। জরায়ুর মুখে ফুটন্ত ডিম প্রবেশ করানোর পরও ইলা মিত্র মুখ খুলছেন না। যে-সাঁওতালদের তিনি ধানকাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারাও জীবন দিচ্ছে কিন্তু ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে একটিও কথাও স্বীকার করছে না। ইলা মিত্রের উপস্থিতি এই উপন্যাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল।

প্রকৃতপক্ষে নারীর জীবন ও সংগ্রাম এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইলা মিত্র তাদের নেতৃত্ব দিলেও তাকে ঘিরে আরও বেশ কিছু নারীচরিত্রকে আমরা চমৎকার ভূমিকায় উপস্থিত হতে দেখি। এদের অধিকাংশই যদিও নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু জীবন সংগ্রামে ও বোধে তারা উজ্জ্বল। এদেরই একজন মধুমালতী। প্রথমে সে হারিয়েছে সংসার, স্বামী ও সিঁদুর, তারপর আত্মহত্যা করেছে। পুষ্পিতা উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা

বহন করেছে সারাজীবন। কালো খালা হারিয়েছে একমাত্র সন্তানকে। হাসনা বেগম হারিয়েছে মফিজুলের মতো সংগ্রামী সন্তান। অহিউল্লাহ মায়ের বাঁচার কোনো অবলম্বন নেই। এরা প্রত্যেকেই এভাবে এ উপন্যাসে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক-একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নারীরও যে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল, সেলিনা হোসেন সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাঙালি জাতিসত্তা আর জনমানুষের সংগ্রাম – সে নারীই হোক কিংবা পুরুষ – এভাবেই একীভূত হয়ে গিয়েছিল এই সময়। বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকাকেও ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন সেলিনা হোসেন। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি আলী আহমদ একদিকে তাগিদ অনুভব করেন সংস্কৃতির বিকাশের অন্যদিকে উত্তরসূরির জন্যে প্রকাশ করে চলেন নিজের ভাবনাকে – শানিত হয়ে ওঠে তার কলম। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রে স্থাপন করেন তিনি। নিজেকে নিরন্তর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ নয়, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই বাঙালি তার মুক্তি অর্জন করতে পারে। আলী আহমদের এই ভাবনাকে যেন বাস্তবায়িত করতে আবির্ভাব ঘটে শেখ মুজিবুর রহমানের।

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা তরুণ রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমানের ধীরে ধীরে উত্থান ঘটতে থাকে এইসময়। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ তিনি ও ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে জেলে যেতে হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বস্তরের মানুষকে ছুঁয়ে যায়, সেলিনা হোসেন নির্মিত চরিত্র মানিক মিয়ার কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি :

"বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা শুধু সাংবাদিক বা সাংবাদিকতার জীবন মরণের সংগ্রাম নয়, সে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত।" (গায়ত্রী সন্ধ্যা, পৃ. ৩৪০) শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি উত্থাপন করলে পূর্ববাংলার মানুষ একে তাদের মুক্তিসনদ বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক আমাদের জানান এবং বাস্তবেও তখন ঘটেছিল, 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি' পুস্তিকাটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায় ও জনপ্রিয়তা পায়। শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ঊনসত্তর সালে শুরু হয়ে যায় গণআন্দোলন। আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব ছাড়া পেলে এরপর ঘটে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা, সত্তরের নির্বাচন। সমগ্র বাংলাদেশের একক অবিসংবাদিত নেতা রূপে আবির্ভাব ঘটে শেখ মুজিবের। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত মুহূর্তের মহড়া শুরু হয়ে যায় নির্বাচনের নেপথ্যে।

গায়ত্রী সন্ধ্যার এই প্রসঙ্গটিই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র উপন্যাসটি যেন এই চূড়ান্ত মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিল – কখন জন্ম হবে বাংলাদেশের। শেখ মুজিব আর

বাংলাদেশ যেন এই উপন্যাসে অভিন্ন হয়ে উঠেছে জাতিসত্তার বোধে। নির্বাচনের রায় উপেক্ষিত হলে এরপর ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন, যা এখন আমাদের ইতিহাসের পরিচিত অধ্যায়। এই ঘটনাক্রমের মাঝেই অপারেশন সার্চলাইট শুরু হলে উপন্যাসের কল্পিত চরিত্র জন্ম নেয় মঞ্জুলিকা-প্রদীপ্তর সন্তান অজেয়। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন যুদ্ধ, নির্যাতন, হত্যার মাঝে নতুন প্রজন্মের আগমন ও অবস্থান তৈরি করেছেন। এরাই একসময় হয়তো হয়ে উঠবে বাংলাদেশের ভবিষ্যত। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। শেখ মুজিব গ্রেফতার হন অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে। আলী আহমদ দেশ থেকে পালিয়ে না গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু বিজয়ের অল্প ক'দিন আগে পাকিস্তানিদের দোসর আলবদর-রাজাকাররা তাকে ধরে নিয়ে যায় আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে, জড়িয়ে পড়ে সমগ্র জাতি। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ। কিন্তু ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়ে যায় অনেক তরুণ-তরুণী। যুদ্ধ শেষে হাত ও চোখ হারিয়ে ফিরে আসে প্রদীপ্ত। প্রতীক জানতে পারে তার প্রেমিকা বন্যা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, হারিয়ে গেছেন আলী আহমদ। প্রতীক আর প্রদীপ্ত বাবার লাশ খুঁজতে থাকে, পায় না। পুষ্পিতা জেনে যায় তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। এরকম অসংখ্য পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় এই চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক।

এবার আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। শুরু হয়ে যায় আরেক সংগ্রাম – দেশগড়ার সংগ্রাম। শুরু হয় গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। কিন্তু হঠাৎই থেমে যায় বাংলাদেশের গতিপথ। সপরিবারে নিহত হন শেখ মুজিব। প্রদীপ্ত মুজিব-হত্যার শোককে শক্তিতে পরিণত করার স্পৃহায় নিজের সন্তানের নাম রাখে অজেয় মৃত্যুঞ্জয় মুজিব, যিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সেলিনা হোসেন এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে প্রবহমান রেখেছেন।

শেষকথা

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের একটা প্রবণতা হচ্ছে সমকালের কোনো ঘটনা বা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করা। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এর শুরু; সাম্প্রতিক কালে একে পূর্ণতা দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার এবং ঈষৎ পূর্বে আবু জাফর শামসুদ্দীন, রিজিয়া রহমান। কিন্তু এরা কেউই ইতিহাস ও মতাদর্শকে এক সঙ্গে মিশিয়ে কোনো উপন্যাস রচনা করেননি। সেলিনা হোসেনের লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রচিত্রণ নয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে উপন্যাসের বিষয় করে তোলা। বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাই তার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ হয়ে উঠেছে, বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় বিষয়।

ভারতবিভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমানদের ভূমিকা, বাংলাদেশের জন্মকে কেন্দ্র করে যত রকমের জিজ্ঞাসা আছে, তার সবই উত্থাপিত, বিশ্লেষিত ও সংশ্লেষ ঘটেছে সেলিনা হোসেনের এই ত্রয়ী উপন্যাসে। একটি জাতির উত্থান সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই উপন্যাসের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। সমকালের একজন লেখক-বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের জন্মকে, দেশ সংক্রান্ত নানান দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জিজ্ঞাসাকে কী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, এই উপন্যাসে পাওয়া যায় তার ছবি। সেলিনা হোসেন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেন যেসব বুদ্ধিজীবী অথবা সাধারণ মানুষ, তাদের সবার মুখপাত্র হিসেবে যেন রচনা করলেন সমকালের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের এই ভূখণ্ডের বাঙালি মুসলমানদের জাতিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও জন্মের ইতিবৃত্ত হয়ে ওঠায় উপন্যাসটিকে আধুনিক গদ্য-মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করা যায় নিঃসন্দেহে।

টীকা

[১] "উপনিবেশবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ", *বাঙালি জাতীয়তাবাদের কাছে ঋণ*, সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১।

[২] বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সালাহ্উদ্দীন আহমদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১০৮।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

চার উপন্যাসের জহিরকথন

কা ম রু জ্জা মা ন জা হা ঙ্গী র

কথাসাহিত্য তথা গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিক, গল্পবলার ধরন, ভাষাসৌকর্য ইত্যাদি নিয়ে নানান কথকতা, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারে কম হয়নি। এই সময়ের উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ, তার প্রাসঙ্গিকতা, ধরন, বিভিন্ন ভাষায় এর বিকাশ ও

আমাদের সাহিত্যে এর শিল্পসম্মত বিস্তারের সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়েও তুমুল কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক উৎকর্ষকতার স্বার্থেই এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। এও উল্লেখ করতে হয় যে, এ বিষয়ে একাডেমিক আলোচনা তেমন একটা চোখে পড়ে না। এ লেখাটি শহীদুল জহিরের উপন্যাসে জাদুময়তা, বাস্তবতার বিন্যাস ইত্যাদির প্রাথমিক অনুসন্ধান মাত্র।

সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিক জীবনে জাদুময়তার সাথে মিথের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জীবন্ত হয়ে থাকার এক ব্যাপার আছে। মিথ নিয়ে একুশ শতকেও শিল্প-সংস্কৃতি বা ইতিহাস-নৃতত্ত্বে আগ্রহের শেষ নেই। এর সাথে আবিষ্কৃত হয় প্রাকৃতিক উপাসনার হরেক রূপ, জড়-জীবের মিলিত সত্তার ভাবনার ধরন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদি মানবসমাজের ইতিবৃত্ত, সামাজিক-রাজনৈতিক মানস-গঠন, সেই প্রাচীনকালের হীন জীবন-যাপনের সাথে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধের ধরন, জীবনপ্রবাহ, রূপতত্ত্ব। মিথের সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার এখন দেখা যায় শিল্পে, সাহিত্যে, নৃতত্ত্বে, ইতিহাসে, জোতির্বিজ্ঞানে, ভাষাতত্ত্বে। এমনকি জাতীয় ঐতিহ্য মিথাশ্রয়ী ভাবনা থেকে একেবারে মুক্ত নয়। মিথ প্রাকৃতিক আচার-নিষ্ঠার ডকুমেন্ট হয়ে পড়ে। রাজ্যশাসন বা সামাজিক পীড়নে এর সাথে মিশে ধর্মীয় আভিজাত্য। ব্যক্তির বিকাশমান ভাবনা, তীক্ষ্ণচেতনা, সামাজিক অবদমনে মিথ ধর্মের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়। উপাখ্যান, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদিতে মিথের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ভাষার জাদুশক্তি মিথকে আশ্রয় করে বাড়ন্ত রূপটি নিতে পারে। সামাজিক বিবর্তনের রূপটিই আবার মিথকে কাছে-পিঠে রেখে আলাদা ফর্ম নেয়। মিথের থাকে সামাজিক স্মৃতি। এসব তার কথাশিল্পচর্চাকালে অপরিহার্য এক বিষয় হয়ে ওঠে। তার গদ্যে ইয়ঙ-এর সমন্বিত চৈতন্য হয়ে একে আলাদা এক নান্দনিকতা দিয়েছে।

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* একটা বিপর্যস্ত, ভয়াবহ স্মৃতি-ভুলে-যাওয়া জাতির গল্প। এ স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের, যুদ্ধের ভয়াবহতা ভুলে থাকার এক ক্ষত যেন। তার এ উপন্যাসে একটা জনপদের এমনই এক ক্ষত বিস্তৃত। এই উপন্যাসের বড়ো শক্তি ভাষার উপর ঔপন্যাসিকের দারুণ দখলদারিত্ব। এতে কি তিনি কোনো উত্তরাধিকারকে বয়ে বেড়ান? এটা তো সত্যি যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* কিংবা *চাঁদের অমাবস্যার* কথা পাঠকের ভাবনায় আসতেই পারে। বিশেষ করে সমন্বিত অবচেতনার একটা ধারাবাহিকতা আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে। তবে এর ভাষার অন্তর্গত শক্তিটি পাঠক একটু নিবিড়ভাবে খেয়াল করলেই দেখবেন, শহীদুল জহির তার অসাধারণ মেধাযুক্ত ভাষাটি নিয়েছেন সামাজিক শক্তির ভিতর থেকে। এখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষার সাথে একটা মৌলিক পার্থক্যই ধরা পড়ে। রাজনীতি আর সমাজবাস্তবতার যে গভীরে তিনি বাজপাখিসম তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছেন, তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে তেমন কিছুই নেই। বরং তিনি ছয় দশকের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকে সরাসরি প্রতিফলিত করার একটা মৌলিক চাপ যেন অস্বীকার করলেন। অথচ শহীদুল জহির এই জায়গাটিতে শুধু স্পেসিফিকই

নন রীতিমতো জেদি। তিনি আট দশকের চলমান বুর্জোয়া রাজনীতির খোলসটি ন্যাংটা করার জন্য তিনি যেন উন্মুখ হয়ে পড়েন। তৎকালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের নামে মৌলবাদকে রীতিমতো উৎসাহিত করে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংগঠন। এ জাতি অত্যন্ত অবাক হয়ে লক্ষ করে, ৭১'এর সাম্প্রদায়িক অপশক্তি শুধু প্রশ্রয়ই পান না, তারাও অন্যসব রাজনীতিক দলগুলোর দোসর হয়ে পড়ে। এখানেই শহীদুল জহির সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বিনির্মাণ করতে শুরু করেন। পোড়ামাটি আর তামাটে জাতির রক্তাক্ত ক্ষতকে তিনি চেনানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে ভাবনাদখলের এই বিকল্প পদ্ধতিকে তিনি প্রশ্নদীর্ণ করতে পারেন। এবং তা তিনি করেন অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে। পঁচাশি সালে লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনের যুবক আব্দুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল যখন নওয়াবপুর রোডে ছিঁড়ে যায় তার অনেক আগে থেকেই আবুল খায়ের কিংবা তার বাবার পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাক বেরোয় এবং এরা উই পোকা খায় অনবরত। এ প্রক্রিয়া চলছে ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধের-পরবর্তী অবস্থা থেকেই। এ বিভ্রম বা সিম্বলই এই উপন্যাসের প্রধান অনুষঙ্গ। বুর্জোয়া রাজনীতির খপ্পড়ে পড়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি শুধু জাতীয়ভাবে ক্ষমাই পায়নি, রাজনীতির অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। এধরনের উপন্যাসের বড়ো সমস্যা হয় যে, শিল্পের ব্যাপারে লেখক নির্মোহ থাকতে পারেন না, সরাসরি তিনি চরিত্রে, ঘটনায় বা অনুষঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। কিন্তু এখানে তিনি চমৎকার মুন্সিয়ানাও ছাপ রেখেছেন। তিনি তার এ উপন্যাসের দুইটি জায়গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষাভঙ্গিমায় স্পষ্ট করতে পারেন; এ দুটি হচ্ছে ১. মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী একটা জনপদকে সমন্বিত অবচেতনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন – এখানে জনপদ শব্দটি সারা উপন্যাসে মাত্র একবার ব্যবহার করলেও তা চরম প্রতীকী ধরনে পাঠককে নাড়া দিতে পারে। ২. তিনি সমন্বিত ক্রোধকেও যেন জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কখনও কখনও লেখককে ধৈর্যহীন মনে হলেও শিল্পমান ক্ষুন্ন হয়েছে, এ কথা বলা যাবে না। এই দুইটি বিষয় যেন পাঠকের ভাবনায় তীক্ষ্ণস্নায়ু-ছেঁড়া বোধ তৈরি করতে থাকে। এভাবেই কাব্যময় ভাষাসৌকর্যে একটা জাতির ক্ষতকে জাগ্রত রাখার কাজটি অত্যন্ত সূক্ষ্মচেতনায় করতে পারেন। এ যেন মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির বিষয়কে জানানোর এক ভাষিক দলিল। মুক্তিযুদ্ধের লোকায়ত দ্রোহের তীক্ষ্ণ চিৎকার হয়ে থাকবে এ উপন্যাসটি।

তাঁর *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* রূপক আর প্রতীকময়তার জাদুতে এ দেশের সমাজ-রাজনীতির অসাধারণ দলিল। উপন্যাসটির শুরুতেই পূর্ণিমা নিয়ে যে বিভ্রান্তি ও ঘোর তৈরি হয়, তা একেবারে শেষ পর্যন্ত থাকে। উপন্যাসটির শুরু এবং শেষ হয় একই জায়গায়। একটা নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ সমস্ত সুহাসিনীকে হতবাক করে দেয়। সমন্বিত বিভ্রান্তির ভিতর আটকা পড়ে তাদের ভাবনা। যে মফিজুদ্দীন মিয়া সপরিবারে মারা যায়, সেটি যেন দেশেরই প্রতীক। এবং একটা পরিবারকে ঘিরেই দেশের রাজনীতি আবর্তিত-বিবর্তিত হয়। আকালু কামলার ছেলে মফিজুদ্দী এই গায়েরই মিয়াবাড়ির জামাই হয়, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়। সারা সুহাসিনীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়। ৮০ বছর

সুহাসিনী প্রতীকী অর্থে দেশ শাসন করে। ব্রিটিশ পিরিয়ডের শেষভাগ, যুক্তফ্রন্ট, আইয়ুব খানের আমল, স্বাধীন বাংলাদেশ এমনকি উপজেলা ভাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত মফিজুদ্দীনের দোর্দণ্ড প্রতাপ বজায় থাকে। এ হচ্ছে উপরের শাসনের বিষয়-আশয়– এর ভিতরে থাকে পাঁচ নারীর আরেক গল্প। এরাই যেন প্রতীকী অর্থে উপন্যাসটির কাঠামো বা আকাঙ্ক্ষা ঠিকঠাক করে। এরা হচ্ছে আকালুর মা, দরিদ্র বেশ্যা নয়নতারা, মফিজুদ্দীনের স্ত্রী চন্দ্রভান, দুলালী আর আলেকজান।

প্রথমেই এ দ্বন্দ্ব পাঠকের মনে তৈরি হতে পারে– কে এই মফিজুদ্দী যে নাকি সুহাসিনীতেই মফিজুদ্দীন মিয়া হয়ে উঠে। ১১১ বছর বেঁচে থাকার ঘোষণা সাজায়। ৮০ বছর ধরে সুহাসিনীকে শাসন করে। এটি একটি প্রতীকী চরিত্র। এমন প্রতীকায়িত চরিত্র বাংলাসাহিত্যে নেই। সে আসলে জাতীয়তাবাদের প্রতীক। এই জাতীয়তাবাদ প্রায়ই উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিশবাদের দোসর হতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। নিজের সংস্কৃতি, ভাষা, দারিদ্রকে শোষণের মাত্রা নির্ধারণে কাজে লাগায়। এর ভিতরেই সমাজপ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনাই তৈরি হয়। মফিজুদ্দীনের ছেলে রফিকুল ইসলাম, আবু বকর আর মোল্লা নাসিরুদ্দীন সেই সম্ভাবনার তুখোড় প্রতীক হয়ে উঠে। তাদের সেই কাজের আরও সহযোগী হয় এদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধপরবর্তী লোকায়ত দ্রোহ, মফিজুদ্দীনের নিষ্ঠুর কবল থেকে বেরিয়ে আসার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুহাসিনীর মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে মফিজুদ্দীনেরই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই মফিজুদ্দীনও খাঁদের মতোই সামরিক-বেসামরিক শাসনের মাধ্যমে তার শাসনকে কল্পিত ১১১ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিল। কিন্তু খাঁ বাড়ি সরাসরি সামরিক শাসনকে কাজে লাগানোর সুবিধা নিয়ে মফিজুদ্দীনকেই সপরিবারে নিহত করানোর ইঙ্গিত তৈরি হয়। এর সাথে মোল্লা নাসিরুদ্দীন এবং আবু বকর মাস্টার-আলেফজান নিহত হয়। সুরধ্বনি নামের গ্রামটিতে রাস্তা বাড়ার মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী শাসনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে শেষ দিকে সুহাসিনীর লোকেরা দুলালীর হাড়সমূহকে মোল্লা নাসিরুদ্দীনের পাশে সমাধিস্থ করার মধ্য দিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষার একটা সংকেত তৈরি হয়।

মহিম সরকারের উঠোনে সুহাসিনীর লোকজন যেভাবে হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দেয়া শুরু করে তাতে কোনো কোনো পাঠকের মনোজগতে '৭৫-এর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়লেও এই উপন্যাসের কাহিনীবিস্তার বা মফিজুদ্দীনের সামগ্রিক জীবনপ্রণালীতে এমন সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করা যায় না। সারাটি উপন্যাসে পূর্ণিমার জাদুময়তায় আলাদা স্পিরিট প্রবহমান থাকে। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবেই যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মডেলে আটকা পড়তে চাননি। পুরোমাত্রায় রাজনীতিনির্ভর উপন্যাস হয়েও উপন্যাসটির শিল্পমান এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। কখনো চাঁদের ঘোর, সামাজিক বিভ্রান্তি, ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কে ক্ষমতাযুক্ত সংসদীয় বা সামরিক রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ অনবরত বিবৃত করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। একহিসেবে এটা একটা ঐতিহ্যপাঠের সাহিত্যিক ওয়ার্কশপ যেন। এখানে বুর্জোয়া

রাজনীতির অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে জাতীয়তাবাদ। এর সাথে কখনো মিশেছে ধর্ম, কখনো ভাষা, কখনো-বা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু সুহাসিনীর ইতিহাসে লোকায়ত দ্রোহের প্রাপ্তি তেমন ইতিবাচক নয়। এই উপন্যাসটির চার নারী এর অন্তর্জগত নির্মাণ করে। নয়নতারা শহীদুল জহিরের এক অসাধারণ চরিত্র। কথাসহিত্যের এত প্রাণময় উপসর্গ খুব বেশি চোখে পড়ে না। এমন একটা বিষয় আরব্য রজনীতেও দেখা যায়। সেখানে শাহ্‌রিয়ার আর শাহ্‌জামাল ভোগ করে ঈপ্সিত-নায়িকাকে এবং তারা তাদের নির্ধারিত সাম্রাজ্যে ফিরে যারা। নারীভোগের এমন একটা বিষয় কথাসরিৎসাগর, এমনকি চীনা রূপকথাতেও আছে। এবং এর সার কথা হচ্ছে, পুরুষ যত শক্তিশালীই হোক নারীর ছলনার কাছে তারা পরাস্ত হতে বাধ্য। আরব্য রজনীর নারীরা ছলনাময়ী, পাপী, কৌশলী। নারীর মুক্তস্বাধীন সত্তা বারবার স্তম্ভিত হয়েছে। কিন্তু শহীদুল জহিরের নারী দুই পুরুষকে যৌনতায় জব্দ করেও মানবিক সত্তা অর্জন করে এবং জল-কাদার এই পূর্ববাংলার সংস্কৃতির নতুন প্রবাহের ইঙ্গিত দেয়। তেমনি আকালুর মা, চন্দ্রভান, দুলালী এমনকি আলেকজানও নতুন প্রাণ দেয় উপন্যাসটিতে। দুলালী আর আলেকজানের প্রতীকী জাদুময়তা আরও চমৎকার। মোল্লা নাসির যে দুলালীর সাথে প্রেম করছে, ছোট-ছোট মোরগকে বিচি ফেলে দিয়ে খাসি করছে এতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী দলিত-মথিত বাঙালিত্বের সিম্বলকে বোঝাচ্ছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীতে আবু বকর মাস্টারের স্বপ্ন কিভাবে ভেঙেচুরে যায় তারই এক সাংকেতিক দলিল হয়ে উঠে। আবুবকর সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফেরার পরপরই নৌকা থেকে নেমেই যত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলেকজানকে কেমন আছে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু পরবর্তীতে তার সেই স্বাধীনসত্তা কেমন জানি কুঁকড়ে যায়। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ রফিকুল ইসলাম তার কথা জানানোর আগেই তো ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। এভাবেই নারীর বহুমাত্রিক ভাবকৌশলের জাদুময়তায় রাজনীতিক জীবনকে স্পষ্ট করে। এখানে স্বপ্নকল্পনা সুহাসিনীর যাবতীয় সামাজিক-জীবনকে চেখে-চেখে পূর্ণিমার শরীর চুঁইয়ে-চুঁইয়ে নামে অনবরত।

শহীদুল জহিরের তৃতীয় উপন্যাস *'মুখের দিকে দেখি'* – যা প্রকাশ পেয়েছে বইমেলা ২০০৬-এ। গ্রন্থটিতেও শহীদুল জহিরীয় কিছু প্রবণতা দিয়েই আমাদের পাঠের অভিজ্ঞতা চালু রাখতে হয়। তাঁর গল্প কিংবা উপন্যাসে কিছু কমন বিষয় ঘুরেফিরে আসে; যা আসলে আমাদের ব-দ্বীপকে চেনানোর বা চিহ্নিতকরণ পরিকল্পনা বলা যায়। এখানেও আছে ভাষার জাদুকরি প্রয়োগ, জীবন বুনে যাওয়ার দুর্দান্ত প্রবণতা। এখানেও আছে ভূতের গলি, সেই গলির কতিপয় মানুষ বা অনেকগুলো মানুষ একত্রে বা আলাদা আলাদাভাবে কতিপয় অবস্থা জারি করে রাখে। উপন্যাসটির শুরুতেই ফখরুল আলম লেদু ভূতের গলিতে মামুন বা মাহমুদের মা জোবেদা রহমানের ২৫ নম্বর বাড়িতে যায়। কিন্তু তার আগে বা পরে অনেক ঘটনায় আমাদের জন্য তৈরি থাকে কিংবা আমরা সেইসব ঘটনায় নিজেদের নিমজ্জন করি। তাতে অনেক চরিত্র ওঠে আসে। প্রথমেই বলতে হয়, সেই ঘটনায় অতি দাপটের সাথে আসে

চানমিঞা। একেই হয়তো কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। সেই বলাটা আবার দীর্ঘস্থায়ীও রাখা যায় না, কারণ আগেই যা বলা হ'ল, মানে অনেক মানুষের অনেক ঘটনা বা কথকতা, কিংবা রক্তাক্ত হাহাকারের ভিতর দিয়ে আমাদের সময় পার হয়। আমরা তাতে যেন নিবিড়-ধারণার ভিতর আরেক আবহ টের পাই।

আমাদের পরিচয় হয় চানমিঞার সাথে। ও আসলে বানরের দুধ-খাওয়া-পোলা। ওর মা খৈমন বড়ো চাল্লু মেয়েমানুষ। একটা কৌশলের ভিতর আটকে ফেলে ময়না মিঞা নামের তরকারিঅলাকে বিয়ে করে সে। সেই ময়না মিঞা আবার অতীব লোভী প্রাণী, নিজের পছন্দেই খৈমনকে বিয়ে করলেও তাদের অর্ধেক বাড়ি খৈমনের বাবা পানবিড়ির দোকানদার আব্দুল জলিলের কাছ থেকে নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। তবে এর স্বত্ব বলবৎ থাকে না। কারণ বাসররাতেই পানি খাওয়ার ছলে খৈমন কাগজটিকে জগের পানি ঢেলে ভিজিয়ে ফেলে। তাতে কালির কতিপয় দাগ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। চতুর খৈমনকে বার-বার তাগিদ দিয়েও আর কোনোদিন বাড়ির অর্ধেকটা ময়না মিঞা আদায় করতে পারে না। তবে বাড়ির সেই অর্ধেকটাই ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কতিপয় দাপুটে মানুষ বিনাদ্বিধায়, এমনকি বিনাবাধায় সেই অর্ধেক অংশ দখল করে ফেলে। চমৎকার এক প্রতীকী আচরণ এখানে নির্মিত হয়, যেখানে যৌতুকলোভী মানুষ আর রাজনীতিক অপশক্তি এককাতারে চলে আসে। এ-সবের ভিতরই খৈমন তার ছেলেকে কিছু অতি আশ্চর্য ঘটনার ভিতর দিয়ে লালনপালন, এমনকি খ্রিস্টান সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সিলভারডেলেও পড়াশোনা করায়। কিন্তু চানমিঞার কপালের বিধিলিখন খণ্ডানো মুশকিল। কারণ এ তার দ্বারা সম্ভবও নয়। রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রজনিত ইতিহাস তার কপালে কিছু দুর্গতি চিহ্নিত করে দেয়। প্রথম সমস্যাটা হয় তার জন্মের সময়। দৃশ্যত ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) যার জন্ম তার নাম হওয়া দরকার ছিল বিজয় মিয়া বা এধরনের কিছু। কিন্তু বিধির কী লিখন, তার নাম হয় পোঁটলার পোলা। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার প্রথম দিকেই তার জন্ম হলেও খৈমন অস্তিত্বের স্বার্থেই তাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চায় না। তলপেটে পোঁটলার মতো বেঁধে রাখে। তাকে প্রকাশ করে ১৬ ডিসেম্বরে। এভাবেই একটা গৌরবজনক জন্মকথা চানমিঞার সামাজিক জীবনে একটা ঝামেলার পয়দা করে। তার আশপাশের মানুষজন তাকে পোঁটলার পোলা বলে ক্ষেপায়।

চানমিঞার জীবনযাপনের সাথে আরও কিছু আশ্চর্য ঘটনা মিশে থাকে। তার মা খৈমন অতি দরিদ্র বলে মানুষের বাসায় মাতারির কাজ করে। কিন্তু আত্মীয়-পরিজনমুক্ত ছেলেকে কে দেখভাল করে? বাসায় একলা রেখে যাওয়া সন্তানকে দেখে রাখে এমনকি দুধ খাওয়ায় এক বান্দরনী। এমনকি বান্দরকাহিনীর সাথে আমরা এক বান্দরবাহিনী প্রত্যক্ষ করি। এতে চমৎকার কিছু প্রতীকী গল্প বা কথকতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। বা তার সাথে যেন তা ঐকান্তিক প্রীতি জন্মায়। বান্দরবাহিনী শুধু চানমিঞাকে দেখেই রাখে না, তাদের একজন করে নেয়, ভালোবাসে, তার পড়াশোনার খরচ জোগায় বলেও ধারণা করা যায়। এমনকি এই সম্পর্ক চানমিঞার জীবনযাপনের সাথে একাত্ম

হয়ে ওঠে। কিছু আচরণ যেন চানমিঞার ভিতরও সেই বান্দরবাহিনী সরবরাহ করে। আমরা রাজনৈতিক কতিপয় প্রশ্নের মুখোমুখী হই বা সমাধান খুঁজি। চানমিঞাকে বিবর্তনের কোলাহলে মজে যাওয়া এক উন্নত প্রাণীও মনে হয়। প্রাণীর জাগতিক-বস্তুনিষ্ঠ বৈধতা আমরা নির্মাণ করতে থাকি। কিংবা বলা যায়, আমরা নিজেদের বোধকে নানাভাবে দেখার প্রবণতায় নিমগ্ন হই।

উপন্যাসটির আরো এক দীর্ঘক্ষেত্র দখল করেছে মামুনুল হাই ওরফে মামুন। ভূতের গলির ২৫ নম্বর বাসার ইন্টামেডিয়েটে পড়া এই যুবক করাতকলে যায় কাঠের ভুসি আনার জন্য। কিন্তু তার আর ফেরা হয় না, কারণ করাতকলের কুলিরা তাকে ট্রাকের উপরে উঠিয়ে দেয়। সে তখন ভুসির ভিতর অজ্ঞান অবস্থায় পড়া ছিল। সে ট্রাকের উপরই থেকে একেবারে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া চলে যায়। সেখানে আরেক লিজেন্ড-এর আশ্রয় পায়। কিংবা লোকজন এক মিথ তৈরি করে। ওদুদ চৌধুরির মেয়ে আসমানতারা হুরে জান্নাত তাকে একটা খরগোস হিসাবে দেখে। এবং মামুন একটা খাঁচায় আটকা পড়ে। গলায় দড়ি বেঁধে আসমানতারা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে একসময় সে সাবালকত্ব অর্জন করে। খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, একসময় সে মুক্তিও পায়। মালিকের আস্থা অর্জন করে। কিন্তু চানমিঞার কপালে অনেক নিরাশা জমা হতে থাকে। স্কুল ছেড়ে দেয়। একপর্যায়ে গাড়ি চুরি করা শুরু করে।

উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধপরবর্তী আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার অসহায়ত্ব, সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কথা নানাভাবে এসেছে। তবে উপন্যাসটির একেবারে গভীরে গেঁথে আছে প্রেম। মানবিক প্রেম। বলা যায়, মাকড়সার জালের মতো, বর্ষার ছলছলে রবে চলা ঢেউয়ের মতো উপন্যাসটির অবয়ব নির্মাণ করেছে। নীরব কিন্তু সচল কান্নাও এর অন্তর্প্রবাহে টের পাওয়া যায়। সেই প্রেম, হাহাকার বা আশাবাদ দারুণ দাপটের সাথে প্রবহমাণ থাকে।

উপন্যাসটিতে চারধরনের জীবনপ্রবাহ লক্ষ করা যায় ১. চানমিঞা, খৈমন, ময়নামিঞার একধরনের কথকতা, ২. মামুন, মিসেস জোবেদা রহমানের ভিন্নধরনের জীবনাচার, ৩. সিলভারডেল কেজি স্কুল, মিসেস মেরি জে ক্লার্ক, জুলি ফ্লোরেন্স, যোসেফ ইউজুন, মিজ ডি কস্তার আরেক দিক ৪. আসমানতারা হুরে জান্নাত, ওদুদ চৌধুরি, সাতকানিয়া, নদীপ্রবাহের জীবন, নদীপথের চোরাকারবারী ইত্যাদি। এভাবে ভাগ করাটাও দীর্ঘস্থায়ী কোনো ব্যবস্থা মনে করার কারণ থাকে না। কারণ একটা ঘটনার সাথে অন্যটা এভাবে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে থাকে যে, মনে হবে, সবকিছু মিলেই *মুখের দিকে দেখি* নামের সৃজনকর্মটি বুনে যাওয়া হয়েছে। এমনকি একই বাক্যে ভিন্ন দুই ঘটনাকে জোড়াতালি দেয়ার এক ল্যাবিরিন্থও প্রত্যক্ষতাজাত হয়। এ-ধরনের শৈল্পিক স্বাধিকার আমাদের কথাশিল্পে খুব বেশি চোখে পড়বে না। চানমিঞা কর্তৃক বান্দরনীর দুধ খাওয়ার ভিতর নানামুখী প্রতিক্রিয়া বা কথকতা মনে পড়তে পারে। যেমন, এ হতে পারে একটা জনপদের একটা সামাজিক গল্প, কিংবা লিজেন্ড বা প্রজন্ম

থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলা প্রজাতির বিকাশের রক্তউত্থিত ইতিবৃত্ত। আমরা উক্ত তিন কারণের ভিতর যে কোনো কারণকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরতে পারি। কিংবা ধরতে পারি, এর সবই লেখকের সাজানো কথা, যার ভিতর দিয়ে জনপদআশ্রিত মিথের কবলে পড়ি আমরা। এক সম্ভাবনা থেকে আরেক সম্ভাবনা বা ইতিহাসের কবলে নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেলি। দ্বৈত মামুনের বিচরণ বা মামুন কর্তৃক খরগোস হয়ে থাকাও যেন এমনই এক রহস্যঘন বিষয়-বিত্তান্ত।

ভাষার কারুকাজ এ গ্রন্থে আরও ঘনীভূত, আরও বৈশিষ্ট্যময় হয়ে আছে। এ-ধরনের ভাষাগত মাদকতা তাঁর অন্য দুই উপন্যাস – *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* কিংবা *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*'তে দেখা মেলেনি। লোকায়ত ধাঁচের ভাষাকৌশল শুরু তার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প* নামের গল্পগ্রন্থের *প্রথম বয়ান* নামের গল্প থেকে। ক্রিয়াপদের লৌকিক আচরণই শুধু দেখা যায় না, ভাষাও তার চলমান প্রথাগত ভদ্রলোকি বন্ধ্যাত্ব পেরিয়ে নবতর আলোর দিশারি হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষাজনিত আচরণ একান্তই মাটিঘেঁষা। এটির ভাষা সনাতন চলতি ভাষাবৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে নতুন গন্ধে ভরপুর হয়। ভাষা আরও মাধুর্যময় হয়ে যায়, যখন এর গল্পটি কোনো অবস্থাতেই যেন ঔপন্যাসিক নিজে বলেন না। কারা যে গল্প বলার দায়িত্বটি পালন করে তা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়; সামাজিক একটা স্পৃহা বা শক্তিই গল্পটিকে পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ বিকশিত করার বা রাখার দায়িত্ব পালন করে। এখানে ভাষার, জবানের, জীবন-আচারের সনাতন শৈল্পিক ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত। আমরা এমনই দেখি যে, কথাশিল্প রচনায় সাধারণত লেখকই সর্বেসর্বা, এ নিয়ে কোনো কোনো লেখক কোনো পর্যায়ে কোনোধরনের দেন-দরবার করার বা কারও সাথে তেমন বোঝাপড়াও করেন না। কিন্তু এ লেখক যত পারেন গল্পটি মানুষজনের মেজাজ-মর্জির কাছে সঁপে দিয়ে বসে থাকেন। এটিই তার লেখার অন্যতম আচরণ। যার ফলে শোনা-কথার আঙ্গিকে তার গল্প এগোয়। এমন জোরজবরদস্তিহীন লোকায়ত শিল্পকৌশল বা কায়দা তাঁর নিজস্ব, যাতে ভাষার উপনিবেশিকতা, সংস্কৃতির বিরাজমান আবহ প্রশ্নদীর্ণ হতে থাকে। ভাষার যে আবদ্ধ ভাবটি আছে তাও ভেঙেচুরে যেতে থাকে। স্বততই রাজনীতি ও কালসচেতন এবং মুক্তিযুদ্ধমুখর এক কথাঅলা তিনি। প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার বাইরে বেহুদা তিনি কথাশিল্প নির্মাণ করেন বলে মনে হয় না।

অনেক ঘটনার ভিতর চানমিঞা আর মামুন মানবিক চেতনায় বাঁচার পরিকল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকে বা জীবনকে আরও বহমান করতে উদ্যত হয়। মামুন নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মানসে আসমানতারার সাথে ঢাকা থেকে আবারও সাতকানিয়া চলে যেতে চায়। খাঁচায় নিজেকে সঁপে দেয়। আমরা এটি পড়তে-পড়তে কতিপয় তাড়না বা ভাবনায় নিপতিত হই। লোকায়ত ভাষাশৈলীর চমৎকার আবহে পড়ে যেতে থাকি। কিছু শব্দ যেমন, মিথ, একাত্তর, এডমিন, ক্যাডার ইত্যাদি সরাসরি লেখা সম্পর্কেও বিকল্প শব্দ খুঁজি। এমনকি একসময় যেন তা পেয়েও যায়, আমরা তখন শব্দত্রয়কে যথাক্রমে বলতে পারি গায়েবি গপসপ, সংগ্রামের বা গণ্ডগোলের বছর,

টিয়েনো/মেজিস্টেট ধরনের কিছু। উপন্যাসটিতে যাহোক শব্দটি ছয়বার ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্বতঃস্ফূর্ত-পাঠস্বাদুতায় খানিক প্রতিবন্ধক মনে হ'ল। আসমানতারার বাবার তৈরি খাঁচা নিয়ে দুইধরনের ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। একসময় যৌবনপ্রাপ্ত মামুন ওরফে 'খরকোস' তা থেকে বার হওয়ার জন্য তুমুল চিল্লাপাল্লা করে। তাকে ওদুদ চৌধুরি বাইরে আনতেও বাধ্য হয়। আর উপন্যাসটির একেবারে শেষের দিকে দেখা যায়, সেই মামুনই খাঁচাকে মায়ের জরায়ু মনে করে আরেকটা জন্মের প্রত্যাশায় সেখানেই আশ্রয় নেয়।

আমরা তার চতুর্থ উপন্যাস (অন্তত প্রকাশনাসূত্রে) আবু ইব্রাহীমের মৃত্যু নিয়েও কিছু কথাবার্তা বলতে পারি। আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে জহির বরাবরই মৃত্যুপ্রসঙ্গ তার কথাশিল্পে জারিত করেনই। এ যে এক ঈশ্বরের আলাদা জগৎ নির্মাণের প্রচেষ্টা। দুনিয়ার সমস্ত ভাবমুখর প্রবণতায় মৃত্যু এক অনিবার্য প্রসঙ্গ। শিল্পে তা এলেও একধরনের দূরত্ব নিয়েই তা শব্দশিল্পে প্রয়োগ করা হয়। কারণ মানুষ স্বভাবতই জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই মৃত্যুজনিত বিষয়-আশয় থেকে যদ্দূর তারা পারে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু জহির মানুষের মৃত্যুর স্পর্শের ভিতর জীবনের গন্ধ পান। আমরা আবু ইব্রাহীমকে জানার জন্য, বরং বলা যায়, তার হাঁড়ি-পাতিল থেকে শুরু করে মনোরঞ্জনের যাবতীয় তথ্য-তালাশের নিমিত্তে তার সহযাগী হতে থাকি। আমরা তাকে ছেড়ে যাই না। এই উপন্যাসের শরীরে তাকে ছেড়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এবং এই বিষয়টা জহির এত জোরালোভাবে সাধন করতে পেরেছেন, এতে আমাদের মনে আপসোস পুঞ্জিভূত হয় না। বরং আমরা আমাদের চারপাশ ভুলে যাই। একধরনের জাদুতে আক্রান্ত হই। এককিসিমের আবেশে মজি। তারই ভিতর গল্প এগিয়ে চলে। আমরা আবু ইব্রাহীমের সংসার চিনি। তার স্ত্রী মমতা আর বিন্দুর সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্রে একটা মধ্যবিত্তীয় ক্ল্যাসিকেল খিটিমিটির মুখোমুখি হয়। আমরা অচিরেই জানি, কিংবা এরি মধ্যেই বোঝা হয়ে যায় যে, তিনি একদিন প্রবল ক্ষমতাবলে শহীদুল জহির হয়ে উঠবেন। আমরা তাকে পাঠ করি।

সেই পাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখা মেলে। আমরা এখানে তার বিষন্নতা দেখি। মাও-এর রাজনীতির প্রতি পক্ষপাতের চেয়েও বড়ো কথা একজন হেলেনের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। এই পরিচয় তখনও তেমন নিবিড় হয় না। কারণ আবু ইব্রাহীম যত নিবিড় ভালোবাসার ভিতর তাকে বাসনা করে, হেলেন তা করে না, তার সৌন্দর্যনির্মিত অবয়বে একধরনের পূজাই যেন কামনা করে। আমরা একটা দীর্ঘশ্বাসঘেরা একরৈখিক প্রেম দেখি। তবে সেই প্রেমের বিস্তৃতি আমাদেরকে ছাড়ে না। ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। তার সংসারকে এলোমেলো করতে থাকে।

এখানে চমৎকার প্রেমজ বিস্তারও দেখি। তার ভালোবাসা কত গভীর তা প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হই, ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হতে হতেও একধরনের সঙ্কোচে পড়তে থাকি আমরা। কারণ আমরা বিন্দুর প্রতিই যেন আবু ইব্রাহীমের একধরনের ভালোবাসার

পরশ দেখি। এমনতর বিষয় আমাদের কথাসাহিত্যে খুব একটা নেই। সমরেশ মজুমদারের কোন্ একটা উপন্যাসে অনেক আগে মনে হয় এধরনের কিছু পড়েছিলাম। আর সবচেয়ে অনুপুঙ্খভাবে আছে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী'তে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, এই উপন্যাস নিয়ে নানান সাময়িকীতে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, এটি পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে- তথাপি এমন একটি দরকারি বিষয় আলোচনার কোথাও উঠে আসেনি। প্রতিষ্ঠান তো খুবই স্পর্শকাতর এক বিষয়- কোন্ স্পর্শে আবার কোন্ কোণা থেকে হুঙ্কার আসে, এই ভাবনাতেই হয়তো তাদের ঘুম হারাম হয়ে থাকে। আবার এমনসব বিষয় কী করে আলোচনায় থাকে!? আমাদের এই পাঠে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টা থাকলেও এই স্মৃতিকে আমরা ভুলতে পারি না। এ যে হেলেনের প্রতি রক্তজ প্রেমের বিস্তার! যা আমাদের মন থেকে কখনও মুছে যায়নি। এখানে জহির হয়তো পরিকল্পিতভাবেই অমোচনীয় কালি ব্যবহার করেন। আমরা ঠিক জানি না, জহিরের বাস্তবত কান্দন এমন ক্ষতবহুল দীর্ঘ ছিল কিনা!

একসময় আমরা হেলেনের দেখা পাই, সে যে সুখে নেই, তাও বুঝতে থাকি। আবু ইব্রাহীম তার এই প্রেমকেও দীর্ঘজীবী করতে পারে না। কারণ একধরনের অনির্ধারিত খেলা খেলে সে, তাকে না জানিয়েই হেলেন এদেশ চেড়ে চলে যায়। আবু ইব্রাহীম অতঃপর তার কষ্ট তাকেই বহনের ভিতর দিয়েই জীবন চালায়।

এখানে তার অফিসিয়াল বা বাস্তবত বন্ধু বলতে সিদ্দিক হোসেনই। তিনিও আবু ইব্রাহীমের মতোই একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। তবে তিনি আবু ইব্রাহীমের মতো মাঝারি মাপারে কেরানির জীবনযাপন করেন না। একসময় খালেদ জামিল তার সূত্র ধরেই আবু ইব্রাহীমের অফিসে আসে। তাকে কন্ট্রাক্টরির লোভনীয় প্যাঁচে ফেলতে চায়। প্রায়ই তার অফিসে আসা-যাওয়া করে। একপর্যায়ে তাকে বাগে আনার পর্যায়েও নিয়ে যায়। কিন্তু আবু ইব্রাহীমের বোধোদয় হয়, এইভাবে ঘুষের পথে পা বাড়ানো যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাকে প্রদত্ত টাকা ফেরৎ দিতে গিয়েই সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। তিনি যেভাবে নিহত হন, তাতে আমাদের মনে হয়, খালেদ জামিলই এদেরকে পাঠিয়েছে।

অতঃপর আমরা একেবারে লেখাটির শুরুর দিকে অথবা শেষের দিকে চলে যেতে পারি। আবু ইব্রাহীম আমাদের চরম এক বিষন্নতার ভিতর রেখে কবরস্থ হন। একসময় মমতার বিয়েও হয়। কিন্তু আবু ইব্রাহীমকে আমরা ছাড়তে পারি না। মৃত্যুর শব্দের ভিতর, নীরবতার ভিতর, এক হা-হুতাশের ভিতর আমাদের সময় পার হয়। নতজানু এক ব্যর্থ নায়কের জন্য আমাদের শোকের উদ্দীপনার ব্যর্থতার শেষ থাকে না।

নানান চরিত্রের নানান অবয়ব দেখতে দেখতে নানান পাঠ অভিজ্ঞতায় আমরা জারিত হই। এমনকি আবু ইব্রাহীমের মেয়ে বিন্দু যেন তার প্রেমিকা, মেয়ে কিভাবে পিতার সান্নিধ্যে জ্বলে ওঠে/ কন্যার সান্নিধ্যে জীবনের এক স্বপ্নের কাছে ফেরে, প্রতিষ্ঠান এখানে ধাক্কা খায়। কারণ এমন পাঠ তো আমাদের খুব বেশি নেই। মৃত্যুর আয়োজন আসলে এখানে কেমন ছিল- এ প্রশ্ন আমরা করতে পারি। আমাদের মনে

হতে পারে, তার তিনধরনের প্রবণতার ভিতর আসা-যাওয়া ছিল। ১. ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যু, যা আবু ইব্রাহীমকে সবসময় একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে রাখত। ২. খালেদ জামিলের হাতে হঠাৎ মৃত্যু, তাও এখানে আমরা দেখলাম। ৩. লেখকের এমন সাজানো মৃত্যু যা নানাভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাতে লেখক কোনো ফাঁক ধাঁধা তৈরি করেননি। এ প্রশ্ন হয়তো আমরা করতে পারি, লেখকের দ্বারা নির্মিত এমন মৃত্যুজনিত ঈশ্বরত্বের কারণ কী? এতে কিন্তু একধরনের ব্যর্থতাও আছে। কারও মনে হতে পারে, তিনি আসলে এই মৃত্যুকে গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। যার জন্যই হঠাৎ এমন মৃত্যুদর্শনে আমরা যুগপৎ হতবিহ্বল আর আতঙ্কিত হই।

এখানে আমাদের সাথে যে নায়কের পরিচয় হয়, তিনি এমনই এক বিষন্ন, ক্লান্ত, হতবিহ্বল এক মানবসন্তান যিনি নিজের ভালোলাগার কথাটাও আজীবনে একবারও ওর প্রেমিকাকে স্মরণ করাতে পারে না। এখানে আমরা কি কোনো স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনি? সংসারের ঝামেলার ভিতরও তিনি নির্বিরোধী থাকতে পছন্দ করেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির হিরোরা তাদের নিয়ন্ত্রণবাদী আচরণ আর ভীতিবহুল-করুণ-বীররসযোগে একটা আবেদন রাখতে পারেন। আমরা যদি প্রচলিত এই ধারণার বাইরে যাই, আর্থার মিলার কর্তৃক তার অবিস্মরণীয় নাটক 'দি ডেথ অব এ সেলসম্যান'-এ হৃষ্টপুষ্ট কোনো ট্র্যাজিক হিরো আঁকেননি। তার নায়ক সাধারণ এক সেলসম্যান, তার কিছুই নাই। একটা স্বপ্ন আছে, তিনি নিজে সুন্দর করে বাঁচতে চান, তার দুই সন্তানকে স্বপ্নের মতো করে বাঁচাতে চান। কিছুই করা হয় না তার। সেই নায়ক, উইলি লোম্যান, নিজেকে শেষতক আত্মহত্যাকরণ ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তরই দেখেন না। আমাদের এই নায়ক আত্মহত্যার পথ বেছে না নিলেও তার যেন আর কোনো পথই ছিল না। ভালোবাসার চরম হতাশা আর নষ্টভ্রষ্ট সময় তাকে বিনাশমুখর এক মানবে পরিণত করে। স্বপ্ন তিনি চেনেন, কিন্তু তা কাউকে স্পর্শ করে না। তবে তার মৃত্যু আর মৃত্যু-পরবর্তী আয়োজনই যেন তাকে এক নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।

এটিতে দুইধরনের গল্প আছে- একটি নিয়ন্ত্রণ করছে হেলেন, অন্যটি খালেদ জামিল। এর ভিতর তেমন কোনো অন্তর্প্রবাহ তৈরি হয় না। চরিত্রের বিকাশ খুব একটা হয় না। যারফলে এটিকে অনেকের কাছে হয়তো এক খসড়া পাণ্ডুলিপিও মনে হতে পারে! ভাষা-সংগঠন তত কম্পেক্ট নয়, এর অভ্যন্তরীণ বাঁধন কোথায় যেন নড়বড়ে হতে হতে একধরনের ক্লান্তিময়তায় ঝিমিয়ে পড়া ভাব হয়ে আছে। এখানে চরিত্ররা তৈরি হয় না, নির্মাণের শৈল্পিক পথ খুঁজে পায় না। টুকরা টুকরা স্বপ্ন দেখে কেবল। নাকি আবু ইব্রাহীম এর বেশি কিছু ধারণই করতে পারে না? মুক্তিযুদ্ধের পরই যার দাঁড়ানোর সমস্ত সম্ভাবনা ছিল, তা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পেষণ, সামাজিক চাপ, লুণ্ঠনজীবীতার যাঁতাকলে সে পড়ল। পরবর্তীকালে এর সাথে যোগ হয়েছে নিদারুণ সামরিক শাসন, যেখানে মধ্যবিত্ত তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কোরবানি দিতে বাধ্য হয়। সর্বত্র এক কারবালার মোকাবেলা করতে হয় তাকে। এখানেও আমরা দেখি সামরিক শাসনের নতুন খেলা শুরু হচ্ছে। পুরাতন-বৃদ্ধ সরকারপ্রধানের বদলে টসটসা যৌবনের সামরিক

শাসক আসছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড করার এক কাল আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই শাসনের জান্তব কোনো আচরণ আমরা সরাসরি দেখি না। কিন্তু আবু ইব্রাহীমের জবুথবু জীবনই তা ধারণ করে যেন। আমরা ক্রমাগত এক পেষণের মুখোমুখি হই। ফ্যাসিজম আমাদের কণ্ঠকেই বদলে দিতে বাধ্য করছে!

এই উপন্যাসে ভাষার বিষয়টা তো ইতোপূর্বে বলাই হয়েছে। তবে পাঠস্বাদুতার কমতি নেই এতে। জীবনানন্দীয় কাব্যময়তায় গদ্যের আলাদা এক ছন্দময়তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনে হতে পারে, তিনি তখনই যেন ক্রমাগত মার্কেজে বুঁদ হওয়া শুরু করেছেন। যেন 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিচিউড'-এর জাদুময়তার কাছাকাছি কিছু পড়ছি। এখানেও শব্দের, কথকতার জাদুর পরশ আছে। এ উপন্যাসের গঠনে শব্দের বাঁধন তত স্পষ্ট না হলেও জহির তার নিজের আদলে উঁকি দিতে থাকেন। তবে তার আর তিনটি উপন্যাসে রাজনৈতিক বাস্তবতা যত তীব্রভাবে উঠে এসেছে এখানে কিন্তু তা আসেনি। একধরনের ছায়া-ছায়া কষ্টমুখর এক মৃত্যুচিহ্নিত জীবনই যেন ক্রমাগত আমরা পাঠ করি। আমরা কুণ্ঠিত হই। এক কবরই যেন আমাদের সামগ্রিক মৃত্যুচিহ্নিত প্রকল্পে ডুবিয়ে রাখে। আমরা ভয় পাই, বিচলিত হই। নিজের শরীরের কোথাও যেন মৃত্যুর গন্ধ শুনতে পাই। আমরা সঙ্কুচিত হই। এত মৃত্যু-মৃত্যু গন্ধ কেন? আবারও আবু ইব্রাহীমের সামগ্রিক বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকি। জীবন মনে হয় এমনই।

আমরা চারটি উপন্যাস পাঠশেষে বাংলা উপন্যাসভুবনের এক বিকল্প নান্দনিকতার সন্ধান পাই। মানুষের মনোজগৎ আর তার শব্দময়তাকে চেনানোর এমন কথাশিল্পী বাংলা সাহিত্যে সত্যি বিরল। জীবনের সামগ্রিক বিন্যাস, রাষ্ট্র-রাজনীতি, কথাশিল্পের নবতর ধরনে নতুন রূপে যেন নিজেদের ভিতর দেখতে থাকি। তার কথাশিল্পপাঠের বড়ো অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে, কোনো সচেতন পাঠকই তার লেখাজোখা পাঠান্তে আর নিজেকে সেই পূর্বেকার মানুষ রূপে নিজেকে চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের বিকাশ ইত্যাদি নানান দিক বিবেচনায় রেখেই এমন সিদ্ধান্তে আসা যায়।

[বর্ধিত ও সংশোধিত জানুয়ারি ২০১০]

জনপ্রিয় উপন্যাস কি সাহিত্য নয়?: প্রসঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ

ফে র দৌ সী সু ল তা না

প্রতি বছরই বইমেলা এলে একটি নাম শীর্ষে উঠে আসে । আলোচিত সমালোচিত হতে থাকে। উচ্চারিত হতে থাকে পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা। তারপরও বাস্তব সত্য হল, বাংলাদেশের বেশিরভাগ পাঠকই তার বই কেনে। তার বই পড়ে এবং উপহার দেয়। সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। যায় কি? সত্য সত্যই। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি।

অনেকে বলেন, জনপ্রিয়তা সাহিত্যের মানোত্তীর্ণের মাপকাঠি নয়। সাহিত্য অন্য জিনিস। আমি বুঝি না, অন্য জিনিসটা কী ? আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীর লেখা আছে , যাঁদের লেখার মধ্যে আমি ঢুকতেই পারি না। তাঁরা মহাপণ্ডিত, এটি বুঝি তাদের ভারী ভারী বাক্যের প্রয়োগ দেখে ; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাই। অথবা শ্রান্তিতে আমার অবসন্ন বোধ হয়। আমি মনোযোগ ধরে রাখতে পারি না। এটি আমার অক্ষমতা। আমি পণ্ডিত না, যদিও অন্যের পাণ্ডিত্য বোঝার জন্য নিজের পণ্ডিত হতে হয় না। ভালো পড়ুয়া হলেই চলে বলে আমার ধারণা।

বাংলাদেশের সাহিত্যে (বাংলা সাহিত্যে) অনেক বড় বড় লেখক আছেন , স্বনামধন্য পণ্ডিত আছেন, কিন্তু এমন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয় উপন্যাসিক কি আছেন? যারা শামসুর রাহমান পড়েন তারাই সৈয়দ শামসুল হক পড়েন, তারাই তো পড়েন হুমায়ূন আজাদ বা আনিসুল হকের বই। তারাই পড়েন ইমদাদুল হকের 'নূরজাহান' বা হাসান হাফিজের 'আগুন পাখি' । সাহিত্যে উপন্যাসের স্থান কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? উপন্যাস তো একটি বিশাল ক্যানভাস। যেখানে সময়কে ধারণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কিছু চরিত্র কী ধরনের আচার-আচরণ করছে তা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান শর্ত। উপন্যাসের ঐ চরিত্রগুলোর সাথে বাস্ত বতার মিল আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে। উপন্যাসের উপজীব্য সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে কিনা ? আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি জরুরি এই জন্য যে, মানুষের আর্থিক সঙ্গতি অথবা অসঙ্গতি সামাজিক শৃংখলা বা

অর্থনৈতিক শৃংখলার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে চরিত্র তার রূপ বদলায়, রং বদলায়, কথা বদলায়, মেজাজ বদলায় ।

যখন উপন্যাস রচনা করা হয় তার মাঝে গল্প বিকশিত হয় বিভিন্ন ধরনের পাত্র পাত্রীর মাধ্যমে। সময়কে বর্ণনা করার জন্য, কল্পনাকে মূর্ত করার জন্য, রূপাশ্রয়ী বর্ণনার জন্য উপমা, অনুপ্রাস অথবা বিদেশি শব্দের প্রয়োগ যথার্থ কিনা তা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন । সবচাইতে বড় যে কথা; উপন্যাসে থাকবে ম্যাসেজ। যতো সুখপাঠ্য উপন্যাসই হোক না কেন, কী উদ্দেশ্যে এবং কেন তা লেখা হল, সেই ম্যাসেজ অবশ্যই দিতে হবে ।

আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের অমর কীর্তিগুলোর দিকে তাকাই তাহলে তার প্রত্যেকটিতেই সাহিত্যের এসব উপাদান দেখতে পাব। তার সবগুলোই যে জনপ্রিয় তা নয় । তবে জনপ্রিয়তার সাথে সাহিত্যের কোনো বিরোধ নেই ।

কারো লেখা জনপ্রিয় হলেই যেমন বলতে পারি না সাহিত্য হয়নি আর কারও লেখা সুখপাঠ্য নয় বলেই তা সাহিত্য, এটাও ঠিক নয় । হুমায়ূন আহমদ'এর প্রথম দুটো উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' আর 'শংখনীল কারাগার' যখন প্রকাশিত হল তখন সাহিত্যামোদী সকলের মাঝে একটা প্রত্যাশা জন্মাল যে, বাংলাসাহিত্যে যুগান্তকারী এক সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল । ক্রমে নন্দিত নরকে আর শংখনীল কারাগার হূমায়ূন আহমেদকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিল। এদুটো উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে। কাহিনী দুটোর চরিত্র খোকা, রাবেয়া, রুনু, ঝুনু বা মন্টু আমাদের আশেপাশের মানুষ। যেন এই চরিত্রগুলো আমাদের মনের কথা, আবেগ আর অনুভূতিই প্রকাশ করছে। সাংসারিক হৃদ্যতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেম সবই যেন আমাদের চিরচেনা। নিজেদের কথা, নিজেদের আবেগ ছাপার অক্ষরে দেখতে পেয়ে পুলকিত পাঠককুল অতি আহলাদে বরণ করে নেয় লেখককে।

এই লেখক যত কিছুই লেখেন তিনি অবশ্যই তার নিজস্ব স্টাইলেই আর অতি সাধারণ মানুষের জন্যই লেখেন । তিনি খুবই সরল আর প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন যা সাধারণের কাছে সহজেই আদরণীয় হয়ে ওঠে । তিনি কোনো জটিলতাকে তার উপন্যাসে উপজীব্য করেন না বরং নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেন, যা আনন্দদায়ক। গল্পকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনে তার জুড়ি মেলা ভার। তার বলার ভঙ্গীর সরলতায় পাঠক চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়। এবং এক পর্যায়ে তিনি তার গল্পকে এমন জায়গায় নিয়ে যান যা পাঠককে চমকে দেয় । দুর্ভাগ্য এই যে ,তার ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার কারণে তার উপন্যাসকে অনেকে বলেন অপন্যাস; আর তার জীবন-ঘেরা চরিত্রগুলোকে বলেন সাদামাটা। তাকে অনেক সময় তার ব্যক্তিজীবন দিয়ে বিচার করা হয়। খুব নিরপেক্ষ, খুব ভাবালুতাবর্জিতভাবে তাকে দেখার অবকাশ হয়তো এখনো আসেনি। বরং যারা তার প্রশংসা করেন– তাদেরকে–তাদের মেধাকেও দেখা হয় তীর্যক দৃষ্টিতে। তার লেখাকে বলা হয় একঘেয়ে, উদ্দেশ্যহীন এবং সস্তা ।

এই লেখকের বিভিন্ন উপন্যাস থেকে তার কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলোকে আলোচনায় আনা যাক। হুমায়ূনের উপন্যাসে তার নারীচরিত্রগুলো হয় অসম্ভব সুন্দরী। ইমোশনাল । বুদ্ধিমতী এবং একটু অস্বাভাবিক। তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স ১৮-১৯ যেটাকে বলে টিনএজ। এরা সাধারণত কোনো বয়স্ক পুরুষ অর্থাৎ তার থেকে ১৫-২০ বছরের বড় পুরুষের প্রেমে পড়ে যায়। তাদের আকর্ষণের চেষ্টা করে। তারা আবেগে পরিচালিত হয়। এখন এই যুগেও তারা শিক্ষাদীক্ষা বা চাকরিবাকরি নিয়ে ভাবে না; তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রেম, বিয়ে এবং সন্তান উৎপাদন। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষের মাঝে রয়েছে এই ধরনের নারীর প্রতিকৃতি– যারা এই উপন্যাসের নায়িকাদের মতো- তাই এই নায়িকারা তাদের চুম্বকের মতো টানে। আর আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সমাজের অধিকাংশ মেয়েই আবেগপ্রবণ এবং লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তারা এইসব নায়িকাদের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। তার লেখনীর ধার এমনই । তার বলার ভঙ্গী এতই মাদকতাপূর্ণ যে, মুহূর্তে একজন টিনএজ মেয়ে 'আমার আছে জল'-এর দিলু হয়ে যায় । অথবা 'মেঘের পরে মেঘ'র আলো, 'তোমাকে'র নীলু হয়ে যায় । এই আবেগ নিয়ে খেলা করা অত সহজ কাজ নয় । অথবা 'কোথাও কেউ নেই'-এর মোনার মতো ব্যক্তিত্বশীল মহিলা অথবা রুমালি যে কিনা তার চাইতে ২০ বছরের বড় এক ফিল্ম ডিরেক্টরের প্রেমে পড়ে । এই চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন এক চমক আছে ; আছে এমন সৌন্দর্য যা নারীকে আবেগআপ্লুত করে ফেলে আর পুরুষকে করে দেয় বিমোহিত ।

আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের মনমানসিকতাকে লক্ষ করেই হুমায়ূন তার উপন্যাসগুলো রচনা করেছেন। তার প্রায় সবগুলো রচনায় মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, আনন্দ-বেদনা মানসিক টানাপোড়েন এবং এমনকি অবচেতন মনের ভাবনাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । বলতে দ্বিধা নেই, এখনো আমাদের সমাজ পুরুষশাসিত। পরিবারের প্রধান পুরুষ, সিদ্ধান্ত নেবার মালিকও পুরুষ। এই পুরুষের মনোজগতে নারী কখনো মোহিনী, কখনো রূপবতী ,কখনো রহস্যময়ী। এই নারীর চিন্তা-চেতনা কেবলই একজন পুরুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপৃত। আর পুরুষ হচ্ছেন সব সময়ই উন্নত শির কোনো না কোনো দিক দিয়ে ।

এই জন্য হুমায়ূন আহমেদের নায়ক যেমনই হোক তার ব্যক্তিত্ব প্রখর এবং সে সবসময়ই প্রভাব বিস্তারকারী। হিমু চরিত্রটি নিয়ে যদি ভাবা যায় তাহলে দেখি, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে হিমু হয়ে বসে আছে। হিমুর অতিপ্রাকৃত চরিত্রের মাঝে যে অহংবোধ, যে দীপ্তি তা যেন আমাদের এই সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের প্রতিচ্ছায়া । তাদেরও অহমিকা আছে তাদেরও চিন্তা-চেতনায় ভালো লাগার, মন্দ লাগার এক নিজস্ব রূপ আছে– হিমুর মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়। তাই তারা যখন দেখে তোমাদের এই নগরে'- আমেরিকা থেকে আগত আশা ' হিমুর প্রেমে পড়ে তখন তারা হিমুর পক্ষে। আবার হিমু তো মহামানব জাতীয় এক চরিত্র- সে তো কখনও প্রেমে পড়তেই পারে না- এবং সেই হিমুও এই যুবসমাজের প্রতীক। হিমুর

মধ্য দিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করার কষ্টকর আনন্দটুকু এখানেই তারা অর্জন করে। এই জন্য হিমু তুমুল জনপ্রিয়। আমি নিশ্চিত, এ বছরও হিমু আমাদের যুব সমাজের মধ্যমণি হয়ে থাকবে ।

হুমায়ূন লেখেন। প্রচুর লেখেন। তবে পাঠক টানার জন্য তিনি এমন কোনো আপত্তিকর দৃশ্যের অবতারতা করেন না। তাই তার বই অন্যের সামনে অনায়াসে পড়া যায় । যৌনতা বা নগ্নতাকে তিনি শৈল্পিক ভঙ্গীতেই দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন এবং এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে এটি অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তিনি এক্ষেত্রেও মধ্যবিত্তের মানসিকতা অতিক্রম করতে পারেননি। একজন পুরুষ তার কাঙ্ক্ষিত নারীকে যতখানি নগ্ন আর যতখানি অশালীন দেখতে চায় তার বেশি তিনি কখনই দেখান না। এই খানে হুমায়ুন বাস্তবতার সাথে আপোস করেছেন বলেই মনে হয়। তার উপন্যাসে নায়িকা তার নগ্নতার জন্য লজ্জিত হয়। এমনকি এই অন্যায়বোধ থেকে সে নায়কের কাছে ক্ষমাও চায়। ফলে তার এই নগ্নতা রূপ পায় পবিত্রতায়। হুমায়ূন সেক্স নিয়ে মধ্যবিত্তের এই হিপোক্রেসি সম্পর্কে ভালোই অবগত আছেন। মোট কথা আমাদের এই মধ্যবিত্তের মানসিকতা, এর সরলতা, দুর্বলতা, ইমোশন ন্যায়-অন্যায় বোধ সব কিছুই তার নখদর্পণে । আর এইগুলোকেই পুঁজি করে তিনি চরিত্রচিত্রণ করেন ।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হল তিনি তার উপন্যাস বর্ণনানির্ভর না করে সংলাপনির্ভর করেছেন। তার চরিত্রগুলো কথা বলে নিজস্ব স্টাইলে, সে স্টাইল আমার-আপনার স্টাইল। হঠাৎ মনে হয় আপনার বা আমার বাবার কথাই বলা হচ্ছে। হঠাৎ মনে হবে এই উপন্যাসের নায়িকা ঠিক আমার বা আপনার পাশের বাড়ির মেয়েটি। তার কথা বলার ভঙ্গী, আচার-আচরণ সবই যেমন আমরা চাই তেমনই। আর সংলাপ? শহুরে বা গ্রাম্য যেভাবেই আসুক– অতি সাধারণ। এবং সাধারণ বলেই এটি অসাধারণ। সহজ কথা সহজে বলার অদ্ভুত দক্ষতা আছে হুমায়ূনের , যা সবার থাকে না।

এটি সত্যি বাংলা সাহিত্যে তিনি সায়েন্স ফিকশন লেখার প্রথম কারিগর। তার লেখার যাদুকরি ক্ষমতার কথা আমরা সবাই জানি। তিনি যাই লেখেন তা মন দিয়েই লেখেন । বাংলাদেশে টিভি ধারাবাহিককে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গেছেন এই হুমায়ূন আহমেদই । অস্কার পুরস্কারের জন্য 'বহুব্রীহি'তে তার বর্ণিত চরিত্রগুলো এত বেশি জীবন্ত এবং এত হাস্যরসাত্মক ছিল যে অতি সহজেই তা জনপ্রিয়তা পায় । তার প্রথম ধারাবাহিক 'এই সব দিন রাত্রি' বা ঐতিহাসিক ধারাবাহিক 'অয়োময়' অথবা শহুরে বখাটে বাকের ভাই খ্যাত 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিক অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তা পায়। । 'কোথাও কেউ নেই'-এর বখাটে বাকের ভাইকে মানুষ এত বেশি ভালোবেসেছিল যে নাটকে তার মৃত্যুদণ্ড যেন কার্যকর না হয় এই জন্য দর্শক বাস্তবে মিছিল পর্যন্ত করেছে। এই যে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি , এটি আমরা আগে কোথাও কি দেখেছি? এখানেই তার সার্থকতা।

শুধু টেলিভিশন নয়, চলচ্চিত্রে হুমায়ুন আহমেদ সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । নিজের রচিত ও পরিচালিত প্রথম ছবি 'আগুনের পরশমনি' । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি এতটাই সুনির্মিত ছিল যে, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ৮টি ক্যাটাগরিতে এটি পুরস্কার পায় । মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তার আর-একটি সুনির্মিত ছবি 'শ্যামল ছায়া' বিদেশি ভাষায় বেস্ট ছবির জন্য মনোনয়ন পেয়েছিল । মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তার এই ছবিতে তিনি ১৯৭১-এর যুদ্ধের যে চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দৃশ্যায়িত করেছেন তা বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি । এই উপন্যাস মুসলিমদের ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার ফলে হিন্দুরা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল তা এত পক্ষপাতহীনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, কেবল সত্যের নির্যাসটুকুই বেরিয়ে এসেছে । মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের যে সন্দেহ এবং বিদ্বেষ দানা বেঁধে আছে;এই ছবিতে মুসলিমদের সেই নেতিবাচক দিকগুলো তিনি পরিহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই– ফলে কেবল বাস্তবতাটুকুই উঠে এসেছে । এখানেই তার সার্থকতা । তিনি তার ছবিতে মুসলিম ধর্মান্ধতার সাথে আপোস করেননি, বরং ঘটনা বর্ণনা করেছেন মাত্র ।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের সাহিত্য প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের অনুরূপে গড়া । হুমায়ূন এই আদল ভেঙে বের হয়ে এসেছেন । তিনি প্রচলিত এই ধারাকে অনুসরণ করেননি । বরং তার সহজসরল বর্ণনা এবং সোজাসাপটা সংলাপ খুবই দ্রুততায় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে । তার উপন্যাস অথবা গল্পের বর্ণনার চেয়ে সংলাপই থাকে বেশি । কথা যে শিল্প, কথা যে সময়কে ধারণ করতে পারে অবলীলায় তা তার সংলাপে ফুটে উঠে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হুমায়ূনের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো খুবই গতানুগতিক এবং সাদামাটা । তাদের আচার-আচরণও আর দশজনের মতো । কিন্তু এই চরিত্রগুলো যখন তিনি রোমান্টিক ভাবালুতায় ভাসিয়ে দেন তখন হয়ে ওঠে অসাধারণ । সাধারণ মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় এই চরিত্রে, যেন সে-ই নায়ক । এখানেই হুমায়ূনের শক্তি । কোন্ সংলাপ লোক পছন্দ করে, কোনটা্ নয় এটি কোন্ যাদুমন্ত্রে তিনি জানেন বলা মুশকিল । সহজ এবং সুন্দরভাবে অথবা বলা যায়– নিষ্পাপভাবে তার চরিত্রগুলো কথা বলে । আর এর মধ্যেই যে সঙ্গতি-অসঙ্গতির ফারাক সেটিই আমাদের হাসির খোরাক যোগায় । হুমায়ূন খুবই পজিটিভ লেখক । তিনি আশাবাদী । তার রচনায় কখনো হতাশা কাজ করে না । সর্বোপরি বাঙালি মানস, বাঙালি মনমানসিকতা, রুচিবোধ বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত- যাদের সোজা কথায় আমরা মিডল ক্লাস বলি– এই ক্লাসের সবরকম পছন্দ-অপছন্দ তার নখদর্পণে বলেই তিনি তার লেখনী দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছেন ।

অনেকে বলেন, হুমায়ূন যা লেখেন তাকে সাহিত্য বলা যায় না । তিনি যে গদ্য রচনা করেন তাতে কোনো উপমা, অনুপ্রাস বা ভাষার সৌন্দর্যের জন্য কোনো অলংকার থাকে না । পাঠকের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই । তিনি তার লেখায় কোনো ম্যাসেজ রাখেন না । তার লেখা পৌনঃপৌনিকতায় দুষ্ট । তিনি তরলমতি যুবক-

যুবতীদের প্রিয়; কারণ তারা বিষয়ের গভীরে ঢুকতে চায় না, ভাবতে চায় না, ফলে তারা হুমায়ূন পড়ে।

আগেই বলেছি উপন্যাস হল আধুনিক সময়ের সৃষ্টি। আধুনিক জীবনের যাবতীয় উপাদান উপন্যাসে বর্ণিত থাকতে হবে। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ যে সময়টাকে ধারণ করে উপন্যাস লেখা হয়েছে সেই সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান ও সুস্পষ্ট থাকতে হবে। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনৈতিক বাস্তবতা অবারিতভাবে উঠে আসবে উপন্যাসে। সমসাময়িক কালে অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু কেউ তেমন জনপ্রিয় হননি। অথচ বঙ্কিমের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বি। বঙ্কিম উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে সেকালের সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা, জটিলতা। বঙ্কিমের বেশিরভাগ রচনাই ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস। তবে এটা সত্য যে বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবন রূপায়ণ সে সময় খুব সহজ ছিল না । সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্নতা, কুসংস্কার এবং শাস্ত্রীয় রীতি তার সময় ছিল প্রকট । এসব উপাদান শিল্পরচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ছিল প্রতিবন্ধক। এসব প্রতিবন্ধকতা ঠেলে দিয়ে সমস্ত জটিল ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের আসল স্বরূপ তিনি বের করে আনেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন আরেক জনপ্রিয় লেখক। সমালোচকেরা বলেন, তার শিল্পসৃষ্টিতে যে ত্রুটি আছে, তাঁর কল্পনা যে স্থানে দুর্বল হয়েছে সে সবই পূরণ হয়ে যায় জনগণের প্রতি তার অন্তরের দরদ দেখে। তিনি বাংলাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন। বাংলাও তেমনি তাকে ভালোবেসেছে। তিনি নতুন করে বাংলাদেশকে আবিষ্কার করেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য এবং সেই আবিষ্কারের মধ্যে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তিনি আবিষ্কার করেন, কী বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তিনিই প্রথম এটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, বাঙালি জীবনের বাহ্যিক একঘেয়েমির অন্তরালে প্রেম ও বিতৃষ্ণা, আশা ও নৈরাশ্য, সুখ ও দুঃখ কিভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। এভাবেই একজন জনপ্রিয় লেখকের মানদণ্ডটি নিরূপণ করা হয়। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রটি নির্ধারণে প্রধানত রচনার সৌকর্য, চরিত্র চিত্রায়নের মুন্সিয়ানা এবং জীবনদর্শনের ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ।

বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরে নিই তবে তাঁর ক্ষেত্রেও সময় এবং সামাজিক সমস্যার অর্থনৈতিক বাস্তবতার বিষয়টি উপন্যাসে বিধৃত হতে দেখি। তথ্যপ্রবাহ এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নানা রকম সমস্যায় ফেলেছে। বিশেষত একদিকে সমাজে বিভক্তি এবং বৈষম্য যেভাবে বাড়ছে অন্যদিকে এটি মানুষকে ভোগ এবং অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ নিয়মহীন পুজিঁর অবাধ প্রবেশ। এক্ষেত্রে শিল্প হিসেবে উপন্যাস কী করতে পারে? তার দায় কী? তাছাড়া আমরা দেখতেও পাচ্ছি উপন্যাস একটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। প্রথমেই যে শর্তের কথা উল্লেখ করেছি উপন্যাসের জন্য সেটা আজকাল মোটামুটি সব উপন্যাসেই সাধারণ বিষয়। কারণ, আমরা যে সময়ের মুখোমুখি– একজন লেখকও অনিবার্যভাবে

সে সময়ের মধ্যেই বসবাস করছেন। সেজন্য সময়ের জটিলতাই শিল্পীকে এরকম প্রকরণ বেছে নিতে উদ্যোগী করে তুলেছে। এর ভেতরেও প্রত্যেকে নিজের নিজের দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সত্যকে নিরীক্ষণ করছেন। যা সত্য ও বির্বতনের নিরিখে দিকচিহ্নধারী তা অবশ্যই আস্বাদনযোগ্য। কালের বিচারেও তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর উপন্যাসে জনপ্রিয়তার শর্তগুলোও এর মধ্যেই নিহিত। কারণ কাহিনীগদ্যে যে রোমাঞ্চ, এডভেঞ্চার ও অপরিমেয় জীবনবোধের সন্ধান থাকে তা অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে নিয়ে আসা দুরূহ। উপন্যাস সে শর্ত পূরণে সক্ষম বলেই তার জন্ম ও সিদ্ধি অবাধ ও জনপ্রিয়।

হুমায়ূন আহমেদ যে সময়ের এবং কালের লেখক সে সময় এবং কাল থেকে তাকে বিযুক্ত করা যাবে না। তার পাঠকসমাজ অস্থিরচিত্ত, প্রযুক্তির এবং তথ্যপ্রবাহের অবাধ গতির প্রস্রবণে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তার চোখে দৃশ্যমান গোটা পৃথিবী। সে নব ঘুরালেই বিশ্ব দেখতে পায়। তার মনোজগত এখন চিন্তার চিত্তাকর্ষক অনুভূতি বিরাজের সময়টুকুও নেই। সে অনলাইনে পৃথিবীর যাবতীয় নির্যাস উঠিয়ে আনতে চায়, জাগতিক সকল কিছুই তার নাগালের মধ্যেই যে রয়েছে। হুমায়ূন এই সময়ের একজন লেখক। তিনিও তার সময়ের মধ্যেই বসবাস করছেন। এই সময়ের পাঠকের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতিগুলোকে তিনি ধরতে চেয়েছেন কালের বিপরীতে গিয়ে নয় বরং স্বপক্ষে থেকেই। তাই তিনি তার গদ্যে বর্ণনায় বিশ্লেষণে সকল বাগাড়ম্বর পরিহার করেছেন। বরং এখনকার মানুষ বলতেই বেশি ভালোবাসে। ভাবতে নয়। তিনি তাই তার উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য করেছেন সংলাপকে। সংলাপের মধ্য দিয়েই তিনি অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অস্থির সময় এবং কালকেও। এই জন্যই 'কোথাও কেউ নেই'-এর 'বাকের' এত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাকেরের মতো একজন মাস্তানও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। কারণ বাকের এই সময়ের সৃষ্টি। এই সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাস বাকেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, কর্মসংস্থানও দিতে পারেনি।

হিমু কেন জনপ্রিয়? হিমু কী করে? সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানে রাত্রি যাপন করে। তার নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। তার কোনো নোঙ্গর নেই। আমাদের এই সমাজে কত শত হিমু আছে যাদের অনেক প্রতিভা আছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তা সত্ত্বেও সে নোঙ্গর ফেলতে পারছে না কোথাও। এই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এই সব হাজারো বেকার পণ্ডিত-শিক্ষিত হিমুকে ধারণ করতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে তার প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য তার বিশ্লেষণক্ষমতা আর বিচারবুদ্ধি তো বিলুপ্ত হয়নি, মরে যায়নি অহংবোধ। সে তো তার জগতে নিজেই সম্রাট। আর এই সব হিমুদের ভালোবাসে যে তরুণীরা, তাদের ভেতরের যন্ত্রণা তো এখানেই নিহিত। সে তার হিমুকে ভালবাসে, তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। তার মঝেই খুঁজে পেতে চায় সর্বকালের সুন্দর, রোমান্টিক, প্রতিভাদীপ্ত পুরুষকে। আমাদের এই অস্থির সমাজব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, আমদের যুবসমাজকে যে ভাঙা-গড়ার মধ্য

দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে– তাতে সুকুমারবৃত্তির নিরন্তর চর্চার সময় কি তারা পাচ্ছে? কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায় তাদের মধ্যে নান্দনিকতা নেই? তাদের মধ্যে সুন্দরের জন্য, সত্যের মহিমার জন্য আকুলতা নেই? আছে। আর আছে বলেই তারা বার বার হুমায়ূন আহমেদের কাছে আসে। তার উপন্যাসের কাছে আসে। এইখানে তারা দেখতে পায় তাদের ঈপ্সিত বাসনার প্রতিফলন। হুমায়ূনের উপন্যাসে যে পাত্রপাত্রী, তারা যে ভাষায় কথা বলে, যেভাবে চিন্তা করে তার মাঝে সে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। তার মধ্যে সে অবগাহন করতে চায়। এর মধ্যেই সে নিজের মুক্তি দেখে, হতাশা দেখে, উত্তরণ দেখে। বাস্তবে যে কঠোর নৈরাশ্য তাদের দমিত করে রাখে প্রতি পলে পলে নিষ্ঠুর বাস্তবতা, তাকে সামনে এগোতে দেয় না। এর লজ্জা থেকে সে উত্তরণ চায়। হুমায়ূনের উপন্যাসে এই সব সাধারণ মানুষেরা নিজেদের কথা সরল ভাষায় বলে, কখনো গ্রামীণ উচ্চারণে বলে তাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতির কথা– অতি সাধারণ এই সব কথা–এগুলো প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে। আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গ ঘরানার সাহিত্য খোলস ছাড়িয়ে, আঙ্গিক ভেঙে বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আমরা দেখেছি হুমায়ূন আহমদের অনেক উপন্যাসের নায়িকা টিন এজ, তারা ভালোবাসে কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে। এগুলো সুখপাঠ্য হওয়ার কথা নয়। এগুলো তো বর্জন করারই কথা পাঠকদের। কিন্তু তা কেন হচ্ছে না? কারণটা আগেই বলেছি। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণে যেসব ব্যক্তি আগে বঞ্চিত হয়েছে তাদের বিলীন সুখ-স্বপ্নের জিয়নকাঠি এখানে প্রতিফলিত হয় বলেই তারা এই অসম প্রণয়কে সাদরে গ্রহণ করে। সুতরাং হুমায়ূন যে এই অস্থির সমাজকে সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছেন, তাদের মনোজগতের ভাবনার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রাপ্তির শূন্যতাটুকু চিহ্নিত করতে পেরেছেন, তা বলাই বাহুল্য। একজন লেখক যখন লক্ষ্মীর প্রতিভূ হন তখন অনাহূত অনেক পরিস্থিতিও তাকে সামাল দিতে হয়। তার লেখা মানেই বেস্ট সেলিং, কাজেই প্রকাশকগণ তাকে চাপে ফেলেন। মানুষ বলেই তিনি সেই চাপে নতি স্বীকার করেন। আর লেখেন অনেক লেখা– যা পড়লে মনে হবে তিনি পাঠকের প্রতি সুবিচার করেননি। এই সীমাবদ্ধতা তার আছে। যখন সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার হবে, যখন তার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলো মূল্যায়িত হবে, তখন যেগুলো পাঠক গ্রহণ করেননি– সেগুলো ঝরে যাবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। তাই একেবারে নির্বিচারে বলতে চাই না হুমায়ূন আহমেদের লেখা সাহিত্য নয় । বলতে চাই– যার লেখা এত জনপ্রিয়- তার লেখার যদি সাহিত্যগুণ না-ই থাকত তবে তা এখনো কেনে কেন মানুষ? পড়ে কেন? উপহার দেয় কেন? এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগেও উন্মাদের মতো তার বই-এর জন্য বইমেলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেন তরুণ-তরুণী ? যুবক-যুবতী ? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা?

মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’: কলাকৈবল্যবাদী উপন্যাস?

ব দি উ র র হ মা ন

মাহমুদুল হক স্বল্প-লিখিয়েদের একজন। উত্তাল সত্তর দশকে তার প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা এক: ‘জীবন আমার বোন’। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৭৬। জীবন আমার বোনেই মাহমুদুল হকের পরিচিতি স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তৃতি, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের বাংলাদেশ। পঁচিশে মার্চের কালরাত্রির দুর্দিনে কাহিনীর সমাপ্তি।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র খোকা। মা-মরা খোকার বাবা পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি চাকরিরত। ঢাকার ধানমন্ডির বাড়িতে কাজের মেয়ে ময়না সহ খোকা আর তার বোন রঞ্জুর বাস। রঞ্জু কলেজের ছাত্রী। ভাই-বোনের সুসম্পর্ক প্রশ্নাতীত। খোকা প্রায়ই বাইরে থাকে। তার বন্ধু-বান্ধবরাই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। তবে কোনো চরিত্রই যেন তেমন সার্থক রূপায়ণের পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি।

কাহিনীর পট উন্মোচন, খোকার বাড়িতেই, ভাই-বোনের কথোপকথন-এর মাধ্যমে। খোকা চারদিন পর বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি থেকে বের হয়ে সাত-পাঁচ ভেবে নীলা ভাবীর ওখানে যাওয়াই স্থির হয়। নীলাভাবী প্রেম নিবেদন করতে চায় খোকাকে। খোকা তার বাকপটুতা আর চাতুরালির সাথে গুরুত্বহীন করে তোলে সে প্রস্তাব। তবে ইতিমধ্যেই খোকা-নীলাভাবী গড়ে তুলেছে দৈহিক সম্পর্ক। নীলা ভাবীর স্বামী বাড়ি ফিরে এলে খোকা ফিরে আসে নিজের বাড়ি। আবার ঘরে থাকে কয়েকদিন। এক-সময় খোকার বন্ধু মুরাদ আসে তাদের ঘরে। নানা আলোচনায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে মুরাদের বিদায়।

পরবর্তী দৃশ্যের উন্মোচন ঘটে রেসকোর্স ময়দানে সভার পর। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়ায় শহর প্রায় শূন্য। খোকা ঢোকে রেক্স-রেস্তোরায়। সেখানে সাক্ষাৎ হয় রহমান, নুরুদ্দিন ও মাওলার সঙ্গে। এরা সবাই খোকার বন্ধু। নানা আলোচনার পর খোকা পা বাড়ায় পথে। পথ চলতে নানা ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। সেজ খালার মেয়ে বেলীর ভাবনায় এক সময় পেয়ে বসে খোকাকে। বেলীও খোকার কাছে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে স্থির হয়

মুরাদের বাড়িতে যাওয়া। মুরাদের বাড়িতে আর থাকে বোন লুলু চৌধুরী। লুলু চৌধুরী বীমা কোম্পানির চাকুরে। কিছুটা খোলামেলা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বন্ধুদের টেবিলে অনেকদিনই লুলু চৌধুরী প্রসংগ এসেছে। লুলু চৌধুরীকে নিয়ে বক্রোক্তিই করেছে বন্ধুরা মুরাদের সামনেই। খোকাকে পেয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে তাকে নিয়ে আলোচনা প্রসংগে – লুলু চৌধুরী এবং প্রস্তাব দেয় খোকাকে তার বীমা কোম্পানিতে যোগদান করতে। খোকা আর মুরাদ বেরিয়ে পরে পথে। এবার আড্ডা, রমনা রেস্তোরায়। সেখানে সাক্ষাত হয় বন্ধু গঞ্জালেস ও ইয়াসিনের সঙ্গে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে দেশ আর দেশের রাজনীতি নিয়ে। আড্ডা শেষে ঘরে ফিরে আসে খোকা। তখন রাত। এসে দেখে রঞ্জু কাঁদছে। সংবাদ পায় এক চাচা এসেছিলেন– খেতে বলেছেন। এসেছিলেন সেজ খালা আর তার মেয়ে বেলী। বেলী খোকার বিছানা বই সব তছনছ করে রেখে গেছে – আর রেখে গেছে একটা চিরকুট। বাড়ির কাজের মেয়ে ময়না চলে গেছে হাতেম আলীর সাথে। হাতেম আলী তাকে বিয়ে করতে বলেছে।

খোকা ভাবে রঞ্জু-মুরাদের সম্পর্ক নিয়ে মুরাদ রঞ্জুকে ভালোবাসে – রঞ্জু সাড়া দেয় না।

পরের দিন খোকা রঞ্জুকে নিয়ে যায় সেজ খালার বাড়িতে। তাকে রেখে বাড়ি ফিরে দেখে লুলু চৌধুরী এসেছে খোকার বাড়িতে। আলাপ-আলোচনা হয় দু'জনে। লুলু বলে যায়। খোকাও বেরিয়ে পরে। এবার খালার বাড়ি থেকে রঞ্জুকে নিয়ে নীলা ভাবীর ওখানে। নীলা ভাবীকে সাথে নিয়ে গ্রামে চলে যেতে উপদেশ দেয় নীলা-স্বামী রাজিব। নীলাও ইচ্ছা প্রকাশ করে খোকার সাথী হতে – খোকা প্রত্যাখ্যান করে সে প্রস্তাব। রঞ্জুকে নিয়ে ফেরে বাড়িতে।

পরের ভোরে মুরাদ আর ইয়াসিন আসে খোকার বাড়ি। তাদের প্রস্তাব রঞ্জুকে নিয়ে গ্রামে চলে যাবার। খোকা ও প্রস্তাব মেনে নেয় না। তাদের বাবা না ফেরা পর্যন্ত বাড়িতেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয় ভাই-বোনে। খোকা স্টেডিয়ামের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয় রহমান আর নুরুদ্দিনের সাথে। এক সময় পা ঘসতে ঘসতে পৌঁছায় নীলা ভাবীর বাড়ি। নীলা-স্বামী রাজিব এসে পরে। চারদিকের নানা রকম খবর। সামরিক বাহিনী নেমে পড়েছে রাস্তায়। এর মধ্যে খোকা-রাজিব দাবা খেলায় মাতে। খোকা আর বাড়ি ফিরতে পারে না। একসময় বাইরে থেকে একটা বুলেট এসে কেড়ে নেয় রাজিবের জীবনপ্রদীপ। সারা শহরে কারফিউ। দুদিন পরে কারফিউ শিথিল হলে খোকা ফিরে যায় ঘরে। রঞ্জুকে পায় – কিন্তু সে বাক্ শক্তিহীন। রঞ্জু বাকশক্তি হারিয়েছে প্রথম ক্রাকডাউনের রাত্রেই। সুযোগ পেয়েই খোকা অন্যান্যদের সাথে রঞ্জুকে নিয়ে পাড়ি দেয় বুড়িগঙ্গা। রঞ্জু জ্বরে আক্রান্ত হয়। আশ্রয় হয় একটা গাছের নিচে। এ সময় সামরিক বাহিনী সেখানেও আক্রমণ চালালে রঞ্জুকে ফেলেই খোকা পালায়। খোকার কাহিনী এখানেই শেষ।

খোকার বন্ধু রহমান, মুরাদ, ইয়াসিন সবাই যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। রহমান যুদ্ধে নিহত। ইয়াসিন পঙ্গু আর মুরাদ গেরিলা কমান্ডার হিসাবে স্বীকৃত। – এই-ই জীবন আমার বোন।

মাহমুদুল হকের জীবন আমার বোন-এ– উপন্যাসের জন্য যা অনিবার্য– সে গাথুনিযুক্ত কোনো প্লট নেই, নেই কাহিনীর কেন্দ্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ বা ছক। সার্থক চরিত্র চিত্রণও এখানে অনুপস্থিত। খোকা বলে যে যুবককে উপন্যাসের নায়ক বলে মনে হয়, মূলত সে চতুর, কথাবার্তায় পাকা, আত্মনিমগ্ন, স্বার্থপর, সমস্ত ঘটনার একজন নিস্পৃহ দর্শক মাত্র। নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও যেন নেই খোকার। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বক্ষণের যে অবস্থার মধ্যে কাহিনীর বিন্যাস – সে অবস্থার বর্ণনা আছে জমকালো, কিন্তু এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য কারা দায়ী। কারাই-বা সংগঠিত করছে এমন যুদ্ধাবস্থা – তা উপলব্ধি করার কোনো উপায় নেই এ উপন্যাস পাঠে। এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা যেন এ সমাজের মানুষই নন। বরং উল্টোটা ঘটেছে– এ উপন্যাসে – সব চরিত্র মিলে যেন মুক্তিযুদ্ধটাকেই খেলো করে তুলেছে।

সাহিত্য-তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলে এন্টি-নভেল Anti-Novel এ যেন ঠিক তাই। "এমন অনেক রচনা আছে যেখানে চরিত্র-চিত্রণ নেই, কাহিনীর বৃত্ত নেই, প্লট নেই, উপন্যাসের ভাবলক্ষণ অনুপস্থিত–এমন যে উপন্যাসকল্প লেখা–তাকেই অধুনা Anti-Novel বলা হয়েছে। Anti-Novel জাতীয় উপন্যাসে চরিত্র-নির্মাণের দিকে লেখকের নজর থাকে না। "[১] ঠিক এভাবেই লেখক এগিয়েছেন তার একশত চুরাশি পাতার জীবন আমার বোন নিয়ে। উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় দিকগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে লেখক বরং অধিকতর মনোনিবেশ করেছেন ভাষা নির্মাণে, অলংকার ব্যবহারে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে। সে হিসাবে মাহমুদুল হকের সার্থকতা সন্দেহাতীত। কিন্তু আমাদের বিচার্য অন্য প্রসঙ্গ। মাহমুদুল হক তার বিষয়বস্তু ও কাহিনী বর্ণনার স্থান ও সময় নির্বাচন করেছেন সমসাময়িক বাংলাদেশ এবং তিনি সার্থকতার সাথে বর্ণনা করেছেন সমসাময়িকতা। সে বর্ণনায় রাজনীতি এসেছে – এসেছে অর্থনীতি, সমাজনীতি, দেশাত্মবোধ, মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি। কাহিনী বর্ণনায় লেখকের সার্থকতা স্বীকৃত। সমসাময়িক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে এ উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে:

(ক) "রাজনৈতিক সংকট তো আছেই, তার উপর চতুর্দিকে হাজার রকমের ডামাডোল। জাহাজ বোঝাই সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে ছুটে আসছে, বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতের উপর বোমা দাগানো কসাই টিক্কা খান আসছে নতুন লাট-বাহাদুর হয়ে।"[২]

(খ) "দুটোর সময় প্রেসিডেন্টের কি এক ছাতার স্পিচ ব্রডকাস্ট হয়েছে, ব্যাস,সারা শহর ফেটে পড়েছে বারুদের মতো। স্টেডিয়ামে চেয়ার ভাঙাভাঙি, দোকানপাট সব দুদ্দাড় করে বন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় কেবল মানুষ আর মানুষ। লাঠিসোটা লোহার রড, পাইপ, হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে ছেলেবুড়ো জোয়ান সব উন্মত্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে।"[৩]

(গ) "কোনো একজন বক্তা বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে, ভাইসব, সময় নষ্ট করবেন না, আপনারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন, আজ আপনাদের সম্মুখে কেবলমাত্র একটি পথই খোলা, সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। কালবিলম্ব না করে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে আপনাদের আঘাত হানতে হবে শত্রুকে।"[৪]

(ঘ) "ইয়াহিয়া-ভুট্টো নাকি দু'দফা মেনে নিয়েছে। টেলিগ্রামও বেরিয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ভিড়, এখন কেবল রেডিও-টেলিভিশনে সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা:"–৫

(ঙ) "চতুর্দিকে মুহুর্মুহু প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ফেটে পড়তে থাকে। প্রাণভয়ে ভীত রাস্তার মানুষজন আত্মরক্ষার জন্যে যে দিকে পারছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এলোপাথাড়ি দুদ্দাড় করে ছুটে পালাচ্ছে।"[৬]

(চা) " এখন সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড। চারিদিকে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ওরা বলছে সৈন্যরা সমস্ত ছাত্রাবাস আর পুলিশ লাইন ট্যাংক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে।"[৭]

(ছ) কী পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা চলেছে শহরময়। জানালার ফাঁকে চোখ রাখলেই দেখা যায় চতুর্দিকে মৃতদেহ, ছিন্নভিন্ন, ঝাঁঝরা, শহর জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, তপ্ত বাতাসের হলকায় দগ্ধ মাংস আর বারুদের কটু গন্ধ।"[৮]

জীবন আমার বোন-এ এমন রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় আরও পাওয়া যায়। সাথে সমসাময়িক বাংলাদেশের অবস্থারও পরিচয় ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে:

(ক) বন্দুকের দোকানগুলো সব লুট হল, জেল ভেঙে কয়েদিরা সব ভাগতে শুরু করছে, এখানে আগুন, ওখানে আগুন, লুটপাট, মোটেই ভালো লক্ষণ না এসব।"[৯]

(খ) "সেজ খালা অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললে, কী জানি, তোরা কী বুঝেছিস তোরাই জানিস। প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে, আর তোরা বাড়ি বাড়ি অস্থির হয়ে উঠেছিস। –মারামারি বেধে গেলে তাল সামলাতে পারবি? "[১০]

(গ) "ইকবাল হলের ছেলেরা কানাঘুষা করছে। হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে ছেলেরা।"[১১]

মাহমুদুল হক এক বর্ণনায় পরিচয় রেখেছেন একজন সমাজসচেতন লেখকের। আন্দোলন-উন্মুখ বাংলাদেশ, সামরিক আগ্রাসন, তার ফলে মানুষের অবস্থা, শহর, বন্দর, ছাত্র-ছাত্রাবাস এ সবই এসেছে এ বর্ণনায়।

উনিশশ' ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পাকিস্তানি সেনার গুলিতে নিহত হয়েছে ছাত্র আসাদ। শহীদ আসাদ গণঅভ্যুত্থান থেকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ পর্যন্ত এক কিংবদন্তির নায়ক হিসাবে ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের কবিতা 'আসাদের শার্ট' স্বাধীন বাংলাদেশেও যে কোনো দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানে আবৃত্ত হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত। মাহমুদুল হক সে আসাদের প্রসংগও এনেছেন বইয়ে, খোকা আর মুরাদের আলোচনায় "আসাদের কথা তোর মনে আছে মুরাদ? দূরাগত ধ্বনির মতো মুরাদের কানে বাজল কথাটা – বললে, মনে থাকবে না কেন, – খোকা বললে, আমি ভাবতেই পারি না আসাদ নেই। খুব কষ্ট হয় আমার।"[১২]

আবার মুরাদের কথায়, আসাদ ছিল আমাদের কাছে বাতাসের ঝাপটার মতো হঠাৎ দেখা পাওয়া বন্ধু, এই জন্যেই কষ্টটা। – চোখটা নিজের দিক থেকে ফিরিয়ে দেশ ও দশের স্বার্থের মাপকাঠিতে ফেলার চেষ্টা কর, দেখবি আজ আর এটা নিছক একটা নাম নয়, ঝকঝকে সোনার তলোয়ারের একটা প্রতীক, বিশাল দেশের ওপর স্থির বিদ্যুতের মতো যা ঝুলে রয়েছে।"[–১৩]

তুলনায়, "আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে এক খণ্ড বস্ত্র মানবিক,
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"[–১৪]

রাজনীতি ও সমসাময়িক সমাজের সাথে অর্থনীতি প্রসঙ্গও এসেছে মাহমুদুল হকের রচনায়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথাও বলেছেন লেখক তার পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে, "অবাঙালি পুঁজিপতিরা বস্তা বস্তা টাকা পাচার ক'রে ফেলছে, রুই কাতলারা ভাগছে, গা ঢাকা দিয়েছে অনেকেই, একটা কালো পরিণতি ধীরে ধীরে তার ক্ষেত্র তৈরি করছে।"[–১৫] এক বাঙালি জীবন বীমা কর্মচারী লুলু চৌধুরীর বক্তব্যে আসে বাঙালি মালিকানায় জীবনবীমা কোম্পানি গড়ে তোলার প্রস্তাব। এবং এর পিছনেও আছে দেশের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য: "সব টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হোক এখন আর বাঙালিদের কেউ তা চায় না। হেড অফিসগুলো সব পশ্চিমে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, দেশের কিভাবে ক্ষেপে উঠেছে, সকলেই চাচ্ছে দেশের টাকা দেশেই থাকুক, দেশেই খাটুক।"[–১৬]

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা সাধারণ মানুষকেও স্পর্শ না করে পারে না। খোকার বাড়ির কাজের মেয়ে ময়না বাবার মনের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে তার কথায়, "আল্লা করুক, জয়বাংলা যদি হয়েই যায় তাহলে আর মেয়েটাকে ঝিগিরি করায় কে?"[–১৭]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ-প্রাক্কালে দেশের মানুষের মধ্যে যে সচেতনা এসেছিল তা-ও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষই যে সচেতন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুরাদের জবানিতে, "এখন এমন একজনও মানুষ পাবি না সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক শ্রমিক হোক, যা-ই হোক না কেন, যে সজাগ নয় সতর্ক নয়। তুই-ই বল না, এদেশের মানুষের এত তাড়াতাড়ি আর এমন সর্বগ্রাসীভাবে আত্মোপলব্ধি ঘটবে তুই নিজেও কি কখনো ভাবতে পেরেছিলি? এর আগে আর কখনো আমরা এমনভাবে একাত্মতা অনুভব করিনি। সারা দেশের মানুষ আশ্চর্যভাবে এক হ'য়ে গিয়েছে।"[–১৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সে যুদ্ধকে সার্থক করতে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে আন্তর্জাতিকতায়। অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রাম থেকে। প্রস্তুতি নিতে হবে সে আলোকে। ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একজন রাজনৈতিক কর্মীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে,"আপনারা ভুলে

যাবেন না, ভাইসব, মনে রাখা দরকার গোটা বিশ্ব আজ আমাদের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ হঠকারীদের চক্রান্তে প'ড়ে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। তাকিয়ে দেখুন সংগ্রামী ভিয়েতনামের দিকে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কীভাবেই-না সেখানকার সংগ্রামী জনতা মুকাবিলা ক'রে চলেছে, এবং একই সাথে প্যারিসে চলছে শান্তি আলোচনা।"[-১৯]

লেখক এসবকিছু দেখছেন সন্তর্পণে – দূরে বসে দর্শক হিসাবে –এর সাথে লেখকের যেন যোগ নেই যোগাযোগ নেই। ইউরোপীয় ও মার্কিন উপন্যাসের এন্টিরিয়ালিস্ট ধারা এসেছে নানা পথ ধরে। এ পথসমূহের মধ্যে 'হ্যাপেনিং' অন্যতম। মানে যা চোখের সামনে ঘটছে, তাকে দ্যাখো, কিন্তু তুমি যদি যর্থার্থ শিল্পী হও, তাহলে তুমি তাতে অংশ নিও না। "[-২০] 'জীবন আমার বোন'ও হ্যাপেনিংধর্মী রচনা। যা কিছু ঘটেছে সব দূর থেকে দেখা এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, এ জাতীয় রচনায় প্লট বা চরিত্র-চিত্রন গৌণ। ফলে কাহিনী বিন্যাস যেন ডকুমেন্টে রূপান্তরিত। সমালোচক 'হ্যাপেনিং'কে অভিহিত করেছেন 'প্রতিক্রিয়ার ব্যাকরণ' বলে। যেখানে কোনো সংগঠন বা ঝঃৎঁপঃঁৎব বলতে কিছু থাকে না। এবং চরিত্রগুলোকে মনে হবে যেন পরজীবী। 'জীবন আমার বোন' এসব লক্ষণাক্রান্ত। এখানে সব চরিত্রই অপেক্ষাকৃত স্বল্পবয়সী। কিন্তু সবাই পাকা পাকা কথা বলে, কেতাবি ভাষায় কথা বলে। চতুর বাকভঙ্গিতে সবাই পটু। এ বাক-চতুরতার ফলে মানুষের হৃদয়বৃত্তি বা হৃদয়ানুভূতি হয় উপেক্ষিত। উন্নত শিল্পকর্মে যা অবশ্য প্রয়োজন জীবন্ত সংগঠন বা সমন্বিত প্রক্রিয়া – তার অনুপস্থিতির কারণে 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসের বিশাল, দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ, উত্তাল পটভূমি থাকা স্বত্ত্বেও এ উপন্যাস পর্যবসিত হয় একমাত্রিকতায়।

এক বিশাল পটভূমিকায় উপন্যাসের পট উন্মোচিত। কেন্দ্রীয় বা নায়ক চরিত্র বলে যাকে চিহ্নিত করতে হয় এ উপন্যাসে – সে খোকা। খোকা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। চারদিন একসাথে বাড়িতে বসে থাকে আবার তিনদিন হয়তো বাইরেই থাকে। খোকার বন্ধু-বান্ধবই উপন্যাসের অন্যান্য মুখ্য চরিত্র। এসব বন্ধুদের সাথে খোকার আলাপ হয়, আলোচনা হয়। এবং অধিকাংশ আলোচনাই রাজনীতি আসে – প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র খোকা রাজনীতিকে অভিহিত করে "রাজনীতির ব্যাপারটাই আগাপাশতলা একটা জমকালো ছেনালি বলে। "[-২১] কে এই খোকা? এ খোকার পরিচয় কাহিনী থেকেই তুলে ধরা যেতে পারে "এই এক স্বভাব খোকার, ঘরে থাকলে জুবড়ে প'ড়ে থাকে, বাইরে বের হ'লে ঘরের কথা ভুলে যায়। – আসল কথা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে তার খুব একটা জমে না কখনোই"।[-২২] এই প্রায়-বোহেমিয়ান খোকার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তার জবানিতেই শোনা যাক, "আমি একটা লোচ্চা, তার (খোকার) এইসব মনে হয়েছে, –আমার কোনো বাছ-বিচার নেই, আমি একটা লম্পট, কামুক, আজ আমি নীলা ভাবীকে বিছানায় কাত করেছি, সবে শুরু আমার, হয়তো কালই আবার হন্যে হ'য়ে উঠব, আবার কাউকে চিত করব। "[-২৩] আর তার নীলা ভাবী তথা নারীজাতি সম্পর্কে খোকার মন্তব্য, "পৃথিবীর সকল নীলা ভাবীরাই এক একটি

জ্বলন্ত কামকুণ্ড, ফুটন্ত টগবগে আগ্নেয়গিরি, যার নিদারুণ লাভাস্রোতে পীত ধবল কালো বাদামি রাশি রাশি খোকার দগ্ধাবশেষ গড়ান খেয়ে চলে। "-[২৪] এমন একজন খোকা দেশ, দেশের মানুষ, মানুষের সমস্যা যেভাবে দেখতে পারে সেভাবেই ফুটে উঠেছে এ কাহিনীতে। রাজনীতি যার কাছে 'জমকালো ছেনালি,' তার পক্ষে রাজনীতি বা সমাজসচেতন হওয়া আদৌ যে সম্ভব নয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, বরং এ উপন্যাসে রাজনীতি-বিরোধী, প্রগতি বিরোধী বক্তব্য এসেছে বারে বারে। যা এ উপন্যাসকে এন্টি-পলিটিকস্ বা এন্টি-রিয়ালিস্টের পর্যায়ভুক্ত করে সহজেই। লেখক রাজনীতিকে যেভাবে দেখেছেন, তার উল্লেখ যেমন আছে এ কাহিনীতে–সে রাজনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্যেরও অভাব নেই এখানে।

খোকার বোন রঞ্জুর কলেজের মেয়েরা সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে। সে সংবাদ খোকাই দেয় রঞ্জুকে এবং বোনকে প্রশিক্ষণে যেতে উৎসাহিত করে এই বলে: "যা না, ঘুরে আয়, নিদেন পক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোকরা তো দেখা হবে–"-[২৫] বলে। আবার স্বাধীনতা সম্পর্কে খোকার মন্তব্য : "স্রেফ চায়ের কাপে চুমুক মেরে আর গুলতানি ঝেড়ে স্বাধীনতা নিয়ে আসব এবার, দেখে নিস। এবারে শালার স্বাধীনতা রোখে কে?"-[২৬] দেশের দুই নেতাকে মুরাদের সাথে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে বলতে শুনি খোকাকে, "তুই মুরাদ চৌধুরী কিংবা শেখ মুজিবর রহমান, মাওলানা ভাসানী আজকের মানুষ হ'তে পারিস না।"-[২৬] (ক) দেশের শ্রমিক শ্রেণী আর শ্রমিক রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য, "ট্যানারি শ্রমিকরা রাজনীতির বোঝেটা কী, গিনিপিগ এক-একটা। হাতের কবজিতে যারা সর্দি মোছে, এখনো যাদের পা গড়িয়ে পেচ্ছাব পড়ে সেইসব হাফপ্যান্ট পরা ইস্কুলের গলটেপা ছেলেরাও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দীক্ষা দিচ্ছে। "-[২৭] অন্যত্র খোকা মুরাদকে বলছে, "দেশ দেশ ক'রে চাষার মতো অমন চিৎকার জুড়েছিল কেন?"-[২৮] খোকা আবার বলে, "দেশের লোক যে কী চায় তারা নিজেরাই তা জানে না, হাত তুলতে বললেই সবাই হাত তুলে, ঐ পর্যন্তই।"-[২৯] বাংলাদেশের জনসাধারণকে চিত্রিত করা হয়েছে এমন চেতনাহীন হুজুগে হিসাবে "আপনি হুজুগেপনাকে ঐক্য ব'লে মনে করছেন। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবার সময়ও ঐ হুজুগেপনা ছিল, আয়ুব খান যেদিন প্রথম আসে স্টেডিয়ামের ভিড়ের কথা মনে আছে আপনার? এরা তো তারাই, সেই মানুষজনই।"-[৩০] পড়লে মনে হয় এদেশের মানুষ চেতনাহীন স্থবির এবং হুজুগ প্রিয়। অথচ এ বইয়ের যখন দেখি "এখন এমন একজনও মানুষ পাবি না সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক শ্রমিক হোক, যা-ই হোক না কেন, যে সজাগ নয় সতর্ক নয়। তুই-ই বল না, এদেশের মানুষের এত তাড়াতাড়ি আর এমন সর্বগ্রাসীভাবে আত্মোপলব্ধি ঘটবে তুই নিজেও কি কখনো ভাবতে পেরেছিলি? "-[৩১] এ ধরনের স্ববিরোধিতার অভাব নেই এ উপন্যাসে। এ স্ববিরোধিতার আলোকে বিচার করলে লেখককে অন্য কিছু ভাবতে হয়। ভাবতে হয় জেনেশুনেই কোনো উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী – এ লেখক। উপন্যাসে সরাসরি অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলে আবার বলতে শুনি, "অর্থনৈতিক মুক্তিটুক্তি ওসব হাফসোল দেওয়া কথা, বার্নিশ

করা কথা, যে যার স্বার্থের কথা ভেবে পাগল হ'য়ে উঠছে, সবাই ভাবছে যার যার নিজের হাতে চাঁদ পাবে।"[–৩২] একাত্তরের ৭ মার্চ শেখ মুজিবের রেসকোর্স মাঠে বক্তৃতায় দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাকই ছিল অন্যতম। যে ঘোষণায় সারা পূর্ববাংলা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে খোকার বক্তব্য, "কাজ কোরো না, অপিসে যেও না, মাস কাবার হ'লেই যে যার মাইনে তুলে নাও, চেহারাটা ভালোই আন্দোলনের, এর নাম চূড়ান্ত পাগলামি–"[–৩৩]

ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের শহীদ আসাদ এসেছে এ উপন্যাসে "ঝকঝকে সোনার তলোয়ারের একটা প্রতীক হিসাবে। সে আসাদেরই দুই বন্ধু খোকা আর মুরাদ। বন্ধু হারানোর শোকে বন্ধুর অনুভূতি "ওটা একটা শোকই। শোক হলেও ... কিংবা চোখ ওঠার চেয়ে, কিংবা টনসিলের ব্যামোর চেয়ে তেমন কোনো মারাত্মক কিছু নয়। "[–৩৪] দেশের প্রগতিশীল বামপন্থীদের সম্পর্কে খোকার মন্তব্য আরও প্রণিধানযোগ্য, "প্রগতিশীল অথবা বামপন্থী গণ্যমান্যদের অনেকেই এখন ইন্টারকনের লোলুপ নিভৃতে বসে কাটিশার্ক-প্যালেস্টাইনের মাহাত্ম্যের প্রসংগে দূর থেকে নমস্কার করে স্কটল্যাণ্ডকে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজি, মুনাফা, শ্রেণী সংগ্রাম, রিয়েলিটি, গণতন্ত্রের গ্যাঁড়াকল এসব-ও যথারীতি স্থান পায়, এবং পিয়াজের খোসা ছড়ানোর মতো অতি সহজে সিল্‌ক খুলে ফেলে মেয়েদের – রাত যখন গভীর হয় কিংবা দিন যখন রাত্রিকালের গভীরতম প্রদেশ ব'লে ভ্রম হয়, অর্থাৎ বামপন্থী হওয়াই সব কথার শেষ কথা।"[–৩৫]

মাহমুদুল হক তার উপন্যাসে রাজনীতি সমাজনীতি, রাজনীতিক বিশেষ করে বামপন্থী রাজনীতিকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন –দেশ, দেশের মানুষ আর মাটির বাস্তবতা থেকে অনেক অনেক দূরে। যা লেখককে এন্টি-রিয়ালিস্ট থেকে এন্টি ক্লাইম্যাক্সের পর্যায়ে ভুক্ত করে সহজেই। যারা সচেতন ভাবে এন্টি-রিয়ালিস্ট তাদের পক্ষেই সম্ভব এমন জমকালো আকর্ষণীয় বর্ণনা দেয়া। যে বর্ণনার আকর্ষণে পাঠক সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে অন্য কিছুর প্রতি। আর লেখকও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে এর মাধ্যমে। লেখক এ কাহিনী বর্ণনায় যে সব অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে মাত্র:

(ক) "কেমন গরুচোর চেহারা হয়েছে কুটুকুমারের।
দেদার মাগী চট্‌কে বেড়াচ্ছে ফ্রি স্টাইলে,"[–৩৬]

(খ) আবে শালা, মাগী না মাগী না। চিরকালই তো
ফকিরনি হাঁটকে-চটকে বেড়ালি, "[–৩৭]

(গ) "লুলু চৌধুরীর পাছাটা ঠিক যেন একটা আধমুনে ধামা,
একটা চোস্ত খাজুরাহো, লুলু চৌধুরীর নদগদে
পাছা দুলিয়ে হাঁটা, ঢুলঢুলে চাহনি আর
ফিক ক'রে হাসা দিয়ে গোটা আদমজী জুট

মিলটাই কেনা যায়, সেদিন স্বপ্ন দেখলাম
ন্যাংটা হ'য়ে ঘোড়ায় চেপে সারা ঢাকা
শহর টহল দিচ্ছে লুলু চৌধুরী, সাক্ষাৎ
লেডিগোদিভা, লুলু চৌধুরীর শাড়ি পরার স্টাইলটা
মারাত্মক, মনে হয় আর দেড় সেকেন্ডের ভিতর
গা থেকে সব আবরণ ঝর ঝর ক'রে খুলে
পড়ে যাবে।"[৩৮]

(ঘ) "একে যোনী, দুয়ে স্তন, তিনে দংশন, চারে বন্ধন।"[৩৯]

(ঙ) আজ আমি নীলা ভাবীকে বিছানায় কাত করেছি, সবে শুরু আমার হাতে। কালই আবার হন্যে হয়ে উঠব আবার কাউকে কাত করব।"[৪০]

মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন'-এ ভাষা ব্যবহারের অন্যদিক সার্থক কাব্যময় ভাষা নির্মাণ। এমন ভাষা বাংলা উপন্যাসে বিরল – বাংলাদেশের তো বটেই। এ যেন বাংলাভাষায় শক্তি সন্ধানে এক নতুন পথের সৃষ্টি। আধুনিক কথাসাহিত্যে অলংকার ব্যবহারের সীমান্তকে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সাথে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছেন উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে।

মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুত বাংলাদেশের বর্ণনা দেন লেখক, "বাংলাদেশ, তুমি শুয়ে আছো অর্ধেন্দু দস্তিদার হয়ে, থেকে থেকে কাতরাচ্ছো, বোমা বিস্ফোরণে নিদারুণ ক্ষত-বিক্ষত তোমার মুখ; তোমার মুখ পুড়ে গেছে। বাংলাদেশ, তুমি মরে গেছ প্রীতিলতার মতো বিষপান করে। বাংলাদেশ, তুমি বুলেটগাঁথা আনোয়ারা, কোলের শিশুকে স্তন দিতে চাও? বাংলাদেশ, তুমি রাক্ষসী, একটা শালিকের মতো শিকার করেছ মতিয়রকে, বাংলাদেশ তুমি কারফিউ গভীর রাতে যার বস্ত্রহরণ করতে গিয়ে মারা পড়েছি আমরা। তুমি টর্নেডো, বাংলাদেশ তুমি সাইক্লোন, বারবার সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তুমি আমাদের, হাঙরের পাকস্থলীতে ব'সে সুর ক'রে তেলওয়াত করি আমরা।"[৪১] আবার লেখকের অনুভূতিতে জীবন যেন স্বপ্নময়। তার ভাষায়, "সবকিছুরই একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের ভিতরে আমরা জন্মাই, স্বপ্নের ভিতরে আমরা বিস্কোর ক'রে উঠি, ঝনঝন ভেঙে যায় সব কাঁচ, তির তির করে কেঁপে ওঠে দুধের সর, কৌমার্যের পাতলা পর্দা। স্বপ্নের ভিতরে আমরা স্তন্যপান করি, স্বপ্নের ভিতরে আমরা শিল কুড়াই, স্বপ্নের ভিতরে আমরা বকুল ফুলের মালা গাঁথি, স্বপ্নের ভিতরে অঞ্জু পুকুরে পড়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে মঞ্জু তাকে ধরতে যায়, স্বপ্নের ভিতরে নীলাভাবী কাঁচের চুড়ির শোকেস হ'য়ে যায়– স্বপ্নের ভিতরে দেখতে দেখতে আমরা আরেক স্বপ্ন হ'য়ে যাই।"[৪২] খোকার আর এক অনুভূতির কাব্যময় প্রকাশ, "ঔদাসীন্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে একটি প্রবল দুপুর; এই দুপুরে তারা ছিটকিনি তুলে দিয়েছে দরোজার, ছিটকিনি খুলে দিয়েছে সংযমের; সংযম ডেকে এনেছে পৈশাচিকতাকে, পৈশাচিকতা কেশর ফুলিয়ে দুঃখকে, দুঃখ ক্যাকটাসের গায়ে গর্ভপাতের নারকী পুষ্পকে, দংশনের ঘর্ষণে পেষণে লেহনে কামদগ্ধ নিঃশ্বাসে ও চুম্বনে একটি একটি ক'রে পাপড়ি ঝ'রে পড়েছে পুষ্পের, পাপড়ি খ'সে পড়েছে গায়ের

পাতায়, গালে গলায় কটিতলে, কাঁধে বাহুমূলে, নাভীমূলে, আঁখিপল্লবে, অশ্রুর মুক্তাফলে, বদ্ধমুষ্টির শংখে, এবং শংখ বের করেছে তার জিহ্বাকে, জিহ্বা সর্পকে, শ্বেতচন্দন কমকুম আর কাচপোকার টিপে নিজেকে সাজিয়েছে সর্প, কুমকুম চন্দনকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে তার গায়ে এসে বসেছে দিব্য প্রজাপতি, শত সহস্র ফুলের নির্দোষ নিমেষ অবিচল বিস্মৃতি তার পাখায়– ।"[৪৩]

লেখকের এ ভাষা নির্মাণ সহজেই সকলের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম। লেখক মাহমুদুল হক উত্তাল সত্তর দশকে রচনা করেছেন এ উপন্যাস, উপন্যাসের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ যেমন এসেছে বর্ণনায় – এসেছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ আবার রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজবিরোধী বক্তব্যেও ঠাসা এ উপন্যাস। শালীন কাব্যময় ভাষাও যেমন ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো আবার অশালীন ভাষা প্রয়োগেও কার্পণ্য করেননি লেখক। এককথায় কী বিষয়বর্ণনা কী ভাষাপ্রয়োগ সর্বত্রই স্ববিরোধিতায় ভরপুর এ কাহিনী। এবং মাহমুদুল হক এ স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন স্ব-ইচ্ছায়। তার মূল উদ্দেশ্যই বইয়ের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করা। সেখানে এন্টি-নভেল, এন্টি-ক্লাইম্যাক্স কিংবা এন্টি-রিয়ালিস্ট-এর কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতে রাজি নন লেখক। লেখক যা কিছু করেছেন সচেতনভাবেই করেছেন–উপন্যাসের জনপ্রিয়তার স্বার্থে। বরং সাহিত্যবিচারে মাহমুদুল হকেরই ভাষায় একে বলা যায় একটা 'জমকালো ছেনালি।' সাহিত্যে এসব ছেনালিপনাদের স্থান নিঃসন্দেহের বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের সারিতে নয় বরং কলাকৈবল্যবাদীদের দলেরই এরা।

তথ্যসূত্র

১. বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ: শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু : পৃ. ১৬৯।
২. মাহমুদুল হক : জীবন আমার বোন : পৃ. ১৫
৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৯
৪. প্রাগুক্ত : ১৭২
৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭৭।
৬। প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮০
৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮০
৮. প্রাগুক্ত পৃ. ১৮১
৯. প্রাগুক্ত: পৃ. ১০৬
১০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪৪
১২. প্রাগুক্ত: পৃ. ৬০
১৩. প্রাগুক্ত: পৃ. ৬১
১৪. শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (আসাদের শার্ট) পৃ. ৬৩।
১৫. জীবন আমার বোন: মাহমুদুল হক পৃ. ৫১

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩৮
১৭. প্রাগুক্ত পৃ. ৫২
১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৭
১৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৮৫
২০. আবদুল হাফিজ : উপন্যাসের আর এক কাহিনী। এন্টি ক্লাইম্যাক্স (প্রবন্ধ) গণসাহিত্য : ৫ম বর্ষ – ৫ম
সংখ্যা পৃ. ৪৮।
২১. মাহমুদুল হক : জীবন আমার বোন : পৃ. ১৫
২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৭-৭৮
২৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৫
২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩-২৪
২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৪
২৬. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৬ ২৬ (ক) প্রাগুক্ত : ১১৬
২৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯
২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬২
২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৮
৩০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪৮
৩১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৭
৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৪
৩৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫১
৩৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬১
৩৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯
৩৬. ৩৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০
৩৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৬
৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৪
৪০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৫
৪১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৯
৪২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১০
৪৩. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫২

রশীদ করীম: উপন্যাস সাহিত্যের 'উত্তম পুরুষ'

দী পং ক র গৌ ত ম

রশীদ করীম। ১২ খানা উপন্যাস লিখে যিনি কথাসাহিত্যের এমন একটি জায়গায় স্থান করে নিয়েছেন যেখানে অবস্থান করছেন হাতে গোনা কয়েকজন গদ্যকার। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় দেশের হাতে গোনা কয়েকজন ক্লাসিক সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সম্মুখ সারির। 'প্রথম প্রেম' নামে একখানি গল্পগ্রন্থ, তিন খানা প্রবন্ধের বই– আর এক দৃষ্টিকোণ, অতীত হয় নূতন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি। এ ছাড়াও রয়েছে একখানা স্মৃতিকথা– 'জীবন-মরণ'।

অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে তিন ১৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই ১৬ খানা গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁকে। তাঁর শৈলী অন্য দশজন লেখকের চেয়ে একদম ভিন্ন। এ কারণে অজস্র লেখার ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করা যায় একজন রশীদ করীমকে– বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রাতিস্বিক ধারার নির্মাণ শ্রমিককে। তার উপন্যাস লেখার ঢং দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে এই সেই লেখক যিনি 'উত্তমপুরুষ'-এর মতো একখানি কালজয়ী উপন্যাস লিখেছেন। বিশেষত বলা যায় তার লেখনশৈলীটার ধরন বর্ণনাত্মক। কথক রীতিতে তিনি গল্প বলেন। উপন্যাসের বর্ণনা করেন তিনি এমনভাবে যাতে সহজেই মনে হয় কাহিনীর ভেতরে থেকেই একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি বর্ণনা করছেন বিষয়বস্তুকে।
অর্থাৎ তিনিই যেন তার গল্পের নায়ক।

যদিও গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক শিল্পরীতির প্রশ্নে কেউ কেউ 'আমিত্ব'কে একদম পছন্দ করে না রশীদ করীমের উপন্যাসে এটাও একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে লিখিত রূপের কাঠামোটা দেখলে মনে হবে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ আমিত্ব দিয়ে ভরা। কিন্তু পাঠ শেষে মনে হবে এখানে রশীদ করীম খুব সতর্কভাবে নিজেকে নৈব্যক্তিক ফর্মে তুলে নিয়েছেন।

তার গদ্যশৈলীর এই মুন্সিয়ানা খুবই উল্লেখযোগ্য। সবচে, বড় কথা হল রশীদ করীমের লেখা একদম বাহুল্যতা বিবর্জিত ও মেদশূন্য। সুক্ষ্ম চিন্তাশৈলী প্রকাশে তার প্রায়োগিক চিন্তা খুবই গুরুত্ববহ। রশীদ করীম তাঁর উপন্যাসকে দিতে চেয়েছিলেন এমন এক শিল্পিত রূপ যেখানে তার শিল্পরীতিও থাকবে তাঁর নিজের মতো করে। এ জন্য লেখার ব্যাপারে তিনি থেকেছেন আপোষহীন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি মোহাম্মদ, পূর্বাশা, নবযুগ, মিল্লাত-এ লিখে সাহিত্যামোদীদের তাক লাগিয়ে

দিয়েছিলেন। তিনি অনেক উপন্যাস লিখতে পারতেন। কিন্তু তাঁর লেখা পাঠ করে এমনও একজন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি সাহিত্যচিন্তার ভাবরসে আপ্লুত থেকে খুব যত্ন করে, জীবন ঘষে ঘষে এক একটি লেখাকে বের করেছেন। তিনি কীভাবে মানুষের অনুরোধের ঢেঁকি গিলে যাচ্ছেতাই একখানা উপন্যাস লিখে দেবেন?

তাতে কি তাঁর উপন্যাস নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে হেরে গেছে? কিংবা বলা যায় তার উপন্যাস কি শিল্পচ্যুত হয়েছে? শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের প্রশ্নে আমরা প্রথমেই ভাবতে পারি শিল্প আসলে কী? আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নটি কারো কাছে বেমানান মনে হলেও শিল্পহীন কোনো বস্তু যে অসার একথা ভেবেই উপন্যাসের বিচার করতে হবে। কারণ শিল্পের জন্য যা-কিছু উৎসর্গিত হয় শিল্পের তদনুরূপ কোনো মূল্য আছে কিনা, তা পরীক্ষা করেও দেখা দরকার।

তাছাড়া সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি যেখানে শিল্পের মূল শর্ত– সেখানে আগে দেখতে হবে উপন্যাসে গণমানুষের সম্পৃক্তি এবং তার অভিব্যক্তি।

'কলকাতার রাস্তা। ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে যায়, কন্ডাক্টর ঘণ্টা দিতে থাকে। দু'-একটা ভিস্তিও চোখে পড়ে– চামড়ার ব্যাগ পিঠে ফেলে অনেকটা যেন ব্যাঙের মতোই লাফাতে লাফাতে নিজমনে চলেছে, রিকশা এগোয় ঠুনঠুন করে। পিচের রাস্তা গরমে গলতে থাকে।

ফুটপাতের দু'ধারে কাটা শশা, তরমুজ আর রঙ বেরঙের শরবত বিক্রি হয়, টেলিগ্রাফের তারে বসে কাক ঝুলতে থাকে। রাস্তার দু'পাশে দেয়ালের গায়ে অসংখ্য সিনেমার বিজ্ঞাপন।'

(উত্তম পুরুষ/পৃষ্ঠা-২২)

একটি গদ্যের মধ্যে কতটা কাব্যময়তা, কত সূক্ষ্ম চিত্রকল্প নির্মাণ এবং একটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে একটি অঞ্চলের দৃশ্যকল্প কতটা জীবন্ত হতে পারে সেটা এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই অনুমান করা সম্ভব। একটা উপন্যাসের ভেতরের এতটুকু বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় একজন লেখকের দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম কত বর্ণনাত্মক। বর্ণনার ওই স্থানকে যারা স্বচক্ষে দেখেছেন তার নিশ্চয়ই এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে ধরতে পারবেন কিনি কোন কোন দৃশ্যকে মিস করেছেন আর যে পাঠক ওখানে যায়নি তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে এই চিত্র।

অর্থাৎ একটি উপন্যাসের দৃশ্যকল্পের বর্ণনা কত শক্তিশালী হতে পারে সেটা 'উত্তমপুরুষ' উপন্যাসের একটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসেরই আরেকটি জায়গায় লেখক লিখেছেন–

'তারপর একজন দশজনকে দেখিয়ে দেয়, ঐ যে দুটো তালগাছ দেখা যাচ্ছে না, তার ফাঁক দিয়ে, ঐ যে মেঘ দেখা যাচ্ছে, তারই নিচে।

সুতার মতো এক ফালি চাঁদ।

ছেলেরা লাফ দিয়ে নিচে নেমে আসে, যে যার বাড়ির দিকে ছুটে। আকাশটা একটু আগেই তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দেখেছে; আকাশের

বুকে কোথায় ক'খণ্ড মেঘ জমেছে, আকাশের গায়ে কোথায় কটা বাড়ি হেলান দিয়েছে, তা-ও তারা একটু আগেই সমস্বরে বলতে পারত। কিন্তু এখন? আকাশের মানচিত্রে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বুকের মধ্যে শীর্ণ অপূর্ণ চাঁদের টুকরোটিকে পুরে নিয়ে সবাই ছুটতে ছুটতে চললাম, যে যার বাড়ি। কে কত আগে আনন্দের বার্তা পৌঁছে দিতে পারে তারই পাল্লা। (উত্তম পুরুষ/পৃষ্ঠা-১৯)

এই বর্ণনারীতির সূক্ষ্মশৈলীর মধ্যে একটা কাব্যময়তা যেন ভর করে আছে। আলাদা কাগজে এই লাইনগুলো দেখলে কার না মনে হবে এটা একটা কবিতা। গদ্যরীতির এই কাব্যময়তা-বোধ রশীদ করীমের প্রত্যেকটি উপন্যাসের উপজীব্য, যে কারণে ভালো লাগা-ভালোবাসার এ চিত্রাবলী তার উপন্যাসের শিল্পমাত্রাকে উত্তীর্ণ করেছে। এবং উপন্যাসের টেকচার নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

ফলে রশীদ করীমের উপন্যাস সহজেই হয়ে উঠেছে ক্ল্যাসিক উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

শুধু 'উত্তম পুরুষ' নয় তার উপন্যাস 'সাধারণ লোকের কাহিনী'তেও আমরা দেখি এখানেও রশীদ করীম একজন কথকের ভূমিকায়। গল্প বলার মতো করে তিনি সিরিয়াস একটি ঘটনার মধ্যে পাঠককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেন একটা জার্নি করাচ্ছেন। কিন্তু সব শেষে জাদুকরের মতো তিনি উধাও হয়ে যাচ্ছেন সবার অজান্তেই। এখানে তার একটা বর্ণনা তুলে ধরলে তার উপন্যাসের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্যবোধের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

'বছর বিশ আগেও এই অঞ্চলটা এক অনুন্নত ফাঁকা জায়গা ছিল। বড়-বড় গাছ এবং হাজার রকমের বুনো পত্রপল্লবে আবৃত এই বিশাল অঞ্চলে শিয়ালের ডাক শোনা যেত। লোকে বলে বাঘও নাকি আসত। বাঘের কথাটা অতিশয়োক্তি হতেও পারে। ঘন অরণ্যেও বাঘ বিরল হয়ে গেছে, এমনকি সুন্দরবনেও নাকি সহজে চোখে পড়ে না। আসলে জায়গাটা কী পরিমাণ অনুন্নত ছিল, সেটা বোঝানোর জন্যই জনশ্রুতি এই মানচিত্রে বাঘও আমদানি করেছে। অনুন্নত অবশ্য ছিল খুবই। জায়গাটার উন্নয়নের জন্য একটা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। চেয়ারম্যান আমাকে চিনতেন। তিনি নিজেই পরামর্শ দিলেন, হাজার টাকা দিয়ে এক বিঘা জমি কিনে নিন। ঠকবেন না। আজকাল হাজার টাকা যত সহজ শোনায়, বিশ বছর আগে তা ছিল না, হাজার টাকা পাব কোথায়? অন্তত আমার কাছে ছিল না। তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে জমি নিয়ে আমি করবটা কী?

(সাধারণ লোকের কাহিনী/পৃষ্ঠা-৬০১)

এই বর্ণনার মধ্যে যে চিত্রকল্প পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় এর প্রত্যেকটি লাইন দিয়ে এক-একটি ছবি আঁকা সম্ভব। কী সহজভাবে পরিপাটির সাথে ও জীবনবাস্তবতার নিরিখ থেকে লেখক বর্ণনা করেছেন একটি ঘটনা। ঘটনার ঘনঘটায় কোনো কাঠিন্য নেই, কোনো তত্ত্ব, কোনো অপ্রয়োজনীয় কথাও নেই। এবং ঘটনার বর্ণনার সহজেই মনে হয় এ ঘটনা বা ঘটনার কথাগুলো লেখকের একদম নিজস্ব কথা।

তা বললে যে এমন কোনো ক্ষতি আছে তা-ও নয়। কিন্তু সে বলার মধ্যে উপন্যাস যদি না থাকে তাহলে বলে কী লাভ।

এখানেই রশীদ করীমের মুন্সিয়ানা।

তিনি উপন্যাসের কথক মনে হলেও কোনো কথাই এমনভাবে তিনি বলেননি যাতে মনে হবে যে লেখক তার জীবনী শোনাচ্ছেন।

তাছাড়া তার লেখায় যে গতিশীলতা এবং কোমলতা, তাতে করে তাঁর একটি উপন্যাস পড়তে শুরু করলে তা শেষ করার জন্য পাঠকের মনের মধ্যে যে তাগিদ সৃষ্টির প্রয়োজন, সেই শক্তি ও প্রবণতা তাঁর উপন্যাসে রয়েছে।

একই কথা আমরা বলতে পারি তার উপন্যাস 'লাঞ্চবক্স' প্রসঙ্গে।

'আমি যে গল্পটি বলতে বসেছি সেটি শুনতে ইচ্ছুক হবেন ক'জনা বলতে পারব না। কারণ গল্পটিতে রোমান্সের যে অংশটুকু আছে, তা খুবই বাসি আর যতটুকু এডভেঞ্চার আছে, খবরের কাগজগুলো তার ঢের বেশি পরিবেশন করছে। এই কাহিনীর মধ্যে খানিকটা গোয়েন্দাকাহিনীর রহস্য আছে। এবং লেখাটিতে যে কমেডিটুকু আছে তা পাঠ করে আপনাদের হাসির বদলে কান্নাও পেতে পারে।'

(লাঞ্চবক্স/১৯৯৫)

পাঠক 'লাঞ্চবক্স' উপন্যাসের শুরুটা দেখে কার-না মনে হবে যে –এটি ভারিক্কি বা ক্ল্যাসিক কোনো উপন্যাস নয়। সাধারণ একটি উপন্যাস– যা একজন কথক বর্ণনাত্মক রীতিতে বলে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী রশীদ করীমের উপন্যাসে কোনো হেয়ালিপনা, কোনো অতিকথন নেই, বরং উপন্যাসের সৌন্দর্যবোধ প্রকট আকারে রয়েছে তার উপন্যাসে। এবং সবচে মজার বিষয় হল প্রাথমিকভাবে দেখলে মনে হবে তার উপন্যাসে কোনো রাজনীতি নেই। পক্ষান্তরে তার উপন্যাসের রাজনীতি এবং উপন্যাসের মানুষেরা আরোপিত কোনো চরিত্র নয়। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই জীবনঘনিষ্ঠ ঘটনাই উপন্যাস আর ঐ পাত্র-পাত্রী যারা তারা কথকের গল্প বলার মধ্য দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তার গল্পের রাজনীতি হচ্ছে একটি ঘটনার ভেতরে যেটা তার উপন্যাসের কাহিনী।

'অফিসে বসে কাজ করছি। সুইং ডোরের দরজাটা নড়ে উঠলেই, বুকটা কেঁপে উঠছে। ঐ বুঝি এল। অফিস তো, কতো লোক যায় আসে, পায়ের আওয়াজ শুনি, অমনি মনে হয়, ইউনিফর্ম পরা লোকগুলোকে এবার দেখতে পাব, কাচের দরজার কাছে। এমন হয়ে গেল, আমি যেন সেই পদধ্বনির জন্য কান পেতেই আছি। টেলিফোন বেজে ওঠে, বিকট শব্দ করে– অন্তত আজ শব্দটা বিকটই মনে হচ্ছে, আর অমনি মনে হয়, আমার বুকের সব কটি শিরা ধরে, কেউ নির্দয় হাতে টান দিল। মনে হয়, নিশ্চয় মার্শাল ল' হেড-কোয়ার্টারের ফোন।'

(আমার যত গ্লানি/পৃষ্ঠা-৪১৩)

রশীদ করীমের উপন্যাসের রাজনীতিকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে উপরোক্ত কথাগুলোই কি যথেষ্ট নয়। মার্শাল ল' তার উপন্যাসে এসেছে। মার্শাল ল' বিষয়টা

কতটা গণবিরোধী ও ভীতিকর সেটা এ উপন্যাসে চমৎকার করে বিধৃত হয়েছে। রশীদ করীম মার্শাল ল'-কে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে কোনো তীব্রতা নেই। কিন্তু ঘৃণা আছে, যেটা একজন অফিস কর্মচারীর ভীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

তার লেখা তার মতো স্বচ্ছ, সাবলীল গতিশীল ও কাব্যময়তা সম্পূর্ণ। ভাষার সাবলীলতা তার লেখাকে অনেক বেশি শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছে। ফলে প্রচারবিমুখ, প্রতিভাবান এই গদ্যশিল্পী নিজেকে শিল্পের অন্তরালে রেখে তার শিল্পিত ভাণ্ডারকে ক্রমশ ঐশ্বর্য মণ্ডিত করেছেন। রশীদ করীমের উপন্যাস আমাদের প্রচলিত উপন্যাসের ধারা থেকে একদম ভিন্ন। কেন ভিন্ন হল? সেটা নিশ্চয়ই আলোচনার বিষয়।

কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় প্রয়াত মনীষী শম্ভু মিত্রের একটি কথা। তিনি লিখেছেন, 'কেঁচোর মায়ের পুত্রশোক এক দিনের, গরুর আরেকটু বেশি। এই কম-বেশি হয় ঘিলুর তারতম্যের কারণে।' রশীদ করীম আমাদের সমাজের একজন বিরলপ্রজ কথাশিল্পী এটা অত্যুক্তি নয়। বিশেষত রশীদ করীমের জন্য মোটেই নয়। তার গদ্যরীতি তার একান্ত নিজস্ব যা আর দশজন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখন সারাদিন তিনি বাসায় বসে থাকেন। লেখেন না। বলেন লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। একথা বলতেও তার কষ্ট হয়। তবুও তার অসুস্থ অবস্থায় গেলে ভীষণ খুশি হন। উঠে দাঁড়াতে চান, আরো উপন্যাসের কথা বলতে চান, কথা বিগড়ে যায় তবুও বলতে চান। তাঁর মুখোমুখি বসে তাঁর না-বলতে পারা কথাগুলোর অনুবাদ নিজের মধ্যে করতে করতে যে কারো মনে হবে– এই ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্যের 'উত্তম পুরুষ'।

জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণা: নারীবাদ ও সমাজ-বাস্তবতা

আহমাদ মাযহার

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে প্রযুক্তি মানুষের করায়ত্ত হলে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে শিল্প-কারখানা, কৃষিভিত্তিক কাজের থেকে বিযুক্ত হতে শুরু করে মানুষ। শিল্প-কারখানায় মানুষের ও যন্ত্রের যোগে উৎপাদনের পরিমাণ যায় বেড়ে। জীবিকার জন্য

মানুষ বের হয়ে আসে কৃষি নির্ভরতার আপন বৃত্ত থেকে। ব্যক্তির এতকালের অবস্থান যায় পাল্টে। ব্যক্তির অবস্থান সমাজে ক্রমশ বড় জটিল হয়ে ওঠে। কৃষিভিত্তিক জীবন-প্রবাহে ব্যক্তি খুব প্রবল ছিল না। শিল্প-কারখানার বিকাশের প্রতিক্রিয়াতে মানুষের মধ্যে জেগে উঠতে শুরু করে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বোধ। এর ফলে ব্যক্তির নিজের মধ্যেকার অতীত সত্তার সঙ্গে নতুন সত্তার শুরু হয় দ্বন্দ্ব। এর মধ্য দিয়ে বহমান সমাজ-সত্তায় সৃষ্টি হয় সংকটের। শিল্পের দ্রুত ক্রমবিকাশ এই সংকটকে ক্রমশ আরও ঘনীভূত করে তোলে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মন স্পর্শকাতর বলে তাঁরাই প্রথমে এই সংকটের অনুভব করেন। এই অনুভবগুলোকেই তাঁরা প্রকাশ করতে গিয়ে সন্ধান করেন নতুন নতুন শিল্পরূপের। এ-রকম অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতাতেই শিল্পমাধ্যম হিসেবে উপন্যাস-এর উদ্ভব। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিভিন্ন সময় সমাজে যে টানাপড়েন সৃষ্টি করে একজন সফল ঔপন্যাসিক পারেন তার গতিপ্রকৃতির সূক্ষ্ম ইতিহাসকে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরতে। উপন্যাস লিখবার সময় লেখকের সেজন্য সমাজে ব্যক্তির অবস্থানের জটিলতা নিয়ে ভাবতে হয়।

দ্রুত শিল্প বিস্তারের ফলে সমাজে বুর্জোয়া বিকাশের শুরু। এর ফলে ব্যক্তিসত্তার অনুভবেও আসে বৈচিত্র্য। সমাজে উদ্ভূত হতে শুরু করে নতুন এবং বিচিত্র মানবিক সংকট। এইসব সংকটকে প্রকাশের জন্য উপন্যাস আঙ্গিকের মধ্যেও সন্ধান করতে হয় নানা বৈচিত্র্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বুর্জোয়া সমাজের আদল খুঁজতে গিয়ে শিল্পমাধ্যম হিসাবে উপন্যাসের সূচনা বলে এখানে যে ব্যক্তিজীবনেকে পাওয়া যায় তা একান্তভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক ব্যক্তিজীবন। বড়জোর বলা যায় পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা নারী-পুরুষের জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাসে। ফলে এতে জীবন সম্পর্কে যে মূল্যবোধের আবর্তন ঘটতে দেখা যায় তা একান্তভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক; নারীর জীবন অনাহূত না হলেও পুরুষই শ্রেয়োতর এই মূল্যবোধই এতে স্পষ্ট। এমনকি নারী লেখকদের লেখায় প্রতিফলিত নারী সম্পর্কিত জীবনদৃষ্টিতেও পুরুষের বিবেচনাগত অবস্থানই প্রাধান্য লাভ করে। সচরাচর উপন্যাসে অঙ্কিত নারী চরিত্রের কাছে তাই পুরুষ নির্দেশিত আদর্শই প্রত্যাশিত বলে মনে হয়। বাংলা ভাষায় উপন্যাস চর্চার শুরু উনিশ শতকে হলেও বিশ শতকেই ঘটেছে এর যথার্থ পরিপুষ্টি। বেশ কিছু মহৎ উপন্যাস রচিত হয়েছে এই সময়ে। উপন্যাসের উপজীব্য যেহেতু ব্যক্তি সুতরাং এই সময়ের উপন্যাসে চরিত্র হয়ে যে ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটেছে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছু নারীও ছিল। বলাবাহুল্য এরা অধিকাংশই পুরুষতন্ত্রের চোখ দিয়ে দেখা নারী। অবশ্য কয়েকজন নারী লেখকের কথা বলা যায় যারা নারীর চোখ দিয়েই নারীকে দেখতে শিখেছিলেন। তাঁদের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলোর কোনো কোনোটি ব্যক্তি হিসাবে বিকশিত হওয়ার চিহ্নবাহী। নারীচরিত্রগুলোর ব্যক্তি হিসাবে বিকাশমানতা সমাজে যে সংকটের সৃষ্টি করে তার ছবি উঠে এসেছে ঐ ধারার নারী ঔপন্যাসিকদের লেখায়। এইসব উপন্যাসের কোনো কোনো নারী চরিত্রকে দেখা গেছে প্রতিবাদী নারী হিসাবে। প্রসঙ্গত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের *পদ্মরাগ* এবং আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি

প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথার কথা বলা যায়। এ-রকম হয়তো আরও দু-একটি উপন্যাসের নাম করা যাবে। তবে সংখ্যায় তা খুব বেশি হবে না।

বিশ শতকে বিশ্বব্যাপী নারীবাদের যে ব্যাপক জাগরণ শুরু হয়েছিল তার ঢেউ বাংলাদেশে এসে লাগলেও তা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করেনি। সমাজে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হলেও নারীকে পুরুষের সহযোগী হিসাবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে তা ছিল সীমাবদ্ধ। বিশ শতকের আশির দশকে এসে নারীবাদী চেতনা আমাদের সমাজে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। নারীবাদী চেতনা যেমন মননশীল রচনায় তেমনি সৃষ্টিশীল রচনাতেও ধীরে ধীরে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীবাদী লেখকের উত্থান ঘটে এইসময়ে। আকিমুন রহমানের *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণা* এরই ধারাবাহিকতায় রচিত একটি উপন্যাস। আকিমুন রহমান তাঁর ইতোপূর্বের সৃষ্টিকর্মেও নারীর জীবনসংকটের স্বরূপকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। মননশীল রচনায় নারী সম্পর্কে রেখেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর। এই উপন্যাসের আলোচনার আগে তাই উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে রাখা জরুরি। শারীরিক সামর্থ্যের দিক থেকে নারী দুর্বলতর। যেমন নারীর পেশীশক্তি কম, লোহিতকণিকা কম তাদের রক্তে, কম তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা, দৌড়ে তাদের গতি ধীরতর, ভার বহনের ক্ষমতায়ও তারা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। শারীরিক সামর্থ্যের এইসব সীমাবদ্ধতার কারণে যুদ্ধ-সংগ্রামে নারীরা প্রায় কখনোই পুরুষের সঙ্গে পেরে উঠেনি। ফলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীর আত্মবিশ্বাসও কম হতে দেখা গেছে। নারী সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই ধারণাই সর্বত্র প্রচলিত। অথচ মস্তিষ্কের ক্ষমতায় নারীর অবস্থানের কোনো তারতম্য আছে এমন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে বিশ শতকের আগ পর্যন্ত কেবল শিক্ষাবঞ্চিত ছিল বলে নারীরা তাদের নিজেদের ভাবনা নিজেরা প্রকাশ করতে পারেনি। বিশ শতকে বুর্জোয়া বিকাশের সূচনা কালে পুরুষেরা অনুভব করল যে নারীদেরও কিছু লেখাপড়া করানো প্রয়োজন। এই সূত্রে নারীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। কিন্তু এই শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে নারী যে মূল্যবোধ অর্জন করে তা হচ্ছে এই যে, নারীর কর্তব্য পুরুষের সহযোগিতা করা। কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কেবল পুরুষের। পুরুষ লেখকদের আঁকা নারীচরিত্রগুলোও সে-কারণেই কমবেশি এই মানসিকতারই প্রতিনিধি। বিশ শতকের যে-সব নারী লেখক নারীর ব্যক্তিরূপকে বা ব্যক্তিরূপের সংকটকে অনুভব করেছেন তাঁদের কেউ কেউ এই বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদেরও সামগ্রিক অর্থে ঠিক নারীবাদী লেখক বলা যাবে না। তাঁরা নারীদের দেখবার চেষ্টা করেছেন সমগ্র সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে। দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরাও কমবেশি পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি। তবে নিশ্চিতভাবে এ কথাও বলা যায় যে, এই লেখকেরাই বাংলাভাষায় নারীবাদী সাহিত্যের

প্রথম পথপ্রদর্শক।

আগেই বলা হয়েছে যে, নারীবাদ আমাদের দেশে সাম্প্রতিক উত্থিত ধারণা। নারীর মানবিক অবস্থানের এই ঊনতার প্রতিকার করতে চান নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখকেরা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই ধারার সাহিত্যকে অনেকটা উচ্চকিত হয়ে পড়তে দেখা যায়। দেখা যায় সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সামগ্রিকতা উপেক্ষিত হয়ে পড়তে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপন্যাসের কাছে কাঙ্ক্ষিত সম্পন্নতা উপন্যাস অভিপ্রায়ী এই ধরনের রচনায় পাওয়া যায় না। *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণায়* অবশ্য নারীবাদী আদর্শ এ-রকম উচ্চকিত হয়ে নেই। তবে এতে নারীর চোখ দিয়ে সমগ্র সমাজ পটভূমিতে রেখেই জীবনকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই দিক থেকে হয়তো এটিকেও সে-কারণে নারীবাদী উপন্যাসই বলা যাবে।

উপন্যাসটি অবর্তিত হয়েছে ইতিহাসে এমএ পাস করা মেধাবী অথচ সরল একটি মেয়ে রুহীর জীবনকে কেন্দ্র করে। মেয়েটি চাকরির সন্ধান করছে কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্ত যে কোনো পরিবারের ঘটনাবলির সঙ্গে এর অনেক ঘটনাই হয়তো মিলে যাবে। রুহীর ফুফাত-চাচাত ভাইয়েরা আর দশটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মানসিকতার পুরুষেরই প্রতিনিধি। রুহীর বাবা, ফুপু, চাচা-এরা আমাদের দেশের খুবই সাধারণ চেনাজানা মানুষ।

ছয় বোনের মধ্যে রুহী সবার চেয়ে বড়। সে লেখাপড়ায় ভালো হলেও আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়ের মতোই আত্মবিশ্বাসহীন নারী। অথচ তার ছোট বোন রুবী বেশ অনেকটা আত্মবিশ্বাসী এবং সাহসী। অন্য চার বোন বেবী, বাবলি, খুকু, ইতি বয়সে বেশ ছোট বলে তারা এখনো ব্যক্তি হয়ে ওঠেনি। ছয় বোনের পরিবারে কোনো ভাই নেই বলে তাদের আব্বা ইঞ্জিনিয়ার ফরিদুল ইসলামের মন দুর্বল। মেয়েদের কীভাবে গড়ে তুলবেন তা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। চাকরির বদলির কারণে তাঁকে আরও বিপাকে পড়তে হয়। পাঁচ মেয়ে ও স্ত্রীর দেখাশোনার জন্য নির্ভর করতে হয় ভাইপোদের ওপর। অথচ দেখা যায় শেষ রক্ষা হয় না। সংকট থেকে বের হয়ে আসতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয় তাদের নিজেদের মতো করেই। শুধু তাই নয়, যাদেরকে তাদের ত্রাতা ভাবা হয়েছিল সেই চাচাত ভাইদেরই সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় রুহী-রুবীদের।

উপন্যাসটিতে ঘটনাবলি বিন্যস্ত হয়েছে খুবই পরিকল্পিতভাবে। রুহীর উত্তম পুরুষে লেখা হয়েছে এর গল্প। চরিত্রগুলো এগিয়ে চলেছে এই বাঁধা ছকে। যদিও এর ঘটনাবলি খুবই সাধারণ, খুব বড় কোনো উত্থান-পতন নেই। অবশ্য উপন্যাসের শুরুই হয়েছে সংকটের পূর্বাভাস দিয়ে। পুরুষবিহীন সাত নারী সদস্যবিশিষ্ট রুহীদের পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে আসা আদালতের সমন দিয়ে উপন্যাসের শুরু। শুরুতেই রুহীর ভাষ্যে এমন একটা আবহ ছিল যে মনে হচ্ছিল তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে

পড়েছে। এই উপন্যাসে যে ধরনের সংকটের অবতারণা করা হয়েছে তা মোটেও অভিনব নয়, বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহে এ-সব খুবই পরিচিত ঘটনা। তবে লেখকের ঘটনাবিন্যাসের উদ্দেশ্য আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থানকে তুলে ধরা। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজে নারীরা ক্রমশ কীভাবে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে আসছে বা এগিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে লেখক তারও অনুসন্ধান করেছেন এখানে। মোটের ওপর এটাই *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণা*-র বিষয়বস্তু।

প্রথমে রুহী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে রুহী এক আত্মবিশ্বাসহীন নারী। আমাদের সমাজে একটি নারীকে জীবনে বিকশিত হবার পথে যে কী পরিমাণ মনস্তাত্ত্বিক অচলায়তন অতিক্রম করতে হয় তার একটি প্রতীক হিসাবেই যেন এই চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে। রুহীর আব্বা রুহীদেরকে প্রায় সারাক্ষণ কোনো না কোনো পুরুষের প্রহরায় রেখেছেন। শুধু পুরুষের সশরীর উপস্থিতি নয়, প্রহরায় রেখেছেন নানা মৌখিক বিধিনিষেধের মাধ্যমেও। এইভাবে প্রহরায় থেকে থেকে রুহী প্রায় মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকতে থাকতে নারীরা তাদের জীবনযাপনে মানসিক ভাবে এমনই প্রতিবন্ধী হয়ে আছে। ইয়োরোপে হয়তো পরিস্থিতি বেশ কিছুটা উন্নত। কারণ শিক্ষাদীক্ষায় তারা আমাদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে আছে। এত কিছুর পরেও এমনকি ইয়োরোপেও নারীদেরকে পুরুষের দ্বারা নানা মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত থাকতে হয়। এই রকম নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের কারণেই নারীরা এমন প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে, তাদেরকে জীবন-সংগ্রামে পিছিয়ে রাখে সবসময়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনে নারীদের অবস্থা রুহীর মতোই প্রতিবন্ধী। টিকে থাকতে হলে তাদের সংগ্রামকে হতে হবে আরও অনেক তীব্র। কতটা তীব্র হতে হবে তার একটা আভাস যেন এখানে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। রুহীর ছোট বোন রুবীর মধ্যে সেই সংগ্রামী চেতনার উপস্থিতি রয়েছে। সেই অর্থে রুবী চরিত্রটি অনেকটা তীব্র সংগ্রামী নারীর প্রতীক। যেন সে নারীকে সংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধকরণের একজন পথপ্রদর্শক। রুহীর ছোট বোনগুলোকে আরও সাহসী দেখা যায়। এটাও লেখকের পরিকল্পনারই অংশ। যেন এই রকম সাহস করে এগিয়ে না এলে জীবনে টিকে থাকা যাবে না এমন মানুষের জাগরণ দেখাতে চান লেখক। রুহীদের মা পুরুষতন্ত্রের শিকার অথচ পুরুষতন্ত্রায়িত একজন নারী। রুহী-রুবীদের বার বার তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সতর্ক করে দিতে থাকেন কী কী করা নারীদের পক্ষে শোভন, কী কী নয়।

রুহীদের সংসারে আকস্মিকভাবে নেমে আসে দুর্যোগ। অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের আব্বা। ফুফাত-চাচাত ভাইয়েরা এতকাল ছিল তাদের পরম নির্ভরতার মানুষ। এই অবস্থায় পড়ার পর অনুভব করল প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। তখন থেকেই মুখোমুখি হতে শুরু করে নির্মম সত্যের। বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় তারা তখন। রুহীও ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে শুরু করে খোলস ছেড়ে। এই বের হয়ে

আসতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি হিসাবে উত্তরণে সূচনা ঘটে রুহীর। আর এরই মধ্যে দিয়ে এই আখ্যানটি এগিয়ে চলে উপন্যাসের সম্ভাবনার দিকে।

রুহীর আব্বার চরিত্রটিরও ব্যক্তি হিসাবে উত্তরণ ঘটেছে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত রুহীর আব্বা ছিলেন যুগপৎ গতানুগতিক পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি এবং নারীর সংকট অনুভবকারী এককজন পুরুষ। তিনি ছয়টি কন্যাসন্তানের পিতা। কোনো পুরুষ সন্তান নেই বলে সারাক্ষণ তাঁকে শঙ্কিত থাকতে হয় এদের নিয়ে। ফলে প্রতি পদে তিনি অনুভব করতে পারেন সমাজে নারীদের অসহায়ত্বকে। তাদের এই অসহায়ত্বকে ঢাকতে সারাক্ষণ তৎপর থাকতে হয় তাঁকে। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ বলে ভাগ্নে-ভাইপোদের কাছে আশ্রয় চাইতে হয়। একসময় অনুভব করেন সেই দুর্বলতার সুযোগটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে থাকে ভাগ্নে-ভাইপোরা। তখন টনক নড়ে। নিজের চরম অসহায়ত্বের সময়েই তাঁর পক্ষে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও গভীরভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়। এইভাবেই ছয় কন্যাসন্তানের পিতা নিজে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও অসহায় নারীদের প্রতিনিধি হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থাতেই তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন মেয়েদের নামে উইল করে যাওয়ার জন্য। এমন আচরণ করতে থাকেন যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ বলে মনে হতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তিনি চিরাচরিত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব থেকে বের হয়ে আসতে থাকেন।

রুহী ব্যক্তি হিসাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখাতে থাকে। পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল রুহী। কিন্তু সময়মতো পুরুষতন্ত্রের আসল চেহারা বের হয়ে এলে আর রুখে না দাঁড়িয়ে কোনো উপায় থাকে না রুহীর। কিন্তু তাই বলে বিপ্লবীদের মতো আচরণ করে না সে। তার আচরণ দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতচকিত নারীর। নারীবাদী লেখকেরা সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে নারীদের বিদ্রোহী বা বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার লোভ সামলাতে পারেন না। আকিমুন রহমান সমগ্র সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রুহীকে সৃষ্টি করেছেন বলে এমন দ্বিধাগ্রস্ত বা ভীতচকিত নারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এটা লেখকের বাস্তবতাবোধেরই পরিচায়ক।

রুহীর ফুফাতো-চাচাতো ভাই রফিক-শফিক-রাজ্জাকরা গতানুগতিক মধ্যবিত্ত মানসিকতারই প্রবল প্রতিনিধি। সে-কারণে রুহী-রুবীদের লড়াইও তাদেরই বিরুদ্ধে। মামলা-আদালত ইত্যাদির মুখোমুখি হওয়ায় জীবনের ষণ্ড রূপের প্রকৃত চেহারা দেখতে পায় তারা। সংগ্রাম-লড়াইয়ের মুখোমুখি হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় পরিস্থিতিকে অনতিক্রমণীয় মনে হতে থাকে তাদের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামনে থেকে যুঝতে শুরু করে তারা। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নারীদের যে কী বিচিত্র পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয় তার কিছু পরিচয়ও এই উপন্যাসে রয়েছে।

জীবনঘনিষ্ঠতা উপন্যাসের কাছে বিশেষ কাঙ্ক্ষিত। *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণার* ভাষা মান বাংলা ও আঞ্চলিক বাংলার সমাহারে এগিয়ে চলেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রুহী ইতিহাসের মেধাবী ছাত্রী। সুতরাং সঙ্গত কারণেই রুহীর চিন্তা বা চেতনাপ্রবাহের প্রকাশে মান ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার চিন্তার ধরন

অনুসারে অনেক ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ডায়ালেক্টেরও সমান ব্যবহার করেছেন লেখক। এর ফলে উপন্যাসের ভাষা হয়ে উঠেছে জীবনঘনিষ্ঠ। সংলাপের ভাষাপ্রয়োগে আঞ্চলিক ডায়েলেক্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভাষাকে আকর্ষণীয় বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝেই কাব্যধর্মিতা ভাষাকে করে তুলেছে সুস্বাদু। সংলাপের ক্ষেত্রেই হোক আর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের বর্ণনাতেই হোক উভয় ক্ষেত্রেই কাব্যধর্মিতা বর্তমান। সংলাপের ক্ষেত্রে গ্রাম্য প্রবাদের ব্যবহারও জীবনঘনিষ্ঠতা ও শৈল্পিকতার অনুকূল হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অবশ্য ভাষার এই কাব্যধর্মিতাকে কখনো কখনো খানিকটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেও দেখা গিয়েছে। কাব্যধর্মিতা সবচেয়ে বেশিমাত্রায় দেখা গিয়েছে বইয়ের নামকরণের ক্ষেত্রে। উপন্যাসের নামকরণে ব্যবহৃত বাক্যের কাব্যধর্মিতা এবং অতিরিক্ত দীর্ঘতা নামকরণকে খানিকটা ভারাক্রান্ত করেছে। ভাবটুকু ঠিক রেখে নামকরণের দৈর্ঘ্য খানিকটা কমানো গেলে সেটা হয়তো যথার্থতর হত।

বহু বছর আগে একবার শিবনারায়ণ রায় এই বলে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের তিরস্কার করেছিলেন যে বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা মননবিমুখ। প্রসঙ্গত এর ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম। তাঁরা মননশীল ধারার উপন্যাস লেখক। *জীবনের রৌদ্রে উড়েছিল কয়েকটি ধূলিকণাও* এই ধরনের একটি মননধর্মী উপন্যাস। বিষয়বস্তু নির্বাচন; চেতনাপ্রবাহ রীতির ঘটনাবয়ন, ভাষাবৈশিষ্ট্য– সবদিক থেকেই এই উপন্যাসকে মননশীল সৃষ্টিকর্ম হিসাবে অভিহিত করা যায়।

মননশীল উপন্যাসের পক্ষে সফল হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ যে-সব চরিত্র চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে বিশেষ চিন্তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয় সেগুলো স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে ধারণার পুতুলে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জনজীবনে নারীর অবস্থানকে উপন্যাসটিতে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ধারণার মূর্তরূপ হিসাবে গড়ে তুলতে গিয়ে লেখক খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এতে সম্পূর্ণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে কি না সে-প্রশ্ন থেকেই যায়।

উড়ুক্কু: বিপন্নতার বর্ণমালা, প্রতিবাদের আখর

গোপা দত্ত ভৌমিক

উড়ুক্কু উপন্যাসের ভূমিকায় নাসরীন জাহান চিৎকারসর্বস্ব শিল্পের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার কথা জানিয়ে ছিলেন। উপন্যাসটির বাস্তবতা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ছেলেবেলা থেকেই সবকিছু একটু ভিন্ন চোখে দেখার অভ্যাসে উড়ুক্কুর প্রতিটি বাস্তবতাকে নির্মম আর রূঢ় করে তুলতে চেয়েছি, যাতে সেই হিংস্র বিবমিষাময় বাস্তবতা শ্লোগানের চেয়ে প্রগাঢ় হয়ে উঠতে পারে। এর সাথে যুক্ত করতে চেয়েছি মনঃসঙ্কট, পরাবাস্তবতা, জৈবিক সঙ্কট, অস্তিত্ব সঙ্কট এই সব বিষয়কে।'

উড়ুক্কুর জীবন শুধু উপন্যাসের 'আমি' নীনা তরফদারের নয়। একটি শিকড়-ছেঁড়া শিকড়-খোঁজা মেয়েকে মাঝখানে রেখে যেন আত্মজিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটি গোটা যুগ। প্রথমবার উপন্যাসটি পড়ার বিস্ময়বোধ মনে এখনো গাঢ় হয়ে আছে। কী সাহসী আঙুলে অবলীলায় নাসরীন জাহান নাড়াচাড়া করেন বিপজ্জনক নিষিদ্ধস্পর্শ বিষয়গুলোকে, স্বচ্ছ যুক্তিবোধে, মুক্ত মানবিকতায়। উপন্যাসটি আমাদের অস্তিত্বের মূল আর কাণ্ড ধরে তীব্র ঝাঁকুনি দিতে থাকে। বিপর্যস্ত করে দেয় আমাদের যত্নলালিত মধ্যবিত্ত স্থিতিবোধ। ভর দেবার মতো জমির অভাব, বানানো আদর্শ আর ঢাকা চাপা দেওয়া রঙিন কথার চাদর দিয়ে আর লুকোনো যায় না। উপন্যাসটি আমাদের যেন অসহায় নিরালম্ব শূন্যতায় ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু বাহ্য, এটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত নীনার সঙ্গে পা মিলিয়ে পাঠক হেঁটে যায় ভোরের দিকে। উড়ুক্কু আমাদের জীবনবিমুখ করে না। চারদিকে উপচে পড়া গ্লানি আর পঙ্কিলতার নিরেট আঁধারের মধ্যে নীনার আলোর অভিসার তার আঁকা ছবির মতোই ধ্রুব হয়ে থাকে। ক্যানভাসে তুলি দিয়ে কোপ মেরে নীনা সেইসব দৃশ্য আঁকছে, 'সেই মৃত্যুতে যে চিড়িক দিয়ে ওঠা রক্ত, যে আর্তনাদ', এর মধ্যে হিম হিম করে বয়ে যায় সন্তরের মীড়ের সুর।'

উপসাগরীয় যুদ্ধের চিল-শকুনের ছায়া গোটা উপন্যাসটি জুড়ে পড়েছে। ১৯৯০ সালের দোসরা আগস্ট মধ্যরাতে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে এবং অধিকার করে নেয়। দীর্ঘকাল চলেছিল ইরাকের সঙ্গে মার্কিন বাহিনীর লড়াই। উড়ুক্কু উপন্যাসের স্থলটিতে এই গনগনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আঁচ এসে লাগছে। ঘটনা আমরা প্রথম জানি নীনার অফিসে। এই ধরনের সব অফিস যেমন হয়, টাইপ, ফাইল, বসের গম্ভীর মুখ, সহকর্মীদের পারিবারিক কাসুন্দি এবং....দৈনন্দিনতা, একটা বিয়া করলাম দাদা

বারোমাস বউয়ের ব্যারাম লাইগা থাকে সকালে তাই নাস্তা হয়নি, গিন্নীর সাথে হেভি ফাইট, অফিসে আসার সময় কোনোদিন চিরুনি খুঁজে পাই না, কবে হরতাল? সাতাশ তারিখ? হে হে মন্দ না, একটা দিন রেস্ট... ধুৎ একটা কলমেও যদি কালি থাকতো... আমাগো ....হইল গিয়া এক নম্বরের দালাল। এইসব পুরনো কাসুন্দির ফাঁক গলিয়ে অকস্মাৎ পত্রিকার হেডলাইনে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করে বসে। নীনার সহকর্মীদের মতো বাংলাদেশের জনমতও দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে বাহবা দিচ্ছে কেউ। কেউ তার অভিযানকে স্বেচছাচারিতা মনে করে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করছে। অনেকদূরে থেকেও যেন যুদ্ধক্ষেত্র তাপ পরিমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে। তেল নুন পান্তা মার্কা ম্যাড়মেড়ে জীবনে হয়তো এ একটা বায়ু পরিবর্তনের মতো। নীনাকে এই উত্তেজনা স্পর্শ করে না, সে শুধু নিরাসক্ত দর্শকের মতো লক্ষ করে যায়। কীভাবে সাদ্দামের এই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন পদক্ষেপকে ঘিরে তৃতীয় বিশ্বের লাঞ্ছিত আহত অভিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ঘৃণা উগরে দিচ্ছে। নীনার পুরুষবন্ধুদের আড্ডায় শাহতাব সালাহদিন, রনজু, সত্যজিৎদের তুমুল তর্কে প্রান্তিক মতামতের বন্যা বয়ে যায়। তোমরা তো মার্কিনের পা-চাটা কুত্তা। তোমরা কী করে বুঝবে, এটা সাদ্দামের অনাচার নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'

–'ট্যাংরা হয়ে বোয়ালের পেছনে লাগতে আসো? মার্কিনের স্বেচ্ছাচারী অন্যায়ের প্রতিবাদ ইরাক আরেকটা অন্যায় দিয়ে করবে?'

দুই শক্তির পারস্পরিক অহংকারের লড়াইয়ের পটে ফুটে ওঠে কুয়েতে আটকে থাকা অসহায় বাংলাদেশীদের মুখ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন ছায়া হেডলাইনে আতঙ্ক ছড়ায়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ে হু হু করে। আবার তারই মধ্যে নীনার দেশের বাড়ির প্রতিবেশী আলম চাচার উদ্বেগে একটা গোপন তৃপ্তি ও সুখ ফুটে বেরোয়, 'এদিকে সারাক্ষণ মুসলমানের ব্যাটা সাদ্দামের লাইগা চিন্তায় অস্থির হয়া আছি, মনে অয় বিশ্বযুদ্ধ লাইগ্যাই যাইবো।'

প্রকাশ্য বিশ্বযুদ্ধ অবশ্য লাগেনি। উপন্যাসের শেষে আমরা খবরের কাগজে ঐশ্বরিক বরাভয় শুনতে পাই। 'অবশেষে সাদ্দাম নিঃশর্তে কুয়েত ছাড়তে রাজি হয়েছে।' 'বুশের রাজকীয় উত্থান, বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ লাভ।'

কালটিকে স্পষ্ট করার জন্য নাসরীন জাহান খবরের কাগজের টুকরো অংশগুলিকে অসামান্য কৌশলে ব্যবহার করেন। নীনার ব্যক্তিগত বিপন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সামাজিক বিপন্নতার মাত্রা। শুধু বাংলাদেশ নয় নিশ্চয়ই, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের দিনলিপিই এই সব কাটিং-এ যেন প্রতিফলিত হতে থাকে। ভারত তো বটেই। খুন জখম আর ধর্ষণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর দুর্ঘটনার ধারাবাহিক চালচিত্রে নব্বই-এর দশকের সূচনাপর্ব শুধু নয় এক অনন্ত অন্ধকার কালপর্ব প্রবাহিত হয়।

উপন্যাসটির সময়সীমা তাই খুব সিধে সরল খড়ির গণ্ডিতে ধরা যাবে না। একদিকে তা উপসাগরীয় যুদ্ধের কাল, অন্যদিকে শুধুমাত্রই সেইটুকু নয়। নীনার আত্মকথনে সময়ের বিচিত্র জটিল বহুতলের বিন্যাস ধরা পড়ে। ছকবাঁধা পুরনো ধরনে উপন্যাসটি এগোয়নি, বরং অনেক সময়ই চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখিকা। বর্তমানের টানা অভিজ্ঞতার সরল রৈখিকতা ভেঙে বার বার স্মৃতিচারণে ফিরে গেছে নীনা। শৈশব বা কৈশোরের, বয়ঃসন্ধির প্রথম যৌবনের নানা মুহূর্তের উদ্ভাস, সেই সব এলেমেলো যন্ত্রণা আর আনন্দ স্তূপের মধ্যে গভীর একটি আন্তঃযোগাযোগ এবং নীনার চৈতন্যলোকে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দুর্মোচ্য গ্রন্থিগুলিকে চিনে নিতে পারে পাঠক। কিউবিস্ট ছবির মতোই হয়ে ওঠে গূঢ় সূত্রে গাঁথা আপাতদুর্বোধ্য রহস্যময় বহুকৌণিক মানবমনের ক্যানভাস। উপন্যাস সূচনায়, ইরফান চাচার ঠিকানা বহু খুঁজে বার করে নীনা ঢুকে পড়ে জমিদারি স্থাপত্যে অভিজাত সুদূর এক ধরনের ভদ্রতার জগতে আর সেখানে একা ঘরে তাকে তাড়া করে নিজের ছিঁড়ে ফেলা দাম্পত্যের ভয়াবহ স্মৃতি। ইরফান চাচার বিশাল বাড়ির বিপ্রতীপে জেগে ওঠে সেই এক কামরার কারাগার, 'ভয়ঙ্কর রকমের বিক্ষত' বাথরুম, তার থেকেও ভয়ঙ্কর রেজাউলের সঙ্গে যৌনমিলনের পাশবিকতা, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। একা সেই ছোট্ট বাড়িতে নিরাপত্তাহীন ভূতগ্রস্ততা ফুটে ওঠে অদ্ভুত একটি বাস্তব ছবিতে, 'মিটসেফের ভাঙা ড্রয়ার ধরে টান দিতেই সার সার তেলাপোকা আমাকে ঘিরে ফেলে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে ওঠে। লাইট অফ করলেই পুরো বাড়ি জুড়ে শুরু হয় তেলাপোকার রাজত্ব।... ওরকম মুত্যুময় অবস্থায় আমি মোমবাতির একটা টুকরোও খুঁজে পাই না।'

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে এইভাবে কখনো স্মৃতির গলিপথ ধরে পিছিয়ে আবার এগিয়ে একটি দিনের মধ্যে অনেক অনেক দিনের মালা, একটি মাসের মধ্যে অনেকগুলি মাসের, একটি বৎসরের মধ্যে নীনার গোটা জীবনের বৎসরসমূহ গাঁথা হয়। বস্তুলোকের সঙ্গে চৈতন্যলোকের আপাতদৃষ্টিতে ভঙ্গুর অথচ প্রকৃতই চিরন্তন একটি সেতু ধরে আসা যাওয়া চলে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নাসরীন জাহানের অন্যতম প্রিয় লেখক। কালের মাত্রাটিকে নানা বিভঙ্গে ফুটিয়ে তোলার কলা ইলিয়াসকে মনে করায়। যদিও নাসরীনের শৈলী তাঁর নিজস্ব। বাংলা উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ রীতি প্রয়োগের বিশিষ্ট ধারায় গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পাশে নাসরীন জাহানও তাঁর নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখিকার 'সোনালি মুখোশ' উপন্যাসেও আমরা তার প্রমাণ পাই।

দুই

'সব কিছুর মধ্যে ন্যূনতম শিল্প বলে তো কিছু থাকা চাই।' সত্যজিৎকে বলেছিল নীনা। ভাঙাচোরা কদর্য জীবন-পরিবেশে শিল্পের সন্ধান নীনাকে প্রতিবাদী করেছে। প্রতিবাদ

যা কিছু অসুন্দর, অমানবিক, ত্রাস জাগানো বিকট তার বিরুদ্ধে। সমস্ত আখ্যানটিই যেন বহমান এক প্রতিরোধ।

নীনাদের নিম্নবিত্ত পরিবারে মেয়ে হয়ে জন্মানোর মধ্যেই প্রাথমিক অপমান ছিল। নীনার মার স্বপ্নে দেখা 'সোনার ময়না পুত্র' প্রথম সন্তান হয়ে এল না বলে গোড়া থেকেই মেয়েটি কিছুটা অবাঞ্ছিত। পরে যখন সে নিজস্ব রোজগার পরিবারের বেদীমূলে ঢেলে দিয়েছে তখনো জেনেছে প্রথম শ্রেণীর সদস্য হবার গৌরব কখনোই জুটবে না কপালে।

সে বড় হয়েছে বাবা-মার অসুখী দাম্পত্য দেখে। ইরফান চাচার সঙ্গে মার এককালের সম্পর্ক নিয়ে সে বাবা-মার কুকুর কামড়াকামড়ি ঝগড়া দেখেছে। মায়া, মমতা, প্রেম নয়, শুধু জান্তব এক অভ্যাসে তাঁরা সংসার করেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। নীনার বাবা ধর্মভীরু সোবহান তরফদার চাকরি ফেলে তবলিগ করে বেড়াতেন, মসজিদে রাত কাটাতেন। অর্থাভাবে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চতুর্থ সন্তানের জন্মের পর নীনা, রানু ও আরেফিন তিন সন্তানকে বেঁধে রাতভর গোরস্থানে ফেলে রাখতে অবশ্য ধর্মপ্রাণ মানুষটির আটকায়নি। রোজা নামাজের উপকারিতা বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি বেহেশতের হুরির বর্ণনার সময় দুর্বার লোভে তাঁর চোখজোড়া হত দেখার মতো! আর মা, 'পয়সা দেখলেই চোখের কোটর উপচে যার মণি বেরিয়ে আসে।' দারিদ্র্য, ধর্মভয়, কাপুরুষতার পথ দিয়ে নীনাদের পরিবারেও অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে দেয় আবদুল আলী মজুমদার। সুদখোর মজুমদার তন্ত্রসাধনার নামে বিকৃত যৌনাচারের জাল বিছিয়ে নষ্ট করে দেয় নীনার ছোট বোন রানুর জীবন। কিশোরী নীনাকেও যেতে হত মজুমদারের কাছে টাকা ধার করতে। সে বেঁচে যায়, কারণ সুন্দরী রানুর প্রতিই মজুমদারের বিশেষ লালসা। গরিব পরিবারটিকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে মজুমদার নিষ্পাপ কিশোরীটিকে বীভৎস এক পিছল পথে নামিয়ে আনে। সাদা কথায় সে কিনে নেয় রানুকে। পরিবার সমর্থক দর্শক হয়ে থাকে। নিষ্ফল প্রতিবাদে অস্থির হয় শুধু নীনা।

'বাবা-মা-ভাই বোনের প্রতি সেই থেকেই আমার বিন্দু বিন্দু ঘৃণার শুরু।'

এই রকম এক সংসারে হয়তো ছবি আঁকার নেশা মানায় না, তবু সেই নেশা পেয়ে বসেছিল নীনাকে, বীভৎস বিশ্রী আর ঘৃণ্য পরিবেশে তার আত্মা এই ভাবেই সুন্দরের সঙ্গ লাভ করতে চায়। ছবি আঁকার প্রতি টানই তাকে নিয়ে আসে মহিমের কাছে। মহিম শিল্পী, তার ব্যবহারেও ছিল সৌন্দর্যের, শিল্পের আভাস। অপরূপ এক প্রেমানুভূতিতে ভেসে যায় নীনা। প্রেমে, বিশ্বাসে, নির্ভরতায় মহিমের হাত ধরে কাঙালের মতো সুন্দরকে স্পর্শ করতে চায়। মহিম নীনার অনেক স্কেচ করেছে অথচ তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় না মেয়েটি; কিন্তু কী একটা খুবই চেনা মনে হয়, 'আবিষ্কার করি, আমার ভেতর থেকে সে রানুকে টেনে বের করেছে, নির্মাণ করেছে সেই অবয়ব।' রানুর শরীরী সৌন্দর্যের কাছে হেরে যায় নীনা। তার ভেতরটা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। এরপর জীবনের তাগিদে মুমূর্ষুর মতো রেজাউলকে তার আঁকড়ে

ধরা। কিন্তু আশাভঙ্গের ভয়াবহতা আবার গ্রাস করে তাকে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'মানুষের মৌলিক চেহারার বাস্তব দরজা।' রেজাউলের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সৌন্দর্যহীন এক পাশবিক দাম্পত্যে সে বাঁধা পড়ে যায়। একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে স্বামীর জান্তব চাহিদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে ধরে ফেলে রেজাউলের বিকৃত কামনার নানা চেহারা, পাশের ফ্ল্যাটের কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার, অবশেষে তার সমকামী অতীত এমনকি বর্তমানও। তারই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয় নীনা। অনাগত শিশুটিকে ঘিরে আবার স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করে। চারপাশের ক্লেদ পার হয়ে গর্ভের সন্তানটিকে ভালোবেসে যায়। জন্মাল একটি অসুস্থ শিশু, জন্মের পর আটান্নদিন পেরিয়ে গেলেও যার কান্না থামে না। ফার্মেসি আর ওষুধ, ধারকর্জ করতে করতে দেউলিয়া অবস্থা। অবশেষে নবজাতকের কান্না চিরতরে থেমে যায়। শুধু নীনার হৃদয়ে সে রেখে যায় চিরস্থায়ী একটি ক্ষত, যা থেকে পরে মাঝে মাঝেই তীব্র যন্ত্রণাসহ রক্তপাত হবে। বাবার মৃত্যুর সময় বাড়ি গিয়ে রানুকে বলেছিল নীনা, 'রানু আমার বাচ্চাটা মরে গেলো। কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিলো। তোরা কেউ একবারের জন্যও গেলি না।'

রেজাউলের সঙ্গে দাম্পত্যবন্ধন ছিঁড়ে দেয় নীনা। আপোস করে না আর। বিচ্ছেদের পর বহিরঙ্গেও এক উদ্ভুক্ক জীবন যাপন করতে হয় তাকে। পাগলের মতো খুঁজে কোনো মতে একটা চাকরি জুটিয়ে এক দম্পতি কামাল আর শানুর পেয়িং গেস্ট হয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করে। তাকে এই উদ্‌ভ্রান্ত অনিকেত দশায় সাহায্য করে ভাই আরেফিন, রেজাউলের কয়েকজন বন্ধু সত্যজিৎ , রন্‌জু, সালাহদিন। নীনা তাদেরও নিজের বন্ধু বলেই মনে করতো। ক্রমশ সে বোঝে এই পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত খুবই নড়বড়ে। এদের সঙ্গে কথোপকথন তাকে মানসিক দিকে সমৃদ্ধ করে বটে কিন্তু কোথাও একটা সম্মানের অভাব টের পায় সে। নতুন ভেস্‌পা চড়িয়ে সত্যজিৎ তাকে ক্রিসেন্ট লেকের কাছে যেদিন নিয়ে গিয়েছিল সেদিনই হয়তো স্বপ্নভঙ্গের শুরু। লেকের হাওয়া, সোডিয়ামের কাঁপা কাঁপা আলো চেনা সত্যজিৎকে অচেনা করে তুলেছিল সেদিন। কিন্তু নীনার মেদুর কল্পনাকে চুরমার করে দেয় সত্যজিৎ, রেজাউলের সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রস্তাব দিয়ে বলে, 'রেজাউল বলেছে ওর সাথে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারে তোর কিছু বিকার ছিল।' শুধু সম্মোহনময় সন্ধ্যাটা দলামোচড়া হয়ে যায় না, আবার ভেঙে যায় নীনার বিশ্বাসের জগৎ। এমনি ঘটে হাসপাতাল প্রত্যাগত সালাহদিনকে শুশ্রূষা করার সময়ও। এরা তাকে ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করে না, একটি ডিভোর্সি মেয়ে হিসেবেই দেখে, যার নীতিবোধগুলো কিছুটা পলকা।

এরই মধ্যে ইরফান চাচার সঙ্গে পরিচয় সংবেদনশীল মেয়েটির জীবনে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা হয়ে আসে। একদা নীনার মায়ের প্রেমিক এই ব্যক্তিটি আবার নীনাকে ফিরিয়ে আনেন ছবি আঁকার জগতে, তার আত্মার আশ্রয়ে। চাকরির ক্লিন্নতা, বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে ভাইকে সাহায্য করে নিজে আধপেটা খেয়ে থাকা ছন্নছাড়া

জীবনে হঠাৎ সুন্দরের আর্বিভাব ঘটে। নীনার মধ্যে লুকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা শিল্পীকে জাগিয়ে তোলে ইরফান চাচার প্রশান্ত বিদগ্ধ মোহময় ব্যক্তিত্ব। ইরফান চাচা তাঁর আপাত নিস্তরঙ্গ অভিজাত দাম্পত্যজীবনের ভাঁজ খুলে ভেতরের ফাঁকিও নীনার কাছে উন্মোচিত করে দেন অনায়াস বন্ধুত্বে। এমন একটা সম্পর্কের মাটি পেয়ে যায় নীনা যার ওপর ভর দিয়ে হয়তো সে দাঁড়াতে পারে, বেদনাময় অতীতের কথা অসম বয়সী বন্ধুকে খুলে বলতে পারে।

ইরফান চাচার পাশাপাশি পারস্পরিক সহমর্মিতার জমি তৈরি করে ওমর। গরিব, চালচুলোহীন, বিদ্‌ঘুটে চেহারা আর পোশাক, অথচ ওমরের ব্যবহারে শ্রদ্ধা আর সম্মানের আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ নীনাকে বিহ্বল করে ভেতরে ভেতরে। ওমর এক ধনীবাড়িতে টিউশনি জুটিয়ে দেয়। সে বাড়ির অতুল ঐশ্বর্য, মসৃণ জীবন হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত করে মেয়েটিকে।

'সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ। তার নরম সবুজ নিটোল চাকচিক্য আমাকে চারপাশ থেকে ভয়াবহভাবে আক্রমণ করে। আহা, আমার জন্মটা যদি হতো সেই প্রাসাদে? স্রেফ একটি জন্মের তারতম্যের জন্য আজ আমি এখানে।'

কিন্তু মোমের সঙ্গে গোলাপি জল মিশিয়ে যার ত্বক তৈরি সেই অপূর্বসুন্দরী ছাত্রীটিকে, তার বেপরোয়া ভোগী জীবনপদ্ধতিকে কোনো ভাবেই আয়ত্ত করতে পারে না সে। অবশেষে একদিন আবার একটি বীভৎস দৃশ্যে, সাদা ঝাঁকড়া পোষা কুকুরের সঙ্গে সুন্দরী কিশোরীটির বিকৃত শরীরী খেলার ধাক্কায় রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে নীনা। ঘোর বিবমিষায় তার হীনম্মন্যতা, ঈর্ষা, প্রাসাদের জীবনে মগ্ন থাকার ইচ্ছা সব ভেসে যায়। বাড়ি ফেরার পথে একদিন কয়েকজন মাস্তানের পাল্লায় পড়ে ধর্ষিত হতে হতে বেঁচে যায়। আর এই সব কদর্যতার মধ্যেও অসুস্থ শরীরে একা বাড়িতে কয়েকটি রাতে রেজাউলের অনুতপ্ত কোমল স্পর্শ সাময়িকভাবে তার প্রতিজ্ঞা টলিয়ে দেয়। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে ক্ষণিক সহবাসে আবার সন্তানসম্ভবা হয় নীনা। আবার নতুন করে মায়ার শুরু। ভ্রূণটিকে বাঁচিয়ে রাখার তীব্র আকুতি নীনার অস্তিত্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। রেজাউলের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন আসে না। এবার প্রতিকূলতা আরো ভয়ংকর। ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক প্রতিবেশ সবই বিরুদ্ধে। ইরফান চাচা তাকে নিজের শক্তির ওপর ভর দিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন, 'তোমার ভেতরে সন্তানটি বড় হবে। তুমি তাকে জন্ম দেবে। এবং তাকে কেন্দ্র করে যত রকমের সামাজিক যুদ্ধ আসবে, তার সবগুলোকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করতে হবে এবং তোমাকে, আমি তোমাকে ঠিক সেই জায়গাতেই দেখতে চাই।' ওমর সমাজভীতি থেকে নীনাকে বাঁচাবার জন্য অনাগত বাচ্চাটির পিতৃত্বের দায় নিতে রাজি হয়। কিন্তু সে তো নেহাৎ বানানো সমাধান। নীনার লড়াই তো তাকে একাই লড়তে হবে। ওমরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তাকে বড়োজোর শক্তি জোগাতে পারে।

তিন

'আমার যেন জন্মই হয়েছে দাম্পত্যজীবনকে বাস্তব আর বিচ্ছিরি সব বোধের ভেতর দিয়ে বারবার চেনার জন্য।' নীনার এই আত্মবীক্ষা বুঝিয়ে দেয় প্রচলিত সামাজিক দাম্পত্যের কী চেহারা উড়ুক্কু উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। প্রাত্যহিকতা কীভাবে আমাদের সৌন্দর্যবোধকে ক্ষইয়ে দেয়, সম্পর্কের শিল্পগুণকে বিনষ্ট করে, 'সোনালি মুখোশ' উপন্যাসে তার একটি ছোট বর্ণনা আছে। প্রাসঙ্গিক বোধে সেটি উদ্ধৃত করছি। সোনালি মুখোশের নিশি আর উড়ুক্কুর নীনার দাম্পত্য আকৃতিতে এক ছাঁচে ঢালা নয় কিন্তু প্রকৃতিতে দুটিই দুঃসহ।

'ঘটনাটা ঘটেছিলো বিয়ের চার পাঁচদিন পর, যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে টাটকা উষ্ণ অকৃত্রিম রোমাঞ্চ থাকে। সবটাই থাকে শিল্পিত, ঘুমনোর সময় অভ্যাস থাকলেও পুরুষের হাঁটুর ওপর লুঙ্গি ওঠে না, মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে স্বামী তাকে দেখে ফেলার আগেই হালকা প্রলেপে নিজেকে সাজিয়ে নেয়, দুজনে দুজনের পরিবারের প্রতি একান্ত মমতা প্রকাশ করে, সবাই যতদূর সম্ভব যার যার বদঅভ্যেসগুলো লুকিয়ে রাখে।'

ক্রমশ দৈনন্দিনতার নৈকট্যে এই সব মায়াবী আবরণ ঘুচে যেতে থাকে। পরস্পরের মৌলিক চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সর্বদা সেই আবিষ্কার আনন্দদায়ক হয় না। অন্তত রেজাউলের নিজস্ব প্রকৃতিকে যত চিনেছে নীনা, ততই শিউরে উঠেছে। অবশ্য প্রতিদিনের জীবনে অশিল্পিত গ্লানিময় আচরণের দায়ভাগে নীনার নিজেরও যে অংশ ছিল তা সে স্বীকার করেছে। সেও তো রেজাউলের ওপর নিয়ত আরোপ করেছে মহিমকে অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ উভয় পক্ষেই। ক্রমশ যেন দাম্পত্যের সমাজস্বীকৃত খাঁচায় দুটি পশুর বাধ্যতামূলক সহবাস হয়ে উঠেছে তাদের জীবন।

তুলনাটা হয় তো খুবই সুদূর শোনাবে তবুও বাংলা উপন্যাসে বেমানান দম্পতির আর্কিটাইপ কুমুদিনী ও মধুসূদনকে আমাদের মনে পড়ে যায়। পারিবারিক সামাজিক কালিক সবরকম পরিবেশই ভিন্ন তবু সুন্দরের জন্য তীব্র অভীপ্সায়, সমাজনীতির দৃঢ় বিরুদ্ধতায় কুমু ও নীনার অন্তর্গত একটা সদৃশতা আছে। যোগাযোগের সেই বিখ্যাত অংশটি মনে পড়ছে, 'এক রকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের– সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়।' এই অসামঞ্জস্যই নীনা ও রেজাউলের। তেমনি এর একটা উল্টোপিঠ আছে সেখানে রক্তগত সামঞ্জস্যের টানেই পাঠকের মনের পটে চাটুজ্যেবাড়ির কুমুদিনীর সুকুমার অভিজাত মুখশ্রীর সঙ্গে তরফদার বাড়ির নীনার রূঢ় জীবনের তাপে-সেঁকা ক্লান্ত মুখ মিলে যেতে থাকে। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণার ধরনে এই জন্যেই তারা প্রায় একই অনুভূতির অংশীদার,

'মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। ... ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে।'

মধুসূদনের সংসারে কুমু তার সুর হারিয়েছিল, রেজাউলের জেলখানায় নীনা হারিয়েছিল তার ছবি। মধুসূদন কুমুদিনীর সম্পর্কে সবটাই সামাজিক জবরদস্তি, রেজাউলকে কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে নীনা। কেন? এ কি বিভ্রম? ইরফান চাচাও অবাক হয়েছিলেন, 'আমি তো জানতাম তুমি রেজাউলকে এই একটা ব্যাপারেই সহ্য করতে পারতে না।'

নীনার অসুস্থতার সময় কোমল শুশ্রূষা উপহার দিয়েছে রেজাউল। কিন্তু শুধুই কি তাই? নীনা স্বীকার করেছে রেজাউলের চর্চিত সতর্ক ব্যবহারের অতি শোভনতা তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়নি, নিজেও সে 'দীর্ঘ দিবস-শর্বরী বুভুক্ষু রমণী।'

'ও এখন নিষিদ্ধ এই বিষয়টাই তখন আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে।' যতই শিল্পিত হয়ে আসুক রেজাউলের পরিবর্তনকে বিশ্বাস করেনি নীনা অথচ এক সহজিয়া মানবিক আবেগের মুখে তার বিতৃষ্ণা সাময়িকভাবে ভেসে গেছে। রক্তমাংসের এই দুর্বলতা নীনাকে ধরা-ছোঁয়ার মানবী করেছে। ভ্রান্তি আর চ্যুতি নিয়ে মানুষ যে এমনই।

বরং কুমুদিনীর দুস্তর মানসিক শীতলতা কোনোদিন অতিক্রম করতে পারেনি মধুসূদন। অন্তঃসত্ত্বা কুমুদিনী স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার আগে দাদাকে বলেছিল 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।' তবুও সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নীনা ফেরেনি। প্রাথমিক সংশয়ের দোলাচলতা কাটিয়ে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কুমুর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ থেকে সরে গেছে নীনার আত্মপ্রত্যয়ী স্পষ্ট দ্রোহপথ। যোগাযোগের কাল থেকে আমরা এসে পড়েছি উড়ুক্কুর কালে। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুন বাঁকে।

নীনা ও রেজাউল ছাড়াও যে ক'টি দম্পতি এসেছে উড়ুক্কু উপন্যাসে, শানু ও কামাল, ইরফান চাচা ও চাচি, নীনার বাবা ও মা সবাই নিজস্ব ধরনে অসুখী ও অতৃপ্ত। শানু ও কামালের জান্তব জীবন দেখে যা ভেবেছে নীনা তা হয়তো সব ক'টি জুটি সম্বন্ধেই বলা যায়, 'এরা মানুষ! এদের ভেতর থেকে কি মনের মৃত্যু ঘটেছে? মানুষ অভ্যাস দিয়ে সুখী হতে পারে? ... সবাইকে নিজের মতো মনে করছি কেন? এক জোড়া দেহের উত্তাপ যদি দুর্বিষহ মনের ক্লেশ মুহূর্তে মুছে দিতে পারে, আমার তাতে অসহ্য লাগার কী আছে?'

চার

কেন অসহ্য লাগে নীনার? শুধু দাম্পত্যের জৈব যান্ত্রিকতা নয়, রাজনীতির নামে নির্লজ্জ শঠতা, ভণ্ডামি, ধর্মের নামে যথেচ্ছ অনাচার আর শোষণ, সমাজের নানা স্তরে বিছিয়ে থাকা কদর্য দুর্নীতি, চতুর্দিকে অসুন্দরের রাহুগ্রাস তাকে প্রতি পদে বিপন্ন করে তোলে। এ আসলে একজন সৎ বিবেকী ব্যক্তিমানুষের অনিবার্য আত্মিক সংকট। নীনা তার জীবনে প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে, ধুলো-পায়ে চলার পথে পথে খুঁজে নিতে চেয়েছে শিল্পকে আর বার বার তার আশা আর স্বপ্নের ওপর এসে পড়েছে কুশ্রী স্থূল হস্তক্ষেপ। কেঁপে উঠেছে মেয়েটির আমূল অস্তিত্ব।

নাসরীন জাহান প্রধান চরিত্রের অভিজ্ঞতার পরতে পরতে এক সর্বব্যাপী সন্ত্রাস কীভাবে মানবস্বভাবের নিগূঢ় নান্দনিকতাকে শ্বাসরোধ করে মারে তার রেখাচিত্র এঁকেছেন। ক্ষমতার হাত এই সন্ত্রাসের জাল বিছিয়ে দেয়, রাজনীতির হাত মিলে যায় মৌলবাদে, দলীয় স্বার্থ মিলে যায় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির গোপন লালসায়। 'সোনালি মুখোশ' বা 'উড়ে যায় নিশিপক্ষী' উপন্যাসে গ্রামীণ পটে এই সন্ত্রাসের চেহারা দেখিয়েছেন নাসরীন। কীভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠকে সুকৌশলে রুদ্ধ করা হয় তার নির্মম ছবি দিয়েছেন।

'সোনালি মুখোশে' জাহিদ উপস্থিত হয়েছিল এক অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামে, যেখানে সর্বময় কর্তা 'ধর্মপ্রাণ' আবদুল খালিক। যে হিমসিক্ত গলায় বলতে পারে 'অধিক শিক্ষা মানুষকে শয়তানও বানায়।' গ্রামের 'কুকর্মগুলি' সে বিবৃত করে নিজের মনের মতো করে, 'হিন্দু ছেলের হাত ধইরা পলাইলো মুসলমান মাইয়া, আবুর বউ লাইগেশন করাইলো, ভিসিআর-এ কী সব বুলুর ব্যবসা শুরু করলো খানের ব্যাটা।' তাই নাকি অভিশপ্ত গ্রামে কবরস্থান থেকে উঠে আসে দুমাথাওয়ালা অজগর। অশিক্ষিত গরিব মানুষের ধর্মভয় কিংবা অলৌকিক শক্তির ওপর তাদের আদিম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা কীভাবে মুনাফা লোটে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের লালসালু উপন্যাসে মহব্বত নগরের মজিদ তার একটি উদাহরণ। আবদুল খালেক মজিদের দলেরই লোক। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিদ্রোহী জমিলাকে আয়ত্ত করতে পারেনি মজিদ, কিশোরীর তীব্র প্রতিবাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। একই ভবিতব্য আবদুল খালিকেরও, তার কিশোরী স্ত্রী সুফিয়া ভীত গলায় স্বামীকে বলে, 'আপনের চেহারা এক্কেবারে, আমার আব্বার লাহান, ঠিক একই মতন বুড়া, গালের মইদ্যে জরুল, এক রহম দাড়ি।'

কিন্তু তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে বিফল হলেও কায়েমী স্বার্থসিদ্ধিতে আবদুল খালেকরা কখনো হারতে চায় না। তাদের হাতে থাকে বাঁধা গুণ্ডার দল। যারা বালিকা হীরাকে তার মায়ের অসহায় দৃষ্টির সামনে ধর্ষণ করে, গোরস্থানে জাহিদকে বস্তায় ভরে পিটিয়ে অর্ধমৃত করে দেয়। এবং আবদুল খালিক অপ্রাকৃতের দোহাই পাড়ে। নিযুক্ত এই দুর্বৃত্তের দলে কোনো ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করে চেনা যায় না, এরা যেন দলাপাকানো বিকৃত মানুষ, মানুষের মুখোশ-পরা অবমানব, যারা সবাই সমান আকৃতির, সমান আত্মাহীন। 'মানুষকে মানুষের হত্যা করার অর্থ মানুষের আত্মহত্যা করা' নাসরীন জাহানের এই ভাবনাটি বার বার তাঁর উপন্যাসে দেখা দেয়। 'উড়ে যায় নিশিপক্ষী' উপন্যাসে নয়নপুর যেন বাংলাদেশের এক প্রতীকী গ্রাম। কুসংস্কার আর আদিম বিশ্বাসের আলো-আঁধারিতে ঘেরা। আবদুল খালিকের মতো এখানে আছে মন্নাফ খাঁ। ওসমানের বাবা-মাকে সে খুন করেছিল। অবশেষে ওসমানও প্রভাবশালী মানুষের পোষা খুনীদের হাতে প্রাণ দেয়।

উড়ুক্কুর সন্ত্রাসের চেহারাটা আরো জটিল। এখানে সরাসরি কোনো শারীরিক খুন নেই। কিন্তু আবদুল আলী মজুমদারের মতো ঘৃণ্য চরিত্র আছে। জনতার বিশ্বাস 'পির-আওলিয়ার সাথে তার যোগাযোগ আছে।' ধ্যানী, আধ্যাত্মিক মানুষের মুখোশের

আড়ালে সুদখোর মজুমদার এক বিকারগ্রস্ত নীতিহীন নিষ্ঠুর কামুক। রানুর আত্মার স্বাধীন বিকাশকে সে সুপরিকল্পিতভাবে কদর্য যৌনাচারের চাপে রুদ্ধ করে দিয়েছে। অন্য অর্থে রানুও এক মৃত মানবী। মজুমদারের হাফ-বিল্ডিং উপন্যাসে এক অশুভ ছায়া ঘনিয়ে রাখে আর এই ত্রাস জাগানো অর্ধেক বাড়ির সঙ্গে মিশে যায় একটি আধাআধি তৈরি পাঁচিলের হিম-ধরানো চেহারা– এই পাঁচিলের দিকেই নীনাকে টেনে নিয়ে চলছিল তিনজন মাতাল মস্তান যুবক। নীনার ক্যানভাসে অর্ধসমাপ্ত তালগোল পাকানো ছবিতে ভয়ের ছায়া প্রসারিত হয়। প্রসারিত হয় বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনীতির চতুর ঘোলাটে জগত। 'খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজদের উৎপাত। ভার্সিটির হলে প্রচুর অস্ত্র। সব ছাপিয়ে বড়ুয়ার গলা ঝনঝন বেজে ওঠে, বুঝলেন, ভারতে দাঙ্গা হয় আর এদেশের সরকার নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মোড় ঘোরানোর জন্য গুণ্ডাদের দিয়ে মন্দির ভাঙ্গায়।'

সাদ্দামের কুয়েত দখল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী আকাশচুম্বী অহংকার, ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার লজ্জাজনক ইতিবৃত্ত, বাংলাদেশে তার বদলা, নৈর্ব্যক্তিক এই রাজনীতি-পটে নাসরীন জাহান খোদাই করে দেন সত্যজিতের মতো ব্যক্তিমানুষের আর্ত কান্না, 'ওপারে কে আছে যে আমরা যাবো? শুধু ধর্ম কি আত্মীয়তা দিতে পারে? ... একজন মানুষের যখন দেশ থাকে না, তার মতো রিক্ত ভিখিরি আর কে আছে পৃথিবীতে?' নিজস্ব ব্যক্তির জীবনে প্রথা আর প্রতিষ্ঠান ভেঙে উড়ান-দেওয়া নীনা বড়ো মমতায় সত্যজিতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকে তুলে আনতে চায় ভয়ের আবর্ত থেকে। কিন্তু এক শিকার কি অন্য শরাহত শিকারকে ত্রাণ করতে পারে?

উড়ুক্কু উপন্যাসে মানবিক অস্তিত্বকে কুরে কুরে খেয়েছে সর্বব্যাপী এক নিরাপত্তাহীনতা, সম্মান হারানোর ভয়ানক শঙ্কা, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্যক্তিকে বিচূর্ণ করার প্রবল চাপ। কয়েকটি স্থায়ী মোটিফ ঘুরে ঘুরে আসে এই উদ্বেগ, ক্ষয়, শূন্যতাকে বোঝাবার জন্য, হাসপাতাল, কবরখানা, অন্ধকার রাস্তা। আশ্চর্য এক ইন্দ্রিয়বেদিতা মানুষের মর্মছেঁড়া হাহাকারকে প্রকাশ করে হাসপাতালের গন্ধে, সেভলনের গন্ধে, মৃত্যুর গন্ধে। আতঙ্ক, স্বস্তিহীনতা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা আর বিষাদে ভারি এই উপন্যাসের আবহ এবং আপাত ভূগোল ঢাকা শহরকে ঘিরে পাক খেলেও তার আড়াল দিয়ে অথবা সেই শহরের অবয়ব-সংস্থানকে ছাপিয়ে পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে গোটা তৃতীয় বিশ্বের মানচিত্র, তার মানসিক বিপন্নতার, উৎকণ্ঠাময় অস্তিত্বের প্রখর বাস্তব।

পাঁচ

'পুরো ফাঁকা মগজের ওপর একটি শিশু হামাগুড়ি দেয়। ক্রমশ বড় হতে হতে ঘর জুড়ে দাঁড়ায় সে। একটি শিশু ... একটি শিশু ... একটিই....। ... আজ ওর কপালে শাদা শিং? আশ্চর্য! নিজের সন্তানের মুখ এতো অপরূপ, এতো মায়াময়? আমি যার চক্র থেকে কিছুতেই আর বেরুতে পারি না।'

নীনার অর্ধজাগর কল্পনায় তার অকালমৃত শিশুটি বার বার এসে দাঁড়ায়। জন্মের পর আটান্ন দিন ধরে চিৎকার করে কেঁদে বাঁচতে চেয়েছিল জণ্ডিস-আক্রান্ত বাচ্চাটি। তারপর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই চিৎকার। হাসপাতালের ছাঁদ-কাঁপানো সেই কান্না আবার শোনবার জন্য তারপর কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে নীনা। বাস্তব পৃথিবী থেকে মুছে গেছে যে শিশু কল্পনায় স্বপ্নে যেন কুহকের রাজ্য থেকে সে রূপে-রূপান্তরে দেখা দেয়। মার বুকে মুখ গুঁজে আশ্রয় চায়। কখনো সে বইয়ের পাতা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে, অক্ষরগুলো ধুয়ে মুছে হলুদ রুগ্ন শিশুর আকৃতি নেয়। হাসপাতালে পা দিলেই নীনার দিকে সেই অপার্থিব শিশু হামাগুড়ি দিয়ে আসে। সুর্যের সাতরং যার শরীরে একটি মৃত্যুসম হলুদে পরিণত হয়েছে। কখনো সে মার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মায়াময় হাসে। টেবিলের ওপর বসে, চেয়ারে পা ঝুলিয়ে দেয়, শূন্যে ভাসে। কেউ চায়নি তাকে। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট রেজাউল অসুস্থ সন্তানকে শনি ভেবেছে। তাকে আদর জানাতে আসেনি নীনার মা বা বোন, শুধু তার মুখ দেখে নীনা নিজের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়েছিল। তাই তার অকালমৃত্যু শুধু নীনারই একান্ত ক্ষতি। একেবারেই তার ব্যক্তিগত দুঃখ।

শওকত ওসমান তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে আরব্য রজনীর কাহিনীকে পুরোপুরি আধুনিক তাৎপর্যে ব্যবহার করেছিলেন। উড়ুক্কু অন্য ধরনের উপন্যাস, এর আখ্যান সময়কালীন বাস্তব থেকে সরাসরি উঠে এসেছে, কিন্তু কাহিনীর ভাঁজে লোককথা, রূপকথা, মিথের রহস্যজগৎকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন লেখিকা। আরব্য রজনীর আফ্রিদি দৈত্য আর সুন্দরী রাজকন্যার রূপকল্পে কখনো যেন মজুমদার আর রানুকেই এঁকেছে নীনা। কিন্তু বাস্তব আর পরাবাস্তবের অদ্ভুত মেশামেশি সবচেয়ে সার্থকভাবে দেখা দিয়েছে নীনার সঙ্গে তার মৃত বাচ্চার সম্পর্কে। নীনার ব্যর্থ প্রেম, নষ্ট দাম্পত্য, ছিন্ন মাতৃত্বের সমস্ত যন্ত্রণা কখনো রূপকথা কখনো অতিকথার ফ্রেমে মা আর মৃত শিশুর অলীক অথচ গভীর অর্থে বাস্তব যোগাযোগের প্রকাশ পেয়েছে।

'ও চিল তুমি কি আমার শিশুর কান্না দিতে পারো?

না।

খরগোশ, ও খরগোশ তুমি কি ...?

না।

মৃগেল, ও মৃগেল মাছ ...।

না।'

নীনার মগ্নচেতনে বাংলার চিরকালীন চেনা রূপকথা, ঠাকুরমার ঝুলির স্মৃতিপুঞ্জ আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে মিশে গেছে। কলাবতী রাজকন্যা, সুঁচ রাজপুত্র আর কাজলরেখার গল্প তার নিজের গল্প হয়ে গেছে। কয়েকটি এলোমেলো উদ্ধৃতি দেওয়া যাক,

'সারা রাত পার করে দিই কাজলরেখার মতো রাজপুত্রের বিষ-সুঁচ ওঠাতে-ওঠাতে। সমস্ত সুঁচ ওঠানোর পর তার চোখের দুটো বাকি রেখে আমি স্নানে গিয়েছি ... এসে দেখি শুধু চোখের সুঁচ খুলে দিয়ে ভিন্ন এক নারী রাজপুত্রের প্রণয়ী হয়ে গেছে।

নয়নলোভন রানু যেমন করে মহিমের প্রণয়ী হয়ে যায়। কখনো রূপকথার আদলে নিজের প্রবল নৈরাশ্য আবার আপন সন্তানহন্ত্রী রাক্ষসী রূপ দেখে শিউরে ওঠে নীনা, 'পঞ্চপ্রদীপের ভাঁজ খুলে নিচে নেমে আসি। চারপাশে দাউ দাউ মরুবালির ঝড় ... কিন্তু এ-কি, সমুখে বানর কেন? কোথায় সেই সুপুত্র রাজকুমার? ... কুড়মুড় করে খাই অজিতের মুণ্ডু, কুড়মুড় করে খাই কুসুমের পিণ্ডি ...। এ-কি! কুসুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মানব শিশু। হায়! ডিম ভেবে আমি তাকে খেয়ে ফেলেছি।'

যে সন্তানকে শুধু কাঁদতে দেখেছে স্বপ্নে তাকে হাসতে দেখে নীনা, কোমল হেসে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সে মৃতদেহের স্তূপ ঠেলে ট্রেনের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে হাসপাতালে দেখা ওমরের আহত ভাইয়ের কোলে গিয়ে বসে।

নীনার চেতনালোকের এই সব আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট অবাস্তব কোলাজে একটি মেয়ের সন্তান হারানোর হাহাকার শুধু নয়, বাচ্চাটিকে আবার গর্ভে ফিরে পাবার তীব্র বাসনা স্পন্দিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে সন্তানসম্ভবা নীনা দ্বিতীয় বাচ্চাটির হন্তারক হতে চায়নি বরং নিজের অবশিষ্ট নিরাপত্তা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে নতুন প্রাণটিকে বাঁচাতে চেয়েছে। জীবনের দিকে আবার ঝাঁপ দিয়েছে। আবার ইজেল খাড়া করে ছবি আঁকতে চেয়েছে, খুঁজেছে সুন্দরকে। নিজের শরীরে জাত ভ্রূণের মধ্যে, ছন্নছাড়া ওমরের মধ্যে, চিলেকোঠার সেপাই'-এর হাড্ডি খিজিরের মতো যার দীন শরীর থেকে মানবতার আলো বিচ্ছুরিত হয়। তার সত্তার গভীরে সাহস জুগিয়েছে ইরফান চাচার প্রশান্ত দীপ্যমান ব্যক্তিত্ব। উড়ুক্কু নীনা 'ভোকাট্টা ঘুড্ডি'র মতো লাট খেতে খেতে ভোরের পথে চলেছে।

'উড়ে যায় নিশিপক্ষী'তে মৃত্যুপথযাত্রী রক্তাপ্লুত ওসমান ঢলে পড়তে পড়তে দেখেছিল নিকটবর্তী আলোর পথ ধরে যেন তার স্ত্রী নীরা শিশুপুত্রকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। সন্তান কামনা এবং তার জন্য মমতা-ছাওয়া একটি ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার স্বপ্ন দেখে নাসরীন জাহানের উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা। এরই অন্যদিকে আছে শানু বা নিশির গর্ভধারণের আকাঙ্ক্ষা এবং আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। নারীর অস্তিত্বের গূঢ় তলদেশে এই আকুতি মৌলভাবে কাজ করে যায়। একই সঙ্গে যা প্রাকৃতিক ও মানবিক। শিশুকে ঘিরে দুর্মর আশাবাদ আগ্রাসী অন্ধকারের প্রান্তে সূর্যসংকেতের মতো মনে হয়। উপন্যাসের মুখ ঘুরে যায় জীবনের দিকে। নীনা যেমন বলেছে 'জীবন এমনই, কুয়োর জলে চুবিয়ে ফের তাকে টেনে না তুললে জীবনের খাঁই মেটে না।'

ছয়

পশ্চিমবঙ্গের সুবর্ণরেখা পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে নাসরীন জাহান বলেছিলেন বাংলাদেশের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সেলিম মোরশেদ, পারভেজ হোসেন,

শহিদুল আলম, কাজল শাহনেওয়াজ, মামুন হুসাইনের লেখায় নতুন চিন্তাভাবনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা তাঁকে অভিভূত করে। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে উড়ুক্কু উৎসর্গ করা হয়েছে গল্পলেখক পারভেজ হোসেনকে। নাসরীন জাহান নিজে পুরনো ছাঁচ ভেঙে নিজস্ব শৈলী নির্মাণকে প্রথম থেকেই রীতিমতো গুরুত্ব দিয়েছেন। লেখিকার প্রথম উপন্যাস হিসেবে উড়ুক্কু তাঁর বক্তব্যের মৌলিকতা শুধু নয়, বলার ধরনের সতেজ নিজস্বতাকে চিহ্নিত করেছে।

নাসরীন জাহানের গদ্যে প্রথমেই যা আমাদের বিস্মিত করে তা হল শব্দ ব্যবহারে তাঁর সম্পূর্ণ অসংকোচ। দুঃসাহস ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে ধুলো কাদা জঞ্জাল থেকে অবলীলায় তিনি ঠিকঠাক শব্দটি এমনভাবে তুলে আনেন দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বার বার মনে হয় ভাষার ক্ষেত্রে তিনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন, টানদড়ির মতোই ব্যাপারটা ভয়ংকর, একটু এদিক-ওদিক হলেই অকারণ অশ্লীলতার কিনারায় চলে যাবে। কিন্তু কখনোই তা হয় না। সবটাই একান্ত জরুরি বলে মনে হয়। একটি শব্দও বদলাতে ইচ্ছে হয় না। নীনার জীবনের বিবমিষাময় বাস্তবতাকে ফোটাবার জন্য এই ধরনের সাহসই দরকার ছিল।

গোটা উপন্যাসটিই নীনার আত্মকথনে গাঁথা। সবটাই সচেতন গল্প বলা নয়, চেতনা প্রবাহী রীতিতে মনের মগ্ন স্তর থেকে বুদ্বুদের মতো ভেসে-ওঠা শব্দগুলো উপরিতলে চলে আসে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সচেতন তির্যকতা। নিজের জীবন, চারপাশের জীবনের প্রতি ধিক্কার নীনার আত্মকথনে বিদ্রূপের মাত্রাটি যুক্ত করে দেয়, ভাষার মধ্যে জীবনের নঞর্থকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'রিকশা ভাড়া চুকিয়ে ঘরে ঢুকেই ওম শান্তি! আমার রুমে চুটিয়ে লুডু খেলছে শানু আর কামাল ভাই। ওদের উচ্ছসিত হাসির তরঙ্গের সাথে আমিও একাত্ম হয়ে যাই।

কী অসম্ভব নির্ভার লাগছে। হাঃ হাঃ পৃথিবীটা এই এখন আমার দখলে।'

'এইসবে ঢুকে পড়ে আমি নিজেও কি ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে উঠছিলাম না? লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে বিকট অবস্থায় শুয়ে থাকতো সে। আমিও কি উদোম পিঠ পেতে দিয়ে তাকে ঘামাচি খুঁটে দিতে বলতাম না? তবে তো স্বপ্নভঙ্গ তারও হয়েছিলো। ... ওই রকম অবস্থায় আমাকেও কি তার মনে হয়নি দলাদলা মাংস?'

গতিশীল, ঝরঝরে চলিত রীতির মধ্যে আকস্মিকভাবে সাধু গদ্য ব্যবহার করেন নাসরীন জাহান, শুধুমাত্র নাটকীয়তা নয়, এই ধরনের প্রয়োগ আখ্যানের ভেতর থেকে গভীরতর অর্থটি তুলে আনে। কখনো ফুটে ওঠে নীনার নিস্পৃহ নিরাবেগ ভঙ্গি, 'এক দেশে ছিলো এক মজুমদার। তাহার ছিলো সুদের ব্যবসা' – যেন এক রূপকথা শোনাচ্ছে সে ইরফান চাচাকে। কখনো মহিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার স্মৃতি জীবনানন্দীয় বিন্যাসে, বনলতা সেনের ধরনে রোমান্স ঘনিয়ে আনে, তলায় লুকোনো থাকে বিদ্রূপের ছুরি, 'তার সাথে রিকশায় শহরতলীর কতো পথ চলিয়াছি, থামিয়াছি, ভাবিত হইয়াছি, পুনরায় চলিয়াছি।' ছাত্রী সিনথির বাড়িতে উদ্ভট পাশ্চাত্য বেশভূষায় সেজে আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন চিড়িয়াখানার জন্তু চেনায়, 'ইহা একটি নীনা। ইহার দুইটি কান আছে, দুইটি চোখ আছে, চুল, নাক, ঠোঁট আছে।

উড়ুক্কু উপন্যাসের অন্যতম গুণ মিতভাষণ। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। এই উপন্যাসে বইপত্রের কিছু প্রসঙ্গ আছে। নীনার মননলোককে পরিমিত বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। সে ভ্যান গগের জীবনী পড়ে, শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ। ফাঁকে ফাঁকে আসে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। ইরফান চাচার সঙ্গে আলাপচারিতে গ্রীক পুরাণকল্প, হান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথা, কোনারকের ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু কোথাও সেই সব আলোচনা ভারি হয়ে চেপে বসে না, বাহুল্য হয়ে ওঠে না। শুধু প্রধান চরিত্রের ভেদবুদ্ধিহীন মানবতা, সৌন্দর্যতৃষ্ণার দিকে অব্যর্থ অঙ্গুলিসংকেত করে।

নাসরীন জাহানের গদ্যস্থাপত্যের অভিনব নিরীক্ষায় কবিতা ও চিত্রকলার অদ্ভুত সম্মেলন আছে। গদ্য উপন্যাসের বাইরের আদল থেকে তিনি সরেন না, কিন্তু মাঝে মাঝেই অন্তর্গত বুনোটে মাধ্যমের বেড়া টপকে কবিতার রাজ্যে আমাদের নিয়ে যান। উপমাগুলোকে যেভাবে তিনি তুলে আনেন তাতে প্রকাশ পায় নিহিত কাব্যিকতা, যা প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লগ্ন আবার কল্পলোকের দিকে ডানা মেলে দুঃসাহসী।

'জানালা দিয়ে ধবধবে বেড়ালের মতো আলো হামাগুড়ি দেয়।'

'শরীরের ভাঁজে ভাঁজে থাকা তেতো ঘাম, জমাট ধুলোর জট খুলে যেতে থাকে।'

'একটা স্থির রুপোর নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে সুন্দর।'

এইসব টকুরো টুকরো ছদ্মবেশী কবিতার মতো নীনার কল্পনা বা স্বপ্নগুলো হয়ে ওঠে সুররিয়ালিস্ট ছবি। তার ইজেলের অসমাপ্ত আকার আর রং যে কাগজ ছাপিয়ে উপন্যাসে নানা স্তরে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। আপাত-অসংলগ্ন অথচ গহন যোগাযোগ গাঁথা উদ্ভট, কিম্ভূত অলৌকিকের সমাবেশ কোনো কোনো বিখ্যাত পরাবাস্তববাদী চিত্রকরের শিল্পকর্ম মনে করিয়ে দেয়। ছিলা টানটান করা উৎকণ্ঠা, নৈরাশ্য, ভয় আর আশাবাদের ঝলকানিসহ জীবনের রহস্যময় রূপকে তিনি কোন মাধ্যমে প্রকাশ করলেন, উপন্যাস না ছবিতে – আমরা যেন ধন্দে পড়ে যাই। উত্তর-আধুনিক উপন্যাসের এখনো অনেকটাই অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ঢুকে পড়ার বিরল অভিজ্ঞতা ঘটে যায় পাঠকের।